

# বনফুল

# রচনাবলী ০২

# বনফুল রচনাবলী

## দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী ঃ
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ ঃ
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

# সূচীপত্র

# নির্মোক

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
গোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৫২ সাল
তৃতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৩৫৫ সাল

মুদ্রক
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়,
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা

সাড়ে চার টাকা

স্বনামধন্য গল্পলেখক

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

# নির্মোক



## প্রথম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম সেদিনকার কথা এখনও আমার আবছা-ভাবে মনে আছে। মনে হইয়াছিল কি অদ্ভুত কৃতিত্বই না অর্জ্জন করিলাম, একটা দুর্জ্জয় দুর্গ যেন জয় করিয়া ফেলিয়াছি! আমাদের কালে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, দুর্ভেদ্য দুর্গজয়ের মতই কঠিন ব্যাপার ছিল। যদিও মনে মনে জানিতাম যে এই দুর্গজয় ব্যাপারে আমার বীরত্ব অপেক্ষা আমার পিতৃ-বন্ধু কর্ণেল— এর পৃষ্ঠপোষকতাটাই সমধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল, তথাপি কিন্তু আনন্দটা কিছু কম হয় নাই। আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র—এ যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার! জাঁদরেল কর্ণেলের জোরালো সুপারিশ-সত্ত্বেও কিন্তু খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব বলিয়াছিলেন যে পত্রটি লইয়া আমি যেন স্বয়ং বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। বড়সাহেবই ভর্ত্তি করিবার মালিক। পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড়সাহেবের আপিসের দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি পাগড়ি লাগানো বেশ কায়দা-দুরস্ত দারোয়ান, অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। সে বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল এবং

অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এ সঙ্কোচটুকু হইত না, কিন্তু আমি পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভনীয় হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিলে হয়ত বে-আইনী কিছু হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না, বসিয়া রইলাম। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত বলা যায় না, এমন সময় হঠাৎ অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লোক, এক কালে আমাদের পরিবারের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—আরে, তুমি হঠাৎ এখানে যে?

উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনিও বার-কয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন ও বলিলেন—এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ী কাছেই।

—আমাকে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—সেই জন্যেই তো বলছি এস আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

ভাবিলাম হয়ত অনাদিবাবুর সঙ্গে আপিসের কাহারও আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপারিশ-পত্র দিবেন। তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—উঠেছ কোথায়?

—একটা হোটেলে।

হোটেলের নাম ঠিকানা বলিলাম।

—আমাদের বাড়ী উঠলেই পারতে!

—আপনি যে এখানে আছেন তা জানতাম না।

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—তুমি এই বেশে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাচ্ছিলে, মাথা খারাপ না কি

তোমার! এই আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তালি-লাগান জুতো—মাই গড্!

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম।

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল, তা না হ'লে হয়েছিল আর কি—! এস এই গলিটার ভেতর—

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমেই বাড়ীতে ঢুকিয়া চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুমার্জ্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার সাজান। প্রতিটি জিনিষে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। টেবিলের উপরে কাগজচাপা দিবার ছোট প্রস্তরখণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোণের শেল্‌ফে চমৎকার করিয়া বাঁধান বইগুলি, তাকের উপর ছোট টাইমপিসটি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন। যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয়, তবু তৈরি হচ্ছিল যখন—। মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেল দিকি আগে! ওই যে নাপিতও এসে গেছে! ওরে, বাবুর চুলটা বেশ ভাল ক'রে কেটে দে দিকি, বেশ দশ-আনা ছ-আনা করে! নাও, চা-টা খেয়ে নাও তুমি—

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম, সে আবহাওয়ায় দশ-আনা-ছ-আনা চুলকাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-

আনা-ছ-আনা চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্য্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় সুতরাং একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে বিস্মিতও কম হই নাই। আমার মুখ-ভাবে অনাদিবাবু মনের কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধ হয়, বলিলেন—অমন নোংরা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যাণ্ট আছে ?

—না।

—আচ্ছা, আমি সে-সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত—দেখি।

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবিতেছিলাম ঐ টেড়িকাটা টিনের বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব কি না, এমন সময় অনাদিবাবু একটি পত্র হস্তে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এই দেখ তোমার বাবারও চিঠি এসেছে।

দেখলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফস্বলের কলেজ হইতে পাস করিয়াছি, বড় শহর সম্বন্ধে আমার তেমন ধারণা নাই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন, কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না, এদিকে ভর্ত্তি হওয়ার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না, জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর

মুখে অনাদিবাবুর খবর পাইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি ক'রো না—

উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম।

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক ফিট করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত তাহা আমাকে ঠিক ফিট করবেই বা কেন, জামাটা একটু ঢিলা এবং প্যাণ্টালুনটা একটু আঁট হইল। অনাদিবাবু তাহাতে কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং 'টাই'টা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া, একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—বাঃ চমৎকার হয়েছে—ফেমাস্!

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া। অনাদিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতাজোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

—ফস্ ফস্ করছে না কি?

ঠিক উলটা—ভয়ানক আঁট হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন—ফিতেগুলো একটু আলগা ক'রে দাও, হাঁটতে যদি লাগে একটা গাড়ী ক'রেই যাই না হয় চল, পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার, দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল!

সত্য সত্যই গাড়ী করিয়া যাইতে হইল। অত-আঁট জুতা পায়ে দিয়া বেশী দূর হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি-দেওয়া জুতা পরিয়া যাওয়া আরও অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়ীই একটা ডাকিতে হইল।

আপিসে গিয়া শুনিলাম, সাহেব টিফিন খাইতেছেন, আধ ঘণ্টা পরে দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায়

প্রকাশ্য ভাবেই একটা টাকা বকশিশ দিলেন এবং সাহেবের সহিত দেখা হইয়া গেলে আর এক টাকা দিবেন আশ্বাস দিলেন।

দেখা হইয়া গেল। বড়সাহেব তাঁহার বাল্যবন্ধু কর্ণেল—এর চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে, আমি দরখাস্ত করিয়াছি কি না! বলিলাম—করিয়াছি।

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। হেড ক্লার্ক সসম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব হুকুম করিলেন যে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। হেড ক্লার্ক চকিতে একবার আমার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই এক বোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর। দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং সভয়ে লক্ষ্য করিলাম যে, আমার কলেজের প্রিন্সিপাল ( অর্থাৎ যে কলেজ হইতে আমি আই. এসসি. পাস করিয়াছি তিনি ) আমার দরখাস্তের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। নিয়ম অনুসারে প্রিন্সিপালের থ্রু দিয়াই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। বাইবেল ক্লাসে কামাই করতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন, ভয় হইতে লাগিল তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া থাকেন। সে ভয় শীঘ্রই কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, প্রিন্সিপাল আমার খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রী প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিলটা লইয়া আমার দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—সিলেক্টেড। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সহিত হেড ক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন

মনে হইল। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বড়সাহেবের বাল্যবন্ধু কর্ণেল—আমার পৃষ্ঠপোষক সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে আমি ভর্ত্তি হইয়া গেলাম।

দীর্ঘ ছয় বৎসরে অনেক কিছুই শিখিলাম।

অ্যামিবা হইতে সুরু করিয়া কেঁচো, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ, মাছ, খরগোস, গিনিপিগ এবং সর্ব্বশেষে মানুষ—মৃত এবং জীবন্ত মানুষ চিরিয়া জীবজগতের নানা বৈচিত্র্যের আভাস পাইলাম। সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর দেহে নানা প্রকার ঔষধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ব্যাধির নানা মূর্ত্তি, প্রসব করানো, অস্ত্র-চিকিৎসা, জীবাণু-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জুরিস-প্রুডেন্স শিখিবার আর বাকি কিছু রহিল না। সৎ এবং অসৎ উপায়ে পরীক্ষার গাঁটগুলিও একে একে পার হইলাম। অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম বইকি! সে কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ডিগ্রি-লাভই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে নিখুঁত নীতি-পথে চলিলে সব সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোলটা টানিয়া রাখ—ইহাই ছিল সকলের সত্য মনোভাব। সুনীতির একটা মুখোস অবশ্যই ছিল, কিন্তু আজ একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে তাহা মুখোসই ছিল, আর কিছু ছিল না।

বিগত ছাত্রজীবনের কথা ভাবিতে গিয়া কয়েকটি ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনেক ছবি মুছিয়া গিয়াছে, এই কয়টি কিন্তু এখনও বেশ উজ্জ্বল হইয়া আছে, হয়ত মনে বিশেষভাবে দাগ কাটিয়াছিল বলিয়া এখনও অবলুপ্ত হয় নাই।

নগেন বলিয়া একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। আমরা সংক্ষেপে তাহাকে 'নগা' বলিতাম। ছোটখাট মানুষটি, গলার স্বর কিন্তু ছিল

বাজখাঁই। শুনিতাম সে গাঁজা খায়। ইহাই অবশ্য তাহার পূর্ণ পরিচয় নয়, সে রেস খেলিত এবং আরও অনেক কিছু করিত। সুতরাং পড়িবার সময় পাইত না। একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দুই জন কাবুলিওয়ালা মেসে আসিয়া তাহার বাক্স-পেঁটরা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। নগেনের পক্ষ লইয়া আমরা কাবুলিওয়ালাদ্বয়কে হাঁকাইয়া দিবার জন্য দল বাঁধিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলাম। নগেন কিন্তু আমাদের নিবৃত্ত করিল। সে হাসিয়া বলিল যে, সুদে আসলে ধারের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে বাক্স-পেঁটরা বেচিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশও বেচারারা উশুল করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কাবুলিওয়ালা বাক্স-পেঁটরা লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় নগাও কোথায় অদৃশ্য হইল। শুনিলাম সে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন নগেনের দেখা নাই। তাহার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় দর্শন দিলেন। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছি, সার্জিক্যাল আউট-ডোরে আমাদের ডিউটি। হঠাৎ নজরে পড়িল, আউট-ডোরের বারান্দার এক ধারে দাঁড়াইয়া নগা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বলা বাহুল্য, বিস্মিত হইলাম।

—কি রে, নগা যে, এত দিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে ?

বাজখাঁই কণ্ঠকে যতটা মৃদু করা সম্ভব ততটা মৃদু করিয়া নগা বলিল —ভাই, বগলে একটা মাছের কাঁটা ফুটেছে, বার ক'রে দে, বড় কষ্ট হচ্ছে।

—বগলে মাছের কাঁটা ফুটল কি ক'রে ? সাধারণত লোকের গলাতেই মাছের কাঁটা ফুটে থাকে ?

—আমি যে আবার পরীক্ষা দিচ্ছি, জানিস না ? আজ জুলজি প্র্যাকটিক্যাল ছিল।

নগা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তবু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বগলে কাঁটা ফুটল কি ক'রে ?

—আচ্ছা বোকা ত তুই দেখছি ! কাল সন্ধ্যের সময় ডোমটাকে আনা-আষ্টেক বকশিশ দিয়ে জেনে গেলাম যে আজ কি পড়বে। ওই ব্যাটারাই তো সব জোগাড় করে। ব্যাটা আমাকে বললে আজ ভেটকি মাছ পড়বে। আমি বাজার থেকে একটা ছোট ভেটকি কিনে আমাদের মেসের হরিচরণকে দিয়ে সেটা ডিসেক্‌ট্‌ করিয়ে কামিজের তলায় বগলদাবা ক'রে নিয়ে গেলাম। ভেটকি যদি দেয় ওই ডিসেক্‌ট্‌ করা মাছটা তাক-মাফিক বের করব। কিন্তু ভাই গিয়ে দেখি মাছ নয়, ব্যাঙ ! কি করি, সেই ডিসেক্‌টেড ভেটকি বগলে ক'রে খানিকক্ষণ ঠায় ব'সে। তার পর আস্তে আস্তে সেটা পাচার ক'রে ব্যাঙটাই চিরলাম। কি হয়েছে ভগবানই জানেন। ডোমটার আক্কেল দেখ দিকি ! কি করবে বেচারা, ওর দোষ নেই, ওই যে নতুন একজামিনারটা হয়েছে ও-ই লাষ্ট মোমেণ্টে ভেটকির বদলে ব্যাঙ দিতে বললে। ডোম ব্যাটা তো তাই বলছে। তুই এখন কাঁটাটা বের কর দিকি—

কাঁটা বাহির করিয়া দিলাম, নগা চলিয়া গেল

নগার কথা শুনিয়া আপনারা যেন মনে করিবেন না যে সব ছেলেই নগার মত। ভাল ছেলে ঢের ছিল, কিন্তু নগাও ছিল। সত্যিকার ভাল ছেলে ছিল, আবার নকল ভাল ছেলেও ছিল। অধ্যয়ন করিয়া এক দল ছেলে ভাল হয়, পরীক্ষকের মনোরঞ্জন করিয়া আর এক দল ছেলে ভাল হয়। পরীক্ষকদের 'হুইম্' ও 'হবি'র খবর রাখা আমাদের ছাত্র-জীবনের মস্ত বড় একটা কর্তব্য ছিল, এবং ভালমন্দ সকল ছেলেরই লক্ষ্য ছিল ডিগ্রী—বিদ্যা নয়।

আমাদের সময় একজন সিনিয়ার হাউস-সার্জ্জন ছিলেন। প্রাচীন লোক, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সদয় ব্যবহার। অমন লোক দেখা যায় না। আমাদের কিসে ভাল হইবে, ভদ্রলোক অহরহ সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা ঢের বয়স কম ছোকরা এক আই. এম. এস. অফিসার হঠাৎ তাঁহার মনিব হইয়া আসিলেন। মিলিটারি সার্ভিসের লোক, মেজাজও মিলিটারি। কারণে-অকারণে সে মেজাজ দেখাইতেও তিনি কার্পণ্য করিতেন না। প্রাচীন হাউস-সার্জ্জনটিকে এক দিন অকারণে সকলের সামনে তিনি অপমান করিয়া বসিলেন। আমি আজও তাঁহার সেই আর্ত্ত অপমানিত অসহায় মুখচ্ছবি ভুলিতে পারি নাই। তাঁহাকে একা পাইয়া বলিয়াছিলাম—স্যার চাকরি ছেড়ে দিন আপনি।

—তিন ফিগারের চাকরি, ভাই, ছাড়া কি সহজ!

একটু হাসিলেন। হৃদয়বিদারক সেই হাসিটুকু আজও মনে আছে।

আর একটা ছবিও মনে পড়িতেছে। তখন ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে আমাদের ডিউটি। আমাদের কাজ ছিলো আউটডোরে যে-সব রোগিণী আসে তাহাদের ব্যাধির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট কি, কতদিন হইতে ভুগিতেছে, এই সকল বিবরণ জানিয়া এবং সম্ভবপর হইলে আন্দাজি একটা রোগ নির্ণয় করিয়া আমরা আউটডোর-টিকিট লিখিয়া রাখিতাম। অধ্যাপক মহাশয় আসিলে তিনি প্রত্যেক টিকিটখানি লইয়া রোগিণীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া এবং টিকিট-লেখক ছাত্রটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া রোগ ও রোগিণীর সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন। এক দিন এই ইডেন আউটডোরে আমার চতুর্থ রোগিণীকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার কি হয়েছে?

—জানি না।

—কোন কষ্ট নেই আপনার?

—না।

—এখানে এসেছেন কেন তাহ'লে ?

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, পেটে একটা কি যেন হয়েছে তাই দেখাতে এনেছি।

আউটডোর-টিকিটে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। একটু পরে আমাদের অধ্যাপক আসিয়া পড়িলেন এবং যথানিয়মে একের পর এক রোগিণীদের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এই রোগিণীটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তিনি সন্তানসম্ভবা। ইঁহার লক্ষণাদি লইয়া অধ্যাপক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলেন। তাহার পর আবার নূতন একটা রোগিণী আসিল, তাহার পর আবার একটা। বারোটা পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল, রোজ যেমন চলে।

আউটডোর শেষ করিয়া বাহির হইয়াছি হঠাৎ নজরে পড়িল সেই মেয়েটি গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। চারি দিকে চাহিয়া সেই ভদ্রলোকটীর চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ আগেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এইবার লক্ষ্য করিলাম মেয়েটীর মাথার সিঁদুর নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হিন্দু ঘরের বিধবা।

—এখানে কোন্ ঠিকানায় আপনি থাকেন ?

মেয়েটি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—হ্যারিসন রোডের ওধারে কোথায় যেন—

—নম্বর জানেন ?

—না।

একটা ক্লাস ছিল, সুতরাং বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার অবসর ছিল না।

তাহাকে বলিলাম—আপনি এইখানে ব'সে থাকুন, আমি আসছি একটু পরেই আবার।

—আচ্ছা।

ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটিকে কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। তাহার বড় বড় সজল চোখ দুইটি কিন্তু মনের ভিতর আঁকা আছে।

আর একটা ছবিও আঁকা আছে।

ইমারজেন্সি-রুমে ডিউটি সেদিন। গভীর রাত্রি, টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেদিন যিনি ও. ডি. অর্থাৎ অফিসার-অন-ডিউটি ছিলেন, তিনি বসিয়া ছিলেন না, শুইয়া ছিলেন। বর্ষার রাত্রি, একটু মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। আমাদের বলিয়াছিলেন যে, খুব জরুরি কাজ না আসিলে যেন তাঁহাকে না উঠানো হয়। আমি এবং আর এক জন ছাত্র জাগিয়া বসিয়া ছিলাম। সেই সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছি, ক্রমাগত সিগারেট খাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে দুই জন পুলিশ একটি আহত গুণ্ডাকে লইয়া ইমারজেন্সি-রুমে প্রবেশ করিল। গুণ্ডার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। বাম চোখের ভ্রূর উপর হইতে সুরু করিয়া প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা, রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। ও. ডি. মহাশয়কে উঠাইতেই হইল—পুলিশ-কেস। আমরা দুই জনে মিলিয়াই কিন্তু চিকিৎসাটা করিলাম, তিনি অবশ্য বলিয়া দিলেন। প্রচুর আইওডিন দিয়া প্যাট প্যাট করিয়া সেলাই করিয়া দিলাম। লোকটা ঠায় বসিয়া রহিল—হুঁ হাঁ কিছুই করিল

না। রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া ও. ডি. মহাশয় আবার শুইতে গেলেন। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

—মারামারি করতে গেছলে কেন ?

সে পরিষ্কার উর্দ্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা এই যে, প্রাণ থাকিতে সে তাহার স্ত্রীর অপমান সহ্য করিবে কি করিয়া ! সূচ্যগ্র-দাড়ি বলিষ্ঠ, দীপ্তচক্ষু সেই গুণ্ডার মুখখানা এখনও ভুলি নাই। তাহার উক্তি সত্য কি মিথ্যা, আচরণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে-সব বিচার করিবার অবসর ছিল না। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা উন্নতমস্তক গুণ্ডাটার মুখে সেদিন রাত্রে যে দুর্লভ মহিমা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের ওয়ার্ডে বুড়া-গোছের একটি রোগী আসিয়া এক দিন ভর্ত্তি হইল। তাহার লিভারের কাছটায় উঁচু, চক্ষু দুইটি হলুদ। সকলে ভাবিলাম, লোকটার নিশ্চয়ই কোনকালে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই এই দুর্গতি। বুড়া তারস্বরে অস্বীকার করিতে লাগিল, তাহার ওসব কিছুই কোনকালে হয় নাই। আমরা কেহই সে-কথা বিশ্বাস করিলাম না; তাহার রক্ত পরীক্ষা করানো হইল। রক্তেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। তখনও কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হইল না, রক্তদুষ্টির চিকিৎসাই কিছু দিন করিয়া চলিল। অনেক দিন চিকিৎসার পর যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন মনে হইল লিভারে বোধ হয় ক্যানসার হইয়াছে। অবশেষে কিছু দিন পরে বুড়ার মৃত্যু হইল। তাহার তিন কুলে কেহ ছিল না, তাহাকে পোষ্টমর্টেম করিবার সুযোগ আমরা পাইলাম। পেট চিরিয়া দেখা গেল লিভার ঠিক আছে, লিভারের ঠিক নিচেই একটা

টিউমার হইয়াছে। চিকিৎসার দোষে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা নয়, সে মরিতই, পেটের ভিতর সারকোমা হইলে কেহ বাঁচে না।

কিন্তু আমাদের কত ভুল হয়!

আর মনে পড়িতেছে সেই মড়াগুলির কথা।

সেই মড়াগুলি, যাহারা স্বেচ্ছায় নয়, অসহায় বলিয়া আমাদের ছুরির তলায় আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের চিরিয়া চিরিয়া আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, যাহারা ডাক্তারিবিদ্যারূপ মহাবজ্রনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াও দধীচির গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, যাহাদের সংসর্গে আমাদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়াছে অথচ যাহাদের আমরা চিনি নাই, সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত বিকৃত বীভৎস মড়াগুলির কথা এখনও ভুলি নাই। সেই প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে—সেই যেদিন অ্যানাটমি হলে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল সামনের টেবিলটার উপর রহিয়াছে মড়া নয়, একখানা কাটা হাত।

ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায় এম. বি. বসিয়া বসিয়া আত্মজীবনচরিত লিখিতেছিল। ডাক্তারের পক্ষে কাজটা অদ্ভুতই। ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী লেখার কোন সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। বিমলের নিজের কাছে কিন্তু ইহার একটা সঙ্গত কৈফিয়ত ছিল। সময় কাটানো চাই ত! হাসপাতালে ছয় মাস হাউস-সার্জ্জনি করার পর হইতে সে একরূপ বেকার অবস্থাতেই বাড়ীতে চুপচাপ বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে একটা বৎসর কাটিয়া গেল, সুবিধা-মত কিছুই জুটিতেছে না। পিতামাতা মারা গিয়াছেন, বোনগুলির

বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নাবালক ভাই নাই তথাপি কিন্তু বিমল নির্ঝঞ্ঝাট নয়। পিতা তাহার স্কন্ধে কিছু ঋণ এবং একটি বধূ চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বধূ মণিমালা আপাতত বাপের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে বটে এবং এম. বি. ডাক্তারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও হয়ত নিজের এম. বি. স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে কিঞ্চিৎ মোহ পোষণ করিতেছে, কিন্তু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে এ মোহ কতদিন টিকিবে। কেবল মাত্র ডিগ্রিটা আস্ফালন করিয়া বেশী দিন তাহাকে মুগ্ধ রাখা যাইবে না। কিন্তু উপায় ত তেমন কিছু—

বিমল পুনরায় ঝুঁকিয়া আত্মজীবনচরিত সুরু করিতে যাইতেছিল এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাজির হইল এবং একটি খামের চিঠি দিয়া গেল। বিমল উল্টাইয়া দেখিল, মণির চিঠি নয়—অত্যন্ত অপরিচিত হস্তাক্ষরে এ কাহার চিঠি! চিঠিখানা পড়িয়া কিন্তু তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লাগিয়া গিয়াছে তাহা হইলে! মাহিনা মাত্র পঁচাত্তর টাকা—তা হোক! ফ্রি কোয়াটার্স আছে, হাতে একটা হাসপাতাল আছে। আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটা মুড়িয়া রাখিয়া সে উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২

ট্রেন আধ ঘণ্টা লেট ছিল। পৌঁছিবার কথা সাড়ে ন-টায়, দশটা বাজিয়া গেল। উদগ্রীব বিমল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিল, ষ্টেশনের চেহারাটা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইল না। অতি ছোট্ট ষ্টেশন, এখানে ওখানে দুই-তিনটা কেরাসিনের আলো টিমটিম করিয়া

[illegible]ছে, জাঁকজমক দূরের কথা, একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম পর্য্যন্ত নাই। বিমল মনে মনে দমিয়া গেল। কুলির সাহায্যে নিজে স্যুটকেস, বিছানা এবং মাইক্রোস্‌কোপের বাক্সটা লইয়া সে নামিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল যদি সেক্রেটারি মহাশয় কোন লোক পাঠাইয়া থাকেন। নজরে পড়িল ওদিকের একটা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখে ভয়ানক ভিড়, একটা কলরব উঠিয়াছে। , এমনই গাড়ীতে যথেষ্ট ভিড়, ইহার উপর আবার এতগুলি লোক চড়িবে! বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

—কোথা যাবেন বাবু আপনি, ? কুলিটা প্রশ্ন করিল।

—হাসপাতালটা কত দূরে, জানিস ? মিউনিসিপাল হাসপাতাল ?

—কাছেই।

থার্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল।

—ওখানে কি হ'ল ?

—কি জানি বাবু।

একটি লোক ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল; প্রশ্নটা শুনিয়া বলিল—ও কিছু নয়, একটা বুড়ী পড়ে গেছে, এমন সব হুড়মুড়িয়ে উঠতে যায়!

গার্ডসাহেব হুইস্‌ল দিয়া নীল বাতি নাড়িতে লাগিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার ভিড়ের কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—এই উঠে পড় সব, উঠে পড় সব, ট্রেন ছাড়ছে!

যে যেমন পারিল উঠিয়া পড়িল, বিমল একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল, আহত বুড়িটা তালগোল পাকাইয়া একটা পুঁটুলির মত ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া আছে। ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। বিমলের কৌতূহল হইল, একটু আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া সে বুড়িটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

—আরে মোলো এ মাগী এখানে পড়ে রইল যে।

একচক্ষু লণ্ঠনহস্তে বিব্রত স্টেশনমাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিমল বলিল—ওর লেগেছে। আপনার আলোটা দিন তো একটু দেখি—

দেখা গেল বুড়ীর আঘাত সত্যই গুরুতর; তাহার শতছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিল, রক্তপাতের ফলে বেশ দ্রুত হইয়াছে। স্টেশনমাস্টার চীৎকার করিতে লাগিলেন—ভাগিয়া ভাগিয়া, এ ব্যাটা আবার কোথা গেল—চন্দু চন্দু—স্ট্রেচার নিকালকে এই বুড়িয়া কো হাসপাতাল মে লে যাও! যত ফ্যাসাদ জুটবে মশাই আমারই ডিউটির সময়! কাণ্ড হ'ল কি—

বিমল বলিল—কোন্ হাসপাতালে পাঠাবেন?

—আমাদের রেলওয়ে হাসপাতালে, জগুবাবুর কাছে, আর কোথা—

—কতদূর এখান থেকে?

—তা বেশ দূর আছে, মাইল-দুই হবে—

বিমল হাসিয়া বলিল—এখুনি কিন্তু এর ব্যবস্থা করা দরকার। মিউনিসিপাল হাসপাতাল কত দূর?—

—সে তো কাছেই—ঐ তো দেখা যাচ্ছে! কিন্তু ও হাসপাতালের বিলিব্যবস্থাই আজব রকম। ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকে না, ওষুধ থাকে তো ডাক্তার থাকে না! এক পাগলা ডাক্তার আছে—তার শুনছি চাকরি, গেছে—এই চন্দু—চন্দু—

—আমিই মিউনিসিপাল হাসপাতালের নতুন ডাক্তার, এই ট্রেনে এলাম—

—ও তাই নাকি—তা বেশ বেশ—পরেশ বাবুর কাছে শুনছিলাম বটে—বেশ বেশ ! চন্দু—এই চন্দু—

চন্দু দুধ দুইতে গেছে ।

ঘরের ভিতর হইতে কে যেন বলিল ।

—ও তাই নাকি,—ভাগিয়াটা গেল কোথা—

একটু ইতস্তত করিয়া স্টেশনমাস্টার মহাশয় বলিলেন—আপনার কাছেই পাঠিয়ে দি তাহলে বুড়ীটাকে—ভালই হ'ল !

—আমি এখনও হাসপাতালে পা-ই দিই নি, আচ্ছা বেশ দিন ।

—আমি তাহ'লে এগিয়ে যাই, হাসপাতালটা কোন্ দিকে বলুন তো ?

—আমি জানি বাবু, চলুন,—কাছেই ।

যে-কুলিটা বিমলের জিনিষপত্র নামাইয়াছিল, সে-ই বলিল ।

—পাঠিয়ে দিন তাহ'লে, আমি চললাম—নমস্কার ! বেশী দেরি করবেন না যেন, বুড়ীর অবস্থা সুবিধের নয় ।

—এখুনি দিচ্ছি, আপনি এগোন ।

কুলির পিছনে পিছনে বিমল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মটা পার হইয়া কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় একটা টর্চের তীব্র আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল ।

—আরে, বিমল যে এসে পড়েছ দেখছি—বাঃ !

—পরেশ-দা ! আপনি কোথা থেকে ?

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—আমি আজকাল এখানেই পোস্টমাস্টার —সম্প্রতি এসেছি । বদ্দিবাবু সেদিন যখন বললেন যে এবার যে নতুন ডাক্তার আসছে তার নাম বিমল চাটুজ্যে, তখনই আমার সন্দেহ

হয়েছিল যে এ আর কেউ নয় আমাদের সেই বিমল—ওরে ওদিকে কোথা যাচ্ছিস্ ?

কুলি বলিল—বাবু বললেন যে হাসপাতালে যেতে।

বিমল বলিল—আমার কোয়ার্টার্সটা কোন্ দিকে বলুন তো ?

চলিতে চলিতে পরেশ-দা বলিতে লাগিলেন—তোমার কোয়ার্টার্স এখন খালি নেই, আগেকার ডাক্তারবাবু এখনও আছেন, চার্জ দিয়ে তবে ছাড়বেন। তুমি ক-দিন আমার বাসাতেই থাকবে আপাতত, বদ্যিবাবু তাই বলেছিলেন আমাকে। আমারই উপর ভার ছিল তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করবার। আমার ক্যাশ মেলাতে মেলাতে দেরি হয়ে গেল, ঠিক সময়ে আসতে পারলাম না। একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—ক্যাশও মিললো না—অথচ—যাক তুমি ঘরের লোক তোমার কাছে নো ফরম্যালিটি—

পরেশ-দা স্মিতমুখে বিমলের পানে চাহিলেন।

বিমল বলিল—আমাকে কিন্তু হাসপাতালে এক বার যেতে হবে।

—এত রাত্রে কেন ?

—একটা রুগী জুটেছে স্টেশনে।

—তাই নাকি !

পরেশ-দা কুলিটাকে বলিলেন—আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি, তুই জিনিষগুলো আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আয়—

—আচ্ছা বাবু। কুলি চলিয়া গেল। পরেশ-দা তখন বিমলকে বলিলেন—চল এইবার তোমার হাসপাতালে যাওয়া যাক। কি রুগী ?

—একটা বুড়ী স্টেশনে পড়ে গেছে তাকেই নিয়ে আসবে।

—ও।

ক্ষণকাল থামিয়া পরেশ-দা বলিলেন—গুপিবাবু আছেন কি না সন্দেহ, চল দেখা যাক্।

—গুপিবাবু কে ?

—কম্পাউণ্ডার।

—কোথায় থাকেন তিনি ?

—হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডেই তাঁর কোয়ার্টার্স, কিন্তু তিনি প্রায় এ সময়টা থাকেন না, পাশা খেলতে যান চৌধুরীদের বৈঠকখানায়।

কথাটা বিমলের ভাল লাগিল না। পাশা খেলিতে যান! জিজ্ঞাসা করিল—হাসপাতালে ইনডোর রুগী তো থাকে।

কুড়িটা বেড আছে বটে, তবে থাকে না বিশেষ কেউ। হয়ত দুই-এক জন আছে, ঠিক জানি না আমি—এই এসে পড়েছি এবার—এই তোমার হাসপাতাল—

বিমল অন্ধকারে আবছাভাবে যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতেই তাহার বেশ ভাল লাগিল—নিতান্ত ছোট তো নয়। চতুর্দ্দিকে কিন্তু অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়া নাই।

পরেশ-দা হাঁকিতে লাগিলেন—জান্‌কী, জান্‌কী—

গেটের পাশের ঘরটা হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। পরেশ-দা বলিলেন—এই হচ্ছে হাসপাতালের মেথর। তাহার পর জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইনি হচ্ছেন নূতন ডাক্তারবাবু।

জান্‌কী ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

পরেশ-দা প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর কোথা, ভৈরব কোথা ?

ঠাকুর হাসপাতালের পাচক এবং ভৈরব চাকর। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে লাগিল পরেশ-দা অনেক খবর রাখেন তো হাসপাতালের! জান্‌কী বলিল, তাহারা বাহিরে গিয়াছে।

—গুপিবাবু ?

নিকটেই গুপিবাবুর বাসা, জান্‌কী খোঁজ লইয়া আসিল, গুপিবাবু এখনও ফেরেন নাই।

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—বললাম তিনি চৌধুরীর ওখানে আছেন। ওরে, তুই বসবার ঘরটা খুলে দিয়ে একটা লণ্ঠন জেলে দে, আর গুপিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, বলগে যা নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন ডাকছেন। এক কাজ কর, তোর রুক্‌মিকে না-হয় পাঠা কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে আনুক, তুই ঘরটরগুলো খোল—

হাসপাতালের ভিতর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কে যেন কাতরাইতেছে।

বিমল প্রশ্ন করিল—ও কিসের শব্দ !

জান্‌কী বলিল—ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী আছে।

বিমল না ভাবিয়া পারিল না, ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী গোঙাইতেছে অথচ আলো নাই, কম্পাউণ্ডার নাই, চাকর-ঠাকুর কেহ নাই, এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা।

স্ট্রেচার-বাহিত হইয়া স্টেশনের রোগীটিও আসিয়া পড়িল। বিমল জান্‌কীকে বলিল—একটা আলো চাই।

—রুক্‌মি, রুক্‌মি, বাত্‌তি লেআ—

মেথরের বউ রুক্‌মি শশব্যস্ত হইয়া একটা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইল এবং বিমলকে একবার আড়চোখে দেখিয়া বাতিটা হাসপাতালের বারান্দার উপর নামাইয়া রাখিল।

পরেশ-দা রুক্‌মিকে বলিলেন—তুই কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় চট ক'রে—বল্ নূতন ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কম্পাউণ্ডারবাবু সন্ধ্যার সময় কোথায় থাকেন তাহা সকলেই জানে,

সুতরাং রুক্মি কোন প্রশ্ন করিল না, চৌধুরীবাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেল। লে-বাতিটা রুক্মি রাখিয়া গেল। সেটা হাসপাতালেরই বাতি, ঐ কালাজ্বর রোগীটার কাছেই থাকিবার কথা, কিন্তু রুক্মিরাই ওটা রোজ ব্যবহার করে। রুক্মির রান্না তখনও সমাপ্ত হয় নাই, অসময়ে এই সব উপদ্রব তাহার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু নূতন ডাক্তারবাবু কি রকম মেজাজের লোক তাহা ঠিক জানা নাই। লক্ষ্য করিলে বিমল রুক্মির মুখের অপ্রসন্নতাটুকু দেখিতে পাইত। একটা জিনিষ কিন্তু বিমল লক্ষ্য করিল—জান্‌কীটি বেশ কাজের লোক, ইংরাজীতে যাহাকে বলে এক্‌স্‌পার্ট। সে অল্প সময়ের মধ্যে কপাট খুলিল, আর একটা আলো জ্বালিল। স্টেশন হইতে আগত বুড়ীটাকে টেবিলের উপর শোয়াইল, একটি ক্ষুদ্র ধমক দিয়া কালাজ্বর রোগীর গোঙানি বন্ধ করিল, টিঞ্চার আইওডিন, তুলা ব্যাণ্ডেজ বাহির করিল এবং সাবানের কৌটাটা বিমলের হস্তে দিয়া জলপূর্ণ মগহস্তে বারান্দার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল বুড়ীর আঘাত গুরুতর।

হাতের কনুইয়ের কাছে একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছে এবং অবিরাম রক্ত পড়িতেছে। আইওডিন তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে এ রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরও খানিকটা চিরিয়া আর্টারিটাকে বাঁধিয়া দিলে যদি কিছু হয়।

জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বিমল প্রশ্ন করিল—ছুরি-টুরি কোথায় আছে?

—আলমারিতে।

—চাবি কোথা?

—এখানেই আছে বাবু।

জান্‌কী চট্‌ করিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবির একটা থোলো আনিয়া বিমলের হস্তে দিল এবং সার্জিকাল আলমারির চাবি কোন্‌টা তাহাও দেখাইয়া দিল। ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই, অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে বুড়ীর শরীরে যতটুকু রক্ত আছে বাহির হইয়া যাইবে। বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া ছুরি, আর্টারি-ফরসেপ্‌স, কাঁচি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিল।

পরেশ-দা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—অপারেশন করবে নাকি?

বিমল একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—ও ছাড়া উপায় নেই—

বিধি অনুযায়ী ছুরি প্রভৃতি স্টেরিলাইজ করা উচিত, কিন্তু তাহা করিবার সময় নাই, খানিকটা লাইজল থাকিলেও হইত, কিন্তু তাহাও হাতের কাছে পাওয়া গেল না। টিঞ্চার আইওডিন দিয়া যতটা হয়।

জান্‌কী লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল, বিমল অপারেশন সুরু করিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে বেশী বেগ পাইতে হইল না, ছিন্ন শিরার মুখটা চট্‌ করিয়াই পাওয়া গেল। ...অপারেশন শেষ করিয়া বিমল যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে তখন পরেশ-দা বলিলেন—এই যে গুপিবাবুও এসে গেছেন।

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রৌঢ় একটি লোক ঘাড়টি ঈষৎ নামাইয়া চশমার কাচের উপর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কাঁচাপাকা গোঁফ, গলদেশে একটি পাকানো চাদর। বিমলের সহিত চোখাচোখি হইতেই গুপিবাবু মুখে একটু হাঁসির ভাব টানিয়া আনিয়া নমস্কার করিবার মত একটা ভঙ্গী করিলেন।

বিমল প্রশ্ন করিল—অ্যান্টিটেটানাস সিরাম আছে?

গুপিবাবু মুখটা ফিরাইয়া মুচকি হাসিটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—ওসব কোথা পাবেন এখানে—

—হাসপাতালে নেই ?

—না।

—বাজারে পাওয়া যাবে !

—জগদীশবাবুর দেকানে পাওয়া যেতে পারে বোধ হয় উনি একটু আপ্‌-টুডেট্।

—তাই একটা কিনে আনুন, কিনে এনে দিয়ে দিন এক্ষুনি।

গুপিবাবু দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। সাবান দিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বিমল বলিল—যান চট্ করে নিয়ে আসুন, আমি লিখে দিচ্ছি—কাগজ-কলম কোথা, হাত ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে বিমল পুনরায় বলিল—কই কাগজ-কলম দিন।

গুপিবাবু একটা তটস্থ ভাব দেখাইয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় জানকী কাগজ-কলম আনিয়া হাজির করিল। বিমল প্রেসক্রপশন লিখিয়া দিতেই গুপিবাবু সেটা লইলেন এবং চশমার কাচের উপর দিয়া মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—জগদীশবাবুর দোকানে নগদ দাম না দিলে—

—ও

বিমল ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দশ টাকার একখানা নোট গুপিবাবুর হাতে দিয়া বলিল—এই নিন, যান।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন।

হঠাৎ বিমলের নজরে পড়িল সেই কালাজ্বর রোগীটাও উঠিয়া আসিয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড়গুলা গোনা যাইতেছে। হঠাৎ

এই রাতদুপুরে অপারেশনের অস্বাভাবিকতা তাহাকেও বিচলিত করিয়াছে। বিস্মিতভাবে সে বিমলকে দেখিতেছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

—আমি? কই না।

তাহার পর জান্‌কীর দিকে একবার মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া পুনরায় বিমলের দিকে ফিরিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল—আমি কেন চেঁচাতে যাব বাবু, দয়া ক'রে এখানে থাকতে দিয়েছেন সেই আমার ঢের—আমি মুখটি বুজে পড়ে আছি। মন্থর পদক্ষেপে সে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বেচারা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে।

জান্‌কী বুড়ীটাকে বিছানায় শোওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। বিমল উঠিয়া গিয়া তাহার নাড়ীটা একবার দেখিল। দেখিল খুব দুর্ব্বল। ব্র্যাণ্ডি দিয়া একটা ঔষধের প্রেসক্রপশন লিখিয়া সে জান্‌কীকে বলিল যে কম্পাউণ্ডার বাবু আসিলে এই ঔষধটা যেন খাওয়াইয়া দেন।

—আচ্ছা হুজুর।

—চল বিমল, এবার যাওয়া যাক। পরেশ-দা বলিলেন।

—হ্যাঁ চলুন।

—তোমার বৌদি নেই, নিজেদেরই গিয়ে রান্নাবাড়া করতে হবে। ক্যাশটাও মেলাতে হবে আমাকে—

বিমল অন্যমনস্ক ছিল। বলিল চলুন।

রুক্‌মি বারান্দার থামের কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল।

পরেশ-দা ও বিমল গেট হইতে বাহির হইতে-না-হইতে সে ছোঁ মারিয়া লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিমল নিজের বাসাটা দেখিতে গেল। গঙ্গার ধারে ছোটখাট বাসাটি বেশ চমৎকার—একটু দূর হইতে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিমল দেখিতে লাগিল। পরেশ-দা সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন—পাগলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না কি এখুনি।

বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিতেছিল মণির এ-সাটা পছন্দ হইবে কিনা। মণি আবার একটু খুঁতখুঁতে ধরণের। এই মফস্বল জায়গায় হয়তো তাহার—

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—দেখা করবে নাকি! এখনও হয়ত ওঠেই নি পাগলা।

বিমল বলিল—বেশ তো চলুন না,—সত্যিই পাগল নাকি?

—ছিট আছে।

কাছে আসিয়া দেখা গেল, বাড়ীর দরজাটা খোলা রহিয়াছে।

—প্রকাশবাবু, ও প্রকাশবাবু।

শব্দ শুনিয়া লোম-ওঠা একটা কুকুর বাড়ীর ভেতর হইতে সুট করিয়া বাহির হইয়া গেল: পরেশ-দা একটু হাসিলেন।

—প্রকাশবাবু—

—কে—

রক্তচক্ষু বিরাটবপু প্রকাশবাবু অসম্বৃত বসনটা সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। কুচকুচে কালো রং, প্রকাণ্ড ভারি মুখ, সদ্যনিদ্রোত্থিত বলিয়া চোখ দুটি লাল লাল।

—কি চান?

ইনিই নতুন ডাক্তার, বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে —কাল রাত্তিরে এসেছেন।

প্রকাশবাবু ক্ষণকাল বিমলের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিলেন ও তৎপরে বলিলেন—ও আসুন, নমস্কার।

—নমস্কার।

বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল তুমি তাহলে আলাপ-টালাপ ক'রে এস আমার ওখানে। আমি যাই ডাকগুলো কাট্‌তে হবে—

—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই বিমলের চোখে পড়িল উঠানের উপর একটা দড়ির খাটিয়ায় বাঁখারিসহযোগে একটি মশারি টাঙানো আছে ঠিক বলা চলে না কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। খাটের এক ধারে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন বসান রহিয়াছে এবং তাহার পাশেই বিখ্যাত ডাক্তারি কাগজ 'ল্যান্‌সেট' একখানা। উঠানের মাঝামাঝি একটা তার খাটানো, তাহাতে একখানি গামছা শুকাইতেছে।

বিমল বলিল—আপনার বুঝি বাইরে শোয়া অভ্যেস?

চকিতে একবার খাটিয়াটার পানে চাহিয়া প্রকাশবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, কি শীত কি গ্রীষ্ম! আসুন ভেতরে বসা যাক।

ঘরের ভিতর গিয়াও বিমল দেখিল প্রকাশবাবুর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। ঘরের ভিতর একটি চৌকি, একটি টেবিল আর একখানি চেয়ার রহিয়াছে।

—একাই ছিলেন নাকি এত দিন এখানে?

—না, ফ্যামিলি জিনিষপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, এই বার আপনার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে আমিও রওনা হয়ে পড়ব—হা-হা-হা—বসুন, বসুন।

প্রকাশবাবু চৌকিটাতে উপবেশন করিলেন, বিমল চেয়ারে বসিল। বিমল একটু ইতস্তত: করিয়া অবশেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন এখান থেকে ?

—আপনি ঐ কথা জিজ্ঞেস করছেন আর আমি ক-দিন থেকে ভাবছি আমি ছিলাম কেন এখানে এতদিন ? নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই তো নেই—হা-হা-হা-হা—

—কতদিন ছিলেন আপনি এখানে ?

—ছ-মাস, তার আগে ছিলাম চা বাগানে, কিছু দিন জাহাজে জাহাজেও ঘুরেছি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডেও ছিলাম কিছু দিন। কিন্তু এখন দেখছি নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই আর বেশী নেই, এইবার ডিসেন্ট্‌লি যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

—কোথাও ঠিক করেছেন না কি কিছু ?

—ঠিক ? ঠিক কি কখনও কিছু হয় মশাই ! জনসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথাও-না-কোথাও ভিড়ে পড়ব আবার ! তবে এবার ডিসেন্ট্‌ কিছু না দেখলে আর সহজে ভিড়ছি না। গান শুনব অক্রূর-সংবাদ পয়সা দেব একটি—ওর মধ্যে আর নেই আমি—হা-হা-হা-হা—

বিমল অনুভব করিল এই বিকট হাসির জন্যই বোধ হয় সকলে ইহাকে পাগল আখ্যা দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ভদ্রলোকের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বারপ্রান্তে ভৃত্য-জাতীয় এক ব্যক্তি দর্শন দিল।

—বাবু, কাল আবার আপনি কপাট খুলে রেখে শুয়েছিলেন কুকুরে সব খেয়ে গেছে—

—আবার !

চক্ষিতের মধ্যে প্রকাশবাবর মখের হাসি নিবিয়া গেল, দারুণ ক্রোধে

সমস্ত মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল। বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখুন, কতকগুলো লোম-ওঠা খেঁকি কুকুর আছে এ পাড়ায়, এ পাড়ায় কেন সর্ব্বত্রই—মিউনিসিপালিটিকে ব'লে ব'লে আমি হার মেনে গেলুম মশাই, এক ধার্ম্মিক চেয়ারম্যান জুটেছে সে কিছুতেই কুকুর মারতে দেবে না। অথচ প্রতি বছরই পাগলা কুকুরে লোককে কামড়াচ্ছে! আর আমি তো নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম—দিজ্ ডগ্স্ আর প্লেইং হেল্ উইথ্ মি—জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে! ব্যাটাচ্ছেলে ভণ্ড কোথাকার!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

ভৃত্যটি ইতস্ততঃ করিতেছিল—প্রকাশবাবু বলিলেন ভৈরব, ইনিই নূতন ডাক্তারবাবু, চা-টা খাওয়াও এঁকে, কিছু খাবারও নিয়ে এস।

ভৈরব ঝুঁকিয়া বিমলকে প্রণাম করিল।

প্রকাশবাবু বলিলেন—ও ঘরের তাকে একটা খালি সিগারেটের টিনে কিছু পয়সা আছে দেখো—

ভৈরব চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই খালি সিগারেট-টিনটি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

—কই, একটি পয়সাও তো নেই এতে বাবু!

—নেই? সে কি, এই তো পরশুদিন একটা টাকা ভাঙিয়ে রেখেছিলাম।

নিরীহের মত মুখ করিয়া ভৈরব বলিল—খরচও তো হয়েছে, কাল তেল আনালেন, সিগারেট আনলাম, আরও সব যেন কি কি—

প্রকাশবাবু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

—ভাল কথা মনে পড়েছে, সিগারেট খান আপনি, ওরে আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আয়।

ভৈরব চলিয়া গেলে একটা স্যুটকেস তিনি চৌকিটার তলা হইতে

টানিয়া বাহির করিলেন। বিমল দেখিল স্যুটকেসে চাবির বালাই নাই। ডালাটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রকাশবাবু বিমলের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন—আর একটি মাত্র বাকি রইল, তার পর স্যুটকেসটা পুনরায় চৌকির তলায় ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—একেবারে নিঃস্ব হবার আগে সরে পড়তে চাই —হা-হা-হা-হা—চলুন আজি আপনাকে চার্জটা দিয়ে দিই—

ভৈরব সিগারেট ও দিয়াশালাই লইয়া আসিতেই প্রকাশবাবু তাহার হাতে দশ টাকার নোটটি দিয়া বলিলেন—এইটে ভাঙিয়ে চট্ ক'রে কিছু খাবার আনো গিয়ে।

বিমল বলিল—কেন ও-সব হাঙ্গামা করছেন।

প্রকাশবাবু বিমলের দিকে এক বার মাত্র চাহিয়া পুনরায় ভৈরবকে বলিলেন—ওই চণ্ডীর দোকান থেকে নিও না যেন, একের নম্বর স্কাউণ্ড্রেল ব্যাটা, দেরি ক'রো না, চা করতে হবে, যাও।

বিমল পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রকাশবাবু সে অবসর দিলেন না, কাপড়ের কসিটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন—এই জায়গা-টার কুকুর বিড়াল মানুষ বাঁদর সব পাজি, আপাদমস্তক পাজি—

—তাই নাকি ?

—উক্ !

একটু পরে বিমল যখন পরেশ-দার বাসায় ফিরিয়া গেল তখন তাহার প্রকাশবাবুর সম্বন্ধে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। লোকটার পড়াশোনা অদ্ভুত, এ-রকম স্থানে তাঁহার বিদ্যাবত্তা বুঝিবার লোক না থাকাই [illegible]। বায়োকেমিস্ট্রি সম্বন্ধে যেরূপ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, বিমলই সব কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ-রকম লোকের কোথাও অধ্যাপ[illegible]

হওয়া উচিত। কিন্তু—। ঐ 'কিন্তু'তেই আমাদের দেশে সব কিছু আটকাইয়া যায়। ঐ 'কিন্তু'টা যে কি জটিল বস্তু তাহা বোঝানো শক্ত। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বলিলেন—হ্যাঁ এদিকে বেশ লেখাপড়া জানেন ভদ্রলোক, এম. এসসি, এম. বি—কিন্তু ঐ এক দোষ। ঠিক সময়ে হাসপাতালে যেত না, বকছে ত বকছেই, হাসছে ত হাসছেই, চটলে ত রক্ষে নেই খুনই করে ফেলবে। বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—চল তোমাকে এইবার বদ্যিবাবুর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই, কাছেই বাড়ী। ওহে হরেন, তুমি ততক্ষণ থেকো একটু এখানে, আমি আসছি একটু বদ্যিবাবুর বাসা থেকে— আমি এলে তার পর বেরিও—

হরেন বলিল—আজ্ঞে আচ্ছা!

হরেন পিওন। পরেশ-দা এখানে পোস্টমাস্টার হইয়া আসাতে হরেন বেচারারই বিপদ হইয়াছে। পরেশদার চিরকালকার স্বভাব নিজের চরকাটি ছাড়া সকলের চরকায় তৈল প্রদান করা। আশেপাশের সকলের সব খুঁটিনাটি খবরটি তাঁহার রাখা চাই, সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা চাই, প্রত্যেক ব্যাপারেই সুযোগ পাইলে মুরুব্বিয়ানা করা চাই। পরেশ-দা এখানকার ফুটবল ক্লাবের রেফারি, সারস্বত মন্দির অর্থাৎ বাংলা লাইব্রেরীর সেক্রেটারি, কংগ্রেসী বদ্যিবাবুর সহচর, স্থানীয় যুবক-সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আঢ্যিদের টেনিস ক্লাবের কর্ণধার। সুতরাং যেরূপ অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য করা উচিত তাহা তিনি করিতে পারেন না। হরেনকেই অর্দ্ধেক কাজ দিতে হয়। রোজই রাত্রে ক্যাশ লইয়া দুর্ভাবনা হয়, কিছুতে

না। অথচ পরেশ-দার উপর সকলেই খুশী। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই উনি এখানে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—এই বদ্দিবাবু লোকটির ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স এখানে, মাড়োয়ারিমহল ওঁর কথাতেই ওঠে বসে। বদ্দিবাবুকে যদি খুশী করতে পার মাড়োয়ারি-মহলে তোমার একচেটে প্রাক্‌টিস হয়ে যাবে।

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া পরেশ-দা বলিলেন—তোমাকে না-দেখেই তুমি চাটুজ্যে শুনেই তোমার উপর একটা টান হয়েছে। এদিকে বদ্দিবাবুর একটু, যাই বল তুমি, ইয়ে আছ। উনিই তো হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি, তুমি চাটুজ্যে ব'লে উনি কি কম লড়েছেন তোমার জন্যে! তোমাদের কমিটিতে হরেন বোস ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁরও একজন নিজের লোক ছিল ক্যাণ্ডিডেট্, কিন্তু বদ্দিবাবুর সঙ্গে হরেন বোস পারবে কেন, ভোটে হেরে গেল! বদ্দিনাথ চাটুজ্যের সঙ্গে পারা বড় চাট্টিখানি কথা নয়!

বিমল বলিল—তাই না কি!

—নিশ্চয়! পুরুষসিংহ যাকে বলে! গিয়েই প্রণাম ক'রো' খুশী হবেন! ভারি অমায়িক লোক এদিকে।

—কি করেন?

—ওকালতি, বেশ ভাল প্রাকটিস ক্রিমিনাল সাইডে—

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁর বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হ'লে কে চিকিৎসা করে?

—জগদীশবাবুর সঙ্গে ওঁর ভাব আছে যথেষ্ট, কিন্তু উনি ডাক্তারি ওষুধ বিশেষ পচ্ছন্দ করেন না, উনি কবরেজি কিংবা হাকিমি ওষুধের পক্ষপাতী—

—ও, তাই নাকি ?

বিমল ভাবিয়া পাইতেছিল না কি উপায়ে এই পুরুষসিংহটিকে খুশী করিতে পারিবে। ডাক্তারি ঔষধই যে ব্যক্তি পছন্দ করে না তাহাকে খুশী করা তো সহজ হইবে না! নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বিমল বলিল—পরেশ-দা, বেশী দেরি করা চলবে না, প্রায় সাতটা বাজে, হাসপাতালে যেতে হবে। প্রকাশবাবু সাড়ে সাতটায় যাবেন বলেছেন, তাছাড়া কালকের সেই রুগীটা কেমন রইলো জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছে—

পরেশ-দা বলিলেন—না বেশী দেরি হবে না।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আটঘাট বেঁধে নিয়ে তার পর কাজ সুরু করে' দাও না তুমি! এ-বেলা বদিবাবু তো হয়ে গেল ও-বেলা চেয়ারম্যান আর জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আপাতত নিশ্চিন্দি! বাকি মেম্বারদের সঙ্গে তার পর ধীরেসুস্থে দেখা করিলেই চলবে—

—চেয়ারম্যান কে ?

—রাখাল নন্দী, ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বাই, কিন্তু টাকার কুমীর। তোমাদের হাসপাতালের ইনডোর রুগীদের খাওয়ার খরচ ওই একা দেয়।

একটু থামিয়া বিমল বলিল—জগদীশবাবু ডাক্তারও কি হাসপাতাল কমিটির মেম্বার না কি ?

—নিশ্চয়ই, বেশ শাঁসালো মেম্বার। ও লোকটিকেও হাতে রাখতে হবে, বড় গভীর জলের মাছ—

বিমল মনে মনে একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সে একা কি করিয়া খুশী করিয়া রাখিবে! ইহা তো রীতিমত সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে! আরও কিছুক্ষণ

চলিবার পর পরেশ-দা বলিলেন—ঐ যে বদ্যিবাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিমল দেখিল একটা বড় বাড়ীর গেটের সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে একটি খদ্দরের ফতুয়া, খদ্দরের একটি কাপড় লুঙ্গির মত করিয়া পরা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, হস্তে একটি নিমের দাঁতন।

—পরেশবাবু যে, আসুন আসুন! সঙ্গে ওটি কে?

বিমল অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল চাটুজ্যে, আপনাদের নতুন ডাক্তার—

—আরে, তাই নাকি বাঃ বাঃ বাঃ—আসুন ভেতরে আসুন।

তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—সব খবর পেয়ে গেছি ভোরেই।

বিমল বুঝিতে পারিল না কিসের খবর। বদ্যিবাবু সামনের দাঁতে দাঁতনটাকে বার-দুই ঘষিয়া বলিলেন—আপনার রুগীকে দেখেও এসেছি, ভাল আছে বুড়ী।

তাহার পর বিমলের পিঠটা চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ, এই তো চাই! চাটুজ্যে না হ'লে কি এ আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত? কি বলেন পরেশবাবু, আসুন ভেতরে, আমি ততক্ষণ মুখটা ধুয়ে আসি।

বদ্যিবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরেশ-দার সহিত বিমল ভিতরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ারে বসিল! একটু পরেই বদ্যিবাবুর দুই জন মক্কেল, তিন জন কংগ্রেসকর্ম্মী, সাহায্যপ্রার্থী একটি যুবক, মিউনিসিপালিটির কেরাণী মহেশ বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদ্যিবাবুর সহিত প্রয়োজন।

প্রকাশবাবু সেদিনই চার্জ দিলেন। সমস্তই এমন এলোমেলো ও

অগোছালো অবস্থায় ছিল যে, আইনতঃ চার্জ লইতে গেলে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় দিন লাগিত, প্রকাশবাবুও বিপন্ন হইতেন। খাতাপত্রের কিছুই ঠিক ছিল না। বে-আইনী ভাবে কোনক্রমে গোঁজামিল দিয়া বিমল প্রকাশবাবুকে রেহাই দিয়া দিল। প্রকাশবাবু সেই দিনই দুপুরের ট্রেনে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় বিমলকে বলিয়া গেলেন—আমার ঐ নড়বড়ে চৌকিটা আর হাতল-ভাঙা চেয়ার দুটো আপনাকে দান করে' গেলাম বিমলবাবু। ওগুলো ভাল কাঁঠাল-কাঠে তৈরি, কব্জাগুলো ঠিক নেই খালি—অর্থাৎ আমার মতো অবস্থা—হা-হা-হা-হা—

বৈকালে চেয়ারম্যান রাখাল নন্দীর সঙ্গেও দেখা হইল। নন্দী মহাশয় নিজের বাগানের একটি ছায়া-শীতল স্থানে শ্বেতপাথরের চৌতারার উপর বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন—অম্বরি তামাকের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। নগ্নগাত্র, ক্ষৌরিকৃত মুখমণ্ডল, ভাষা-ভাষা আরক্ত নয়ন, মাংসল নাকের উপর সূক্ষ্ম একটি তিলক, গলায় কণ্ঠী, দক্ষিণ বাহুমূলে মাদুলি, মেদবহুল অতিপুষ্টদেহ নন্দী মহাশয় গরমে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন! পিছনে দুই জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া প্রাণ-পণে হাওয়া করিতেছিল। বিমলের সঙ্গে পরেশ-দাও গিয়াছিলেন। পরিচয় দিতেই অর্থাৎ বিমল চাটুজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তান এই বোধ মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক হইতেই নন্দী মহাশয় শরীরের গুরুভার সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন এবং বেশ একটু ঝুঁকিয়া বিমলকে নমস্কার করিলেন। পরেশ-দা বলিলেন—বসুন, বসুন, আপনি বসুন!

—ওরে দুখানা চেয়ার নিয়ে আয় শীগ্‌গির—ব্রাহ্মণ-সন্তান দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা আর আমি বসব, সে কি একটা কথা হ'ল!

নন্দী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেশীক্ষণ অবশ্য তাঁহাকে

দেরী হইতে হইল না,—দুইখানি চেয়ার শীঘ্রই আসিয়া পড়িল এবং সকলে উপবেশন করিলেন

নন্দী মহাশয় পুনরায় আদেশ করিলেন—ডাব নিয়ে আয়, বরফ দিয়ে আনিস।

পরেশ-দা বলিলেন—আপনার বাড়ীতে বরফ!

নন্দী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের জন্যে রাখতে হয়, আমার মত সকলেই ত আর বাতুল নয়!

পরেশ-দা বলিলেন—আপনি খান না তা শুনেছি।

গড়গড়ার নলে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না! সংস্কার বলে' ত একটা জিনিষ আছে—

কিছুক্ষণ তামাকে টান দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—খাব, আগে আমরা ইলেকট্রিসিটিটা এনে ফেলি, নিজের বাড়ীতে রেফরিজেরেটারে বরফ বানিয়ে তার পর খাব। দাঁড়ান না,—

পরেশ-দা বলিলেন—ইলেক্‌ট্রিসিটি হবে না কি টাউনে?

—চেষ্টা তো করছি, একটা স্কীমও খাড়া করেছি, বাগড়া দিচ্ছেন আমাদের মথুরবাবু—লোকটিকে ত জানেন—অরগুণ নেই বরগুণ আছে—

পুনরায় গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

আবার সহসা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি না হ'লে এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্ট বলুন তো—এই চাকর দুটো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তবু দেহ শীতল হচ্ছে না! ওদেরও তো কষ্ট হয়।

আবার কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিলেন। তাহার পর সহসা বিমলের

দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আপনাদের হাসপাতালেও ত ইলেক্‌ট্রি[illegible]
সুবিধে হয়।

বিমল বলিল—তা হয় বইকি!

নন্দী মহাশয় পুনরায় তাম্রকূটে মন দিলেন। সেদিন রাত্রে লণ্ঠন ধরিয়া অপারেশনের কথাটা বিমলের মনে পড়াতে সে পুনরায় বলিল—ইলেক্‌ট্রিসিটি হ'লে খুব সুবিধে হয়। রাত্রে ইমারজেন্সি অপারেশন ইলেক্‌ট্রিসিটি না থাকলে হওয়া অসম্ভব।

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন—ঐ পয়েণ্টটা টুকে দেবেন ত আমাকে—

হঠাৎ এই পয়েণ্টটা টুকিয়া লইয়া কি হইবে বিমল ঠিক বুঝিল না, তথাপি বলিল—আচ্ছা।

ডাব আসিল। দুই-চারি কথার পর পরেশ-দা ও বিমল গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার প্রাক্কালে নন্দী মহাশয় বলিলেন—হাসপাতালটার বড় বদনাম হয়ে গেছে মশাই আগের ডাক্তারের আমলে। আপনি একটু সামলেসুমলে নিন আবার!

—আচ্ছা

জগদীশ বাবু ডাক্তারের সহিতও আলাপ হইল।

লোকটি অতিশয় মিষ্টভাষী। দেখিয়া মনে হয় তিনি কখনও কাহারও মনে ব্যথা দিতে পারেন না। কাহারও কথার প্রতিবাদ করা, এমন কি ইঙ্গিতেও কাহারও মনে আঘাত দেওয়া যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুখে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। সামনের দিকে নীচে গোটা দুই দাঁত নাই, হাসির ফাঁকে ফাঁকে ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়া লাল-টুক্‌টুকে জিবের ডগাটি প্রায়ই দেখা যাইতেছে। বিমলের পরিচয় পাইয়া

একমুখ হাসিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—আপনার কথাই হচ্ছিল একটু আগে! থামুন এই কটা সেরে নিই, তার পর কথা কইছি আপনার সঙ্গে—সমবেত কয়েকজন রোগী-রোগিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন —আসুন আপনারা ঘরের ভেতর—

পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—আমার ডাকের সময় হ'ল, আমি চললাম, হরেন বেচারা একা সামলাতে পারবে না। তুমি আলাপ-টালাপ করে' এস—বুঝলে?

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল একা বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে জগদীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোকরা বলিতে বলিতে বাহির হইল—তেতো ওষুধ আমার বউ খেতে পারবে না ডাক্তারবাবু, এ ওষুধটা মিষ্টি হবে ত?

জগদীশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার পানে এক বার চাহিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটুকু বারদুই উঁকি দিয়া গেল। বলিলেন—আমি তোমার বউকে চিনি না? ঠিক ওষুধ দিয়েছি। আজ দেখো, ঠিক খাবে—

ছোকরা পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। জগদীশবাবু সস্মিত মুখে বিমলের দিকে চাহিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—এলাম আপনাদের আশ্রয়ে—

জগদীশবাবু কিছু না বলিয়া তেমনই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল—দেখছেন কি অমন করে'?

জগদীশবাবু বলিলেন—আশ্চর্য্য চওড়া ত আপনার কপাল!—

তাহার পরই তাঁহার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোকলা দাঁতের ফাঁকে জিব উঁকি মারিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত বিমলকে কপাল লইয়া কেহ প্রশংসা করে নাই। সে হাসিয়া বলিল—এ-কথা আর তো কখনো শুনি নি!

জগদীশবাবু বলিলেন—আমি বলছি, খুব চওড়া কপাল আপনার—

বিমল কি বলিবে চুপ করিয়া রহিল। জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন লাগছে জায়গাটা?

—মন্দ কি।

—হাসপাতাল কেমন দেখলেন?

—এখনও দেখবার সময় পাইনি, চার্জ নিতেই আজ সমস্ত সকালটা গেল। কাল থেকে দেখা যাবে ভাল করে'। আজ বিকালটা আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতেই কাটল—

—বেশ, বেশ—ভূধরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, কে তিনি?

—তিনি আমাদেরই এক জন—এখানেই প্র্যাকটিস্ করেন। বাজারের ভিতর তাঁর ডিসপেন্সারি।

বিমল প্রশ্ন করিল—এখানে ফিল্ড্ কেমন?

—ঐ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় আর কি আমাদের কজনের! এবার উঠতে হবে আমাকে, তিনটে কল বাকি আছে এখনও—

জগদীশবাবু উঠিতেছিলেন, বিমলও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন সময় একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু, সাবান দেওয়ার জন্য

মাথার চুল উসকোখুসকো, হাতের আঙুলে দামী পাথর-বসানো আংটি। বেশ সভ্যভব্য সুন্দর চেহারা।

—আসুন, আসুন অমরবাবু, তার পর খবর কি, কেমন আছেন—

বিমল অমরকে এখানে দেখিবে প্রত্যাশা করে নাই। সে সবিস্ময়ে বলিল—অমর তুই এখানে!

অমর বলিল—বিমল যে, আরে তুই কোথা থেকে?

—আমি যে এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছি!

—তাই না কি,—যাক বাঁচা গেল! তোরই কথা ভাবছিলাম আজ ক'দিন থেকে!

তাহার পর জগদীশবাবুর দিকে ফিরিয়া অমর বলিল—এ আমার অনেক দিনের বন্ধু, ম্যাট্রিক, আই-এস্‌সি সব একসঙ্গে পড়েছি। ও মেডিকেল কলেজে ঢুকল, আমি জেনারেল লাইনেই থেকে গেলাম। তুই এখানে এসেছিস।

বিমল বলিল—তুই এখানে এলি কোথা থেকে?

—কি মুশ্‌কিল, এইখানেই যে আমাদের বাড়ী—ওপারে।

বিমল জানিত অমর কোন বড় লোক জমিদারের পুত্র কিন্তু এইখানেই যে তাহার বাড়ী তাহা সে এই প্রথম শুনিল। জগদীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—মথুরবাবু আছেন কেমন?

অমর হাসিয়া বলিল—বাবার কথা আর বলবেন না, আমেরিকা থেকে কি এক ওষুধ আনিয়েছেন তাই খাচ্ছেন, আমার ওষুধটা বদলাবেন না কি?

জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন আছেন আপনি?

—সামান্য একটু ভাল।

-ওই তবে চলুক।

—চল গঙ্গার ধারে একটু বসা যাক কোথাও—

জগদীশবাবুকে নমস্কার করিতে গিয়া বিমল সহসা লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখের হাসিটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা নড়িতেছে না।

বাহির হইয়া বিমল প্রশ্ন করিল—হয়েছে কি তোর?

কথাটা শুনিয়া কেমন অপ্রভিত হইয়া অমর বলিল—চল্ সব বলছি—তুই এসেছিস ভাল হয়েছে।

নিকটেই গঙ্গার ধারে একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া উভয়ে উপবেশন করিল। দামী সিগারেট-কেশ হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বিমলকে একটি দিয়া নিজে একটি ধরাইতে ধরাইতে অমর বলিল—সব কথা খুলে বলছি তোকে, কিন্তু ভাই কিছুতে যেন প্রকাশ না হয়। এক ফোকলা ছাড়া আর কেউ জানে না—

বিমল একটু হাসিল, অমর বলিতে লাগিল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, বিমল এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। বড়লোকের ছেলেদের পদস্খলনের সেই সনাতন কাহিনী। সঙ্গদোষে পড়িয়া পদস্খলন, সংক্রামক ব্যাধি, মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজীবন মনস্তাপ এবং জলের মত অর্থব্যয়। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতে এরূপ অনেক কাহিনীই সে শুনিয়াছে! কাহিনী শেষ করিয়া অমর বলিল—মুশ্‌কিল হয়েছে ভাই এখন বিন্নুকে নিয়ে।

—বিন্নু কে?

—সব ভুলে গেছিস দেখছি। নরেটোর বিন্নুকে ভুলে গেলি?

—তাকে বিয়ে করেছিস নাকি?

—হ্যাঁ।

—শুনেছিলাম তোর বাবা-মা'র অমত আছে, বিয়ে হবে না—

—তাঁদের অমতেই লুকিয়ে বিয়ে করেছিলুম, সে অনেক কাণ্ড, তার পর বাবা-মা সব ক্ষমা করেছেন ; বিনু এখন আইডিয়াল হিন্দু বধূ, টিপিক্যাল গৃহলক্ষ্মী যাকে বলে, ব্রত, উপোস, পুজো-মানত ধুপধুনো গঙ্গা-জল গোবরজল নিয়ে বিনু সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছে ! মা-বাবা বউমা বলতে অজ্ঞান ! কিন্তু আমি ভাই মহা মুশকিলে পড়েছি ! বিনু ঘুণাক্ষরে একথা জানে না এখনও !

বিমল বলিল—তার মানে ?

—মানে, ভণ্ডামি করছি। বিনুর কাছে 'পোজ' করেছি আমি কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়েছি এবং গুরুর আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি। তুই ভাই একটা উপায় বলে দে আমাকে-ওপিনিয়ন চাই।

বিমল বলিল—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অমর প্রশ্ন করিল—তুই বিয়ে করিস নি এখনও ?

—করেছি বইকি।

—বউ কোথা ?

—পড়ছে—এবার তার আই-এ পরীক্ষা।

—তার মানে, কি নাগাদ আসবে এখানে ?

—পরীক্ষা হয়ে গেলেই—হচ্ছে পরীক্ষা—

—বিনুর সঙ্গে তাহলে জমবে ভাল. এ-অঞ্চলে কলেজেপড়া মেয়ে আর একটিও নেই—

বিমল হাসিয়া বলিল—ভালই হবে। কত দূর তোর বাড়ী এখান থেকে-

-ওপারে, যাস এক দিন—কালই আয় না। ফেরি ঘাটে পেরিয়ে

মথুরবাবুর বাড়ী কোন্ দিকে বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই। কোন্ সময় আস্‌বি ?

—কাল বিকেলের দিকে চেষ্টা করব। চল্ এখন ওঠা যাক্। তুই সকালে হাসপাতালে আসিস না ?

—আচ্ছা।

সেদিন রাত্রে বিমল মণিমালাকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিল। মনের আবেগে ভবিষ্যৎ জীবনের মনোরম একটি চিত্র আঁকিয়া দিল। হাসপাতালের বর্ণনা, তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটার বর্ণনা, পরেশ-দার অতিথি-পরায়ণতা, অমর ও অমরের স্ত্রীর কথা, নন্দী মহাশয়, জগদীশবাবু, বদিবাবু, গুপি কম্পাউণ্ডার, হাসপাতালের অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার ভুলু, ভৈরব চাকর, শিবু ঠাকুর, জানকী মেথর, এমন কি রুক্মি মেথরাণীর কথা পর্য্যন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বিমল লিখিল —আমার জীবনের পথে তুমিই সঙ্গিনী. তুমি না এলে কিছুই ভাল লাগছে না !

পরেশ-দা আসিয়া বলিলেন—আর একটা কাগজ দেবো ? উঃ একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পিঠ ভরিয়ে ফেললে যে হে তুমি !

বিমল হাসিয়া বলিল—ক্যাশ মিলল আপনার ?

—মিলেছে, যোগে ভুল হচ্ছিল।

—চলুন আমার হয়ে গেছে !

উভয়ে গিয়া খাইতে বসিল। পিওন হরেনই রাঁধিয়াছে আজ।

৪

তাহার পরদিন সকাল হইতে-না-হইতেই বিমল হাসপাতালে গিয়া হাজির হইল। সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে, সাতটা হইতে হাসপাতালের কাজকর্ম্ম আরম্ভ হওয়ার কথা। বিমল গিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল জানকী ঘর ঝাড়ু দিতেছে। বিমল প্রথমেই গিয়া বুড়িটাকে দেখিল, বুড়ি ভাল আছে। তাহার পর কালাজ্বর রোগীটাকে সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, ইহার রক্ত, মলমূত্র সমস্তই পরীক্ষা করা দরকার, তাহার তো নিজেরই মাইক্রস্‌কোপ আছে, সহজেই করিতে পারিবে। জানকীকে ইহার মলমূত্র রাখিতে আদেশ করিল।

—তোমার কি কষ্ট হয় ?

—আমার পেটটা বড্ড ব্যথা করে বাবু, পিলেটা কামড়ায় বড্ড।

—সেই জন্তে বুঝি সন্ধ্যের সময় চেঁচাচ্ছিলে সেদিন।

—না, চেঁচাই না তো কোন দিন আমি, জানকীকে জিজ্ঞেস করুন আপনি। পিলেটা বড্ড কামড়ায় থেকে থেকে, তাই একটু উঁ আঁ করি।

—আচ্ছা, সব ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি তোমার, ভাল হয়ে যাবে।

—আমার পেটের ব্যথার একটুকু ভাল ওষুধ দিন বাবু—

দ্বারপ্রান্তে ভুলু—অ্যাপ্রেন্টিস্‌ ড্রেসার—আসিয়া দর্শন দিল এবং বিমলকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলু আঠার-উনিশ বছরের ছোকরা, শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা বিনীত অথচ সপ্রতিভ ভাব। প্রথম দিন দেখিয়াই বিমলের ইহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—কম্পাউণ্ডার বাবু কোথায় ?

—গঙ্গা নাইতে গেছেন।

—তাঁকে খবর পাঠাও, সাতটা তো বাজে! ঠিক সময় কাজ আরম্ভ করতে হবে!

ডুলু বলিল—আচ্ছা।

সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং সম্ভবতঃ কম্পাউণ্ডার বাবুর বাসাতেই গেল।

বিমল হাসপাতালটা আর একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। ছোটখাট হাসপাতালটি বেশ সুন্দর।

সাতটার সময় কাজ আরম্ভ হইল না। গুপিবাবু ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাস্নানাদি সারিয়া টিকিতে ফুল বাঁধিয়া ও কপালে চন্দনের তিলক কাটিয়া যখন হাজির হইলেন তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিমল মনে মনে চটিয়াছিল, তথাপি ভদ্রভাবেই বলিল—বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনার। কাল থেকে কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে হবে।

গুপিবাবু তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চশমার কাচের উপর দিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না, হাসপাতালের রেজিষ্টারখানা লইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া রুল টানিতে লাগিলেন। বারান্দায় ডুলু জানকীর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ পাকাইতেছিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—এখানে ন-টার আগে কোন রুগীই আসে না।

বিমল দৃঢ়স্বরে বলিল—রুগী আসুক না-আসুক, সকালে সাতটা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত, আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হাসপাতাল খুলে রাখতে হবে।

গুপিবাবু রুল টানিতে টানিতে চশমার ফাঁক দিয়া আর একবার বিমলের মুখের পানে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না।

বিমল নীরবে বসিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধ্বংস করিল এবং তারপর উঠিয়া নিজেই বুড়ির ঘা-টা ড্রেস করিল। সত্যই ন-টার আগে কোন রোগী আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও অতিশয় বাজে রোগী। দাদ, খোস, কানে পুঁজ, কয়েকটা ম্যালেরিয়া—অতিশয় সাধারণ রকম জন পনর দীন দরিদ্র রোগী। বিমল তাহাদেরই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রেসক্রপশন দেখিয়া গুপিবাবু অবাক হইলেন। এসব ঔসধ হাসপাতালে থাকে নাকি! বিমলকে কয়েক বারই প্রেসক্রপশন পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সে মনে মনে দমিয়া গেল। ঔষধ না থাকিলে চিকিৎসা করিবে কিরূপে! সে হাসপাতালের ঔষধের ষ্টক্-বহিটা লইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, কিছুই ঔষধ নাই। অসাধারণ ঔষধের কথা দূরে থাক, অতি সাধারণ ঔষধই নাই। কুইনাইনই যৎসামান্য আছে। প্রকাশবাবুর একটা কথা মনে পড়িল—থাকুন এখানে কিছুদিন, সব বুঝতে পারবেন ক্রমশঃ। আপনি অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছেন, আপনাকে হতাশ করে' দিতে চাই না!

একটু পরে কিন্তু আরও হতাশ হইতে হইল। হাসপাতালের সেক্রেটারির নামে বি. কে. পালের এক চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম্ম এই যে, হাসপাতালের নিকট বি. কে. পালের এখনও প্রায় পাঁচ শত টাকা পাওনা আছে, তাহা যেন অবিলম্বে শোধ করিয়া দেওয়া হয়। বিমল সত্যই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। যে-হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয়, যেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্য্যন্ত নাই, সেখানে সে ডাক্তারি করিবে কি লইয়া? টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল। বিমল প্রত্যাশা করিয়াছিল অমর আসিবে, কিন্তু আসিল না। সে উঠিতে যাইবে, এমন সময়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে একটি লোক আসিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, নন্দী মশায় ডাকছেন আপনাকে এক বার।

-কেন ?

—তাঁর বাড়ীতে ডেলিভারি কেস্ আছে, লেডী ডাক্তার এসেছেন, ভূধরবাবু এসেছেন, জগদীশবাবুকে পেলাম না, আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।

—চলুন।

বিমল গিয়া দেখিল নন্দী মহাশয়কে দুই জন ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বাতাস করিয়া চলিয়াছে। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকিতে একটি শীতলপাটির উপর উপবেশন করিয়া ক্রমাগত ঘামিতেছেন। নিকটে ভূধরবাবুও বসিয়াছিলেন। ভূধরবাবুকে বিমল ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, নন্দী মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিমল দেখিল, ভূধরবাবুর বয়স খুব বেশী নয়, খুব ফরসা রং, বেঁটেখাটো মানুষটি, দেখিলেই কেমন যেন দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়। নাসারন্ধ্র সর্ব্বদাই যেন স্ফীত, ভ্রূযুগল সর্ব্বদাই যেন ঈষৎ উত্তোলিত, অধরে কেমন যেন একটা ব্যাঙ্গ-তিক্ত হাস্য। অদূরে আর একটি চেয়ারে প্রৌঢ়া লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিকও বসিয়া আছেন। বিমল তাঁহাকেও নমস্কার করিয়া আর একটি চেয়ারে বসিল।

নন্দী মহাশয় বলিলেন—জগদীশবাবু এসে পড়লেও বেশ হ'ত!

—জগদীশবাবুকে পাওয়াই মুস্কিল, তাঁর নাইবার-খাবার অবসর নেই।

ভূধরবাবু বলিলেন—নাইবার-খাবার আমারও অবসর নেই! কিন্তু আপনার বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে আসতেই হ'ল! ওপারে দু-দুটো আর্জ্জেণ্ট কেস বসে' আছে আমার জন্যে, তাছাড়া এই দেখুন না—

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এটা না হয় ও-বেলা গেলেও চলবে, ছয় সাত; আট—এটা তো এ-বেলা যেতেই হবে—নয়—দশ—

বিমলের কেমন অস্বস্তি হইতে লাগিল, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিত ইহা আর কিছু নয় হিংসা।

বিমল নির্ব্বিকার হইবার ভান করিয়া বলিল—পেনটা হচ্ছে কতক্ষণ থেকে—

নন্দী মহাশয় বলিলেন—ঘিনঘিনে ব্যথা কাল সকাল থেকে হচ্ছে, মেয়েরা বলছে জিরেন ব্যথা, আপনারা দেখুন।

ভূধরবাবু বলিলেন—ফরসেপস্ দিয়ে টেনে বের করে' দিলেই চুকে যায়, অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলে কি! তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ফরসেপ্স্ তো শেষ উপায়। ফরসেপ্স্ দেওয়ার হাঙ্গামা আছেই, বিপদও কম নয়।

সে বলিল—আমার মনে হয় ঘুমের একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক প্রথমে। এইটেই কি প্রথম বার ?

নন্দী মহাশয় বলিলেন—না এটি তৃতীয়।

—এর আগের দু-বার ত কোন গোলমাল হয় নি ?

—না।

ভূধরবাবুর দিকে চাহিয়া বিমল বলিল—একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার দিয়ে দেখা হয়েছে কি ?

ভূধরবাবু একটু বিচিত্র রকমের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমি কি সেকথা ভাবি নি ভাবছেন ? এসেই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়েছি আমি! এঁদের আবার বৈষ্ণবী ধাত কি না ?

বিমল হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি,—কিন্তু ব্রোমাইডে ত কোন আমিষ নেই—

লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তিনি

বলিলেন—ব্রোমাইড দিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় ফরসেপ্‌স্‌ দিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত!

বিমল বলিল—দেখা যাক্‌ না, ডাইলেটেশন কত দূর হয়েছে?

মিসেস্‌ মল্লিক বলিলেন—তা প্রায় পুরো হয়ে গেছে।

নন্দী মহাশয় চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—জীবনের কোন আশঙ্কা নেই ত?

মিসেস্‌ মল্লিকই রোগী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বলিলেন—না সে কোন ভয় নেই!

—তাহলে আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাই দিয়েই দেখা যাক না, ফরসেপ-মরসেফ আসুরিক ব্যাপার পরেই হবে না-হয়, যদি দরকার হয়। আপনি বিমলবাবু যান একবার দেখে [illegible] নাড়ীটা। ভূধরবাবু আপনিও আর একবার যান—ভূধরবাবুর [illegible] বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল। রোগী দেখিয়া তাহার মত আরও দৃঢ় হইল, ফরসেপ্‌স্‌ দেওয়া উচিত নয়। বাহিরে আসিয়া সে ব্রোমাইডেরই ব্যবস্থা করিল এবং নন্দী মহাশয়ও সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিয়া ভূধরবাবুও তাহা সমর্থন করিলেন। লেডী ডাক্তার যদিও মুখে [illegible] বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে [illegible] মনে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফরসেপ্‌[illegible] হইলে অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইত। পঞ্চাশ টাকার বদলে মাত্র চারটি টাকা লইয়া তাঁহাকে আপাততঃ উঠিতে হইল। লেডী ডাক্তার চলিয়া গেলে ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল লক্ষ্য করিল, ভূধরবাবু ফীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলিলেন না। বিমল যখন উঠিতে যাইতেছে, নন্দী মহাশয় মুখে একটা বিনীত ভাব ফুটাইয়া বলিলেন—আপনার দক্ষিণেটা কত বলুন, আনিয়ে দি—

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক সে পরে হবে এখন—

এক মুখ হাসিয়া নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিলেন।

বিমল চলিয়া যাইবার একটু পরেই ব্যস্তসমস্তভাবে জগদীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—শুনলাম নাকি রমেনের স্ত্রীর কাল থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে!

নন্দী মহাশয় বলিলেন—হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে বৌমার, আপনি এলেন বাঁচলাম। দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। লেডী ডাক্তার, ভূধরবাবু আর আমাদের হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু, সব এসেছিলেন। লেডী ডাক্তার আর ভূধরবাবু ফরসেপ লাগাতে চাইছিলেন, নতুন ডাক্তারবাবু বললেন আগে একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক, এই লিখে দিয়ে গেছেন তিনি দেখুন—

নন্দী মহাশয় বিমলের প্রেস্‌ক্রপশনটি জগদীশবাবুকে দিলেন।

জগদীশবাবু প্রেস্‌ক্রপশনটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন ও গম্ভীর ভাবেই ফেরত দিলেন।

নন্দী মহাশয় পিছনের ভৃত্যদ্বয়কে ধমক দিলেন—ঢুলছিস নাকি তোরা, জোরে বাতাস কর—জগদীশবাবু এই এইখানটায় বসুন আপনি হাওয়া পাবেন, তার পর কি রকম দেখলেন প্রেস্‌ক্রপশনটা—

—আমাদের কেতাব-কোরাণ অনুসারে ঠিকই। তবে বউমার ধাত আমি চিনি কি না, তাই এই ওষুধটার ডোজটা আমি একটু কমিয়ে দিতে চাই।

—দিন।

জগদীশবাবু ব্রোমাইডের ডোজটা একটু কমাইয়া দিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ফোকলা দাঁতের

ফাঁকে জিবটা উঁকি মারিতে লাগিল।—বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনবেন?

—কি বলুন।

—চণ্ডীতলা থেকে একটু মাটি নিয়ে এসে পানাপুকুরের জলের সঙ্গে গুলে পেটে বেশ ক'রে একটি প্রলেপ দিইয়ে দিন। বড় বড় লেবার কেস যেখানে কিছুতে হালে পানি মেলে না, সেখানে ঐ চণ্ডীতলার মাটি মুখ রক্ষে করেছে! ওষুধটা চলুক, কিন্তু প্রলেপটাও দিন।

চণ্ডীতলার মাটি আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল।

৫

কয়েক দিন হইল বিমল নিজের বাসায় আসিয়াছে। নিজের আলাদা একটি চাকরও রাখিয়াছে, কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড, রান্নাবান্না হইতে সুরু করিয়া সব কাজকর্ম্মই সে নিপুণভাবে করে। পরেশ-দাই চাকরটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পিওন হরেনের ভাই যোগেন। সনাতন রীতি, হাসপাতালের চাকরই ডাক্তারবাবুর বাসায় কাজ করিয়া থাকে। এই সনাতন রীতির ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসপাতালের চাকর ভৈরব মনে মনে যৎপরোনাস্তি চটিয়াছিল। এত দিন ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কাজ করার ওজুহাতে সে হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিত, ডাক্তারবাবুর বাজার-হাট করিয়া দিয়া দুই পয়সা উপরি রোজগার করিত, ডাক্তারবাবুর নিকট কিছু বেতনও পাইত। এই অদ্ভুত ধরণের নতুন ছোকরা ডাক্তারবাবুটি আসাতে সমস্তই ওলটপালট হইয়া গেল। সে বিমলের নামে সুযোগ পাইলেই গোপনে একটু-আধটু নিন্দা করিতে লাগিল। কম্পাউণ্ডার গুপিবাবুও চটিয়াছিলেন। বিমলের কড়া হুকুম অনুসারে তাহাকে ঠিক ঠিক সময়ে হাসপাতালে হাজির হইতে হইতেছিল। এ তো বিপদ কম নয়! হাসপাতালে রোগী

ঔষধ কিছু নাই, শুধু সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করা। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকটা কোনক্রমে নমোনমো করিয়া সারিয়া ফেলিতে হয়, বৈকালে ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাগ্দী-পাড়ায়, কুলি-পাড়ায়, মুসলমান-পাড়ায় ঘুরিয়া চার আনা আট আনা দক্ষিণা লইয়া একটু-আধটু প্র্যাকটিস তিনি করিতেন—তাঁহাকে দুই-চারি আনা পয়সা দিলে হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ ভাল করিয়া 'মন দিয়া' তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন এই ভরসায় অনেক গরিব লোকই তাঁহাকে ডাকিত—'সেদিনকার ছোঁড়া' এই ডাক্তারটা আসিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়া ইহার একটা বিহিত করার প্রয়োজন গুপিবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় হাসপাতাল-কমিটির এক জন মেম্বার তো বটেনই, অন্যান্য মেম্বারদের উপরও তাঁহার আধিপত্য আছে। ধনী মহাজন তিনি অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখেন। বদিবাবুর মতন 'দুঁদে' লোকও চৌধুরীকে চটাইতে সাহস করেন না। নানাকারণে চৌধুরী মহাশয় গুপিবাবুর উপর প্রসন্ন। গুপিবাবু তাঁহার বাড়ীর পুরোহিত, অসুখ-বিসুখ করিলে নার্স, প্রতি সন্ধ্যায় পাশাখেলার সহচর এবং সর্বোপরি সুদক্ষ মোসাহেব। সুতরাং কম্পাউণ্ডার হইলেও গুপিবাবু নিতান্ত অক্ষম লোক নহেন, ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই তিনি করিতে পারেন। অনেক ডাক্তার তিনি চরাইয়াছেন! বিমল যদিও মনে মনে গুপিবাবুর মনোভাবটা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ চিন্তা ছিল না। সে সেদিন সন্ধ্যায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল কি করিয়া হাসপাতালে কিছু ঔষধ যোগাড় করা যায়। ঔষধ না থাকিলে সে চিকিৎসা করিবে কি দিয়া। নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন যে প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল তাহাতেই কাজ হইয়াছে,

করসেপ্‌স্‌ লাগাইতে হয় নাই। জগদীশবাবুর চণ্ডীতলার মাটি এবং ভূধরবাবুর হোমিওপ্যাথির কৌটা যে তাহার কৃতিত্বের খানিকটা হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। চণ্ডীতলার মাটির কথা সে শোনেই নাই। তাহার মনে হইল নন্দী মহাশয়ের নিকট গিয়া হাসপাতালের দুরবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে হয়তো তিনি কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। সে উঠিয়া পড়িল। পরেশ-দাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এখনই একবার গেলে হয়। কাল সমস্ত দিন হাসপাতালের কাজেকর্মে অবসর পাওয়া যাইবে না। পোস্টাফিসে গিয়া দেখিল পরেশ-দা নাই, তিনি সারস্বত মন্দিরের মাসিক অধিবেশনে গিয়াছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নাই। বিমল একাই নন্দী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

—আসুন আসুন ডাক্তারবাবু!

নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বিমল উপবেশন করিয়া বলিল—বমেনবাবুর স্ত্রী ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কোন গোলমাল হয় নি, বেশ ভাল আছে।

ইহার পরই বিমল মনে মনে প্রত্যাশা করিতেছিল যে নন্দী মহাশয় তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—চা আনতে বলব, না সরবত?

—চা-ই আনতে বলুন।

চায়ের ফরমাস দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—এই নিদারুণ গ্রীষ্মে

কি করে যে আপনারা চা খান তাই আমি ভাবি। আমার রমেনেরও ঐ, সকাল-বিকাল চা চাই—

চা-পানান্তে বিমল আসল কথাটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া নন্দী মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

—তাই নাকি? এই রকম অবস্থা হাসপাতালের?

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আপনার আগে যে ডাক্তারটি ছিলেন অত্যন্ত চণ্ডাল লোক ছিলেন তিনি মশাই, শুনতাম ঘরে ব'সে ব'সে ব্যাঙ-খরগোস চিরতেন, জ্যান্ত ধরে ধরে চিরতেন—এদিকে হাসপাতাল একেবারে দেখতেন না, তিনিই ডুবিয়ে গেছেন হাসপাতালটাকে সম্পূর্ণরূপে—

বিমল বলিল—কিন্তু তিনি বিদ্বান্ লোক ছিলেন।

—যে বিদ্যেতে জীবে দয়া করার প্রবৃত্তি লোপ পায় তেমন বিদ্যে শেখার প্রয়োজনটা কি তাই আমাকে বুঝিয়ে বলুন!

বিমল বুঝিল, নন্দী মহাশয়কে বুঝানো অসম্ভব। সে চেষ্টা সে করিল না, মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নন্দী মহাশয় গড়গড়ার নলে চক্ষু বুজিয়া টান দিতে দিতে বলিলেন—জীবে দয়াটাই হ'ল গিয়ে পরম ধর্ম্ম, সব শিক্ষার মূল কথা।

বিমল বলিল—তা ত ঠিকই! হাসপাতালের গরিব রোগীগুলোকে দেখলে কষ্ট হয়, বিশেষতঃ তাদের যখন একটু ভাল ওষুধ দিতে পারি না, তখন সত্যি বলছি বড় খারাপ লাগে! আপনার দয়ায় হাসপাতালের ইনডোর রুগীগুলো তবু খেতে পায়—

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

বিমল বলিতে লাগিল—কিন্তু ওষুধটা না থাকলে চিকিৎসা করব কি দিয়ে, এমন কি কুইনিন পর্য্যন্ত নেই—

নন্দী মহাশয় চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—ওটা তো শুনেছি ভয়ানক পয়জন, ওটা যত কম খায় লোকে ততই ভাল! ঐ কুইনিন খেয়েই দেশের লোকগুলো আরও জরাজীর্ণ হয়ে গেল মশাই যাই বলুন আপনারা!

বিমল নন্দী মহাশয়ের ধাত বুঝিয়াছিল, কিছু বলিল না।

কানে-কলম-গোঁজা প্রৌঢ় এক ব্যক্তি একটি খেরোর খাতা হস্তে প্রবেশ করিলেন। এবং সবিনয়ে বলিলেন—চরণ ঘোষের খাজনাটার সুদটা কি—

নন্দী মহাশয় অধীর ভাবে উত্তর দিলেন—কত বার বলব এক কথা! বাপ-পিতামহের বিষয়টা ক উড়িয়ে দিতে বল আমাকে দানছত্তর ক'রে!

কানে-কলম-গোঁজা ব্যক্তি নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যেন কিছুই হয় নাই, নন্দী মহাশয় পুনরায় প্রশান্ত ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ, মাথায় রইল আপনার কথাটা, এবারকার মিটিঙে দেখব চেষ্টা ক'রে যদি কিছু করতে পারি। আসল কথা কি জানেন, ট্যাক্স আদায় হয় না। আমাদের যে ঐ ট্যাক্স-কলেক্টারটি আছে অতি হারামজাদা ব্যক্তি সে। লোকের কাছ থেকে দু-চার পয়সা ঘুস-টুস-খায়—একটি পয়সা আদায় করে না। অথচ ওর গায়ে হাত দেবার জো নেই—বদ্যিবাবুর মক্কেলের দালাল উনি।

নন্দী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন,

বদ্যিবাবুর কানে আবার কথাটা যেন না ওঠে দেখবেন, উনি আমাদের পার্টির লোক, ওঁকে চটানো মুস্কিল!

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নন্দী মহাশয় আরও কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন তাহার পর বলিলেন—কত ডিফিকাল্‌টি যে মশায় তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। যাক্ আপনি ভাল লোক যখন এসেছেন ওষুধ-বিষুধের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে

আরও দুই-চারি কথার পর বিমল বিদায় লইল। অন্ধকার একটা সরু গলি দিয়া বিমল আসিতেছিল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। হাসপাতালকে সে যদি ঠিক মত খাড়া করিয়া তুলিতে পারে পসার জমাইতে দেরি হইবে না। ভূধরবাবু এবং জগদীশবাবুর যেরূপ কলের বহর দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'ফিল্‌ড্' তো নিতান্ত ছোট বলিয়া মনে হয় না। হঠাৎ একটা উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিয়া বিমলের কানে প্রবেশ করিল। উৎকর্ণ বিমল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। অচেনা দুই জন লোক ঘরের ভিতর কথা বলিতেছিল।

—হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটি ছোকরা হলে কি হয়, ডাক্তার ভাল।

—একের নম্বর ধড়িবাজ!

—না না, হরেনবাবু ওকথা বলবেন না। স্টেশন থেকে একটা বুড়িকে কুড়িয়ে এনে নিজের পয়সা খরচ ক'রে চিকিৎসা ক'রে ভাল তো করেছে। আপনাদের হাসপাতালে তো ওষুধপত্তর কিছু নেই!

—ওসব চাল মশাই! এক চালে বাজি মাৎ করবে ভেবেছে, অত সহজে ভোলবার ছেলে হরেন বোস না।

—আমার সঙ্গে অবশ্য এখনও বিশেষ পরিচয় হয় নি, কিন্তু আমার চাকরটা তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে দেখাতে গিছল, খুব যত্ন করে দেখেছে নাকি, খুব সুখ্যাতি করছিল সে।

হরেনবাবু বলিলেন—অতিশয় চালিয়াৎ লোক মশাই, গুপিবাবুর কাছে শুনলাম এমন সব প্রেস্‌ক্রুপশান করে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। চাল দেখাবার জন্যে নানারকম বিদ্‌ঘুটে ওষুধের প্রেসক্রুপ্‌-শান লেখে। সব বুঝি মশাই।

বিমল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। এই হরেন বোসই কি তাহাদের হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার? ইহার কথাই কি পরেশ-দা বলিয়াছিলেন! ভয়ানক লোক তো!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল স্বয়ং বদিবাবু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। প্রকাশবাবুর হাতল-ভাঙা চেয়ারটি ভৃত্য যোগেন বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই উপর বদিবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

—ডাক্তার বাবু নাকি, বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি?

—নন্দী মহাশয়ের কাছে গিছলাম।

—তাঁর পুত্রবধূটির খবর ভাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারই ওষুধে দেখলাম উপকার হয়েছে!

—আপনি কি ক'রে দেখলেন?

স্মিতহাস্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—রাজা কর্ণেন পশ্যতি! চার দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। বদিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন—আপনি কি খুব ক্লান্ত আছেন?

—না, কেন বলুন তো ?

—এক জায়গায় যেতে হবে, একটু দূর আছে।

—বেশ চলুন।

—এখুনি তৈরি ?

—তা নয় তো কি ?

—বাঃ, এই তো চাই, চলুন।

—কতক্ষণ দেরি হবে ?

—ঘণ্টা দুই-আড়াই ওপারে গিয়ে, মোটরে ক'রে মাইল-চারেক। ওপারে সতীশবাবু জমিদার আছেন তাঁদেরই বাড়ীতে।

—কারও অসুখ নাকি ?

—অসুখ আছে এক জনের, সতীশ বাবুর ভায়ের, এ অঞ্চলের সব ডাক্তারই দেখেছেন কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাছাড়া আরও একটা কাজ আছে।

—কি ?

—ওঁদের জমিদারীতে একটা ফৌজদারী হয়ে গেছে : একটা লোক মারাও গেছে, তারই পোষ্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ নাকি পেয়েছেন ওঁরা, তাই আমাকে যেতে লিখেছেন একবার। মোটর পাঠিয়েছেন, আপনাকে দিয়ে রিপোর্টটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই, কি ভাবে জেরা করলে সুবিধে হবে।

—বেশ চলুন। দাঁড়ান, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে নি।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বদিবাবুকে বলিল—আমাদের হাসপাতালে ওষুধ কিচ্ছু নেই, তার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি। এই কথা বলতেই নন্দী মহাশয়ের কাছে গেছলাম আমি।

-কি বললেন তিনি ?

—তিনি বললেন, আগামী মিটিঙে কথাটা পাড়বেন!

—মিটিঙে পেড়ে তো সবই হবে, টাকা কই, ওষুধের দোকানের ধারই এখনও শোধ হয় নি।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বদিবাবু প্রশ্ন করিলেন—কত টাকার ওষুধ হ'লে চলে আপনার আপাতত?

—কিছুই তো নেই, শ-পাঁচেকের কম হ'লে কি ক'রে চলবে!

—পাঁচ শ টাকা! বলেন কি মশাই?

—কিছুই ওষুধ নেই যে?

—দেখি।

সতীশবাবুর ভাইকে পরীক্ষা করিয়া তাহার কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইল।

সতীশবাবু শুনিয়া বলিলেন—সে কি মশাই, কালাজ্বর শুনেছি আসাম অঞ্চলে হয়, কুলিদের।

বিমল হাসিয়া বলিল—আজকাল সর্ব্বত্রই হয়।

—ভদ্রলোকদেরও?

—হ্যাঁ।

সতীশবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাহলে উপায়?

—রক্তটা আজ নিয়ে যাই, পরীক্ষা ক'রে তার পরে ঠিক জানাব।

—রক্ত কি আপনিই পরীক্ষা করবেন? আপনার কি সব যন্ত্রপাতি—

—এর জন্যে যা দরকার তা আমার আছে।

বদিবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে সতীশবাবুর দিকে চাহিলেন। বিমলের রক্ত-পরীক্ষা করিবার সমস্ত সরঞ্জাম আছে এ কৃতিত্ব যেন তাঁহারই!

সতীশবাবু বলিলেন—সিভিল সার্জন একবার দেখেছিলেন, তিনিও রক্তপরীক্ষার কথা বলেছিলেন, কিন্তু জগদীশবাবু মানা করলেন ব'লে আর হয় নি। বললেন, এমনই শরীরে রক্ত নেই, রক্ত পরীক্ষা ক'রে আবার খানিকটা রক্ত নষ্ট ক'রে লাভ কি ? রক্ত নিলে আবার কোন অনিষ্ট-টনিষ্ট হবে না তো ? দেখছেন তো কি রকম দুর্ব্বল !

—না, কোন অনিষ্ট হবে না।

বিমলের কথায় যতটা না হউক বদ্দিবাবুর আগ্রহে সতীশবাবু অবশেষে রক্তপরীক্ষা করাইতে রাজি হইলেন।

রক্ত লইবার সময় সমারোহ ব্যাপার পড়িয়া গেল। একজন মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল, সতীশবাবু ও বদ্দিবাবু দুইজনে দুই পাশে দাঁড়াইয়া রোগীকে ভরসা দিতে লাগিলেন, সতীশবাবুর মা পূজার ঘরে গিয়া সভয়ে ঠাকুরদেবতার শরণাপন্ন হইলেন, বাড়ীর কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা উৎসুক হইয়া দ্বারপ্রান্তে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর চাকর-দাসীদের মুখেও একটা সশঙ্ক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিমলও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। রোগীর তো কথাই নাই, তিনি চোখ বুজিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নেই সমস্ত হইয়া গেল, কোনরূপ অঘটন ঘটিল না। বিমল রক্ত লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

সতীশবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—একটু দুধ খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বলেন ?

—দিন।

—একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেব তার সঙ্গে ?

—ব্র্যাণ্ডি আছে বাড়ীতে ?

সতীশবাবু ও বদ্দিবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল।

সতীশবাবু বলিলেন—আছে।

—দিন তাহলে এক চামচে।

এ ব্যাপার চুকিয়া গেলে বিমল পোষ্টমর্টেম রিপোর্টখানা আত্মোপ্রান্ত পড়িল এবং কি ভাবে জেরা করিলে বদিবাবুর সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া দিল।

সব চুকিয়া গেলে সতীশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে বিমলকে আহারটাও তাঁহারই বাড়ীতে সমাধা করিতে হইল। সতীশবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, বদিবাবুও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহার শেষ করিয়া ফিরিতে বিমলের বেশি দেরি হইয়া গেল। বিমল যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। এত রাত্রে বাড়ী আসিয়াও কিন্তু বেচারা ঘুমাইতে পারিল না। আসিয়াই শুনিল হাসপাতালে শক্ত একটা রোগী আসিয়াছে। ভৃত্য যোগেন খবরটি দিল। বিমলকে তখনই আবার হাসপাতালে ছুটিতে হইল।

বাউরিদের একটি বউ আপিং খাইয়াছে।

অল্পবয়সী এই মেয়েটির মনে কি এমন গভীর ধিক্কার হইল যে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! বিমল যথারীতি সমস্ত ব্যবস্থাই করিল, গলার ভিতর দিয়া রবারের নল চালাইয়া ঔষধ দিয়া সমস্ত পেটটা বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিল, একটি ইনজেকশন দিল এবং গুপিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কফি কোথাও পাওয়া যাবে?

—কফি? আজ্ঞে, না।

—কারও বাড়ীতে নেই? ঠিক ঠিক, পরেশ-দার কাছে আছে। এই জানকী, যা তো নিয়ে আয় চেয়ে আমার নাম করে!

জানকী চলিয়া গেল।

বিমল তখন বাউরি-বউয়ের আত্মীয়স্বজনকে ( অনেকেই আসিয়াছিল ) আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে কেহই কিছু বলিতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর একটি বৃদ্ধা চুপি চুপি বলিল যে, দুখীরাম অর্থাৎ ঐ মেয়েটির স্বামীই ইহার জন্য দায়ী। বিবাহ হইবার পর হইতে সে সুন্দরিকে অর্থাৎ ঐ বউটিকে কিছু তো কিনিয়া দেয়ই নাই, উপরন্তু উহার গহনাগুলি সব বিক্রয় করিয়া সেদিন জমিদারের খাজনা এবং কাবুলিওলার ধার শোধ করিয়াছে। বেচারি সুন্দরি লুকাইয়া লুকাইয়া সংসার-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া দুইটি টাকা অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়া ছিল, ইচ্ছা ছিল একটি রঙীন শাড়ী কিনিবে, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় দুখীয়া তাহাও ছিনাইয়া লইয়া গিয়া তাড়ি-মদে সে টাকা দুইটি নিঃশেষ করিয়াছে। সুতরাং সুন্দরি আপিং না খাইয়া করিবে কি? সত্যই তো, শাড়ী কেনার টাকা দিয়া তাড়ি কেনা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য। বিমল সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, কাল দুখীরামকে ডাকাইয়া সে উহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিবে।

জানকী কফি আনিয়া হাজির করিল। সুন্দরিকে খানিকটা কড়া কফি পান করাইয়া এবং তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া বিমল বাসায় ফিরিয়া গেল। বাসায় গিয়া দেখিল পরেশ-দা বসিয়া আছেন। হাসিমুখে বলিলেন,—তোমার জ্বালায় তো অস্থির দেখছি, সখ ক'রে এক টিন কফি কিনে রেখেছিলাম, সব শেষ ক'রে দিলে যে!

—না, আছে এখনো খানিকটা।

—এই নাও আজ সন্ধ্যার ডাকে এসেছে—সম্ভবত 'হার ম্যাজেষ্টীজ' চিঠি—ভাবলাম দিয়ে যাই।

বিমল দেখিল সত্যই মণিমালার চিঠি।

—সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিছলে? সারস্বত মন্দিরের ফেরত এসেছিলাম একবার।

—একটা কলে গেছলাম, ওপারে।

—জমিয়েছ বল! উঠি এবার, ঘুমোও তুমি।

পরেশ-দা চলিয়া গেলে বিমল মণির চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। অন্যান্য নানা কথার পর মণি লিখিয়াছে, "তুমি অমন একটা বিচ্ছিরি কাগজে চিঠি লিখেছ কেন? ভাল দেখে প্যাড কিনো একটা। সবাই আমাকে ঠাট্টা করছিল এমন!" বিমল একটু হাসিল, নিশ্চিন্তও হইল। মণি ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়াছে।

মানুষের কপাল যখন খোলে তখন সবদিকেই সবরকম সুবিধা হয়। সতীশবাবুর ভায়ের শেষ পর্য্যন্ত কালাজ্বরই সাব্যস্ত হইল এবং সতীশবাবুর পরিচিত মহলে বিমলের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ও অঞ্চল হইতে দুই-একটি দুরারোগ্য রোগীও আসিয়া হাজির হইল। বদ্দিবাবু চাটুয্যে-মহিমায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসপাতালের ঔষধের কিন্তু সুরাহা হইল না। নন্দী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার পর হাসপাতাল-কমিটির একটা মিটিং হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা এ-সম্পর্কে যে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন আপাত-দৃষ্টিতে সেগুলি আশাপ্রদ হইলেও আসলে কিছুই নয়। একটি প্রস্তাব এই, হাসপাতাল-কমিটি মিউনিসিপাল কমিটিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে ঔষধ বাবদ কিছু টাকা হাসপাতালে দেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে, সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হউক তিনি যেন সদর হাসপাতাল হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ এই হাসপাতালে ঋণ-স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মিউনিসিপালিটিতে টাকা নাই, সুতরাং প্রথম প্রস্তাবটিতে যে অনুরোধ

করা হইয়াছে তাহা পালন করিতে মিউনিসিপালিটি অসমর্থ। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী হয়তো কার্য্যকরী হইতে পারিত কিন্তু বিমল শুনিল যে বর্ত্তমানে যিনি সিভিল সার্জন তিনি নানা কারণে জগদীশবাবুর করায়ত্ত। প্রথমতঃ স্বজাতি, দ্বিতীয়তঃ এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ প্রায়ই তাঁহাকে মোটা টাকার 'কল' খাওয়াইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি এমন কিছুই করিবেন না যাহা জগদীশবাবুর স্বার্থহানিকর। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বিমলের যেরূপ নামডাক শোনা যাইতেছে, তাহাতে জগদীশবাবু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন বই কি। মুখে অবশ্য তিনি বিমলকে সহাস্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যাহাতে সদর হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাওয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। পরেশ-দা বলিলেন, চেষ্টা উনি অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাহা অন্যপ্রকার। পরেশ-দার কথাই ফলিল ; কয়েক দিন পরে সিভিল সার্জন উত্তর দিলেন যে, ঋণ দিবার মত বাড়তি ঔষধ সদর হাসপাতাল অথবা তাঁহার নিজের ভাণ্ডারে নাই।

কোন দিকেই যখন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না তখন অপ্রত্যাশিত রকম একটা সম্ভাবনার সূচনা লইয়া অমর আসিয়া হাজির। সেদিনের পর অমরের সহিত বিমলের আর দেখা হয় নাই। বিমল ভাবিতেছিল নিজেই এক দিন অমরের কাছে যাইবে। যেদিন দেখা হইয়াছিল তাহার পর দিন অমরের নিজেরই আসিবার কথা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমল বলিল—এর নাম বুঝি কাল ?

—আমি এখানে ছিলাম না ভাই, কলকাতা গেছলাম।

—কেন, অসুখের জন্যে ?

—অনেক টাকা খরচ করেছি সেখানে, কিছু হয় নি 'এখন তোমরা

যা কর, কলকাতার উপর আর আমার বিশ্বাস নেই, অসুখের জন্যে যাই নি সেখানে।

—হঠাৎ আমাদের ওপর এত বেশী বিশ্বাস হবার মানে ?

অমর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কি জান ?

—কি ?

—তোমরা থালি প্রাণে মার, আর কলকাতার ডাক্তাররা ধনেপ্রাণে মারেন। অনেক রকম ক'রে দেখেছি ভাই, কিছু হয় নি। আচ্ছা, অনেস্টলি বল তো ভাই সারবে কি না ?

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—সারবে না।

—কখনও না !

—আমার তো মনে হয় না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে, গোড়ায় গোড়ায় চিকিৎসা করালেও বা কিছু আশা ছিল। তুই কিছু দিন লুকিয়ে রেখেছিলি সেইটেই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

অমর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া সিগারেটের ধোঁয়ার 'রিং' বানাইতে লাগিল। বিমলও চুপ করিয়া রহিল। যোগেন দুই পেয়ালা চা সম্মুখে নামাইয়া দিয়া গেল।

এক চুমুক চা পান করিয়া অমর বলিল—যাক গে, সে যা হবার হবে, এখন আমি যে জন্যে তোর কাছে এসেছি শোন।

—কি ?

—আমরা 'বিসর্জ্জন' প্লে করছি। তোকে রঘুপতির পার্ট নিতে হবে। সেবার কলেজে তুই রঘুপতির পার্ট যা করেছিলি চমৎকার !

বিমল ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্লে করিতে হইবে !

—সে কি ! কোথায় প্লে হবে !

—ওপারে আমাদের ক্লাবে, আমাদের বাঁধা স্টেজ আছে বাবার এক কালে খুব সখ ছিল কিনা—বাবাই স্টেজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

—আমার কি ভাই রোজ রোজ রিহার্সাল দেওয়া পোষাবে? একটা হাসপাতালের ভার রয়েছে, কখন কি রোগী এসে পড়ে—

অমর কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। সে বলিল—বেশ তোমার বাড়ীতেই রিহার্সাল দেব আমরা, এখানেই এসে জোটা যাবে সন্ধ্যের পর—ক-টাই বা পার্ট

—ফিমেল পার্ট করবার লোক আছে? অর্পণা কে হবে?

—চমৎকার লোক আছে।

বিমলের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। বলিল—এক কাজ যদি কর ভাই রাজি আছি।

—কি?

—এখানে থিয়েটার দেখবার উৎসাহ কি রকম সকলের?

—খুব।

—পয়সা খরচ করেও দেখতে আসবে? যদি আমরা টিকিট করি?

—আসতে পারে, একবার আমরা করেছিলাম, আড়াই-শ টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল, টিকিট অবশ্য ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রী ক'রে আসতে হয়েছিল—

বিমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—আমি রাজী আছি, এবারও যদি তাই কর। টাকাটা কিন্তু আমার হাসপাতালে দিতে হবে, কিচ্ছু ওষুধ নেই ভাই, মহাবিপদে পড়েছি, এদিকে মিউনিসিপালিটির টাকা নেই, ওদিকে ওষুধের দোকানে ধার জমে আছে—

অমরও সোৎসাহে রাজী হইয়া গেল।

বিমল বলিল—আচ্ছা আমিই তোর ওখানে যাব না হয়। আমার বাড়ীতে রিহার্সালের গুলতালি করা ঠিক নয়। ঠিক পাশের বাড়ীতেই একটা শক্ত টাইফয়েড রোগী আছে।

—কালই তাহলে এস, দিন পনেরো মধ্যে নামাতে হবে বইখানা, আমিও কাল থেকে তাহলে টিকিট বিক্রী করতে লেগে যাই।

—বেশ।

অমর চলিয়া গেল, বিমল একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যদিও আজ অমর বিনুর কথাটা তোলে নাই, তবু বিনুর কথাটা তাহার বার-বার মনে হইতে লাগিল। অমর এ কি নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে!

—ডাক্তারবাবু?

—ভিতরে আসুন।

যাঁহার বাড়ীতে 'টাইফয়েড' তিনিই আসিলেন।

—ভূধরবাবু এসেছেন, চলুন আপনি একবার।

—চলুন, যাচ্ছি।

ভূধরবাবুর সহিত একযোগে বিমল টাইফয়েড রোগীটির চিকিৎসা করিতেছিল। টাইফয়েডের চিকিৎসা করিবার বিশেষ কিছুই নাই। জল গ্লুকোজ আর ডিজিটালিস। তবু একটা চিকিৎসার ভড়ং করিতে হয়, ভূধরবাবু লম্বা প্রেসক্রপশন লেখেন, বিমল আপত্তি করে না। মাঝে মাঝে বিমলের ইচ্ছা করে সমস্ত ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া দিতে; কিন্তু তাহা করিলে গৃহস্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। পশার জমাইবার ইহাই মূলমন্ত্র।

ভূধরবাবু নাড়ীটি টিপিয়া বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া

রহিলেন। তাহার পর বিমলকে বলিলেন—আপনি দেখুন তো একবার পাল্‌স্‌টা।

বিমলও দেখিল, সকালে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল সেই রকমই আছে, বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। জ্বর একটু বাড়িয়াছে, সন্ধ্যার দিকে রোজই বাড়ে, তাই একটু বেশী দ্রুত।

ভূধরবাবু বলিলেন—মকরধ্বজ দেওয়া যাক্‌, কি বলেন!

মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় মকরধ্বজের বিষয় কিছুই পড়িতে হয় নাই, মকরধ্বজ সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। তবে মকরধ্বজের কথা বাল্যকাল হইতে সে শুনিয়াছে, নিশ্চয় ভাল ঔষধ হইবে। এই যে রোজ এত পেটেণ্ট ঔষধের প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন লিখিতেছে, ইহাদের সম্বন্ধেই বা কি এমন বিশেষ জ্ঞান আছে তাহার। তবু লিখিতেছে, অনেক সময় ফলও হইতেছে।

—কি বলেন বিমলবাবু, মকরধ্বজটা দেওয়া যাক।

—বেশ তো, দিন।

—তাহলে দেখুন, খানিকটা আলোচাল জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন, তারপর সকাল বেলা সেই জলটা ছেঁকে তার সঙ্গে মকরধ্বজটা বেশ ক'রে মেড়ে, অনেকক্ষণ ধরে মাড়বেন, মাড়াটাই আসল, বেশ ক'রে মেড়ে তারপর চাটিয়ে চাটিয়ে খাইয়ে দেবেন।

রোগীর পিতা শ্রীহর্ষবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কোন ভয়ের কারণ দেখছেন কি?

—টাইফয়েড রুগীর ভয়ের কারণ সর্ব্বদাই, আটঘাট বেঁধে রাখছি আমরা, কি বলেন বিমলবাবু?

—তা তো বটেই।

ভূধরবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে তাঁহার কলের ফর্দ্দ

বাহির করিয়া বলিলেন—এখনও তিন জায়গায় বাকী, আর পেরে উঠছি না মহাশয়।

শ্রীহর্ষবাবু ভূধরবাবুর দক্ষিণা আনিয়া দিলেন। ঠিক পাশের বাড়ী বলিয়া বিমল কিছু লইতেছিল না। শ্রীহর্ষবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল হাসপাতালের দিকে গেল। হাসপাতালে আরও দুই-তিনটি নূতন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। পুরাতন সেই কালাজ্বর রোগীটি অনেক ভাল আছে,—তাহার পেটে কৃমি ছিল 'হুক ওয়ার্ম'। কৃমির চিকিৎসা করাতে তাহার পেটের ব্যথাটা কমিয়াছে। বিমল রোজ রাত্রে হাসপাতালের রোগীগুলিকে একবার দেখিয়া তবে শুইতে যায়। পরেশ-দা'র পরামর্শ অনুযায়ী সে গুপিবাবুর পাশা খেলাটা একেবারে বন্ধ করে নাই—চৌধুরী মহাশয়কে বেশী চটাইয়া ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। যতক্ষণ গুপিবাবু চৌধুরী মহাশয়ের বাসা হইতে না ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ তুলু, সেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার ছোকরাটি, ইনডোর রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছে। এ ব্যবস্থায় বিমল আপত্তি করে নাই, রোগীদের দেখিবার একজন কেহ থাকিলেই হইল। বিমল হাসপাতালে গিয়া দেখিল তুলু বসিয়া পড়িতেছে। তাহাকে ড্রেসারি পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহারই পড়া পড়িতেছে। এ সময়ে বিমল তাহার পড়ার একটু সাহায্যও করে আজকাল, যে-জায়গাটা বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া দেয়। তুলু এজন্য খুব কৃতজ্ঞ। বিমল আসিতেই তুলু উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রোগীগুলির আর এক বার খবর লইল। বাউরি-বউটি ভাল হইয়াছে। বিমলকে দেখিয়া সে মাথায় ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিল।

বিমল বলিল—তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি কাল বাড়ী চলে যাও। আবার যেন আপিং-টাপিং খেও না! তুথীয়াকে

ডেকে আমি ধমকে দিয়েছি, সে তোমাকে কালই শাড়ী কিনে দেবে।

বধূটি ফিক করিয়া হাসিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল। শাড়ী কিনিবার দামটা যে বিমলই দুখীয়াকে দিয়াছে সে কথাটা সে আর বলিল না। দুখীয়াকেও সে মানা করিয়া দিয়াছিল, কথাটা যেন প্রকাশ না পায়। এই গরিব বধূটির তুচ্ছ একটা শাড়ীর সখ মিটাইয়া সে মনে মনে বেশ একটা প্রসন্নতা অনুভব করিতেছিল।

অন্যান্য রোগীদের দেখিয়া বিমল যখন হাসপাতাল হইতে নামিতেছে তখন বারান্দার অন্ধকার কোণ হইতে একটি দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া খুব ঝুঁকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরিধানে সামান্য একটি কৌপীন, মাথায় রুক্ষ চুল, লোলচর্ম্ম মুখে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খুব লম্বা ও খুব রোগা। চক্ষু দুইটি কোটরগত। অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়।

—আমার অসুখ করেছে বাবু, আমায় ভরতি ক'রে লেন।

অতি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সে বিমলের দিকে চাহিল।

—কি হয়েছে তোমার ?

—জ্বর হয়, বাবু রোজ।

—সকালে আসনি কেন! আচ্ছা এস দেখি।

বিমল ভিতরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কালরোগে ধরিয়াছে—যক্ষ্মা। ইহাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়া কি হইবে! ভরতি করা অনুচিতও, অন্যান্য রোগীদের অনিষ্ট হইতে পারে। তাহাকে সে কথা বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, সে হাসপাতালের বিছানায় শুইতে চায় না, সে ঐ গাছতলাটায় শুইয়া থাকিবে, তাহাকে যেন দুই বেলা দুটি দুটি খাইতে দেওয়া হয়, আর একটু ওষুধ।

—খেতে পাই না বাবু, খেতে পাই না, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম—। অভিভূত বিমল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটা পা ধরিয়া কিছুতে ছাড়ে না। নিরুপায় বিমলকে শেষে ঐ ব্যবস্থাই করিতে হইল। আর কিছুই না হোক লোকটা দুই বেলা খাইতে পাইবে তো। কিন্তু কত দিন ধরিয়া সে এমন ভাবে তাহাকে রাখিতে পারিবে, তাছাড়া কয় জনকেই বা সে এমন ভাবে আশ্রয় দিতে পারে! দেশসুদ্ধ সকলেই যে প্রায় ঐ রকম! রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল ভাবিতে লাগিল যক্ষ্মারোগের শাস্ত্রসঙ্গত যে-সব বিধান আছে স্যানাটোরিয়ম, ভাল খাবার, স্বাস্থ্যকর স্থান—আমাদের দেশের কয়টা যক্ষ্মারোগী তদনুযায়ী চলিতে পারে। যে হতভাগা-দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে সেখানে—

—বিমল না কি ?

টর্চ প্রদীপ্ত করিয়া পরেশ-দা আগাইয়া আসিলেন।

—তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন বলুন তো ?

—নন্দী মশায়ের ওখানে গেছলাম, তিনি বললেন যে, তোমাকে দিয়ে ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখিয়ে তাঁকে দিয়ে আসতে।

—ইলেকট্রিসিটির সম্বন্ধে ছোট প্রবন্ধ! কেন ?

—উনি বলছেন মিউনিসিপাল মিটিঙে যদি পাস হয় ওঁর প্রস্তাবটা, তাহলে ওঁরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার চাইবেন।

—কিসের জন্যে ?

—যাতে মিউনিসিপালিটিতে ইলেকট্রিসিটি হয়! গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা যদি দেয় ওঁরাও সকলে কিছু কিছু দেবেন।

—যে-দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, হাসপাতালে ওষুধ নেই, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কি হবে ? হাসপাতালের ওষুধের বেলায় টাকা নেই অথচ—

—আহা বড়লোকের খেয়াল তুমি বোঝ না।

বিমল কিছু বলিল না, নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ-দাও অকারণে টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া এদিকে-ওদিকে আলো ফেলিতে লাগিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল—প্রবন্ধ নিয়ে কি হবে ?

—নন্দী মশায় বক্তৃতা করবেন।

—কোথায়।

—মিউনিসিপাল মিটিঙে ! বুঝছ না, মিউনিসিপাল বোর্ডে পাস না হলে তো গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করা যাবে না। নন্দী মশায় তোমার প্রবন্ধটা নিয়ে বোর্ডের মেম্বারদের ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা বোঝাতে চান।

একটু থামিয়া পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—ভবী কিন্তু ভোলবার নয়। মথুরবাবুর দলকে কায়দা করা শক্ত।

—মথুরবাবু কি ইলেকট্রিসিটির বিরোধী ?

—ইলেকট্রিসিটির বিরোধী ঠিক নন, নন্দী মশায়ের বিরোধী। নন্দী মশায় যা করবেন মথুরবাবু এবং তাঁর দল ঠিক তার উল্টোটি করবেন।

—মথুরবাবু মানে অমরের বাবা তো ?

—হাঁ।

—অমরবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে তো।

—একসঙ্গে পড়তাম আমরা।

—মথুরবাবুর সঙ্গে বেশী মাথামাথি করলে নন্দীমশায় আবার না চটে যান।

বিমল বলিল—তা ব'লে তো অভদ্রতা করতে পারি না। তাছাড়া আমি ডাক্তার, কোন বিশেষ দলে আমার নাম না থাকাই ভাল। আমি—

নমস্কার ডাক্তারবাবু, সঙ্গে উটি কে, ও পরেশবাবু, নমস্কার নমস্কার।

একচক্ষু লণ্ঠনটি তুলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোক, মোটা অথচ বেঁটে। বিমলকে বলিলেন —আর একবার একটু কষ্ট করতে হবে ডাক্তারবাবু, আমার মেজো ছেলেটার গা-ময় আমবাত না কি যেন বেরিয়েছে, যদি একটু দেখতেন। আমাদের রেলের ডাক্তার জগুবাবুর যা ব্যবসা-সারা দেখা! একটি রোগ সারতে তো দেখলাম না জগুবাবুর হাতে এ পর্য্যন্ত। ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন তাই আমার মেয়ের পেটের অসুখটা সারল।

—চলুন।

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি রুগী দেখে এস তাহলে। আজ কালীবাড়ী থেকে একটু প্রসাদ দিয়ে গেছল, হরেন শুনছি রেঁধেছে বেশ ক'রে, তুমি আমার ওখানেই খেয়ো আজ রাত্তিরে। যোগেনকে মানা ক'রে দিয়েছি রাঁধতে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। বিমল ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুবর্ত্তী হইল। এ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিমলের কয়েকটি ব্যাগারি রুগী জুটিয়াছিল। ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় তো প্রায়ই ডাকিতেছেন। যাইতে যাইতে সমস্ত পথটাই ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় জগুবাবুর নিন্দা করিতে করিতে গেলেন। "মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে লিখে চিকিৎসার

ব্যাপার প্রায় ভুলেই গেছে আমাদের জগমোহন। সার্টিফিকেট নইলেও আবার আমাদের চলে না, জগুকে চটানও মুস্কিল। ইদিকে ভয়ানক কান-পাতলা লোক আবার।"

বিমল বলিল—আপনাদের জগুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে এক দিন।

—সেদিকে জগু ঠিক আছে, আলাপে মোহিত ক'রে দেবে একেবারে। কেউ এক বার গেলেই হ'ল চা রে জলখাবার রে, জগমোহন মিস্ত্রিরের সেদিকে কোন ত্রুটিটি ধরবার উপায় নেই।

জগু-প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনমানসে বিমল বলিল—আপনি কত দিন থেকে আছেন এখানে?

—তা হয়ে গেল বছর-দুই মশাই, এসে থেকে ভুগছি মশায় ছেলেপিলে নিয়ে, এটা ওঠে তো ওটা পড়ে, আর আমার পরিবার তো রোগের একটি ডিপো বললেই হয়, কি যে ওর হয় নি তাই আমি ভাবি!

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কেবল ক্যান্সারটাই হ'তে বাকি আছে বোধ হয়, আর সব হয়ে গেছে। জগু তো টি. বি. ব'লে [illegible]রই করেছে, ভূধরবাবু বললেন, ফ্যারিনজাইটিস্, জগদীশবাবু টনসিল খারাপ, আপনি যদি দেখতে চান দেখুন—হয়রান হয়ে উঠেছি মশায়, পারি না আর।

ষ্টেশন-মাষ্টারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিমল ভাবিল বদিবাবুর খবরটা একবার নেওয়া যাক। সতীশবাবুর ভাইয়ের চিকিৎসা সে করিতেছে বটে কিন্তু এখনও এক পয়সা পায় নাই। তাঁহারাও দেয়

নাই, বিমলও চাহে নাই। এ সম্বন্ধে কি করা উচিত সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বদিবাবু যাহা বলেন তাহাই করা যাইবে। থিয়েটারের কথাটাও বদিবাবুর কানে তোলা উচিত। মথুরবাবুদের সঙ্গে হৃদ্যতার জন্য নয়, হাসপাতালের ঔষধের জন্যই সে এ কার্য্য করিতে রাজী হইয়াছে, তাহা বদিবাবুকে অন্ততঃ জানাইয়া রাখা ভাল। জায়গাটায় যেরূপ দলাদলি তাহাতে বুঝিয়া সুঝিয়া চলাই ভাল। বুঝিয়া চলিলে এ স্থানে বেশ রোজগার হইবে, বেশ বড়লোকের জায়গা। ভূধরবাবুর কথাগুলো তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল, এখনও তিনটে বাকি, আর পারি না মশাই। এই অল্প কয়েক দিনে সে-ও তো এদিকে-ওদিকে দুই-চারিটা রুগী পাইয়াছে এবং সকলেই বিনাপয়সার নয়। হাসপাতালটাকে দাঁড় করাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহার পশার জমাইতে দেরি হইবে না। ঔষধ কিছু অবিলম্বে চাই। বদিবাবুর বাড়ী গিয়া বিমল শুনিল যে বদিবাবু এখানে নাই; কংগ্রেসের কাজে বাহিরে গিয়াছেন, তিন-চার দিন পরে ফিরিবেন।

## ৬

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বনিয়াদি বংশের সন্তান। পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অক্লেশে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল পর্য্যন্ত তাঁহাদের গৌরবময় ইতিবৃত্তি সংগ্রহ করা যায়। নানারূপ দলিল, পাঞ্জা, সনন্দ, তরবারি, উষ্ণীষ, ছবি তাঁহাদের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া এখনও মথুরাবাবুর গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। মথুরামোহনের পিতামহই সম্ভবতঃ এ বংশের শেষ মহিমা। তাঁহার বজরা, ঘোড়া, রোশনচৌকি, তাঁহার অমিত বিক্রম, তাঁহার অহেতুক দয়া, তাঁহার

আকস্মিক ক্রোধের কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত রহিয়াছে। মথুরামোহনের পিতার সময়ে এ অঞ্চলে প্রথম রেল-লাইন আসে, সিগারেট আসে, ক্যামেরা আসে। সুতরাং কোট-প্যান্টালুন পরিয়া সাহেবী কায়দায় চলা-বলা আহার-বিহার—এইটাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি নাকি পুরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার যে প্রতিকৃতিখানি রহিয়াছে সেটিও সাহেবী—পোষাকে। তাঁহার পরিচ্ছদ, আসবাব, এমন কি অনেক খাদ্যদ্রব্যাদিও নাকি সাহেব-বাড়ী হইতে আসিত। তিনিই নাকি এ-অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে বিস্কুট ও পাউরুটি আহার করেন। জনৈক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত বিলাতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবীয়ানা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে বাইনাচ, যাত্রা, দোল, দুর্গোৎসব হইত, বড় বড় তানপুরা লইয়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া আসর জমাইতেন। সম্ভবতঃ উভয় প্রকার শালীনতা বজায় রাখিতে গিয়াই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়েই পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধেও তাঁহার চৈতন্য হয় এবং তিনি সপরিবারে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে থাকেন। এতকাল তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না, পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে সন্তানসম্ভাবনা হইল এবং মথুরা শহরে মথুরামোহন জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিমলের সহিত মথুরামোহনের এক দিন আলাপ হইয়া গেল। থিয়াটারে রিয়ার্সাল দিবার জন্য প্রথম যেদিন সে ওপারে গেল, সেই দিনই অমরের বাড়ী যাইতে হইল। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল কল্পনায় সে মথুরামোহনকে যাহা ভাবিয়াছিল আসলে তিনি মোটেই সেরূপ দেখিতে নহেন। বিমল আশা করিয়াছিল দাম্ভিক পরাক্রান্ত

ক্ষমতাপ্রিয় এক জন উদ্ধতনাসা উগ্রগুম্ফ ব্যক্তিকে দেখিবে, কিন্তু দেখিল এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ব্যক্তিকে। মথুরামোহন দেখিতে অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির। পরিধানে থান, গায়ে একটি অতি সাধারণ ধরণের ফতুয়া, পায়ে চটি, কেশবিরল মস্তক, চোখেমুখে একটি স্নেহ-কোমল মৃদু হাসি, দেখিয়া মনে হয় না যে ইনি কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন। অথচ ইঁহারই ভয়ে ওপারের অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত —বিশেষতঃ মিউনিসিপালিটির মেম্বরেরা। আপাতদৃষ্টিতে লোকটির মধ্যে ভয়ঙ্কর তো কিছুই বিমল দেখিতে পাইল না। খানিক ক্ষণ আলাপের পর মথুরবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—তুমি অমরের বন্ধু এ-কথা আগে জানলে তোমাকে এখানে আসতে মানা করতাম আমি।

—কেন ?

সহসা তাঁহার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন —মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় কোন ভদ্র সন্তান ভালভাবে থাকতে পারে না, ঐ মাইনেতে যারা টিকে থাকবে তারা ভাল হ'লেও দিন-কতক পরে খারাপ হয়ে যাবে। মাইনে ভাল না দিলে কাজ ভাল হয় না, হ'তে পারে না !

বিমল বলিল—সে তো ঠিকই। কিন্তু মিউনিসিপালিটির যা অবস্থা তাতে বেশী মাইনে দেবে কি ক'রে ! হাসপাতালে ওষুধ পর্য্যন্ত নেই !

তা তো জানি। আমার মতে হাসপাতাল তুলে দেওয়া উচিত। ওরকম একটা প্রহসন রাখার চেয়ে না রাখা ভাল !

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

অমর বলিল—আমরা ক্লাবে এবার টিকিট ক'রে বিসর্জ্জন প্লে করছি। টাকা যা হবে সব হাসপাতালে দেব আমরা !

—ভাল।

মথুরামোহন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া সহসা বলিল—একটা কথা কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার শত্রুপক্ষ। তোমার কোন ত্রুটি পেলে ছেড়ে কথা কইব না আমি!

বিমল বলিল—ত্রুটি হ'তে দেব কেন।

—পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাবে, ত্রুটি হ'তে দেব না বলছ কোন সাহসে!

মথুরবাবু কান হইতে রূপার খড়কেটি নামাইয়া লইয়া হাসিমুখে দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—আচ্ছা সে দেখা যাবে!

অমর হাসিয়া বলিল—চল ক্লাবে যাওয়া যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিমল উঠিয়া মথুরবাবুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় পদধূলি লইতে গেলে মথুরবাবু বলিলেন—এই তো এখুনি এক বার প্রণাম করলে আবার কেন! ও-সব পায়ের ধূলোটুলো নিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বি অন ইওর গার্ড—

একটু হাসিয়া বিমল ও অমর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বলিল—তোর বাবার সম্বন্ধে যে-রকম ভয়াবহ সব গুজব শুনেছিলাম, ভয় হয়ে গিয়েছিল আমার। এত ভাল লোক অথচ সবাই এত ভয় করে কেন বল্ দিকি।

—ভাল লোক বলেই।

—মানে?

—মানে মিউনিসিপালটিতে উনিই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিয়ম মেনে চলতে চান আর ঘুস নেন না।

—বাকী সবাই?

—বাকী সবাই মিউনিসিপালিটিকে নানাভাবে দোহন করছে !

—বদ্দিবাবুও ?

—নিশ্চয়। ওপারে ওঁর অতগুলো বাড়ী, মিউনিসিপালিটিকে হাতে না রাখলে ওঁর চলবে কি ক'রে ? নিজের ইচ্ছেমত প্ল্যান, নিজের ইচ্ছেমত কল, যখন যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন। নিজে তো যা খুশী করিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অনুগৃহীত লোকদের করিয়েও দিচ্ছেন ! খুব তুখোড় লোক।

বদ্দিবাবুর নিন্দা শুনিতে বিমলের ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিমলরা চলিয়া গেলে মথুরবাবু অন্দরে গেলেন। গিয়াই শেফালির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। শেফালি মথুরাবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা, বড় আদরিণী। ষোল-সতে ছ বয়স।

—বাবা, বারান্দায় ব'সে কার সঙ্গে কথা বলছিলে বিমলবাবু, নয় ?

—তুই কি ক'রে দেখলি !

—বাঃ, দোতলার জানলা থেকে দেখা যায় না বুঝি বারান্দাটা !

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মথুরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—বারান্দাটা দেখা যায় বলেই উঁকি মেরে দেখতে হবে, ধন্য বাবা আজ-কালকার মেয়ে তোমরা ! ভদ্রলোক যদি দেখতে পেতেন !

—দেখতে পেলেই হ'ল ! আমি তো কেবল খড়খড়িটা একটুখানি ফাঁক ক'রে দেখেছি।

—কি দরকার তোমার দেখবার মা।

—আমার খুড়শ্বশুরের অসুখ তো উনিই ভাল করেছেন, সেই জন্যে দেখছিলাম কেমন দেখতে লোকটি !

শেফালি হাসিতে লাগিল, মথুরবাবুও তাহার পানে সস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

—তুমিই আদর দিয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি।

এক খিলি পান ও কিছু দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া সকোপ কটাক্ষে মথুরা-গৃহিণী মথুরাবাবুর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—কালই দাঁড়াও বেয়াইকে খবর দিচ্ছি, নিয়ে যান তোমাকে!

—ইস্, আমি যাচ্ছি কি না এখন।

ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে শেফালি বৌদিদির ঘরে গিয়া ঢুকিল। মথুরবাবুও উঠিয়া ধীরে ধীরে বাথরুমে গিয়া খিল দিলেন। মথুরবাবুর বাথরুম একটি দেখিবার মত জিনিষ, বলিয়া না দিলে বাথরুম বলিয়া বোঝা শক্ত। দুইতিন রকমের গদি-আঁটা চেয়ার, একটি সোফা, দেয়ালে নানা রকমের ছবি, এক কোণে একটি আলমারিতে নানা বই, একটি ছোট টেবিলের উপর সব রকমের খবরের কাগজ, নিকটে একটি ছোট মিটসেফের ভিতর চকোলেট, লজেন্স্ প্রভৃতি মুখরোচক টুকি-টাকি খাবার, দেয়ালের গায়ে কাঠের একটি সুদৃশ্য শেল্ফ্ তাহাতে তাঁহার প্রিয় কয়েক রকম পেটেণ্ট ঔষধ, আর একটি দেয়ালে চমৎকার একটি ঘড়ি। ঘরের ভিতর হইতেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় জানালাটি খুলিয়া দিলেই হইল। মথুরাবাবুর বাথরুম তাঁহার বৈঠক-খানা অপেক্ষা বেশী আরামজনক। এই ঘরখানির ঠিক পাশেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট একটি স্নানের ঘরও অবশ্য আছে। মথুরবাবু নির্জ্জনতা ভালবাসেন এবং স্নান করিবার অছিলায় বাথরুমে ঢুকিয়া জনতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন। এক বার বাথরুমে ঢুকিলে দুই-তিন ঘণ্টা তিনি বাহির হন না এবং দুই বেলা তাঁহার বাথরুমে ঢোকা চাই-ই। মথুরাবাবু বাথরুমে ঢুকিয়া খিল দিলেন। মথুরাবাবুর

গৃহিনী মন্দাকিনী বাথরুমের রুদ্ধ দ্বারের পানে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া আর এক খিলি পান ও আর একটু দোক্তা আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। চশমার খাপ ও মহাভারতখানি বাহির করিয়া আনিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর আপন মনেই বলিলেন—নিজে আর পড়িতে পারি না, বাপু, বৌমা, ও বৌমা, কোথা তুমি—

বিনোদিনী পাশের ঘরেই ছিল, বাহির হইয়া আসিল।

—কি মা ?

—কি করছ তুমি ?

—কিছুই না।

—আচ্ছা, তাহলে মহাভারতের একটুকু আমাকে প'ড়ে শোনাও তো মা! ঐটুকু হলেই কর্ণপর্ব্বটা শেষ হয়ে যায়। আমি আর পারছি না পড়তে—

বিনোদিনী বসিল ও মহাভারত লইয়া পড়িতে সুরু করিল—

হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন তদ্রূপ তুমি শর-নিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ-বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষ-প্রধান যুধিষ্ঠির—

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সহসা মন্দাকিনী বলিলেন—আচ্ছা বৌমা, তোমার চুলের এ কি ছিরি! চুলে তেলটেল দাও'না, আজকাল

তোমাদের কি যে ফেসিয়ান হয়েছে মা, চুল ভেজাবে না কিছুতেই! চুল-বাঁধুনী এসেছিল তো আজ, চুলটা ভাল ক'রে বেঁধে নিলেই পারতে!

বিনোদিনী কিছু বলিল না, লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেও যে ব্রহ্মচর্য্যের চর্চ্চা করিতেছে এ কথা তো শাশুড়ীকে বলা যায় না।

শাশুড়ী বলিলেন—চল আমিই তোমার চুলটা বেঁধে দি, মহাভারত কাল শুনিয়ো! চল, ওঠ।

বিনোদিনীকে লইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন।

বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে যখন মন্দাকিনী প্রথম শুনিলেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপনে একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল! কলেজে-পড়া মেয়ে; না জানি সে কি জাতীয় জীবই হইবে। কি জাতীয় জীব যে হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব অস্পষ্ট ছিল না। হাই-হীল জুতা-পরা, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে অবগুণ্ঠন-হীনা শিক্ষিতা মহিলা মন্দাকিনী ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং দুর্ভাবনাটা সেই জন্যই বেশী হইয়াছিল। কিন্তু বিনোদিনী তাঁহার সে দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে। অল্প দিনেই মন্দাকিনী বুঝিলেন যে এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দুর্লভ। ব্রত-আচার, পূজা-পার্ব্বণ সব বিষয়ে নিখুঁত। যেমন লজ্জা, তেমনি ধীরস্থির। মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই, বরং তাহার প্রসাধন সম্বন্ধে উদাসীনতাই ইদানীং মন্দাকিনীকে পীড়িত করিতেছে।

গঙ্গার ধারেই বিমলের বাসা। ঘাট হইতে বাসা বেশী দূরে নয়। গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। একটি ছোট পানসি আসিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়িল এবং পানসি ভিড়িতে অমর ও বিনোদিনী নামিয়া পড়িল।

অমর বলিল—চল বিমলকে জাগানো যাক।

—না, না, কি দরকার, চল, মা যদি জানতে পারেন, ভয়ানক কাণ্ড করবেন।

—কিছু করবেন না, চল না! অনেক দিন পরে বিমল তোমাকে দেখে ভারি খুশী হবে! বলছিল আজ তোমার কথা।

—কি বলছিল?

—বলছিল বিনুকে নিয়ে এস এক দিন আমার বাড়ীতে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিমলবাবুকে বিনোদিনীর মনে পড়িল। অমরের সহিত বিমল কয়েকবার বিনোদিনীদের বাড়ীতে গিয়াছিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিল বিমলবাবু কি এখনও তেমনি লাজুক-প্রকৃতির আছেন নাকি? তখন তো কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিতেন না।

বিমল স্বপ্ন দেখিতেছিল, মণিকে। পরীক্ষা দিয়া মণি যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমল এক বোতল কডলিভার অয়েল লইয়া তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, সে কিছুতেই খাইবে না। বড় দুর্গন্ধ! দুধও খাইবে না, খাইতে ভাল লাগে না।

—ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু—

বিমল বিছানায় উঠিয়া বসিল, তবুও স্বপ্নের ঘোর যেন কাটিতে চায় না। ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিল জানালা দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া নীরব মাধুর্য্যে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে।

—ডাক্তারবাবু—

কপাট খুলিয়া বিমল দেখিল অমর ও বিনোদিনী দাঁড়াইয়া আছে। এও স্বপ্ন নাকি!

য[illegible]সপাতালে ঔষধ নাই তথাপি বিমলের সদয় ব্যবহারের গুণে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল লক্ষ্য করিল এখানে গরিব লোকদের ভিতর কালাজ্বর খুব বেশী, অথচ হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা করিবার মত ইন্‌জেকশনের ঔষধ প্রচুর নাই। অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা কম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজের প্রথম মাসের বেতনটা ব্যয় করিয়া কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌শন আনাইয়া ফেলিল। লেখালেখি করাতে দরও কিছু সস্তা হইল। কালাজ্বর-রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া এবং চিকিৎসা করিয়া বিমলের সময় ভালই কাটিতে লাগিল। বিমল ভাবিয়া দেখিল যে চাকরি না পাইলে কোথাও না কোথাও তাহাকে ডিসপেনসারি খুলিয়া তো বসিতে হইত এবং অনিবার্য্যভাবে কিছু অর্থব্যয় হইতই। প্রাকটিস জমাইবার জন্য প্রথম প্রথম কিছু খরচ করিতেই হয়, সুতরাং এই খরচটা করা এমন কিছু অবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। হাসপাতালের এই দরিদ্র রোগীরা মুক্তকণ্ঠে তাহার নাম চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপিত করিবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্যও তো একটি প্রয়োজনীয় খরচ আছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাতে নিঃস্বার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপরতার আমেজই বেশী ছিল, কিন্তু চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ইন্‌জেকশন দিয়া অনেক রোগী ভালও হইতে লাগিল।

একদিন হাসপাতালের কাজ সারিয়া বিমল বাহির হইতেছে এমন সময় এক বুড়ী আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। বুড়ী বিমলের অচেনা নয়, এখানে আসিয়া অবধি বুড়ীকে সে প্রত্যহই দেখিতেছে, রোজ তাহার হাসপাতালে আসা চাই। সে আসিবার আগেও নাকি বুড়ী রোজ আসিত। তাহার অসুখ মাথাধরা, কিছুতেই সারতে[illegible]

—কি চাই তোমার, ওঠ, ওঠ।

—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

—কিসের ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে ?

—মাথাধরার ! কত লোক ইন্‌জেকশন নিয়ে নিয়ে সেরে গেল আমার চোখের সামনে, আমারই কিছু হচ্ছে না—

—ওষুধ খাও, সারবে।

—লাল, নীল, সাদা কত রকম ওষুধই তো খেলাম। ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না বাবু—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন, দোহাই আপনার ডাক্তার বাবু।

—কি মুস্কিল, তোমার তো আর কালাজ্বর হয় নি, কি ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে।

—সব অসুখেরই ইন্‌জেকশন আছে, সেদিন ঐ রক্ত-আমাশয় রুগীটা এল, একটা ইন্‌জেকশন দিতেই সেরে গেল !

বুড়ী রোজ হাসপাতালে আসে এবং কোথায় কি হয় লক্ষ্য করে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিমল তথাপি বলিল—মাথাধরার ইন্‌জেকশন নেই কোন।

বুড়ী কিন্তু মানিল না, বিমলের পিছু লইল। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—সে ম'রে ইস্তক আমার এত হেনস্তা ডাক্তারবাবু ! নিজের পেটের ছেলে, এত ক'রে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলাম সেই এখন দেখে না, বউ নিয়ে উন্মত্ত। বউও জুটেছে একটা ডাইনী, নিজের পেটের ছেলেগুলোকেই টপটপ ক'রে খেয়ে ফেললে, ঘরদোর শ্মশান হয়ে গেল আমার ! এত লোকের মরণ হয় আমারই কেবল হয় না ? যমেরও অরুচি আমি—

বিলাপ করিতে করিতে বুড়ী বিমলের বাসা পর্য্যন্ত আসিয়া হাজির

হইল। বিমল তাহাকে আরও দুই-এক বার বলিল যে, তাহাকে দিবার মত ইন্‌জেকশন তাহার নাই। বুড়ী কিন্তু কিছুতেই শোনে না। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—নিজের পেটের ছেলেই যাকে দেখে না তাকে অপরে দেখবে কেন, কিন্তু আপনি শুনেছিলাম ভাল লোক, দয়াধর্ম্ম আছে, তাই সাহস ক'রে—

বুড়ী ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলে। নিরুপায় বিমল শেষটা ঠিক করিল খানিকটা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহারই দুই-চারি ফোঁটা বুড়ীকে ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া যাক। নাছোড়বান্দা বুড়ী কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল—আচ্ছা ব'স, দিচ্ছি ইন্‌জেকশন!

টেষ্ট-টিউবে জল গরম করিতে করিতে বিমলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। মাইক্রসকোপের কাজের জন্য তাহার কাছে "মেথিলিন ব্লু"র কতকগুলি বড়ি ছিল। ময়দার গুলির ভিতর "মেথিলিন ব্লু"র কয়েকটি গুলি লুকাইয়া বিমল সেগুলি বুড়িকে দিল এবং জলের ইন্‌জেকশন দিয়া অবশেষে বলিল—এই বড়িগুলোও খেও। বড় কড়া ইন্‌জেকশন শরীরের সমস্ত বিষ বেরিয়ে যাবে।

বুড়ী খুশী হইয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বুড়ীর সহিত এই প্রবঞ্চনাটুকু করিয়া বিমলের ভারি আনন্দ হইল। ডাক্তারি করিতে কত প্রবঞ্চনাই যে করিতে হয়! দুস্থ লোককে সান্ত্বনা দেওয়াই যখন পেশা তখন প্রবঞ্চনা করিতে হইবে বইকি! কয়টা লোককে সত্য কথা বলিয়া আশ্বস্ত করা যায়!

আহারাদি শেষ করিয়া বিমল আবার হাসপাতালের দিকে রওনা হইল। সাধারণতঃ এ সময়টা সে একটু বিশ্রাম করে, কিন্তু আজ ফিমেল ওয়ার্ডে একটি নিউমোনিয়া রোগিণীকে সে ভর্ত্তি করিয়াছে, তাহার রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। হাসপাতালের গেটে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় তাহার নজরে পড়িল একটি আধ-বয়সী মেয়ে

আ...া দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার হাতে একটি গামলায় কলাপাতা দিয়া কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

—কে তুমি ?

মেয়েটি মাথার ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া মাথা নিচু করিয়া বলিল—আমি বাবু ঠাকুরের পরিবার।

—হাসপাতালের শিবু ঠাকুরের ?

—হঁা।

—গামলাতে ও কি ?

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বিমল বলিল—কি আছে ওতে, দেখি ঢাকা খোল তো।

অতিশয় সঙ্কোচভরে মেয়েটি কলাপাতার ঢাকাটা খুলিয়া বলিল—হাসপাতালের রুগীদের দিয়ে যা ভাত বেঁচেছিল তাই নিয়ে যাচ্ছি—

বিমল দেখিল অন্ততঃ চার-পাঁচ জনের ভাত ডাল তরকারি গামলাতে রহিয়াছে।

—এত ভাত বেঁচেছিল ? বল কি। মোটে তো দশ-বারো জন রুগী আছে। এস আমার সঙ্গে।

হাসপাতালে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিবুঠাকুরের ভয়ে কোন রুগী প্রথমে কোন কথা বলিতেই চায় না। বিমল অভয় দেওয়াতে অবশেষে সকলে বলিল যে তাহারা কোনদিনই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাদের এক-আধ মুঠা দিয়াই সমস্তই শিবুঠাকুর প্রত্যহ লইয়া যায়। ভৈরব চাকরও প্রত্যহ তাহাদের অন্নে ভাগ বসায়।

বিমল বলিল—আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

তৎক্ষণাৎ ভৈরব ও শিবুকে ডাকিয়া বিমল তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিল এবং গুপিবাবুকে ডাকিয়া বলিল যে, একজন নূতন ঠাকুর এবং

নূতন চাকর অবিলম্বে চাই। ইহাদের আর রাখা চলিবে না। গুপিবাবু সহজে কোন কথা বলেন না, বলিলেও খুব কম বলেন। চশমার কাঁচের উপর দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন ও সংক্ষেপে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি। চট ক'রে পাওয়া মুস্কিল।

রুকমি আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—মুস্কিল কিসের, নরু ঠাকুর তো ব'সে আছে, কেষ্টাও ব'সে আছে, ডাকলেই আসবে।

—তুই সব কথার মাঝখানে ফোড়ন দিস কেন বল ত? আ গেল যা!

জানকীও তাহাকে ধমকাইয়া দিল—তুই বাড়ী যা না!

রাগে গর গর করিতে করিতে রুকমি চলিয়া গেল।

বিমল জানকীকে আদেশ করিল নরু ঠাকুর ও কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া আনিতে, আজই সে তাহাদের বাহাল করিবে।

ফিমেল ওয়ার্ডে নূতন রোগিণীটির রক্ত আনিতে গিয়া বিমল দেখিল সেদিনকার সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারীটা তাহার বিছানার পাশে মাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

—তুমি এখানে ব'সে আছ কেন?

গুপিবাবু বলিলেন—এই নিয়ে চার বার হ'ল! এর আগে তিন বার মানা করেছি আমি। সেই থেকে কেবল এইখানে ঘুরঘুর করছে।

বিমল বলিল—যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং বটগাছতলায় গিয়া বসিল। একটু পরে বিমল রক্ত পরীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বাবু!

—কি ?

—ও মেয়েটা কি বাঁচবে ?

—তুমি ওখানে গেছলে কেন ? আর যেও না।

—আচ্ছা বাবু।

বিমল চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বাঁচবে বাবু ?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

—আমার অমন একটি মেয়ে ছিল, বিনা ওষুধে বেঘোরে জ্বরে ছট্‌ফট্ করতে করতে মরে গেছে সে বাবু !

বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার কোটরগত চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বিমল দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এ কি বাঁচবে বাবু ? একটুকুও তো জ্ঞান নেই।

—শক্ত ব্যারাম, নিউমোনিয়া হয়েছে।

—আহা, শুনলাম ওর বাপ-মা কেউ নেই !

সত্যই মেয়েটি অনাথা, ওপারের অনাথ-আশ্রম হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। বিমল চলিয়া যাইতেছিল, আবার সে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—আমি ওর কাছে ব'সে যদি হাওয়া-টাওয়া করি করি তাতে ক্ষেতি কি বাবু ?

—না, তুমি যেও না। ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যাওয়া মানা।

সে আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বাড়ীতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শ্রীহর্ষবাবু—পাশের বাড়ীর সেই ভদ্রলোক যাঁহার ছেলের টাইফয়েড হইয়াছে—তিনি হন্তদন্ত হইয়া হাজির হইলেন।

—পাইখানার সঙ্গে খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে যেন মনে হচ্ছে।

বিমলের মুখ শুকাইয়া গেল।

—তাই নাকি ? চলুন তো দেখি।

গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সত্যই 'হেমারেজ' আরম্ভ হইয়াছে।

—ভূধরবাবুকে খবর দিন।

শ্রীহর্ষবাবু বলিলেন—লোক পাঠিয়েছিলাম, তিনি বাড়ীতে নেই।

—জগদীশবাবুকে খবর দিন তাহলে, আর এই ইন্‌জেকশনটি তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন।

লোক ছুটল।

বিমল রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল, নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। পেটের ভিতর আরও রক্তক্ষয় হইতেছে নিশ্চয়। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

জগদীশবাবুকে যে লোক ডাকিতে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল —জগদীশবাবুও বাড়ীতে নাই। বিমল ইন্‌জেকশনের জন্য যে 'সিরাম'টি আনিতে দিয়াছিল তাহাও এখানে পাওয়া গেল না। বিমল শেষে নিজের ব্যাগ হইতে মর্ফিয়া বাহির করিয়া আনিল। মর্ফিয়াও ইহার একটি ঔষধ।

শ্রীহর্ষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা কি ইন্‌জেকশন দেবেন ?

—হাঁ।

—কি ওটা ?

—মর্ফিয়া।

—ওটা দিলে তো—

শ্রীহর্ষবাবু বাক্যটা সম্পূর্ণ করিলেন না বটে, কিন্তু অর্থ বুঝিতে বিমলের কষ্ট হইল না। মর্ফিয়া দেওয়াটা বিপজ্জনক কি না তাহাই শ্রীহর্ষবাবু জানিতে চাহিতেছেন। মর্ফিয়া ঔষধটি শক্তিমান ঔষধ, শক্তিমান জিনিষ মাত্রেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সে-কথা শ্রীহর্ষবাবুকে

বলিলে তিনি আরও ঘাবড়াইয়া যাইবেন। হেমারেজে মর্ফিয়া বহুকালের সনাতন ঔষধ, বিমল নূতন কিছু করিতেছে না। তা ছাড়া অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার। বিমল বলিল—ও ওষুধটা যখন পাওয়া গেল না এইটেই দেওয়া যাক, এটাও হেমারেজের একটা ওষুধ। ক্যালসিয়মও একটা দিচ্ছি।

বিমল মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া দিল। ক্যালসিয়মও দিল একটু পরেই ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িল।

সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

রাত্রি আটটা নাগাদ ভূধরবাবু আসিলেন এবং নাড়ী টিপিয়া মুখ-বিকৃতি করিলেন, কিছু বললেন না, চলিয়া গেলেন। আর একটু পরে জগদীশবাবু আসিলেন ও মর্ফিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া এমন একটা মুখভাব করিলেন যাহা অবর্ণনীয়। সে মুখভাবে রোগীর জন্য আফশোষ, বিমলের অজ্ঞতার জন্য অনুকম্পা, রোগীর পিতার জন্য সহানুভূতি এবং তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে না ডাকাতে কি কাণ্ডটা হইল এই ধরণের একটা গর্ব্ব একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

অপ্রস্তুত বিমল বলিল—হেমারেজে মর্ফিয়া দিতে কেতাবে তো লেখে।

—কেতাবে অনেক কথাই লেখে।

জগদীশবাবুর মুখটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি বিমলকে যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। কেতাবাতীত অভিজ্ঞতার মহিমা লইয়া জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

বিমূঢ় বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

একটু পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল—নারীকণ্ঠের আর্ত্ত হাহাকার—ওরে বাবা রে আমার ছেলেকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেল্লে রে।

সেদিন রাত্রে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ডুলু আসিয়া বিমলের ঘুম ভাঙ্গাইল—হাসপাতালে সেই নিমোনিয়া-রোগীটার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গরমের জন্য ডুলু রোজ আসিয়া হাসপাতালের বারান্দায় একটি ক্যাম্প-খাট বিছাইয়া শয়ন করে, আজও শুইয়াছিল। হঠাৎ ফিমেল ওয়ার্ড হইতে একটা দারুণ চীৎকার শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে গিয়া দেখে অল্প অন্ধকারে সেই লম্বা ভিখারী বুড়াটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করিতেছে। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতেছে দেখিয়া ডুলু গুপিবাবুকেও উঠাইয়া ছিল।

গুপিবাবু বিমলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিমল গিয়া দেখিল মেয়েটি মারা গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ভয়েই হার্ট ফেল করিয়াছে।

ভিখারী বুড়াটা বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

বিমলের ভয়ানক রাগ হইল। তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া বলিল—বেরিয়ে যাও তুমি হাসপাতাল থেকে—

টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটা পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে আর কেহ তাহাকে হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখে নাই।

অতি প্রত্যূষে দাঁতন-হস্তে বাদিবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

—ডাক্তার বাবু, আপনি একটা ভারি অ-রাজনৈতিক কাজ ক'রে ফেলেছেন।

—কি বলুন তো?

—শুনলাম, মথুর মুখুজ্যেদের ক্লাবে গিয়ে আপনি মিশেছেন!

—মিশলেই বা।

বদ্দিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, চালে একটু ভুল হয়েছে! আমাদের সমস্ত জীবনটাই তো একটা দাবাখেলা, চালে ভুল হলেই মাৎ হয়ে যেতে হবে! ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি—

বিমল ব্যাপার সমস্ত খুলিয়া বলিল এবং উপসংহারে বলিল—অমর আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার অনুরোধ এড়ানো একটু শক্ত, কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে এ-কাজ আমি করি নি, আমি করেছি হাসপাতালের জন্যে। থিয়েটার থেকে শ-দুই আড়াই হতে পারে! হাসপাতালে একেবারে ওষুধ নেই যে আমি আমার নিজের মাইনে দিয়ে ওষুধ কিনে চালাচ্ছি—সবই তো জানেন আপনি!

বদ্দিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, এইবার ফতুয়ার পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া বিমলের হস্তে দিয়া বলিলেন—এই নিন।

বিমল সবিস্ময়ে দেখিল পাঁচ শত টাকার একখানি চেক।

—এ কোথা পেলেন?

বদ্দিবাবু কিছু না বলিয়া স্মিতহাস্যে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন।

—আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—টাকাটা পেলেন কি ক'রে?

—বিমল চাটুয্যের পক্ষে যদি এক মাসের মাইনেটা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, বদ্দি চাটুয্যের পক্ষে পাঁচ-শ টাকা যোগাড় করা কিছু অসম্ভব নয়!

বিমল হাসিতে লাগিল।

বদ্দিবাবু বলিলেন—ওটা খুব দামী চাল দিয়েছিলেন আপনি একটা,

ভেরি গুড স্ট্রোক—কিচ্ছু বেগ পেতে হয় নি আমাকে, যার কাছে চেয়েছি সে-ই দিয়েছে—

—চাঁদা ক'রে তুললেন নাকি ?

—ভিক্ষে ! বামুনের ছেলের ভিক্ষে করতে তো লজ্জা নেই ! তবে বেশী লোকের কাছে যেতে হয় নি। ওপারের সৌরীনবাবু, জমিরুদ্দিন, হীরালালবাবু, এ-পারের নন্দীমশায় আর বদি চাটুজ্যে, এক-শ টাকা ক'রে দিয়ে দিলাম প্রত্যেকে, মিটে গেল। আপনি একটা রসিদ দিয়ে দিন আমাকে, আর আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—পাশের বাড়ীর টাইফয়েডটা কি আপনার চিকিৎসাতেই ছিল ?

—ভূধরবাবুও দেখছিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—মর্ফিয়াটা খুব ডেন্‌জারাস্ ওষুধ না কি ?

আমাদের সব ওষুধই ডেন্‌জারাস্! কিন্তু কি করা যায় বলুন, সিরামটা পাওয়া গেল না, একটা কিছু তো করতে হবে, তাছাড়া মর্ফিয়া তো এর ওষুধই।

বদিবাবু কিছু বলিলেন না, গম্ভীরভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন। ভাবটা যেন আমি তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু মর্ফিয়াটা না দিলেই যেন ভাল করিতেন !

—ওরা কান্নাকাটি করছে না, সব চুপচাপ যে ?

—ভোরের ট্রেনে সবাই দেশে চলে গেছে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—ক'টা রুগী মরল আপনার হাতে ?

বিমল হাসিয়া উত্তর দিল—বেশী নয়, গোটা-তিনেক—

—সহস্রমারী হ'তে এখনও দেরী আছে তাহলে! আচ্ছা, চলি এখন আমি! ভাল কথা, ও ব্যাপারটার কি করবেন ঠিক করলেন?

—কোন্ ব্যাপারটা?

—থিয়েটারের?

—থিয়েটার করতেই হবে।

—করতেই হবে? না করলে কি হয়?

—এখন পিছোনো অসম্ভব।

—ওষুধের বখেড়া মিটে গেল, আবার ওসব কেন! আপনাকে নিজেদের দলে টেনে রাখবার জন্যেই নন্দী টাকাটা দিয়েছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আমি তো আপনাদের দলেরই।

—তবু কি দরকার ওঁর মনে একটু ধোঁকা ধরিয়ে দেবার?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবু বলিলেন—তাহলে বলি গে নন্দীকে যে থিয়েটার আর আপনি করতে যাবেন না, কি বলেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—মাপ করুন আমাকে, অমরকে কথা দিয়ে ফেলেছি; বিমল চাটুয্যের কথার আজ পর্য্যন্ত কখনও নড়চড় হয় নি।

বদিবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—এ চালটা মন্দ দিলেন না তো, অল রাইট—

মৃদু হাসিয়া বদিবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিমল বাহির হইল। একটু দূরে গিয়াই নজরে পড়িল পাড়ার রমেশ মোক্তার ও প্রতাপ

ডাক্তার তাঁহাদের সনাতন চৌকিটিতে বসিয়া প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। রমেশবাবুও আর মোক্তারি করেন না, প্রতাপবাবুও আর ডাক্তারি করেন না। প্র্যাকটিসের চূড়ান্ত করিয়া প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে উভয়েই এক দিন একযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এইরূপ জনশ্রুতি। উভয়েই প্র্যাকটিস-জীবনে সত্য-মিথ্যা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করেন নাই—অবহিতচিত্তে উপার্জ্জনই করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ব্যাঙ্কে উভয়েরই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ লাখের কোঠায়। চরিত্র দুইটি কিন্তু অদ্ভুত। ইঁহাদের যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা অর্থ আছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা অসম্ভব। আধ-ময়লা কাপড় পরিয়া নগ্নগাত্র বৃদ্ধ দুটি সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া অতিশয় উষ্মাভরে অতিশয় বাজে বিষয়ে প্রতিদিন কেবল তর্ক করেন। প্রতাপবাবু গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, পাকা গোঁফদাড়ি আছে; রমেশবাবু ঠিক উল্টা, কুচকুচে কালো, বেঁটে এবং মাকুন্দ। গলার স্বরও দুই জনের দুই রকম। প্রতাপবাবু উদারায় এবং রমেশবাবু তারায় বাঁধা। তর্কের পদ্ধতি এবং বিষয় বিচিত্র। অথচ দুই জনে পরম বন্ধু।

প্রতাপবাবু হয়ত তাঁহার বাজখাঁই গলায় বলিলেন—পটলের দরটা কমছে ক্রমশঃ, কাল দশ পয়সা হয়েছিল।

মিহি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিলেন—বাজে কথা, কাল তিন আনা দর ছিল।

—বিশু কি তাহলে মিছে কথা বল্লে বলতে চাও, বিশু, বিশু—

ভৃত্য বিশু আসিয়া দাঁড়াইল।

—কাল পটলের সের কত ক'রে ছিল ?

—আজ্ঞে দশ পয়সা।

—শুনলে তো, আচ্ছা যা। বিশু চলিয়া গেল।

রমেশবাবু বলিলেন—বাজে কথা, বিশ্বাস করি না। হয়ত পচা বা ছোট জিনিস এনেছে।

—বিশু, বিশু—

বিশু পুনরায় আসিল।

—কাল যা পটল এনেছিস নিয়ে আয় তো।

বিশু পটল লইয়া আসিল, দেখা গেল পটল ভালই।

রমেশবাবু তখন অন্য পথ ধরিলেন। বলিলেন—বিপিনের কথা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার বিশু হয়ত অন্য জিনিষে দু-পয়সা মেরেছে, পটলের বেলায় মিথ্যে করে শস্তা দেখিয়ে ভালমানুষ সাজছে! আমার বিপিন—

—তোমার বিপিনটি একটি চোর, ওই ডোবাবে তোমায়।

অতঃপর তর্কের বিষয় আর পটল রহিল না, বিপিন চোর, না বিশু চোর ইহাতে পর্য্যবসিত হইল। তাহার পর ক্রমশঃ সাধুতা কি, অসাধুতা কি, তাহার পর রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ, ক্রমশঃ বেদ-বেদান্ত—এই ভাবেই রোজ চলে। রোজই একটা তুচ্ছ বিষয় হইতে সুরু হইয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয় এবং ক্রমশঃ তুমুল হইতে তুমুলতর হইতে থাকে। রমেশবাবু এবং প্রতাপবাবু বাল্যবন্ধু, শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছেন, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াছেন, একসঙ্গেই এক জন ডাক্তারি এবং এক জন মোক্তারি পাস করিয়াছেন, একসঙ্গে একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস্ ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে প্রত্যহ একসঙ্গে বসিয়া তর্ক করেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের বিন্দুমাত্র মিল নাই, তথাপি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারেন না। ঐ পুরাতন কাঠের চৌকিটিতে উপবেশন করিয়া একটা-না

একটা কিছু লইয়া উভয়ে দিনের পর দিন কলহ করিয়া চলিয়াছেন। লোকে ইঁহাদের নাম দিয়াছে 'মাণিকজোড়'।

বিমলের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে ইঁহাদের মৌখিক আলাপ মাত্র হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়।

আজ সহসা প্রতাপবাবু বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু রমেশের বগলের এই ফোড়াটা দেখুন তো পেকেছে কি না ?

রমেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—কি মুশকিল, আমার ফোড়া আমি বুঝতে পারছি না, বলছি পাকে নি।

—আহা, ডাক্তারবাবুকে দেখতেই দাও না।

—দেখুন, বেশী টিপবেন না যেন।

বিমল দেখিয়া বলিল—প্রায় পেকেছে।

প্রতাপবাবু বলিলেন—ওই দেখ।

রমেশবাবু বলিলেন—প্রায় পেকেছে, আর পেকেছে, এক কথা নয়, দেখব আবার কি ?

—আমি বলছি তুমি তোকমারি দাও।

তোকমারি দেওয়ার অবস্থা এখনও হয় নি, পুঁই পাতায় গরম ঘি লাগিয়ে আরও দু-এক দিন বেঁধে রাখতে হবে।

বিমল বলিল —কেটে দিলেই চুকে যায়।

রমেশবাবু বলিলেন—আপনি সরে যান তো মশায়।

বিমল একটু হাসিয়া পরেশ-দার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বেশ আছে এই বৃদ্ধ দুইটি। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে সংসার [illegible] এবং সময় কাটাইবার জন্য তর্ক আছে, নাই বা থাকিল সে তর্কের মাথামুণ্ড, সময় ত কাটে !

পোষ্টাফিসে যাইবা মাত্র পরেশ-দা বলিলেন—এই নাও মণিমালার চিঠি!

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—খুব যদি উত্তেজিত না হয়ে ওঠ তাহলে ঐ কোণের টুলটায় ব'সে পড়তে পার, হরেন ততক্ষণ চা করুক।

বিমল হাসিয়া বলিল—উত্তেজিত হলেই বা কি?

—টুলটা মজবুত নয়, তাছাড়া কাছেই কালির বোতলটা রয়েছে।

বিমল হাসিয়া টুলটিতে উপবেশন করিয়া পত্রখানি খুলিল।

—তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি কিন্তু আমার চিঠির একটি কথারও উত্তর দাও নি, ভাল প্যাডও কেন নি। একটু ভালবাস না তুমি আমায়। ওখানকার বাড়ীটা কেমন, কিছু লেখনি, 'বাথরুম' আছে ত? গঙ্গার ঘাট থেকে কত দূর, পাড়াপড়শীরা কেমন লোক, সব লিখো এবার। তোমাদের সিভিল সার্জনের মেয়ে তরঙ্গিণী আমাদের সঙ্গে 'পড়ত' একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম এবার। সে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গেছে, এখন ঐখানেই থাকবে। আমি গেলে এবার তার সঙ্গে দেখা করব, কেমন! আমি কিন্তু এ মাসটা এখানে থাকতে চাই। এ ক'মাস তো পরীক্ষা পরীক্ষা করেই কেটেছে, সিনেমা-টিনেমা কিছুই দেখা হয় নি। এবার তো কলকাতা থেকে নির্ব্বাসন হবে, তার আগে একটু ফুর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক। তুমি আসতে পারবে কি? এলে বেশ হ'ত। না যদি আসতে পার অন্ততঃ গোটা-কুড়ি টাকা আমাকে পাঠিও, মা বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে। এত দিন ত ওঁরাই সব খরচ দিয়েছেন, বিয়ে হবার পরও কত টাকা দিয়েছেন, আর কিন্তু নেব না। টাকা তুমি নিশ্চয় পাঠিও। আমার মাকে চিঠি লেখ না কেন তুমি? আমার চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁকে ভাল ক'রে একখানা চিঠি দেবে, নইলে তোমার চিঠি আমি চাই না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলেন না,

কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হন তা বুঝতে পারি। আমাকে খালি খালি চিঠি দাও অথচ আর কাউকে দাও না, এমন লজ্জা করে আমার, মাকে নিশ্চয় চিঠি দিও।

তোমার প্র্যাকটিস ওখানে একটু একটু বাড়ছে শুনে সুখী হলাম। কত টাকা জমালে? আমার কিন্তু একটা জিনিষের সখ আছে, তাবিজ এক জোড়া, সেটা বুড়ো হবার আগে চাই। দেবে তো?

তোমার বন্ধু অমরবাবুর স্ত্রী বিনোদিনীকে চিনি আমি। লরেটোর মেয়ে, খুব সুন্দরী। ওদের তো "লভ্ ম্যারেজ"—মেয়েদের মধ্যে ওদের দু-জনকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। রাগ ক'রো না, কিন্তু তোমার বন্ধুটি লোক মোটেই ভাল নন। বেশী মিশো না তুমি ওঁর সঙ্গে। বিনোদিনী এসেছিলো নাকি তোমার বাসায় এক দিন? বেশ চমৎকার দেখতে, নয়? আমার চেয়ে ঢের ভালো। কি কি গল্প করলে তার সঙ্গে লিখো। মেয়েটি লেখাপড়াতেও খুব ভাল। অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছে।

অনেক বাজে কথা লিখে কাগজ ভরালাম। এইবার উঠি, সন্ধ্যের 'শো'তে 'ওয়ে অব অল ফ্লেশ' দেখতে যাব। শুনেছি খুব ভাল হয়েছে নাকি বইখানা। পপি আমার টেবিলের নীচে ব'সে পায়ের তলায় সুড় সুড়ি দিচ্ছে। পপিকে মনে আছে ত? আমার সেই ছোট্ট লোম-ওলা কুকুরটা এমন সুন্দর হয়েছে আজকাল। আমি কিন্তু পপিকে নিয়ে যাব, ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।···

পরেশ-দা বলিলেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ভায়া।

বিমল চিঠিটা মুড়িয়া পকেটে রাখিল এবং গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া একটা চুমুক দিল।

পরেশ-দা বলিলেন—কি হে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন, দুঃসংবাদ নাকি কিছু?

—না।

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল চা পান করিতে লাগিল। যোগেন বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিল, সে বিমলের হাতে আর একখানি চিঠি দিল। এখানি একটি পোষ্টকার্ড। পিতৃবন্ধু নিবারণবাবু লিখিয়াছেন, "তোমার পৈতৃক জমির খাজনা প্রায় চল্লিশ টাকা বাকী পড়িয়াছে। টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া খাজনাটা শোধ করিয়া দিও। ভাল ভাল জমি, বাকী খাজনার দায়ে যেন নিলাম না হইয়া যায়।" মণিমালার জন্য অবিলম্বে কুড়ি টাকার এবং অনতিবিলম্বে বাজুর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জমির খাজনার জন্যও চল্লিশ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুইটি চিঠিরই মর্ম্ম—টাকা চাই। বিমল উঠিয়া পড়িল।

পরেশ-দা বলিলেন—এর মধ্যেই উঠছ যে?

—বাঃ, হাসপাতাল যেতে হবে না, সাতটা তো বাজে।

হাসপাতালে ওষুধের কিছু হ'ল?

—এই যে।

বিমল পাঁচ শত টাকার চেকটা পরেশ-দা'কে দেখাইল। সমস্ত শুনিয়া উল্লসিত পরেশ-দা বলিলেন—বলেছিলাম তো তোমাকে আগেই, বদিবাবু ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। থিয়েটার আর করছ না তা হ'লে?

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—করছি। বদিবাবুকে বলেছি সব।

—তার মানে?

—পরে বলব, আপনি কাজ করুন।

—না, না ব'লে যাও ভাই—পরেশ-দা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

অগত্যা বিমলকে সংক্ষেপে সব কথা বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বললেন—নন্দী কিন্তু চটবে।

—দেখা যাক।

বিমল হাসপাতালে পৌঁছিয়া দেখিল একমুখ হাসি লইয়া সেই বুড়ী বসিয়া আছে। ইন্‌জেকশন লইয়া তাহার মাথাধরা সারিয়া গিয়াছে। শরীরের সমস্ত বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে—উঃ কি ভীষণ নীল বিষ!

৯

ইলেক্‌ট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল একটি প্রবন্ধ বিমলকে লিখিয়া দিতেই হইল—নন্দী-মহাশয়কে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায় সে ভাবিয়া পাইল না। নন্দী মহাশয় খানিকটা তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মথুরবাবুর দলকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলেন না। শহরে ইলেক্‌ট্রিসিটি আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা কর্জ্জ লওয়া হউক —এ প্রস্তাব কিছুতেই পাস হইল না। এই দরিদ্রদেশের পক্ষে ইলেক্‌ট্রিসিটি বর্ত্তমান অবস্থায় যে কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মথুরবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন—এদেশে ভগবানের কৃপায় এখনও আলোক অথবা বাতাসের অভাব হয় নাই, এদেশে এখনও অভাব অন্নের, শিক্ষার, চিকিৎসার। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত অসহায় লোক যে-অন্ধকারে বাস করিতেছে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বালিয়া সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। ইলেক্‌ট্রিসিটি আসিলে বিলাসপরায়ণ দুই-দশ জন ধনীর হয়ত সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই ইহা অসুবিধা ও অশান্তির কারণ হইবে। দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রিসিটি আনিবার প্রস্তাব সুতরাং অন্যায় এবং হাস্যকর।

নন্দী ভোটে হারিয়া গেলেন। তিনি আরও ক্লিষ্ট হইলেন যখন তিনি শুনিলেন যে মথুরবাবু নিজব্যয়ে তাঁহার নিজের বাড়ীতে 'ডাইনামো' বসাইতেছেন। নন্দী-মহাশয়ও যে নিজব্যয়ে বাড়ীতে একটা ডাইনামো বসাইতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু এখন বসাইতে গেলে সকলে বলিবে যে তিনি মথুরবাবুর নকল করিতেছেন। প্রাণ থাকিতে তিনি এ অপবাদ সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যেমন করিয়াই হউক মিউনিসিপালিটির সাহায্যেই শহরে ইলেকট্রিসিটি আনাইবেন। নিজে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া একা বৈদ্যুতিক আলো হাওয়া ভোগ করিব এবং বাকী সকলে দারিদ্র-নিবন্ধন কষ্ট পাইবে, মথুরবাবুর মত এত বড় স্বার্থপর নন্দীমহাশয় নহেন। মুখে না বলিলেও বিমলের উপর নন্দীমহাশয় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। নূতন ডাক্তারবাবুটি রোজই নাকি ওপারে গিয়া থিয়েটারের মহড়া দিতেছেন। বদিবাবু তাঁহার চাটুয্যে-প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই লোকটিকে আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে যে খাল কাটিয়া কুমীরই বোধ হয় আনা হইয়াছে। আসিতে না আসিতে ছোকরা সোজা গিয়া মথুরবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িল। লোকটি এদিকে কথায়-বার্ত্তায় দেখিতে শুনিতে ভালই, চিকিৎসাও মন্দ করে না, হাসপাতালের কাজকর্ম্মের সুখ্যাতি সকলেই করিতেছে, রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে—কিন্তু ছোকরা যদি বিভীষণ হয় তাহা হইলে ত বড় মুশকিলের কথা। মথুর মুখুজ্যেদের সঙ্গে এতটা মাখামাখি মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। বিমলের প্রতি নন্দী-মহাশয়ের মনোভাব ক্রমশই হয়ত আরও বিরূপ হইয়া উঠিত, কিন্তু দুইটি কারণে তাহা আর হইল না। মিউনিসিপালিটির ও হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার হরেন বোসের উপর নন্দী-মহাশয় চটা। লোকটা কনট্র্যাকটারি করিয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছে এবং হঠাৎ বড়লোক

হইলে যাহা হয় হরেন বোসের ঠিক তাহাই হইয়াছে। আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইলে আঙুল ও কলাগাছ উভয়েরই মর্য্যাদা নষ্ট হয়। গরিবের ছেলে স্বল্প-শিক্ষিত হরেন বোস টাকার জোরে হঠাৎ সবজান্তা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য সমস্তই তিনি বুঝিতেছেন এবং সব বিষয়েই অসঙ্কোচে মোসাহেব-মহলে মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। যে বস্তুটি থাকিলে মানুষের সঙ্কোচ হয়, সে বস্তুটি তাঁহার নাই। তাঁহার অভিমত শিক্ষিত-সমাজে হয়ত গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজকেই কি তিনি গ্রাহ্য করেন? তিনি যাঁহাদের এবং যাঁহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন, সেই সমাজে বাহবা পাইলেই যথেষ্ট। বাহবা পানও। লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিচার দ্বিধা-বিহীন। নন্দী-মহাশয় ভণ্ড, বদিবাবু চতুর, মথুরবাবু ঘুঘু, ডাক্তারটা চালিয়াৎ, পোস্টমাষ্টার খোসামুদে, জগদীশবাবু অর্থপিশাচ, ভূধরবাবু তুখোড়—সকলের সম্বন্ধেই হরেনবাবুর অভিমত পাকা। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা-বলে তিনি সকলেরই আদি-অন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। একটি মাত্র লোককে তিনি একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি চৌধুরী মহাশয়। কনট্র্যাকটারির জন্য মাঝে মাঝে টাকার দরকার হইয়া পড়ে এবং ঐ চৌধুরীই তাঁহাকে সে সময় সাহায্য করেন। অনেক সময়, সুদও গ্রহণ করেন না, বিনা হ্যাণ্ডনোটেও দুই-এক বার টাকা দিয়াছেন। এ বাজারে এ রকম লোক বিরল—ইহাই হরেন বোসের ধারণা। হরেন বোসের সহিত বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর সুতরাং বন্ধুত্ব আছে এবং এই দুই জনকে কেন্দ্র করিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র দলও মিউনিসিপালিটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলটি নন্দী-মহাশয় অথবা মথুরবাবুর দলের সহিত একমত নহে, যখন যে-দলে ভোট দিলে নিজেদের সুবিধা হইবে সেই দলেই ইঁহারা সাধারণতঃ যোগদান করেন। কখনও নন্দী-মহাশয়ের

দলে, কখনও মথুরবাবুর দলে, যেখানে যখন সুবিধা। ভোটের লোভে নন্দী-মহাশয় এবং মথুরবাবু উভয়েই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাই এ দলটিকে প্রশ্রয় দেন। যুদ্ধে ভোটই যেখানে প্রধান অস্ত্র, সেখানে এতগুলি ভোটের আনুকূল্য পাওয়া কম কথা নহে। বোস-চৌধুরীর দলে কিন্তু কয়েক জন দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক আছেন, নানা ভাবে তাঁহারা নাকি সহজে প্রলুব্ধ হন। নন্দী-মহাশয়ের দলের প্রধান পাণ্ডা বদিবাবু সে খবরটি রাখেন এবং বেগতিক দেখিলে ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক-গুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বল-বৃদ্ধি করেন। কি ভাবে তাঁহারা প্রলুব্ধ হন তাহা সকলেই জানে, অথচ কেহ কিছু বলে না। আমরাও তাহা ব্যক্ত করিয়া অকারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে চাহি না। তবে এটা ঠিক কথা, এই দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকগুলি না থাকিলে বিমলের এখানে আসা সম্ভবপর হইত না। এই বোস-চৌধুরী দলেরই কতকগুলি লোককে গোপনে ভাঙাইয়া বদিবাবু জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই ইলেকট্রিসিটি ব্যাপারেও বদিবাবু যদি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিতেন কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বদিবাবুর নিজেরই ইহাতে অমত ছিল। ভোট দিবার বেলায় যদিও তিনি নন্দী-মহাশয়ের দিকে ভোট দিয়াছিলেন, কিন্তু বোস-চৌধুরীর দল ভাঙাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি যে এ কার্য্য করিতে পারেন তাহা এক তিনি এবং ঐ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক কয়টি ছাড়া আর কেহ জানে না। এই লোকগুলি যদিও বোস-চৌধুরী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু নিজেদের তাঁহারা কোন দলের সহিত একীভূত করিতে চান না, নিজেদের তাঁহারা স্বাধীনচেতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বোস-চৌধুরীর দলই অধিকাংশ সময়ে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দেন বলিয়া সাধারণতঃ এই দলে যোগদান করেন। স্বাধীনচিত্ততার ব্যতিক্রম

দেখিলে অন্য দলে যাইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। মিউনিসিপালিটির দলাদলির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হরেন বোস এবং তাঁহার দল ইলেকট্রিক স্কীমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার কারণ হরেন বোস নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি এই ইলেকট্রিক কনট্র্যাক্ট পাইবেন না, পাইবেন রমেন নন্দী, নন্দী-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র! এই অকর্ম্মণ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কোন একটা রোজগারের পন্থায় চালু করিয়া দিবার জন্য নন্দী-মহাশয় বহু কাল হইতে সচেষ্ট আছেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে আর যে-ই সহায়তা করুক, হরেন বোস করিবেন না তাহা ঠিক।

নন্দী সুতরাং হরেন বোসের উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন যখন সেই হরেন বোসই বিমলবাবু ডাক্তারের নামে এই অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইলেন যে অতি সামান্য দোষে এই ছোকরা ডাক্তারটি হাসপাতালের এতকালের পুরাতন পাচক শিবু ঠাকুর এবং পুরাতন ভৃত্য ভৈরবকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ভৃত্য ভৈরবের জন্য যতটা না হউক, শিবু ঠাকুরের পদ-চ্যুতিতে হরেন বোসের মর্ম্মাহত হইবার সঙ্গত কারণ আছে বইকি। কারণটি প্রকাশ করিয়া বলবার মত নহে। কিন্তু শহরের কে না এ কথা জানে! সেই শিবু ঠাকুরের চাকরি গিয়াছে, বিমলবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—নন্দী-মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিমলের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। মুখে অবশ্য তিনি হরেনবাবুকে বলিলেন তাই নাকি, ছেলেমানুষ কি না, মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়, আচ্ছা আমি বলব ওঁকে। বসুন—ওরে ডাব নিয়ে আয়।

হরেনবাবু কিন্তু বসিলেন না, চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই বদিবাবু আসিলেন। তিনি কোর্টে যাইবার বেশে সজ্জিত ছিলেন, আসিয়াই বলিলেন—দেখুন, আমাদের মিটিঙের দিনটা পেছিয়ে দিন, বাজেট-মিটিং, ওটাতে আমার থাকা দরকার—

—আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

—আমি আজ বেরিয়ে যাচ্ছি, থার্ডের আগে ফিরতে পারব না! সদরে দুটো কেসও আছে, তাছাড়া ঐ অঞ্চলে আমার কিছু জমি আছে তা নিয়ে কি সব গোলমাল হয়েছে প্রজাদের সঙ্গে, সেটা মিটিয়ে ফেলতে চাই!

নন্দী-মহাশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বাজেট-মিটিঙে বদিবাবু না থাকিলে তিনি একেবারে নিঃসহায়, অথচ মিটিঙের তারিখও বদলানো অসম্ভব, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে বদিবাবু এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ও ঠোঁটের উপর তর্জ্জনীটি স্থাপন করিয়া বদিবাবু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

—তারিখ বদলানো অসম্ভব তাহলে ?

—কি ক'রে হয় বলুন ?

—আচ্ছা বেশ, যাতে সেদিন 'কোরাম' না হয় সে ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি। আপনি চেয়ারম্যান, আপনি না গেলে ভাল দেখায় না, কিন্তু কেবল আপনি যাবেন আমাদের দলের আর কেউ যাবে না। ও-পারের সতীশ, জমিরুদ্দীন, হীরালাল ওদের মানা ক'রে যাচ্ছি, কেউ আসবে না।

—মথুরবাবুর দলটি তো আসবে ?

—ওদেরও দু-চার জনকে আটকাবার ব্যবস্থা করছি। ঠিক হয়েছে, মথুরবাবুর দলের জন-চারেক থিয়েটার নিয়ে মেতেছে, আমাদের

ডাক্তারও তো আছে ওর ভেতর, ওকেই টিপে দিয়ে যাই রিহার্শাল-কিয়ার্শলে কোন একটা ছুতোয় আটকে রাখবে এখন ওদের সেদিন সন্ধ্যেবেলায়! ডাক্তার ওদের মধ্যে গিয়ে বেশ জমিয়েছে শুনছি—

নন্দী-মহাশয় ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেটা কিন্তু আমি খুব সুসংবাদ ব'লে মনে করি না।

বদিবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন—মনে করেন না মানে?

—মথুরবাবুর সঙ্গে অত ঢলাঢলি ভাল লাগে না মশাই!

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ডাক্তার ওখানে গিয়ে এক হিসেবে আমাদের কত সুবিধে হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না? আমি তো এ যোগাযোগটাকে খুব ভাল ব'লে মনে করি, বিমলবাবু ব'লেই পেরেছেন।

—কি রকম বলুন তো?

—বিপক্ষের শিবিরে নিজেদের একটা স্পাই থাকা মন্দ কি?

নন্দী মহাশয় জিনিযটাকে এভাবে একবারও ভাবেন নাই। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দী-মহাশয় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন—তাহলে কি বলতে চান—

ঘাড় নাড়িয়া বদিবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ওই। কথাটা কাউকে বলি নি, আপনিও যেন ঘুণাক্ষরে কাউকে বলবেন না, পাঁচ কান হ'লে আবার—! বিমলবাবুকেও বলবেন না যেন—

—না না, পাগল!

—আচ্ছা এবার উঠি তাহলে আমি।

বদিবাবু চলিয়া গেলেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র মিথ্যার প্রভাবে নন্দী-মহাশয়ের মন নির্ম্মেঘ হইয়া গেল, বিমলের উপর তাঁহার যে

অপ্রসন্নতাটুকু ছিল তাহা আর রহিল না। বরং তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অতিশয় চতুর ছোকরা তো। থিয়েটারের অজুহাতে বেশ সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঢুকিয়াছে! অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে নন্দী-মহাশয়ের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ইহার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা ঘটিল। বৈকালে বিমল হাসপাতালে কাজ করিতেছিল। গত রাত্রে ভারি সুন্দর একটা রোগী আসিয়াছিল, তাহারই রক্তের স্লাইডগুলি বিমল আর এক বার দেখিতেছিল। কাল রাত্রে ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয় এই সাঁওতাল রোগাটিকে পাঠাইয়াছিলেন। লোকটা থার্ডক্লাস একটা গাড়ীতে অজ্ঞান অবস্থায় রক্ত-মাখামাখি হইয়া পড়িয়া ছিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। নিশ্চয়ই কেহ ইহাকে খুন করিয়া গিয়াছে, সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল। বিমলও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার গায়ে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই, রক্ত পড়িয়াছে নাক হইতে। সমস্ত গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। রাত্রেই রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—ম্যালেরিয়া। সহজ ম্যালেরিয়া নয়, ম্যালিগন্যানট্‌ ম্যালেরিয়া, সাংঘাতিক জিনিস। রাত্রেই সে একটি কুইনাইন ইন্‌জেকশন দিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রোগী উঠিয়া বসিয়াছে। বলিতেছে যে গাড়ীতেই তাহার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহার পর কি হইয়াছে সে জানে না। সম্ভবতঃ জ্বরের ঘোরে সে বেঞ্চি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলেই রক্তপাত ঘটিয়াছে। বিমল উত্তর দিকের বারান্দায় বসিয়া রক্তের স্লাইডগুলি আর এক বার দেখিতেছিল, এমন সময় গুপি-বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, সিভিল সার্জ্জন আসছেন—

বিমল সিভিল সার্জ্জনকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই।

উঠিয়া আসিয়া দেখিল খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা একটি বাঙালী সাহেব একটি চামড়া দিয়া বাঁধানো সরু বেত আস্ফালন করিতে করিতে জগদীশবাবুর সহিত এই দিকেই আসিতেছেন—তাঁহার গোঁফ দুই দিকে কামানো, কিন্তু পাকা, কানের পাশের চুলেও পাক ধরিয়াছে, চোখে মুখেও বার্দ্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ, কিন্তু চলনে বলনে বেশ একটা চটুলতা আছে। বার্দ্ধক্যটাকে অস্বীকার করিয়া একটু যেন বেশী জোরে হাঁটিতেছেন, বেশী জোরে হাসিতেছেন, বেতের সরু ছড়িটাকে একটু বেশী জোরে ঘুরাইতেছেন। বিমল নমস্কার করিতেই জগদীশবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—ইনিই আমাদের নূতন ডাক্তার, আর ইনি আপনাদের সিভিল সার্জন।

সিভিল সার্জন রিষ্টওয়াচটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—চলুন আপনার হাসপাতাল দেখি।

ইনডোরে ঢুকিয়া বলিলেন—ইনডোর তো আপনার ভর্ত্তি দেখছি, ছ্যাট্‌স্ গুড্—

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই-একটা টিকিট দেখিলেন।

—অধিকাংশই কালাজ্বর দেখছি, এ-সব রক্ত পরীক্ষা আপনি নিজেই করেন নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজেরই মাইক্রসকোপ আছে।

—ছ্যাট্‌স্ গুড্।

—ম্যালেরিয়া এ-অঞ্চলে কেমন পান ? খুব, নয় ?

—কালই তো একটা পেয়েছি।

বিমল সাঁওতাল রোগীর ইতিহাস বলিল এবং স্লাইড দেখাইল, দেখিয়া শুনিয়া সিভিল সার্জন খুশী না হইয়া পারিলেন না। তাঁহার খুশী ভাবটা লক্ষ্য করিয়া জগদীশ-বাবু বলিলেন—যথেষ্ট পরিশ্রম

করেছেন উনি হাসপাতালের জন্যে, আমরা ওঁকে ওষুধ দিতে পারছি না এই হয়েছে এক মুশকিল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—এতগুলো কালাজ্বর কেসের ইনজেকশন কোথায় পাচ্ছেন ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমল বলিল—নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিচ্ছি, কি আর করব ! বদিবাবু কিছু টাকা চাঁদা করে তুলে দিয়েছেন, ওষুধ আনতে দিয়েছি কিছু—

সিভিল সার্জন ও জগদীশবাবুর একটা দৃষ্টি বিনিময় হইল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—ভেরি গুড্, চলুন আপনার আউটডোর রেজিষ্টারটা দেখি।

রেজিষ্টারে দেখা গেল রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

সিভিল সার্জন তাহার পর বাহিরে হইতেই একবার, সার্জিকাল আলমারিটাতে উঁকি দিলেন।

—ছুরি-কাঁচিগুলিতে ঠিকমত ভ্যাসিলিন দেওয়া হয় তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ড্যাটস্ গুড্। রবার টিউবগুলো অমন ক'রে না রেখে কেরোসিন ভেপারে রেখে দেবেন। একটি টিনের বাক্স করিয়ে নেবেন, তার মাঝে একটা ফুটোফুটোওলা পার্টিশন থাকবে—নীচে খানিকটা কেরোসিন তেল রেখে দেবেন আর উপরে ঐ টিউবগুলো। আচ্ছা, কোকেন কতটা আছে দেখি—

কোকেন দেখা ও ওজন করা হইল—ঠিক আছে।

সিভিল সার্জন গুপিবাবুকে একটা ধমক দিলেন—তোমার নিক্তি এত ময়লা কেন, আজই পরিষ্কার করবে।

—যে আজ্ঞে।

সিভিল সার্জন বাহির হইয়া আসিয়া বিমলকে প্রশ্ন করিলেন—আপনার ইনডোরে কি একটা ফিমেল কেস সম্প্রতি মারা গেছে ?

—হ্যাঁ, নিমোনিয়া হয়েছিল।

—হার্টটা ফেল করল শেষকালে বুঝি ?

—হ্যাঁ, ভয়ও পেয়েছিল হঠাৎ।

বিমল ভিখারীর ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

সিভিল সার্জন জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে বেনামী চিঠিতে যা লিখেছে তা একেবারে মিছে কথা নয়। ওরকম ভিকিরি-টিকিরিকে আর আশ্রয় দেবেন না, আর হাসপাতালে নার্স যথন নেই, তখন রোগীর শুশ্রূষা করবার মত আত্মীয়স্বজন না থাকলে ভর্ত্তিও করবেন না। অনর্থক বদনাম হয়। আপনার নামে এক বেনামী চিঠি গিয়ে হাজির এক দিন আমার কাছে, আচ্ছা আপনার ভিজিটার্স বুকটা বার করুন।

বিমলের কথায়-বার্ত্তায় কার্য্যে সিভিল সার্জন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বেনামী চিঠি সত্ত্বেও বিমলের প্রশংসাসূচক মন্তব্যই করিলেন। তাহার পর হাত-ঘড়িটা আর এক বার দেখিয়া বলিলেন—জগদীশ চল তোমার কেসটা এবার দেখা যাক।

জগদীশ কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন—চল।

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে গুপিবাবুর বাসায় বসিয়া হরেন বোস সাগ্রহে সিভিল সার্জনের আগমন-বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু খুব খুশী হইলেন না। বেনামী চিঠি লিখিয়া লোকটাকে জব্দ করা গেল না তো !

১০

হরেন বোসের সহিত বিমলের শত্রুতা ত ছিলই, আরও একটি শত্রু বৃদ্ধি হইল। স্টেশন-মাষ্টার ঘোষালবাবুর সহিতও সদ্ভাব রক্ষা করা বিমলের পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না। বেঁটে ভূঁড়ি-সর্ব্বস্ব এই লোকটির উপর বিমলের তাদৃশ শ্রদ্ধা গোড়া হইতেই ছিল না। রেলের ডাক্তার জগুবাবুর সহিত আলাপ হইবার পর হইতে বিমল ঘোষালবাবুর উপরে চটিয়াছে। ডাক্তার জগমোহন অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক, গোলগাল মুখখানিতে সরলতা যেন মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বদাই সকলের উপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। অত্যন্ত বেশী ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয় জগুবাবু তাঁহার ন্যায্য মূল্য কাহারও নিকট হইতে পান না। অতিশয় সুলভ হইয়া তিনি সকলেরই নিকট যেন খেলো হইয়া রহিয়াছেন। জগুবাবুর সহিত দুই-একটি রোগীও বিমল ইতিমধ্যে দেখিয়াছে, ডাক্তার হিসাবে লোকটি মোটেই নিন্দনীয় নহেন, বরং নিরহঙ্কার এবং জগদীশবাবু, ভূধরবাবুর অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক। অথচ এই জগুবাবুর নিন্দায় ঘোষাল শতমুখ। রেলের আইন-অনুসারে ঘোষাল বিনামূল্যে জগুবাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারেন কিন্তু সে চিকিৎসা পাইবার জন্য তাঁহাকে ত দুইমাইল দূরে যাইতে হইবে। হাতের কাছে যখন বিনামূল্যেই বিমলবাবুকে পাওয়া যাইতেছে তখন আর অত কষ্ট করিয়া লাভ কি। একজন প্রতিদ্ব ডাক্তারের নিন্দা করিলে বিমলবাবু হয়ত খুশী হইবেন এই আশায় ঘোষাল সম্ভবতঃ জগুবাবুর নিন্দা করিয়া থাকেন। বিমল সবই বুঝিত, কিছু বলিত না। ঘোষালবাবুর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, সুতরাং প্রায়ই বিমলকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হয়। ঘোষাল-গৃহিণীর যক্ষ্মা হয় নাই —হইয়াছিল কোলাই জ্বর ( বি কোলাই ইনফেক্‌শন ), ইন্‌জেকশন লইয়া

ও ঔষধ পান করিয়া তিনি বিজ্বর হইয়াছেন। সুতরাং বিমলের প্রতি ঘোষালের বিশ্বাস আরও অগাধ হইয়াছে এবং কাহারও সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইলেও বিমলের ডাক পড়িতেছে। প্রায়ই বিমলকে হাসপাতালের ফেরৎ কিম্বা হাসপাতাল যাইবার মুখে ঘোষালবাবুর বাড়ী যাইতে হইতেছে। ইহাতে এত দিন বিমল কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টিও বেশ অসাধারণ রকমের। এখানে আসিয়া অবধি এত জোরে, বৃষ্টি বিমল এক দিনও দেখে নাই। মেঘের যেমন গর্জ্জন তেমন বর্ষণ। এই বর্ষা-সন্ধ্যায় বিমল একা চুপচাপ বসিয়া ছিল। এই বৃষ্টিতে ওপারে রিহার্সাল দিতে যাওয়া অসম্ভব, হয়ত কেহই আসে আর নাই। সহসা তাহার নজরে পড়িল ঘরের একটা কোণ হইতে জল পড়িতেছে। তোরঙ্গটা ছিল সরাইয়া আনিল এবং যোগেনকে ডাকিয়া একটা বালতি কিংবা গামলা ঐ জায়গাটায় রাখিতে বলিল, সমস্ত ঘরটা তাহা না হইলে জলময় হইয়া যাইবে। যোগেন বলিল যে পাশের ঘরে এবং রান্নাঘরেও নাকি জল পড়িতেছে। ক্রমশঃ দেখা গেল দালানেরও উত্তর দিকটার ছাতে ফাটল, সেখান দিয়া বেশ প্রবলভাবেই জল পড়িতেছে। বাড়ীটা অবিলম্বে সারানো দরকার। কিন্তু হাসপাতালের ফাণ্ডের কথা চিন্তা করিয়া সে একটু দমিয়া গেল। নিরুৎসাহ ভাবটা কাটাইয়া ফেলিবার জন্য সে বলিল—ষ্টোভে তেল আছে ?

—আজ্ঞে আছে।

একটু জল গরম ক'রে আন দিকি, পরেশ-দার কফি একটু খাওয়া যাক, দুধও গরম কর এক পেয়ালা, চিনি আছে ত ?

—আছে।

—কফি খেয়েছিস কখনো তুই ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তোকে, জল গরম কর তাড়াতাড়ি।

যোগেন মহা উৎসাহে জল গরমের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মেডিকেল গেজেটখানা খুলিতে গিয়া সহসা তাহার ভিতর হইতে মণিমালার একখানা পুরাতন চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। পুরাতন চিঠি পড়িতে এত ভাল লাগে! মণিমালার চিঠিতে বিশেষ কোন কবিত্ব থাকে না, সাদাসিধা আমি-ভাল-আছি-তুমি-কেমন-আছ গোছ চিঠি, তবু পড়িতে ভাল লাগে। বিমল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতেছে এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া হুড়মুড় করিয়া ষ্টেশনের পয়েণ্টস-ম্যান চন্দু আসিয়া উপস্থিত। এক পা কাদা, সর্ব্বাঙ্গ ভিজা, দুই হাতে দুইটি সিক্ত ছাতা!

—বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন হুজুর, জলদি।

—কেন ?

—খোকা খাট থেকে গিরে গিয়ে বেহুঁস হয়ে গেছে।

—তাই নাকি, বড় বৃষ্টি পড়ছে যাব কি ক'রে ?

—বাবু ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন,—চন্দু ছাতা দেখাইল।

এই বৃষ্টিতে বিমলের বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু খোকা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, না গেলেও নয়। যোগেনকে জল গরম করিতে বারণ করিয়া দিয়া অবশেষে বিমল হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া খালি পায়ে বাহির হইয়া পড়িল। এক জোড়া মাত্র জুতা আছে, সেটাকে ভিজানো ঠিক হইবে না। চন্দু ষ্টেশনের একচক্ষু আলোটি আনিয়াছিল, তাহারই আলোকে কোনক্রমে বিমল মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল।

সেখানে গিয়া কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় কি, কেহই ত অজ্ঞান হয় নাই! মাষ্টার-মহাশয়ও বাড়ীতে নাই, তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটি খাটের উপর হইতে মারামারি করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিল এবং মাষ্টার-মহাশয়ের গৃহিণীর বর্ণনানুযায়ী পড়িয়া যাইবার পর একটু যেন "কেমন কেমন" করিতেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, এখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তবু যদি ডাক্তারবাবু একবার উহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! বিমল গম্ভীরভাবে তাহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। তাহার যত দূর মনে পড়িল এই মাসেই সে ঘোষালবাবুর ওখানে অন্ততঃ দশ বার গিয়াছে। সে পরদিন চল্লিশ টাকার একখানি বিল ঘোষালবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। টাকা অবশ্য ঘোষালবাবু দিলেন না। পরেশ-দার অনুরোধে ইহা লইয়া বিমলও আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। ঘোষালবাবুর মধ্যে দুইটি পরিবর্ত্তন কিন্তু দেখা দিল, প্রথম তিনি বিমলকে পরিত্যাগ করিলেন, দ্বিতীয় তিনি ভূধরবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারিতে মাঝে মাঝে যাতায়াত সুরু করিলেন। তাঁহার মেয়ের জ্বর হওয়াতে ভূধরবাবুই এক দিন আসিয়া দেখিয়া গেলেন এবং বিমল লোক পরম্পরায় শুনিল, ঘোষাল না কি বলিয়াছেন যে পয়সা দিয়া ডাকিতে হইলে ভাল ডাক্তারই তিনি ডাকিবেন, বাজে ডাক্তারকে ডাকিতে যাইবেন কেন! ভূধরবাবু অবশ্য একবারই আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাবেক জগমোহনই পুনরায় আসিয়া ঘোষালবাড়ীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। বিমল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

## ১১

দেখিতে দেখিতে আরও মাসখানেক কাটিল। এক দিন মহাসমারোহে 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনীত হইয়া গেল। প্রত্যেকের ভূমিকাই চমৎকার হইয়াছিল। 'অপর্ণার ভূমিকায় আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে অদ্ভুত অভিনয় করিল। পুরুষ মানুষে মেয়ের ভূমিকা এত সুন্দর করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে বিমল আশাই করিতে পারে নাই। বিমলের নিজের ভূমিকাও চমৎকার হইয়াছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় এ অঞ্চলে আর না কি হয় নাই। মথুরবাবু অভিনয়-রসিক, বিমলের অভিনয়ে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটা সোনার পদক তাহাকে উপহার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ধনী সকলেরই নিকট অমর টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, সকলেই আসিয়াছিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটির পরিচয় লাভ করিয়া সকলেই খুশী হইলেন। মহিলাদের জন্য চিকের আলাদা বন্দোবস্ত ছিল; বিনোদিনী, সেফালি এবং মথুরবাবুর বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা চিকের অন্তরালেই বসিয়া ছিলেন। পর্দ্দা বিষয়ে মথুরবাবু, বিশেষ করিয়া মথুরবাবুর গৃহিণী রীতিমত সনাতনপন্থী। অসূর্য্যম্পশ্যা না হইলেও আলোকম্পশ্যা যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পালকি ছাড়া কখনও বাড়ীর বাহির হন না। মোটর আছে কিন্তু তাহা খোলা মোটর বলিয়া তাহাতে মেয়েরা চড়ে না। মথুরবাবু একটি ঢাকা মোটর কিনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মথুরবাবুর স্ত্রীর তাহাতে নাকি ঘোর আপত্তি। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমাদের পালকিই ভাল। পালকি আছে ব'লে তবু কয়েকটা লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, মোটর হ'লে ও বেয়ারাগুলোকে তোমরা ত আর রাখবে না! তাছাড়া ও মোটর-ফোটরের চেয়ে পালকিই আমার বেশী পছন্দ। মহিলা-দর্শকগণের মধ্যে

অধিকাংশই পর্দ্দানশীন ছিলেন। বাহিরে চেয়ারে আসিয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন মেমসাহেব ছিলেন, তাঁহারা সদর হইতে মোটরযোগে অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন—পুলিস-সাহেবের স্ত্রী, জজ-সাহেবের স্ত্রী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী। তাঁহারা অবশ্য বেশীক্ষণ বসেন নাই, খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে চেয়ারে একটি বাঙালী মহিলাও বসিয়াছিলেন, তিনি একাই ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। বিমল শুনিল তিনি নাকি সৌরীনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, কলেজের পাস না হইলেও খুব শিক্ষিতা এবং মার্জ্জিত-রুচি। একটু অতি-আধুনিকতার শুচিবায়ু আছে এবং সেজন্য নাকি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন না; যখনই যেখানে যান নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলেন। এসব সত্ত্বেও নাকি সুপ্রিয়া সরকার মেয়েটি "কোয়াইট্ টলারেবল্"—জয়সিংহ-বেশে সজ্জিত অমর অন্ততঃ সেই কথাই বিমলকে বলিল। সিভিল সার্জ্জন আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী নাকি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা চিকের অন্তরালে বসিয়াছেন বলিয়া মণিমালার বান্ধবী তরঙ্গিণীকে বিমল দেখিতে পাইল না। মথুরবাবুর বাড়ীর কাছেই ক্লাব, সুতরাং তাঁহার সদ্য বসানো 'ডায়নমো'র সহায়তায় রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অভিনয়। এই জন্যই সকলের উৎসাহ আরও বেশী হইয়াছিল;—সুবিধা কত! কিন্তু অসুবিধাটাও খানিকক্ষণ অভিনয় হওয়ার পর বোঝা গেল—হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল। অগত্যা অভিনয় কিছুক্ষণ বন্ধ রহিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মেজাজ ও যোগাযোগ ঠিক হইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। এমন একটা কলরব উঠিল যে, মনে হইল সব বুঝি পণ্ড হইয়া যায়! নানা রকমের

নানা মন্তব্য, নানা গ্রামে নানা রকম শিস চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই যখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ দপ করিয়া আবার সব আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং অভিনয় পুনরায় সুরু হইল। মাঝখানে খানিকটা গোলমাল হওয়াতে একটু রসভঙ্গ অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়গুণে আবার বেশ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না।

অভিনয়ান্তে অমর বলিল—খরচখরচা বাদে ৩১১৷৶১০ বেঁচেছে, এর সবটাই কি তুই চাস?

—নিশ্চয়!

—কেন, তোমার বদিবাবু ত পাঁচ-শ টাকা জোগাড়ই করছে।

—না, আমার অনেক দরকার টাকার, আমার বাসাটার চার দিক দিয়ে জল পড়ছে, সারাতে হবে।

—সব টাকা দিচ্ছি না, আড়াই-শ তুমি নাও, বাকিটা নিয়ে আমরা সবাই স্ফূর্ত্তি করি এক দিন। কি বল হে, শরৎ—

শরৎ ছোকরাটি অপর্ণা সাজিয়াছিল। চিরন্তন বখাটে ছোকরা, ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারে নাই, থিয়েটার করিতে পারে বলিয়া অমরই তাহাকে এখানকার কো-অপরেটিভের একটা চাকরী জুটাইয়া দিয়াছে। সে একটু বিনীত অথচ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ সার্।

—অত টাকা নিয়ে কি স্ফূর্ত্তিটা করবি শুনি?

অমর হাসিয়া বলিল—অত টাকা আর কই, ও কটা টাকাতে কি-ই বা হবে, মাঝ থেকে আমার পকেট থেকে গচ্ছা লাগবে আর কি! এক কাজ করলে হয়, সতীশখুড়োকেও দলে টানলে মন্দ হয় না, তাঁরই বাগানবাড়ীতে জোটা যেতে পারে।

বিমল এ-সবের নিগূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিতেছিল না। সতীশবাবু নামটা কিন্তু পরি৷ সতীশবাবুর ভায়ের সে কালাজ্বর চিকিৎসা করিয়াছে, সেই সতীশবাবু না কি! জিজ্ঞাসা করিতেই অমর বলিল—হ্যাঁ সেই।

—তোর খুড়ো হয়?

—হয় বইকি এক সম্পর্কে, আমার বোন শেফালির খুড়শ্বশুর। জ্যোতিষবাবুর ছেলের সঙ্গে শেফালির বিয়ে হয়েছে কি না! ওরা তিন ভাই—জ্যোতিষ, সতীশ, অতীশ। তুই অতীশের চিকিৎসা করেছিলি।

একটু থামিয়া অমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—শেফালির বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু সতীশবাবু আমাদের খুড়ো, উনিই ত প্রথমে হাতেখড়ি দেন আমাদের! এক হিসেবে গুরুদেবও।

শরৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসি গোপন করিতে করিতে মুখের পেণ্ট তুলিতেছিল।

অমর গম্ভীরভাবে বলিল—খুব মজলিসি লোক আমাদের সতীশখুড়ো, আলাপ ক'রে দেখিস, খুড়োরই বাগানবাড়ীতে গিয়ে জমায়েৎ হওয়া যাবে এক দিন!

এতক্ষণ বিমল লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু এইবার অমর প্রকাশ্য ভাবেই আলমারির পিছন হইতে ব্রাণ্ডির বোতলটা বাহির করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিল। বিমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

—ছি ছি, অমর এ কি!

অমর একটু থিয়েটারি ভঙ্গী করিয়া বলিল—কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু, কিছু নয়!'

তাহার পর বলিল—তুই এখন বাড়ী যা, তিনটে চারটে নাগাদ আমি টাকা নিয়ে তোর ওখানে যাব। তুই যা এখন—

ভোরবেলা নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইতে বিমলের কেবল অমরের কথাই মনে হইতে লাগিল। ছেলেটা সত্য সত্যই একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। অমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে, তাহার উপর মদ ধরিয়াছে! বেচারী বিনোদিনী! সেদিন গভীর রাত্রিতে জোৎস্নালোকে বিনোদিনী ও অমর তাহার বাসায় আসিয়াছিল। বিনোদিনীর জোৎস্নালোকিত মুখচ্ছবিটি বিমলের বার-বার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিনোদিনী কি এখনও অমরকে তেমনই ভালবাসে যাহার প্রেরণায় এক দিন সে তাহাকে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিল? অমরের অধঃপতনের কিছু মাত্র ইঙ্গিত কি তাহার অন্তর্যামী মন পায় নাই! সব জিনিষই কি কথায় প্রকাশ করিতে হয়, অকথিত কত জিনিষই ত আমরা এমনিই বুঝিতে পারি। কোথায় যেন সে পড়িয়াছিল ভগবান আমাদের ভাষা দিয়াছিলেন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য নয়, গোপন করিবার জন্য। উক্তিটা হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু খানিকটা সত্য আছে বইকি উহার মধ্যে। অমর কেমন স্বচ্ছন্দে বিনোদিনীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সত্যই ভুলাইতে পারিয়াছে কি? বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হয়। পারঘাটে নামিয়া বিনোদিনীর কথাই ভাবিতে ভাবিতে বিমল অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছিল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই কখন নিজের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল খেয়াল ছিল না, হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল যখন তাহার মেজশালা শুভেন্দু তাহাকে সম্বোধন করিল।

—জামাইবাবু, আমরা এসে গেছি! দিদি, জামাইবাবু এসেছেন! বিস্মিত বিমল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দেখিল হাতলভাঙা সেই

চেয়ারটার উপর মণিমালা স্মিতমুখে বসিয়া আছে। বিমল ঢুকিতেই মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তোমাকে আশ্চর্য্য করে দেব ব'লে কোন খবর না দিয়েই আমরা এলুম—এসে নিজেরাই বেকুব! মা কিন্তু বলেছিলেন—নয় রে খোকা—যে ডাক্তার মানুষ কলে-টলে কোথাও বেরিয়ে গেলে মুশকিলে পড়বি তোরা! ওকি, তোমার মুখে ও-সব কি!

বিমল হাসিয়া বলিল—পেণ্টগুলো ওঠে নি বোধ হয় ভাল ক'রে!

—কিসের পেণ্ট?

—কাল রাত্রে থিয়েটার করতে গেছলাম ওপারে।

—কি থিয়েটার?

—'বিসর্জ্জন'।

—হঠাৎ থিয়েটার! ওপারে কোথায়?

—অমরদের ওখানে।

মণিমালার মুখে নিমেষের জন্য একটা ছায়াপাত হইল।

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ থিয়েটার?

বিমল অকারণে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়া সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া বলিল—আমাদের হাসপাতালে কিছু টাকার দরকার পড়েছিল, তাই থিয়েটার করে সেই টাকাটা তোলা গেল!

—টিকিট ক'রে হয়েছিল বুঝি?

—হাঁ, দাঁড়াও আমি আগে মুখটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি।

বিমল তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল।

একটু পরে বিমল বাথরুম হইতে বাহির হইতেই মণিমালা আসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি কি!

—কি ?

—ওই চেয়ারে তুমি বসতে, ওই চৌকিতে ওই বিছানায় শুতে !

—স্বচ্ছন্দে !

ছি, ছি তোমরা সব পারো। এই ময়লা গেঞ্জি প'রে রোজ তুমি হাসপাতালে যাও ! চাকরটাকে বলতে পার না একটু সাবান দিয়ে দিতে !

চাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিমল মিথ্যাভাষণ করিল।

—সাবান তো প্রায়ই দেয়।

—দেয় না আরও কিছু ! ছি ছি ঘরদোর কি ক'রে রেখেছ আজই থামো সব পরিষ্কার করাচ্ছি ! পরিষ্কার করাবই বা কি ক'রে বা বিচ্ছিরি তোমার ঘরের মেঝে, সিমেণ্ট উঠে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ফাটলে ফাটলে সব যত রাজ্যের ময়লা !

বিমল বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজে যে-সব বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করে না, সেই সব বিষয় লইয়া এই তরুণীটি ত মহা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তরুণীটি অপর কেহ নহে তাহারই সহধর্ম্মিণী ! বারান্দার এক প্রান্তে স্তূপীকৃত জিনিষগুলির প্রতি সে চাহিয়া দেখিল। অনেক জিনিষ আনিয়াছে ত। একটা বড় তোরঙ্গ, একটা চামড়ার স্যুটকেস, একটা ছোট হাতবাক্স, তাছাড়াও আর একটা অ্যাটাচি-কেশ—প্রত্যেকটিতেই বেশ পরিচ্ছন্ন খাকির ওয়াড় পরানো। হোল্ড-অলে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়া বাঁধা বিছানার ফাঁকে যে বালিশটি উঁকি দিতেছে তাহাও বেশ ঝালর-দেওয়া ওয়াড়-পরানো এবং ঝালরের ওধারেও লাল সুতা দিয়া কি একটা কারুকার্য করা আছে যেন ! ইহা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা মাটির হাঁড়িতে কি যেন রহিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা চৌকোণা ও বস্তুটা কি ! ওদিকে একটা কেরোসিন

কাঠের বাক্সের ভিতরই বা কি রহিয়াছে। মণিমালার সঙ্গে যে এত-গুলো জিনিষ অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত, তাহা ত বিমল একবারও ভাবে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—কুকুরটা কই দেখছি না।

—সেটা মিনু কিছুতেই ছাড়লে না, এমন আবদারে মেয়ে জন্মে দেখি নি কখনো, এমন কাঁদতে লাগলো—

বিমল মনে মনে মিনুকে অসংখ্য ধন্তবাদ জানাইল।

—ওরে খোকা, খোকা কোথা গেল—

শুভেন্দু সোজা গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছিল। গঙ্গায় সার বাঁধিয়া পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে, অবাক হইয়া সে তাহাই দেখিতেছিল। কলিকাতায় জন্ম, কলিকাতাতেই মানুষ, এই ফাঁকা গঙ্গার ধারটি তাহার ভারি ভাল লাগিতেছিল। যোগেন তাহাকে ডাকিতে গেল।

বিমল বলিল—একটু চা খেয়ে এইবার হাসপাতালে যাওয়া যাক! ওই হাঁড়িটাতে কি আছে?

—সন্দেশ, ভীমনাগের ওখানকার ভাল সন্দেশ। খাও না।

—ওই চৌকোণা জিনিষটা কি বল দিকি?

—ওটা আয়না।

—কেরোসিন কাঠের বাক্সে ওটা কি?

—ওটা একটা সেলায়ের কল, নতুন কিনে এনেছি। তোমাকে কিন্তু মাসে মাসে ওর ইনষ্টলমেণ্ট দিতে হবে, বেশী নয় পাঁচ টাকা ক'রে—

—বেশ।

হাসপাতালে গিয়া কিন্তু বিমল একটি দুঃসংবাদ পাইল। কাল রাত্রে সে যখন থিয়েটার করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন একটি কলেরা রোগী হাসপাতালে আসিয়াছিল এবং একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মারা

গিয়াছে। চশমার কাচের উপর দিয়া তাকাইতে তাকাইতে গুপিবাবু ভালমানুষের মত বলিলেন—আমি ভাবলাম বুঝি সাধারণ ভেদবমি, কলেরা ব'লে অতটা ধরতে পারি নি, পারলে জগদীশবাবু কি ভূধরবাবু কাউকে খবর দিতাম!

অযৌক্তিকভাবে বিমল বলিল—আমাকে খবর দিলেই পারতেন।

চশমার কাচের উপর দিয়া গুপিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—তা কি হয়, আপনি একটা 'মেন' পার্টে ছিলেন।

—একটা দুটো কলেরা ফাজ্ খাইয়ে দিলেও ত পারতেন!

—চাবি যে আপনার কাছে।

বিমল চুপ করিয়া রহিল, সত্যই তাহার বলিবার কিছু নাই।

গুপিবাবুর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিবার জন্য সে নিজেই কিছুদিন হইতে আলমারির চাবি নিজের কাছে রাখিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া যন্ত্রচালিতবৎ দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। ঘুমও পাইতেছিল, কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটা—যাহাকে সে ষ্টেশন হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহার জন্য কয়েকটি হাঁসের ডিম লইয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছে। বিমলকে ডিমগুলি দিয়া সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

বিমলের বার-বার কলেরা রোগীটার কথা মনে হইতে লাগিল। আহা, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে।

বৈকালে অমর আসিল। বিমলের হাতে সে ৩১১৷৴১০ দিয়া বলিল —তখন ঠাট্টা করছিলাম, এ টাকা কি অন্য কিছুতে খরচ করতে পারি।

তাহার পর হাসিয়া বলিল—বাবা তোর জন্যে আজ একটা সোনার

মেডেল গড়াতে দিলেন! আর একটা কাজও কিন্তু তিনি করেছেন আজ।

—কি?

—হাসপাতালে কাল রাত্রে একটা কলেরা রোগী নাকি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, সে-কথা তিনি রিপোর্ট করেছেন সিভিল সার্জন আর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে!

বিস্মিত বিমল চুপ করিয়া রহিল।

১৩

এই বিপদেও বদিবাবু বিমলকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারই পরামর্শ-অনুযায়ী সে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট জবাবদিহি করিল যে হাসপাতাল-কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে সে থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল এবং ঐ থিয়েটার হাসপাতালেরই সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সখের জন্য নয়। আরও লিখিল যে, তাহার অনুপস্থিতিকালে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার ছিলেন রোগীকে কিছু ঔষধও দেওয়া হইয়াছিল, একেবারে বিনা চিকিৎসায় মরিয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বদিবাবু নন্দী-মহাশয়ের স্বাক্ষরিত অনুমতি-পত্র আনিয়া দিলেন এবং বিমল সেটি তাহার জবাবদিহির সহিত গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল। আরও শোনা গেল স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নাকি বদিবাবুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ইহা লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী খানিকক্ষণ বসিয়া থিয়েটার দেখিয়াছিলেন, অভিনয় তাহার নাকি ভাল লাগিয়াছিল, তা ছাড়া একটা সৎকার্য্যের জন্য যখন হইতেছে মোট কথা ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, বিমলের কিছুই হইল না।

এই প্রসঙ্গে হরেন বোস সক্ষোভে চৌধুরীকে বলিলেন—এই ডাক্তার ছোকরার কেন্দ্রে বোধ হয় বৃহস্পতি আছে, বুঝলেন !

চৌধুরী বলিলেন—সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে নন্দী-মহাশয় সহাস্য মুখে বিমলকে বলিলেন—কি রকম ডাক্তারবাবু; পরিচয় পেলেন ত কি রকম কেউটেটি !

বিমল স্মিতমুখে বলিল—আশ্চর্য্য লোক, অথচ ওঁর ছেলেরই অনুরোধে আমি রাজি হয়েছিলাম—

—আশ্চর্য্য লোক নয়, পাজি লোক।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—অত্যন্ত হারামজাদা ব্যক্তি !

বিমল কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবুর সঙ্গেও এক দিন দেখা হইয়াছিল। তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ওষুধপত্তর ত সব এসে গেল, আর কি, এইবার পাড়ি জমিয়ে ফেলুন ! ভূধর আর জগদীশকে চটাবেন না, ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করুন।

—আচ্ছা।

মণিমালা ইতিমধ্যে সংসার গুছাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক মনোমত ভাবে নয়, মোটামুটি। প্রথমেই সে ঐ হাতলভাঙা চেয়ার ও নড়বড়ে চৌকিটাকে সংস্কার করাইয়াছে, সামান্য একটু সারাইয়া বার্নিশ করিয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে ঝুল ছিল, দালানে পাখীর বাসা ছিল, উঠানের কোণটা একটা আঁস্তাকুড় হইয়াছিল যেন! চায়ের পাতা, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের খালি বাক্স, কনডেন্সড্ মিল্কের খালি টিন, এঁটোকাঁটা কি না ছিল ওখানে। যোগেনকে দিয়া মণিমালা সব পরিষ্কার করাইয়াছে, পরিষ্কার করাইবার সময় কত বড় প্রকাণ্ড একটা বিছা বাহির হইল! অনায়াসে সাপও থাকিতে পারিত।

ওদিককার ঘরটাও কি কম নোংরা হইয়াছিল! যত রাজ্যের পুরাতন খবরের কাগজ, একটা ছেঁড়া বালিশ, কালিহীন একটা শুকনো দোয়াত, আর যোগেনের একটা ময়লা বিছানা! ওইটুকু ছোঁড়া বিড়ি খায় কত, বিড়ির টুকরায় সমস্ত ঘরটা যেন পরিপূর্ণ! যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য! ও-ঘরটা পরিষ্কার করিয়া মণিমালা যোগেনের শুইবার ব্যবস্থা বাহিরের ঘরটাতে করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে বিছানাপত্র যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আর বিড়ি খাইয়া যেন ঘরে না ফেলে। নিজের কলটি, আয়নাটি, বাক্সগুলি বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইবার পর মণিমালা আবিষ্কার করিয়াছে দুইখানি টেবিল, খানচারেক ছোট ছোট 'ডিসেন্ট' চেয়ার, একটি আলনা, একটি ছোট ঘড়ি না হলে চলিবে না। ওগুলি অবিলম্বে চাই। ছোট ছোট গোটা-দুয়েক তেপায়া, একটি আরাম-কেদারা, একটি 'হোয়াট নট' পরে কিনিলেও চলিবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিষ অবিলম্বে চাই—একটা মিট-সেফ্। এ-সব ত গেল আসবাব-পত্র। ঘরের দেওয়ালগুলি চুনকাম করানোর দরকার, জানলা কপাট-গুলিও রং করাইতে হইবে. মেঝেটা আর একবার সিমেণ্ট করাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের তালাগুলাও কি বিশ্রী! উহারই উপর খবরের কাগজ পাতিয়া মণিমালা আপাততঃ চালাইতেছে বটে, কিন্তু গোটাদুই ভাল কাচের আলমারি তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে।

হঠাৎ কলেরা এপিডেমিক সুরু হইয়া গেল।

হাসপাতালে প্রতি দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অন্তর রোগী আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে হাসপাতাল ভরতি হইয়া গেল। শেষে বিমল হাসপাতালের সামনের মাঠটায় খড়ের চালা তুলিয়া রোগী রাখিতে সুরু করিল। থিয়েটারের টাকাটা হাতেই ছিল, টাকার জন্ত কাহারও

কাছে হাত পাতিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে চালাগুলিও ভরিয়া গেল, সেখানেও স্থানাভাব। যাহাদের হাসপাতালে স্থান দিতে পারিল না তাহাদের বাড়ী গিয়াই বিমল তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার স্নানাহারে অবসর নাই—কেবল স্যালাইন, 'ফাজ' আর ভ্যাকসিন! ডুলু এবং গুপিবাবুও খুব খাটিতে লাগিলেন,—ডুলু প্রাণ দিয়া, গুপিবাবু প্রাণের দায়ে। ঘরে ঘরে মাছির মত লোক মরিতেছে! যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—অসহায় দীন-দরিদ্রের দল!

মণিমালা ভয় পাইয়া গেল! তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার স্বামী এ কি করিতেছে! নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখা ত উচিত, একাই সকলকে দেখিতে হইবে তাহারই বা মানে কি। রোজগার হইলেও বা না হয় কথা ছিল, অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এ সব কি কাণ্ড! একটুও ভাল লাগে না তাহার! বিমলকে বলিলে সে কথা শোনে না। সে দিনরাত পাগলের মত ঘুরিতেছে! সবাই যে বাঁচিল তা নয়, অনেক মরিল, অনেক বাঁচিল। এই কলেরা রোগী লইয়াই বিমলের বদনাম হইয়াছিল, ইহাতেই তাহার আবার সুনামও হইল। হাসপাতালের নূতন ডাক্তার বাবুটির সুখ্যাতিতে দেশ ছাইয়া গেল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

ছয় মাসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে বিমলের প্র্যাক্টিস জমিয়া উঠিল। সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হইয়া গেল। হাসপাতালে ঔষধের অভাব নাই, রোগী অনেক আসিতেছে এবং তাহাদের মুখে মুখে বিমল

ডাক্তারের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নন্দী মহাশয় এবং বদ্দিবাবু তো বিমলের পক্ষে আছেনই, হাসপাতাল-কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও তাহার উপর প্রসন্ন হইতেছেন। এমন কি হরেন বোস এবং চৌধুরী মহাশয়েরও উগ্রভাবটা যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আর কিছু নয়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে "ট্যাক্‌ট" অর্থাৎ লোক পটাইবার ক্ষমতা তাহা যে বিমলের যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অবকাশ নাই। কোন রকমে চৌধুরী মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে হরেনবাবুও তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িবেন, তাহা বিমল বুঝিয়াছিল। একদিন সুযোগও ঘটিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয়ের ছোট নাতিটি পীড়িত হইয়া পড়িল। বছর-দেড়েক বয়স, ভয়ানক জ্বর। সাধারণতঃ জগদীশবাবুই চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অসুখ হইলে দেখেন, এবারও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু বিমলের সৌভাগ্যক্রমে শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। জগদীশবাবু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—বিমলবাবুর মাইক্রসকোপ আছে, ওঁকে ডেকে রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন। সুবিধে যখন রয়েছে—

সিভিল সর্জনের সহিত জগদীশবাবুর গোপনে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু আজকাল জগদীশবাবু প্রায়ই বিমলের মাইক্রসকোপের সাহায্য লইতেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক জগদীশবাবু আর একটা কথাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বোধ হয়। চিকিৎসা-ব্যাপারে দায়িত্বটা যত ভাগাভাগি হইয়া যায় ততই মঙ্গল। তিনি রক্তপরীক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় হরেন বোসের সহিত এ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে করিতে বড় দেরি করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাও বিমলের পক্ষে ভারি সুবিধাজনক হইল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকিলে বিমল হয়ত আসিয়া রক্তই পরীক্ষা করিত এবং কিছুই পাইত না। কিন্তু দেরি করিয়া ডাকার ফলে ডিপথিরিয়ার লক্ষণসমূহ বেশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, বিমল রক্ত পরীক্ষা না করিয়া গলা পরীক্ষা করিল এবং গলা হইতে একটা 'সোয়াব' লইয়া দেখিতেই ডিপথিরিয়া ধরা পড়িল। গ্রহ যখন প্রসন্ন হন এমনই হয়। সৌভাগ্যক্রমে ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক 'সিরামও' সে সম্প্রতি ডাক্তারখানায় আনাইয়াছিল। এত দামী ঔষধ এ সব হাসপাতালে সাধারণতঃ থাকে না, তবু যদি কখনও দরকার পড়ে এই জন্য বিমল দুইটা টিউব আনাইয়া রাখিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেগুলি কাজে লাগিয়া গেল। চৌধুরীর নাতি যখন ভাল হইয়া গেল তখন গদগদ চৌধুরী বিমলকে বলিলেন—এ ঋণ আমি কখনও শুধতে পারব না ডাক্তারবাবু, তবু আপনার পারিশ্রমিক কত দিতে হবে, সেটা অনুগ্রহ ক'রে বলুন।

বিমল হাসিয়া বলিল—আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেব কি! কিছু দিতে হবে না আপনাকে।

—না, না, এত মেহনৎ করলেন আপনি—

—কিছু না, এটা তো আমার কর্ত্তব্য করেছি মাত্র। সবার কাছেই কি আর পয়সা নেওয়া চলে, আপনারা হলেন ঘরের লোক—

না, না, সেটা—

বিমল কিন্তু এক পয়সা লইল না। চৌধুরী-বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

জগদীশবাবু সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভারি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমি তো বললুম চৌধুরী মশায়, মাইক্রসকোপের সাহায্য নইলে আপনার নাতির ব্যায়রামটি ধরা পড়বে না! কেমন, বলি নি আমি?

তাঁহার ফোঁকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি কাঁপিতে লাগিল।

বিমল স্মিতমুখে জগদীশবাবুর মুখের পানে চাহিল এবং বলিল— আমি তো মাইক্রসকোপে দেখে তবে ধরলুম, আপনি তো না দেখেই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন, আপনাদের চোখই আলাদা, আপনাদের মত এক্স্‌পীরিয়েন্‌স্‌ হ'তে ঢের দেরি এখন আমাদের—

তাহার পরদিনই জগদীশবাবু বিমলকে আর একটি রক্ত পরীক্ষা করিতে দিলেন এবং বিমলও একটি টাইফয়েড কেসে এক রকম অকারণেই তাঁহাকে "কন্‌সালটেসান" অর্থাৎ পরামর্শ করিবার অজুহাতে ডাকিল। একেবারে অকারণে নয়, রোগীটি শাঁসালো, একটু ধুমধাম করিয়া চিকিৎসা না করিলে হাতছাড়া হইয়া যাইত। জগদীশবাবু আসিয়া সিভিল সার্জ্জনকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সিভিল সার্জনের সহিতও বিমলের বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ এই উদ্যমশীল যুবক ডাক্তারটিকে প্রথম দিন হইতে তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছে—এই মৃতপ্রায় হাসপাতালটিকে ছোকরা নিজ চেষ্টায় পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে তো! দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কন্যা তরঙ্গিণীর সখী ইহার স্ত্রী। মণিমালাকে লইয়া বিমল এক দিন তরঙ্গিণীর সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছে। বিমলকে দেখিয়া তরঙ্গিণী, তরঙ্গিণীর মা সকলেই খুব খুশী। সিভিল সার্জনের মনেও কেমন যেন একটা বাৎসল্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সুবিধা পাইলেই বিমল তাঁহাকে 'কল' দিতেছে। সেদিনই তো একটা অপারেশনের জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাকে প্রায় দুই শত টাকা পাওয়াইয়া দিল। সুতরাং অনিবার্য্যভাবে সিভিল সার্জন মহাশয় বিমলকে সুচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মনিবরা সকলেই যখন সুপ্রসন্ন তখন আর ভাবনা কি! হাসপাতাল-

কমিটির মেম্বারদের বাড়ীতে বিনা-পয়সায় দেখিলেই তাঁহারা খুব খুশী থাকেন। তা ছাড়া বিমল ইঁহাদের নিকট পয়সা লইবেই বা কিরূপে, জগদীশবাবু, ভূধরবাবু কেহই ইহাদের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন না। যদিও ইহারা সকলেই বড়লোক, ফী দিয়া ডাক্তার ডাকিতে সক্ষম, কিন্তু এখানকার রেওয়াজই এমনই দাঁড়াইয়া গিয়াছে! বিমল কেন শুধু শুধু সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতে যাইবে! মোট কথা বিমলের প্র্যাকটিসের পথ মোটেই আর দুর্গম রহিল না। পুষ্পাকীর্ণ না হইলেও কণ্টকাকীর্ণ রহিল না তাহা ঠিক!

পারঘাটার নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বিমল সেদিন বেশ একটু উত্তেজনাভরেই গিয়া ওপারে দামী মোটরটিতে আরোহণ করিল। বাঘমারির জমিদারবাবু সৌরীন্দ্রমোহন বসুর বাড়ী হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সৌরীনবাবু এ অঞ্চলের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, বেশ শিক্ষিত এবং ধনী। সৌরীনবাবুর বাড়ীতে বিমল এই প্রথম যাইতেছে। কি অসুখ এবং কাহার অসুখ কিছুই জানা নাই, সৌরীন-বাবু কেবল একবার যাইতে লিখিয়াছেন। বাঘমারি গ্রামটি প্রায় বারো মাইল দূরে। মোটরে চড়িয়া বসিতেই কেতাদুরস্ত ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। বারো মাইল পথ অতিক্রম করিতে অবশ্য বেশী সময় লাগিল না। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরেই গাড়ী প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা এক অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে থামিল। বিমল গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল দূরে ডিম্বাকৃতি তৃণাস্তৃত 'লনে' একটি ছোট টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি মহিলা এবং দুই জন পুরুষ আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। ড্রাইভার বলিল—আপনি হুজুর ঐখানেই যান, বাবুসাহেব ঐখানেই রয়েছেন।

বিমল অগ্রসর হইল! বিমলকে আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া একজন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এ ভদ্রলোকটিকে বিমল ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। খুব ফরসা চেহারা, গালের দুই দিকে বেশ বড় জুলফি, সুলালিত এক জোড়া কালো কুচকুচে গোঁফ, আরক্ত চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত।

—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু বসুন।

প্রৌঢ় সৌরীনবাবুকে বিমল চিনিত, তিনিও সেখানে বসিয়াছিলেন। বিমল তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি মোটা সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন—আসুন, ঐ আপনার রোগী—সিগার দিয়াই তিনি উপবিষ্টা একটি মহিলাকে দেখাইয়া দিলেন। সুপ্রিয়া সরকারকে বিমল আগেই চিনিতে পারিয়াছিল।

—কি হয়েছে ওঁর?

সুপ্রিয়া বলিলেন—কিছুই হয় নি। অসুখ আমার নয়—অসুখ এঁদের—

অপর যে মহিলাটি বসিয়াছিলেন তিনি সুপ্রিয়ার জননী ভগবতী দেবী। তিনি বলিলেন—ঐটেই ওর প্রধান অসুখ, ওর ধারণা ওর কিছু হয় নি, অথচ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে!

জুলফিদার যুবকটি বলিলেন—এক মিনিট বসুন ডাক্তারবাবু আমি এখনি আসছি—

তিনি চলিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া ঠোট দুইটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার কালো দাঁতগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। তিনি সহসা সমস্ত ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—আবার আপনাদের থিয়েটার হচ্ছে কবে, পূজোর সময় হবে না কি?

বিমল হাসিয়া বলিল—কি জানি, আমার সময় হবে না বোধ হয়, আর—

অমরও তো দেশোদ্ধারে মেতেছে,
সকলেই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে মুশকিল!

সুপ্রিয়ার মা কি যেন একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। সৌরীন-বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং চুরুটে মৃদু একটা টান দিয়া সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বউদিদি চটছে, বুঝলি সুপ্রিয়া

সুপ্রিয়ার মা কিছু না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে তাঁহার অসমাপ্ত উলের সোয়েটারটা তুলিয়া লইয়া বুনিতে সুরু করিয়া দিলেন।

সৌরীনবাবু তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির সমর্থন করিয়া পুনরায় বলিলেন—সবাই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে পৃথিবীতে টেঁকা মুশকিল। অকেজো লোকেদের আলসেমির দৌলতেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য—এ কথা সবাই ভুলতে বসেছে এই ইউটিলিটির যুগে, আমরা ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি যে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পথে এই ইউটিলিটি-বাদ প্রধান অন্তরায়, এ-কথা তুমি স্বীকার কর না বউদি?

বউদিদি সোয়েটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন—বুঝতেই পারছিনা তোমার কথা, বাংলা ক'রে বল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—ইউটিলিটির বাংলা কি সুপ্রিয়া?

—উপযোগিতা।

—ও ভারি খটমট হ'ল; কেজোমি বললে কেমন হয়? সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—ওটাও শ্রুতিমধুর হল না।

তা হ'ল না বটে, কিন্তু কেজোমির সঙ্গে পেজোমি কথাটার চমৎকার মিল আছে। আর আমার বিশ্বাস আমরা যতই ইউটিলিটির দিকে ঝুঁকছি ততই পাজি হয়ে উঠছি!

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তা' হ'লে তোমার মতে কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক, তোমার মতন ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে সিগার-ফোঁকাটাই ভাল লোকের লক্ষণ!

সুপ্রিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যাহাকে 'ডেকোরাম' অর্থাৎ শোভনতা-জ্ঞান বলে, তাহা যদি মায়ের একটু আছে! চটিয়া গেলে তিনি অবলীলাক্রমে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া যাহা মুখে আসে বলিয়া বসেন। আর কাকাবাবুটিও কুটুস্ কুটুস্ করিয়া কথা বলিয়া মাকে চটাইতে পাইলে আর কিছু চান না। মা যেদিন হইতে সোয়েটারে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতে কাকাবাবু কেজোমির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক এ কথা আমি বলছি না, কিন্তু যে-সব মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না এবং না-জানাটাকে গৌরবের ব'লে মনে করে, তাদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়!

—কি সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ হয় যে তারা ছদ্মবেশী মশা, মাছি, ছারপোকা, শকুনি, বাঘ, ভালুক অর্থাৎ নিছক একটা প্রাণী, বেঁচে থাকবার জন্যেই কেবল ছটফট করছে—ঠিক মানুষ নয়!

—অর্থাৎ অকেজো লোকই ঠিক মানুষ তোমার মতে!

সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয়, নিছক প্রাণী হিসেবে টিকে থাকবার জন্যে যে বাঁধা পথ আছে, সেই পথ ছেড়ে যে যতটা বিপথে যেতে পারে সেই-ততটা মনুষ্যধর্ম্মী। মানুষ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার বিপথে যেতে পারে না। মানুষই গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, থিয়েটার করে। মনের আনন্দে সে

এত কাল এই সব বাজে কাজ ক'রে এসেছে। কিন্তু ইদানীং নিছক এই আনন্দটুকুর জন্যই আর সে এ সব করতে প্রস্তুত নয় দেখা যাচ্ছে। আজকাল আমরা গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, থিয়েটার করি আনন্দের জন্যে নয়—পয়সার জন্যে, সব কিছুকেই কাজে লাগাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। তুমি ঐ যে সোয়েটার বুনছ ওটা নিছক শিল্পচর্চ্চা নয়, তুমি বুনছ আমার শীতনিবারণের জন্যে—

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তাতে ক্ষতি কি!

—সব কিছুই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠলে কেমন যেন লাগে। প্রত্যেক কাজের পেছনে একটা মতলব আছে মনে হ'লে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়। জীবন ধারণ করা মানে একদল মতলববাজ লোকের সঙ্গে ক্রমাগত মোকদ্দমা করা! ব্যাপারটা হয় তো তাই-ই, কিন্তু অবস্থাটা সুখের নয়—

এই বলিয়া তিনি সিগারের ছাইটি ঝাড়িয়া আর একটি টান দিলেন। সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ আগেই তাহার হাতের বইখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়ার মা-ও এ কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিমল চুপ করিয়া ভাবিতেছিল অদ্ভুত লোক তো ইঁহারা! যাঁহার অসুখের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন তাঁহার অসুখই নাই এবং এতক্ষণ ধরিয়া যে-সব কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহার সহিত অসুখের কোন সম্পর্কও নাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার! নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—অথচ মজা এই যে আমরা সেই সব মানুষের সঙ্গই পছন্দ করি যারা এই সব বাজে কাজে মজবুত। এই যে বিমলবাবুকে আজ ডাকা হয়েছে এটা তাঁর ডাক্তারি নৈপুণ্যের জন্যে ততটা নয় যতটা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য। সুপ্রিয়া এঁর অভিনয় দেখে খুশী হয়েছিল,

সম্ভবতঃ সেই জন্যেই ইনজেকশন দেবার জন্যে এত লোক থাকতে এঁকেই ডেকে আনা হ'ল।

সুপ্রিয়া বই হইতে মুখ তুলিলেন এবং ভ্রূলতা ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—এত বাজে কথাও বলতে পারেন কাকাবাবু।

সৌরীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—হীরালাল আমার নাম দিয়াছে বৈজিক-সম্রাট্, অবশ্য বাজে কথার জন্যে নয়, আমি ভাল বেজিক খেলতে পারি ব'লে!

জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকটি কতকগুলি কাগজ হস্তে আর একজন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন। পিছনে দুইজন চাকর চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আনিয়া সাজাইতে লাগিল। জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকের নাম সুধীর এবং তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম সুব্রত। সুধীর সুপ্রিয়ার দাদা এবং সুব্রত সুপ্রিয়ার স্বামী। বিমল পরিচয় পাইয়া সুব্রতবাবুকে নমস্কার করিল। মনে মনে বিস্মিত হইল—অতিশয় জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোক তো। চোখের জ্যোতি তীব্র, গালের হাড়-দুইটা উঁচু হইয়া আছে, নাকটা খড়্গের মত। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবী, পায়ে সুদৃশ্য একজোড়া চটি। তিনি কলিকাতার নামজাদা দুই-তিন জন ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন—ওঁদের সবাইকে একসঙ্গে ডেকে দেখিয়েছিলাম, ওঁরা দেখে শুনে এই ব্যবস্থা করেছেন। রিপোর্টগুলো দাও তো সুধীর—

বিমল রিপোর্টগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। সব রকম পরীক্ষাই হইয়াছে কিন্তু কোনটাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। বিমল সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—এ সব থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কষ্টটা কি?

বই হইতে মুখ তুলিয়া সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—বললাম তো, কিছুই না!

সুব্রতবাবু বলিলেন—মাঝে মাঝে যে 'প্যালপিটেশন' হয় সেটা কি তাহ'লে 'মিথ্' ?

সৌরীনবাবু তাঁহার কাঁচাপাকা বাবরিটি এবং ধূম-পক্ক গুম্ফটি গুছাইয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—ইংরেজী 'মিথ' এবং বাংলা মিথ্যার মধ্যে যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, আশা করি সুব্রত তুমি সে অলীক সাদৃশ্যের সুযোগ নিচ্ছ না। যদি নিয়ে থাকো তা হ'লে দুঃখিত হও। তোমরা ব'স, আমি একটু টেনিস-কোর্ট'টা তদারক করে আসি। হীরালালরা হয়ত এসে পড়বে এখুনি, কালকে নেটটা যা করে টাঙিয়েছিল! আমাদের হরিচরণকে এবার পেন্সন দেওয়া দরকার হয়েছে—

সৌরীনবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

ভগবত দেবী সোয়েটার হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে যাও।

—একটু ঠাণ্ডা হোক, গরম চা খাবার বয়স গেছে।

একটু দূরে টেনিস-কোর্ট, সেখানে চাকরেরা নেট টাঙাইতেছিল—সৌরীনবাবু সেই দিকে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য টেবিলে চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—আপনার প্যালপিটেশন হয় বুঝি?

সুধীরবাবু এতক্ষণ কথা বলেন নাই, তিনি বলিলেন—হজমও হয় না ভাল, ডাক্তার রায় হজমের জন্যে এই সব প্রেস্ক্রাইব করেছেন।

বিমল বলিল—দেখেছি। বেশ ভাল ওষুধ, ওগুলো খাচ্ছেন?

ভগবতী দেবী বলিলেন—তাহলে আর ভাবনা কি! কি ভাগ্যি যে ইনজেকশন নিতে রাজি হয়েছে।

বিমল বুঝিল তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই। কলিকাতার ডাক্তারের ফরমায়েস অনুযায়ী জার্মানির একটা পেটেণ্ট ঔষধ তাহাকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইনজেকশন করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। তাহার ডাক্তারি বুদ্ধির সাহায্য ইহারা চান না।

বিমল বলিল—চলুন তাহলে ইনজেকশনটা শেষ ক'রে ফেলা যাক—

সুপ্রিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনার ভাল ছুঁচ আছে তো, জগদীশ ডাক্তারের যা ভোঁতা মরচে-পড়া ছুঁচ, সেই ভয়ে তাঁকে আর ডাকি নি।

বিমল হাসিমুখে মিথ্যা কথা বলিল—আপনি জানতেও পারবেন না।

সুব্রতবাবু বোধ হয় সুপ্রিয়ার উত্তরে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। গেট দিয়া আর একটি মোটর প্রবেশ করিল। সুধীরবাবু উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিমল ও সুব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার আর কোন দরকার নেই তো ?

—না।

—আমি তা হ'লে একটু টেনিস খেলি গিয়ে, হীরালালবাবুরা এলেন।

ভগবতী দেবী বলিলেন—ঠাকুরপোও তা হ'লে আর এল না চা খেতে! বিয়ে না করলে পুরুষমানুষগুলো যেন কি এক রকম হয়ে যায়।

বিমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিয়ে হয়েছে তো ?

—অনেক দিন।

ইনজেকশন-পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নেই হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলিলেন—চমৎকার আপনার হাত তো!

বিমল গম্ভীর ভাবে বলিল—হাত নয় কপাল!

একটু থামিয়া আবার বলিল—কি বই পড়ছিলেন ওটা তখন?

—আলডুস হাক্সলির 'ক্রোম ইয়েলো'।

—চমৎকার বই।

—নয়? এঁরাই আমার সঙ্গী, ওই দেখুন না।

বিমল দেখিল অধুনিক, অতি-আধুনিক নানাবিধ পুস্তক-রাজি সুপ্রিয়া সরকারের আলমারির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অধিকাংশই উপন্যাস এবং অধিকাংশেরই নাম পর্য্যন্ত বিমলের জানা নাই।

সুব্রতবাবুর অসন্তোষ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। তিনি বলিলেন—ক্রমাগত প'ড়ে প'ড়ে চোখটাও নষ্ট করিবে তুমি।

সুপ্রিয়া বলিলেন—আচ্ছা তোমরা সবাই আমার স্বাস্থ্যের উপরই বিশেষ ক'রে এত নজর দিতেছ কেন বল দেখি! দেখুন তো ডাক্তারবাবু, স্বাস্থ্যটা কার বেশী খারাপ, আমার, না ওঁর?

বিমল স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল —আপনি কি বরাবরই এই রকম রোগা?

—হ্যাঁ।

—মোটা অবশ্য তুমি কোন কালে ছিলে না কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমি দিন-দিন আরও রোগা হয়ে যাচ্ছ!

—না, না, পাগল! উঠছেন নাকি ডাক্তারবাবু?

বিমল বলিল—হ্যাঁ চলি এবার, নমস্কার!

সুপ্রিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—তিন দিন পরে আবার দেখা হবে, এ ইনজেকশনগুলো না দিলে তো আপনাদের শান্তি নেই !

বিমল হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। সুব্রতবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুব্রতবাবু প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা আমার স্ত্রীর অসুখটা কি বলুন তো ?

—বিশেষ কিছু নয়, হার্টটা একটু দুর্ব্বল বোধ হয়।

—এ ইনজেকশনগুলো দিলে উপকার হবে ?

—ইনজেকশনটার নাম তো খুব বাজারে। আমি এর আগে কখনও ব্যবহার করিনি।

সুব্রতবাবু আর কিছু বলিলেন না।

চলিতে চলিতে টেনিস-কোর্টের কাছাকাছি আসিতে সৌরীনবাবু হীরালালবাবুর সহিত বিমলের পরিচয় করাইয়া বলিলেন—ইনিও অদূর ভবিষ্যতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছেন !

বিমল নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—এমন মধুর রোগী আর পাবেন না আপনি। আজকাল কত পার্সেণ্ট হে ?

হীরালাল বাবু হাসিয়া বলিলেন—দশ।

মোটাসোটা গোলগাল হীরালালবাবু চিবুকের নীচে চর্ব্বির বাহুল্য একটা দেখিবার মত জিনিস। দশ পার্সেণ্ট সুগার।

হীরালালবাবু বলিলেন—আসুন এক দিন আমার ওখানে বিমলবাবু।

—আচ্ছা।

বাড়ী ফিরিয়া বিমল দেখিল মণিমালা প্রায় প্রয়োপবেশন করিবার উপক্রম করিয়াছে ! এরূপটা যে ঘটিতে পারে বিমলও তাহা প্রত্যাশা

করে নাই ; হারু স্যাকরার তো নামডাক খুব ! এখানকার সকলে তো উহাকে দিয়াই গহনা গড়ায়।

ঠোঁট ফুলাইয়া মণিমালা বলিল—তোমার কথায় এখানে গড়াতে দিলাম, একেবারে ছাই হয়েছে তাবিজ !

—কই দেখি ?

মণিমালা তাবিজ-জোড়া আনিয়া তাচ্ছিল্যভরে বিমলের হাতে দিয়া বলিল—এই দেখ তোমার হারু স্যাকরার কীর্ত্তি !

—কেন, এ তো বেশ হয়েছে।

—বেশ না ছাই ! এর নাম কি পালিশ ?

—খারাপটা কোন্‌খানে তা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যই বিমল বুঝিতে পারিতেছিল না।

—না, খারাপ নয় ! ম্যাট্‌ম্যাট্‌ করছে ;—তরঙ্গিণী গড়িয়েছে কলকাতা থেকে কেমন চমৎকার।

—এও তো বেশ হয়েছে, দেখি পর তো ?

বিমল স্বয়ং পরাইয়া দিতে গিয়া একটু বিপন্ন হইল। কোথায় কি ক্লিপ আঁটিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই।

—তুমি ছাড় আমি পরছি।

তাবিজ পড়িয়া হাত দুটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণিমালা দেখিতে লাগিল।

বিমল বলিল—সুন্দর হয়েছে তো।

—ছাই !

তাহার পর তাবিজ খুলিতে খুলিতে মণিমালা বলিল—তোমার কেমন একটা জিদ চড়ে গেল ওই হারু স্যাকরাকে দিয়েই করাবে।

—আচ্ছা, কাল ওকে ডাকিয়ে ব'লে দিচ্ছি আমি, ভাল ক'রে দেবে।

ও বলেছে পছন্দ না হ'লে ফেরত নেবে—

—ডাক্তারবাবু—। বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে।

—কে ?

বিমল বাহিরে গিয়া দেখিল ভুলু।

কি খবর ?

—হাসপাতালে একটা শূয়োরে-চেরা লোক এসেছে। বুনো শূয়োরে তার পেটটা চিরে দিয়েছে একেবারে।

—চল যাচ্ছি।

বিমল গিয়া দেখিল একটা আঠার-উনিশ বছরের বন্যবরাহের দন্তঘাতে মৃতপ্রায়। পেটের অন্ত্রগুলো সব বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। এই মফঃস্বলের হাসপাতালে ইহার সুচিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। সদরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মরিবে। অপটু হস্তে এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা লইয়াই বিমল যতটা পারিল করিল। অন্ত্রগুলাকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া শাস্ত্র অনুযায়ী যতটা পারিল পরতে পরতে পেটটা সেলাই করিয়া দিল। এমনিই তো মরিত—যদি বাঁচে!

২

গঙ্গাবক্ষে নৌকা সজ্জিতই ছিল, ভূধরবাবু তাহাতে বসিয়া ছিলেন, বিমলও গিয়া আরোহণ করিল। কামারখালির অখিল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে ডাক পড়িয়াছে। অখিল চৌধুরী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত চৌধুরী মহাশয়েরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রয়োজন হইলে বরাবর ভূধরবাবুকেই ডাকিয়া থাকেন, এবার জ্যেষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে বিমলকেও ডাকিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যগ্র।

বিমল নৌকায় আসিয়া উঠিতেই ভূধরবাবু বলিলেন—টিফিন কেরিয়ারে ও-সব কি মশাই ?

—লুচি মাংস।

—আপনি খাদ্য-রসিক আছেন তো মশাই, বাইরে থেকে আপনাকে দেখে নিরামিষ ব'লে বোধ হয়!

বিমল হাসিয়া বলিল—বাইরে থেকে দেখে লোকের সম্বন্ধে বিচার করেন এত কাঁচা লোক তো আপনি নন! অন্ততঃ আমার তাই ধারণা!

—না, তা বটে, মানে—ভূধরবাবু হাসিয়া নিজের ছোট বেতের বাস্কটি খুলিতে খুলিতে বলিলেন—আমিও আমিষ ব্যাপার এনেছি কিছু, জানি না আপনার এ—সব চলে কি না।

ছোট বোতলটি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—কঁইয়্যাক্? অর্থাৎ ইংরেজীতে যার বানান কগ্ন্যাক! চলে নাকি ?

বিমল বলিল—না।

—তাহলে আর কি আমিষ আপনি! নিরীহ পাঁটা কেটে সবাই খেতে পারে।

বিমল হাসিল, তাহার পর সহসা কি মনে করিয়া বলিল—বেশ দু-এক ঢোক খাওয়াই যাবে না হয়, তাতে আর কি হয়েছে!

ভূধরবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন—সোডায় না কম পড়ে যায়। আনিয়ে নেব নাকি আরও দু-বোতল।

—ক-বোতল আছে ?

—দু-বোতল।

—ওতেই হবে, না হয় শেষে গঙ্গোদক তো আছেই, শোধন হয়ে যাবে।

—যা, বলেছেন! আমাদের চক্রবর্তীকে চেনেন? আরে ঐ যে ঘাই ওপারের উকিল হারাধন চক্রবর্তী, চেনেন না তাকে?।

—নাম শুনেছি, আলাপ নেই তেমন!

—আমি ওর নাম দিয়েছি চোকোস চক্রবর্ত্তি! একেবারে চৌকস লোক। মদ রোজ খাওয়া চাই' কিন্তু আটঘাট বেঁধে—

—মানে, গ্লাসে প্রথমে ব্রাণ্ডিটি ঢালবেন, তা প্রায় আউন্স-ছয়েক, তার পর তাতে গোটা-চারেক কার্টার্স লিভার পিল ফেলে দেবেন, তার পর তাতে চামচ-টাক সোডা,তার পর হাতে আংটি-বাঁধা পৈতেটি জড়িয়ে চোখ বুজে গ্লাসের উপর পৈতেসুদ্ধ হাতটি নিয়ে গিয়ে মিনিট দুই মন্ত্রপাঠ করবেন, তার পর আংটিটা মদে একবার ডুবিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে মদটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলবেন! রোজ এই ব্যাপার!

—আংটিটা ডোবাবার মানে?

—যে সে আংটি নয়, আংটিতে মীনে-করা কালীমূর্ত্তি রয়েছে, মদ আর মদ রইল না, কারণ হয়ে গেল! চোকোস রিয়েলি চৌকস!

—চমৎকার লোক তো!

—চমৎকার!

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

অগণিত তরঙ্গশীর্ষে মাণিক জ্বলিতেছে। ভূধরবাবু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, বিমলও চাহিয়া আছে। তাহার কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, রগের শিরাগুলা দপ দপ করিতেছে। বিবেকও দংশন করিতেছে। জীবনে এই প্রথম মদ্যপান। কেন সে মদ খাইতে গেল! লোভে পড়িয়া? তাহা তো ঠিক নয়।

মদ দেখিয়া লো[illegible] তাহার কোন কালে হয় নাই [illegible] ভূধরবাবুকে খুশী করিবার জন্য, ভূধরবাবুর লজ্জা নিবারণের জন্যই সে মদ খাইয়াছে। ভূধরবাবু যাহাতে তাহার নিকট অকারণ সঙ্কোচ বোধ না করেন, তাহাকে একটা পীর-পয়গম্বর মনে না করেন, মনে মনে নাক সিঁট্‌কাইয়া যেন না ভাবেন—ইস ভারি আমার সাধু রে! ভূধরবাবুর বন্ধুত্ব কামনায় যদি সে দুই-এক ঢোঁক মদ্যপান করিয়াই থাকে, কি এমন ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে! মন হইতে সে চিন্তাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা তাহার অমরের কথাটা মনে পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সেদিন সে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিল কেন। সে হয়ত এমনি কোন বন্ধুত্বের দাবি মিটাইতে গিয়া—

ভূধরবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—হ্যাঁ, যে-কথাটা বলছিলাম, বিজনেস ইজ বিজনেস! পৃথিবীর চার দিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দী-ফিকিরে সে-গুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা! কোন ফন্দী-ফিকির করব না অথচ টাকাগুলো আপনা আপনি এসে আপনার ট্যাঁকে ঢুকে পড়বে তা কি কখনও হয়। এই যে দেখুন না, আমি ঐ যে আখ মাড়িয়ে গুড় তৈরী করবার কলটা বসিয়েছি, ওর তদ্বির করতে হচ্ছে কত রকম! যেখানে যা ঘুষঘাস সিন্নি-পৈরবি সবই দিতে হচ্ছে, না দিলে আমার গুড় নেবেনা কেউ! দেখুন আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান এসেছে—

—কি?

—আচ্ছা এই গুড়কেই একটু পরিষ্কার ক'রে বোতলে পুরে ভিটামিন-ফিটামিন পাঁচ রকম ভাঁওতা জুড়ে বাজারে বের করলে কি রকম হয়! বিজ্ঞাপন দিলে ঠিক চলে!

বিমল হাসিয়া ফেলিল—আপনার মাথায় খেলেও তো নানা রকম।

ভূধরবাবুও হাসিতে লাগিলেন—না খেললে উপায় কি, বা ভীষণ সময় পড়েছে মশাই, আজকাল রোজগারের নতুন নতুন পন্থা বার করতে না পারলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। যে যাই বলুক মশাই, পয়সাই হ'ল আসল ; ঐ যে আপনাদের চেয়ারম্যান রাখাল নন্দী, কি আর ওর এমন গুণ আছে বলুন, না আছে বিদ্যে না আছে বংশমর্য্যাদা, তবু আমরা লেখাপড়া-জানা ভদ্রসন্তানরা ওর দুয়ারে দু-বেলা সেলাম ঠুকছি তো! কেন? ও তাকমাফিক পাটের ব্যবসা ক'রে লাখ কয়েক টাকা রোজগার করেছে এই তার একমাত্র কারণ। তাই ও মান্য, তাই ও গণ্য, তাই ও চেয়ারম্যান, তাই ও সব!

ভূধরবাবু তাকিয়াটার উপর কনুই দিয়া একটু আরাম করিয়া বসিলেন ও গঙ্গার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—ইটের ভাটাও করব ভাবছি একটা, করতে পারলে খুব লাভ হয় ওতে, এ অঞ্চলে এক ঐ আঢ্যিদের ছাড়া আর কারও নেই।

বিমল বলিল—একা মানুষ আপনি ক-দিক সামলাবেন?

—সামলাতে হবে! শুধু ডাক্তারি ক'রে আর পেট ভরবে না মশাই, সেদিন গেছে! আজকাল কমপিটিশন কত, চার দিকে ডাক্তার তো গিজগিজ করছেই, তার ওপর কবরেজ আছে, হোমিওপ্যাথ আছে, হাকিম আছে, হাতুড়ে আছে, মাদুলি আছে, জলপড়া আছে। ঐ যে আমাদের জগদী।বাবু. এদ্দিনের সিনিয়ার লোক, কত রোজগার করেন উনি বলুন তো?

ভূধরবাবু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ভাবটা, দেখি আপনার আন্দাজের দৌড়টা!

বিমল বলিল—কত, পাঁচ-সাত-শ?

—তিন-শ'র এক ছিদাম বেশী নয়! হবে কোথা থেকে মশাই,

ডাক্তারদের রোজগার বাইরে থেকে খুব বেশী মনে হয়, কারও বাড়ীর সামনে দিয়ে বার-দুই যাতায়াত করলেই সে মনে করে উঃ খুব কামাচ্ছে, কিন্তু যে কামাচ্ছে সেই জানে পকেটে ক'টা টাকা ঢুকল—তাও আবার সবগুলো সচল থাকে না।

—অ্যাঁ কি বলেন !

ভূধরবাবু হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে বিমলের পানে চাহিলেন। তাহার পর আবার সুরু করিলেন—এই কম্‌পিটিশনের জন্যেই তো মশাই আমি হোমিওপ্যাথি, কবরেজি সব করি, যখন যা সুবিধে। রুগী হাতছাড়া করি কেন ! যখন দেখি আমাদের ওষুধে বিশেষ বাগ মানছে না, রুগীর বাড়ীর লোকেরাও একটু দোনা-মোনা করছে, তখন তাক বুঝে তাদের মনোমত ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। হোমিওপ্যাথি চাও, চলে এস আমিই দিয়ে দিচ্ছি—এক ফোঁটা কবরেজি চাও, তা-ও দিচ্ছি—অপরের কাছে যাবার দরকার কি ! হোমিওপ্যাথির একটা মস্ত সুবিধে খেতে খারাপ নয়, সস্তা, রুগীর ইষ্ট না হোক অনিষ্ট হয় না, আর যখন লেগে যায় অদ্ভুত ফল ! অদ্ভুত ফল মশাই, একটা নশিয়া সেদিন কিছুতে কমে না, কমলো শেষে ইপিকাক থার্টিতে !

বিমল বলিল—কবরেজিটা কিন্তু একটু—

তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া ভূধরবাবু বলিলেন—ঐ কয়েকটা ওদের বাঁধি গৎ আছে, মকরধ্বজ, স্বর্ণপর্পটি, চ্যবনপ্রাশ, ঐ আমাদেরই মত ব্যাপার ! আর্সেনিক, আয়রন্, ক্যালসিয়াম আর তার সঙ্গে বায়ুপিত্তকফঘটিত কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক ! কবরেজরাই কি জোচ্চুরি করে না মনে করেন ! অধিকাংশ কবরেজই আজকাল কুইনিন ব্যবহার করে, অ্যালকহল ব্যবহার করে। পয়সা রোজগার করতে হ'লে

এ-সব না ক'রে উপায় কি ! সেদিন তো দেখলাম এক কবরেজ এমিটিন ইনজেকশন দিচ্ছে—

—তাই না কি ?

—না তো কি ! নিও-সালভারশনের মতন ওষুধ যে কোন হাতুড়ে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিচ্ছে ! এই কবরেজগুলো আমাদের পরম শত্রু, ক্রমাগত আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ক'রে বেড়ায়। আমিও বাগে পেলে ছাড়ি না। এই সেদিন আমি সঞ্জয় কবরেজকে বেশ নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছি ! ওর কম্পাউণ্ডার এসে আমারই দোকান থেকে কুইনাইন কিনছিল, এক-দোকান লোকের সামনে দিলুম এক্সপোজ ক'রে বাছাধনকে !

বিমল মাঝিকে প্রশ্ন করিল—আর কত দূর মাঝি ?

—ঐ যে আলোটা হুজুর, ঐ যে দূরে একটুকুন টিপকাছে—

ভূধরবাবু বলিলেন—এখনও মাইল-দুই তার মানে, এটুকু আর বাকি থাকে কেন, শেষ ক'রে ফেলি আসুন।

—আপনি খান, আমি আর খাব না।

—আরে খান খান, ঐ তাগড়া শরীর আপনার, কিছু হবে না।

—না থাক, প্রথম দিনেই অত ভাল নয়।

ভূধরবাবু অগত্যা বাকিটুকু একাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিলেন। মুখটি মুছিয়া বলিলেন—এই যেখানে আমরা যাচ্ছি, কামারথালিতে, দেখবেন এক জন ডাক্তার আছেন, পাক্কা ব্যবসাদার যাকে বলে ! এম. বি. নন, সাব-এসিস্টেণ্ট সার্জন, কিন্তু পাকা লোক। জমি-জারাৎ খেত-খামার বিস্তর করেছেন, প্র্যাকটিসও খুব ! কিন্তু ডাক্তারি ব্যবসা কি ক'রে করতে হয় জানেন ভদ্রলোক।

—কি রকম ?

—এই ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর ডিসপেনসারিতে প্রকাণ্ড একটা কড়া ক'রে রোজ বার্লি তৈরি হয়, আর গরীব রুগীদের সেটা তিনি বিতরণ করেন। খরচ বিশেষ কিছুই নয়, দু-আনার বার্লিতে ভেসে যাবে কামারখালি, কিন্তু এর জৌলুষটা ভীষণ, সবাই ধন্য ধন্য করছে। ডাক্তারের এত দয়া যে নিজের ওখান থেকে বার্লি পর্য্যন্ত তৈরি ক'রে গরীবদের দেয়। মহাদেববাবুর আর একটি ভয়ানক অস্ত্র আছে—সহজে কথা বলেন না। আপনি আপনার বিদ্যে ফলিয়ে যতই ব'কে মরুন মহাদেববাবু চুপচাপ, বড়জোর চোখ দুটো হয়ত ওপর দিকে তুললেন, কিংবা একটু ভুরু কোঁচকালেন, কিংবা হয়ত একটু মুচকি হাসলেন—ব্যস! আপনার সামনে সাধ্যপক্ষে কিছু বলবেন না, যা বলবার আপনি চ'লে গেলে বলবেন! এবং যেটি বলবেন সেটি কামারহাটির সকলের কাছে বেদবাক্য। বিশেষত মেয়েমহলে। একবার এই গ্রামের একটি মেয়ের জ্বর হয়েছিল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাই শুনে একেবারে এক সায়েব সিবিল সার্জ্জন নিয়ে এসে হাজির। মহাদেববাবু কিছু বললেন না। সায়েব দেখে শুনে সেই সনাতন কুইনাইন মিকশ্চার লিখে দিয়ে গেলেন, কুইনিন আর অ্যাসিড এন. এম. ডিল.। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াতে মহাদেববাবু চটেছিলেন। তিনি মেয়ের মাকে ডেকে বললেন—দেখ বাছা, তোমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি থেকে সায়েব-ডাক্তার এসে দেখে গেল, খুবই আনন্দের কথা এটা। কিন্তু সায়েব যা ওষুধ দিয়ে গেলেন তা সায়েবি ধাতে সইতে পারে কিন্তু তোমার ঐটুকু মেয়ে তা সইতে পারবে কি না সন্দেহ—এই দেখ—বলে তিনি ফোঁটা দু-চার অ্যাসিড শানের উপর ফেললেন। বুঝতেই পারছেন সঙ্গে সঙ্গে বজবজ করে উঠল, শানের খানিকটা ক্ষয়েও গেল। মহাদেব চিন্তিত মুখে সেই দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে

বললেন—যে ওষুধে শান গ'লে যাচ্ছে, সে ওষুধ ওই কচি মেয়েকে দিতে বাপু আমার কেমন যেন—। আর বলতে হ'ল না সাহেবের ওষুধ চলল না। তার পর দিন আমি এলুম, মিকশ্চার দিলুম না, দিলুম কুইনিন পাউডার।

একটু থামিয়া পুনরায় ভূধরবাবু বলিলেন—লোকটার রুগী দেখার ধরণও অদ্ভুত। আপনি যা দেখবার দেখলেন—বুক, পেট, জিব, চোখ, আপনার দেখা হয়ে গেলে মহাদেব হয়ত খুব নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে মাথার চুলগুলো দেখতে লাগলেন। আপনি যদি জিগ্যেস করেন কি দেখছেন, কোন উত্তর দেবেন না, একটু মুচকি হাসবেন! অদ্ভুত লোক!

বিমল বলিল—আপনার উপর খুব বিশ্বাস বুঝি।

ভূধর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাসের কারণ আছে, শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে কমিশন দি।

—বলেন কি?

—একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল জ্যোৎস্নালোকে নদীর প্রতি তরঙ্গটি যেন মুচকি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে।

অখিল চৌধুরীর বাড়ির রোগীটির জিহ্বায় ক্যানসার হইয়াছে। ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি, বিমল সে কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভূধরবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বলিল না। ভূধরবাবুর চোখের পাতায় সে যেন একটা নিষেধের ইঙ্গিত পাইল। মহাদেব বাবুও তাঁহার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী নীরব রহিলেন। অখিল চৌধুরী মহাশয় বিমলকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কেমন বুঝছেন, ডাক্তার বাবু?

বিমল একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—কঠিন ব্যাপার।

ভূধরবাবু সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—তা তো বটেই। কিন্তু কঠিন ব'লে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যথাসাধ্য!

মহাদেববাবু একটু মুচকি হাসিলেন।

ভূধরবাবু কাগজে কলমে নানা রকম ভাবে যথাসাধ্য করিলেন। ব্যথার জন্য, ঘুমের জন্য, ঘায়ের জন্য, রক্তপড়া বন্ধ হওয়ার জন্য এবং জীবনীশক্তি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ঔষধের ফর্দ লিখিয়া যখন উভয়ে উঠিতে যাইবেন তখন মহাদেববাবু বলিলেন—এঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া কি উচিত মনে করেন?

ভূধরবাবু বলিলেন—পারলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু এখন যে রকম দুর্ব্বল রয়েছেন, আর যাওয়াও তো সোজা নয়—

অখিলবাবু বলিলেন—দেখুন আপনারা যা ভাল মনে করেন—

ভূধরবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—দিন-পনর দেখুন, যদি একটু উন্নতি হয়, গায়ে একটু জোর-টোর যদি পান, ব্লাডপ্রেসারটা যদি একটু কমে—তখন দেখা যাবে।

মহাদেববাবু নির্ব্বিকার ভাবে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া গিয়া ভূধরবাবু বিমলকে বলিলেন—আপনি আর একটু হ'লে সব মাটি করেছিলেন তো মশাই। ক্যানসার যে ওর সারবে না সে কথা ব'লে আমাদের লাভ কি! ওরা তো চিকিৎসা করাতে ছাড়বে না। আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হাল ধরবে। ওরকম কথা কখনো বলতে আছে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ও যতক্ষণ খরচ করতে পারে করুক, আমরা যতক্ষণ নিতে পারি নিয়ে নি।

নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভূধরবাবু বলিলেন—মহাদেব বাবুকে ও-কটা টাকা দিয়ে ভালই করলেন, ভবিষ্যতে ফের ডাকবে দেখবেন।

বিমলের কিন্তু কেমন যেন লাগিতেছিল সে একটু হাসিল মাত্র।

৩

পাশে মণিমালা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, বিমল জাগিয়া আছে। এপাশ-ওপাশ করিয়া কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। অনেক দিন আকাশের নীচে শোওয়া অভ্যাস নাই, তাই বোধ হয়। বহুকাল পরে আজ ছাতে শুইয়াছে। মণিমালা তো ছাতে শুইতে কিছুতেই রাজি ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই শেষে আসিয়াছে। ঘরে তাহার একা শুইতে ভয় করে। বিমল নিদ্রিত মণিমালার মুখের দিকে খানিক-ক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা এখানে যেন কেমন ঠিক খাপ খাইতেছে না! তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচির সহিত এখানকার কোন কিছুরই যেন ঠিক মিল নাই। এই বাড়িটা লইয়া তাহার অসন্তোষের সীমা নাই। মেজেটা খারাপ, জানালা-কপাটগুলো খোলা, দেওয়ালের এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে চটা উঠিয়া গিয়াছে, ছাতটা শ্যাওলাপড়া, ছাত হইতে জল পড়িবার নলগুলো বিশ্রী, বাড়ির পিছন দিক্‌টা কেমন যেন জঙ্গলের মত কচুগাছ-ঘেঁটুগাছে ভরা, উঠানটা বাঁধানো নয়, এক পশলা বৃষ্টি হইলে কাদা হইয়া যায়, উঠানের ওদিকের দেওয়ালটা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো ইট বাহির হইয়া আছে, বাড়ির উত্তর দিকে অশ্বত্থ গাছটায় যত কাক ও বকের আড্ডা। বাড়িটা মোটে ভাল নয়! ইহার উপর শহরের একটেরে হওয়াতে সন্ধ্যার পর কেমন যেন নির্জ্জন হইয়া পড়ে, এমন কি ঐ দিকের মাঠটা হইতে শেয়ালের ডাক পর্য্যন্ত শোনা যায়,

দুই-একটা শেয়াল সে স্বচক্ষে দেখিয়াছেও এক দিন। তাহার উপর সঙ্গী নাই। পাড়ায় যে মেয়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। লেখাপড়া করিয়া এ যেন অন্য জাতের হইয়া গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া বিমলের সঙ্গেও যে মতের খুব মিল হয় তাহাও নয়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই তো ঝগড়া হইতেছে। আজই তো দুপুরে সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া রাগারাগি হইয়া গেল। ক্লান্ত বিমল দুপুর বেলায় বিশ্রামের জন্য একটু শুইয়াছে, মণিমালা কল লইয়া বসিল। ব্লাউস না বালিসের ওয়াড় ভগবান জানেন কি হইতেছে, কিন্তু শব্দের চোটে অস্থির। বাড়িটা দর্জির দোকান হইয়া উঠিয়াছে। এই আপদটার জন্য মাসে মাসে টাকা গুনিতে হইতেছে। বিমল বলিল—ও খচখচানি বন্ধ কর এখন।

এই কল-প্রসঙ্গে আরও দুই-এক বার বচসা হইয়া গিয়াছিল, মণিমালা দুম্ করিয়া কলের ঢাকাটা কলের উপর চাপাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটার উপর বসিল এবং সমস্ত বিকালটা মুখ ভার করিয়াই রহিল। সন্ধ্যাবেলাতেও বিমলের সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই।……ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মণিমালার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিমলের সমস্ত বুকখানা অপূর্ব্ব মমতায় ভরিয়া উঠিল। বেচারীর দোষ কি! যেমন ভাবে বাল্যকাল হইতে মানুষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি তো এখানে পাইতেছে না। প্রতাপবাবুর কোন্দলপরায়ণা নাতিনী অথবা পরেশ-দার স্ত্রীর সহিত ইহার কি করিয়া মিল হইবে। প্রতাপবাবুর নাতিনীটি কেবল কলহের ছুতা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং পরেশ-দার স্ত্রীর অতি-ঔৎসুক্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়। মণিমালার কত গহনা আছে, কোনটা কত ভরির, জড়োয়া গহনাগুলোর দাম কত, ঝুমকোর বানি কত লাগিয়াছে, ঐ বেনারসীখানা কবে

কিনিয়াছে, ঐ ঢাকাই শাড়িখানা ডাক্তারবাবু নূতন কিনিয়া দিয়াছেন বুঝি, সকালে কি রান্না হইয়াছিল, রাত্রে কি রান্না হইবে, ডাক্তারবাবু কি খাইতে ভালবাসেন পরেশ-দার স্ত্রীর ঔৎসুক্যের সীমা নাই। লেখা-পড়া শিখিয়াছে বলিয়া মণিমালার যে এ-সব ঔৎসুক্য একেবারে নাই তাহা নয়, সেও পরেশ-দার স্ত্রীর নিকট হইতে অনুরূপ অনেক খবর সংগ্রহ করে কিন্তু এ-সব ছাড়াও সে আরও কিছু চায়। সে চায় শরৎ-বাবুর লেখা লইয়া একটু আলোচনা করিতে, রবীন্দ্রনাথের দুই-একখানা গান গাহিতে, সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে সব গল্প বাহির হইয়া থাকে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে, ছিমছাম হইয়া বেড়াইতে। কেবল রান্না আর খাওয়া, রান্না আর খাওয়া—এ ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই এখানে! বিমল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার সহিত দুই দণ্ড বসিয়া যে গল্প করিবে তাহারও অবসর নাই। দুপুরে অথবা সন্ধ্যার পর যদি কোন দিন অবসর হয় তাহাও যে সে ঠিক কি ভাবে কাটাইবে তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। মণিমালার সহিত বসিয়া কি বিষয়ে গল্প করিবে সে। দুই-এক দিন সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, ঠিক যেন জমে না। এখানে সিনেমা-টিনেমা কিছুই নাই যে মাঝে মাঝে যাওয়া যায়। কলিকাতা শহরে আবহাওয়ায় মানুষ মণিমালার যেন নির্ব্বাসন হইয়াছে। এখানে বিমলই তাহার একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু বিমলকে সে কতটুকু পায় এবং যখন পায় তখন নাগাল পায় না। বিমল যে-জগতে বাস করে সে-জগতে মণিমালার প্রবেশাধিকার নাই।

হঠাৎ গভীর রাত্রে বিমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মণিমালা তাহাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আবেগে নয়, ভয়ে।

—ওগো শুনছ, নীচে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে !

বিমল কান পাতিয়া শুনিল একটা শব্দ হইতেছে বটে। বলিল—দেখে আসি দাঁড়াও।

—আমি একা থাকতে পারব না এখানে।

—বেশ চল সঙ্গে।

ছাতের এক কোণে লণ্ঠনটা কমানো ছিল, তাহার শিখাটা বাড়াইয়া লইয়া উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। নামিয়া আসিয়া প্রথমে কিছুই নজরে পড়িল না। তাহার পর সহসা দেখিতে পাইল মাঝের ঘরের তালাটা ভাঙ্গা, কপাট খোলা। চোরটা বাক্স ভাঙ্গিতে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহাদের পদশব্দ এতক্ষণ তাহার কানেই যায় নাই। ইহারা কাছাকাছি আসিতে তবে সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। পলাইতে পারিল না, নিমেষের মধ্যে বিমল তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল, ডাকাডাকি করিয়া যোগেনকে তুলিল। যোগেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা কাছে আনিতেই দেখা গেল চোর আর কেহ নয় হাঁসপাতালের পুরাতন চাকর ভৈরব। ইহাকেই কিছু দিন আগে বিমল দূর করিয়া দিয়াছিল। ভৈরবেরই কাপড় দিয়া যখন তাহার হাত-পা বাঁধিতে বিমল ব্যস্ত, তখন সহসা যোগেন বলিল—বাবু, মা মূর্চ্ছা গেছেন !

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল সত্যই মণিমালা মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

—তুই ভাল ক'রে বাঁধ একে, পারবি তো ?

—খুব পারব।

যোগেনের হাতে ভৈরবকে ছাড়িয়া দিয়া বিমল মণিমালার কাছে আসিল। সত্যই সে মূর্চ্ছা গিয়াছে, ঠোঁট দুইটা নীল হইয়া গিয়াছে,

হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, বিমল তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মণিমালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—এখানে থাকলে ঠিক মরে যাব আমি কিছুতে বাঁচব না!

বিমল স্নেহভরে তাহার সিক্ত অলকগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল—ছি অমন করতে নেই। ভয় কি!

কিন্তু সে লক্ষ্য করিল মণিমালা তখনও একটু একটু কাঁপিতেছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক উঠিয়া পড়িল এবং ভৈরবকে টানিতে টানিতে থানায় লইয়া চলিয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহাকে যে মারটা মারিল তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর কেমন যেন একটা হিংস্র নিষ্ঠুরতা আছে, সুযোগ পাইলেই কারণে-অকারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে। সকলে থানায় চলিয়া গেলে বিমল সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে কে যেন ডাকিল ডাক্তার-বাবু!

—কে?

বিমল কপাট খুলিয়া দেখিল শতছিন্ন ময়লাকাপড়পরা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, তৈলবিহীন এক মাথা রুক্ষ চুল, অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারা। বিমলকে দেখিয়াই সে বিমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—আর ককৃখনো করবে না বাবু, ওকে ছেড়ে দিন এবারটি—

—কে তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল না।

যোগেন বলিল—ভৈরবের স্ত্রী।

বিমল তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা কাল দারোগাবাবুকে বলব আমি।

মেয়েটি চোখ মুছিতে মুছিতে অন্ধকারে একা চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার মনে হইল স্ত্রী-হিসাবে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পড়া অশিক্ষিত কুৎসিত মেয়েটি মণিমালার অপেক্ষা বেশী মহিমময়ী। এই অন্ধকারে রাত্রে সে একা তাহার চোর স্বামীর উদ্ধারের জন্য স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়াছে। অন্ধকার বলিয়া ভয় করে নাই, ছেঁড়া কাপড় বলিয়া লজ্জা করে নাই, স্বামী চোর বলিয়া ঘৃণা করে নাই, পায়ে ধরিতে সঙ্কোচ করে নাই: মীই উহার সব, তাহার উদ্ধারের জন্য ও সব করিতে প্রস্তুত। ঘরে ফিরিয়া দেখিল মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলো লইয়া নিজের বাক্সগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

ভাগ্যে আমরা এসে পড়েছিলুম, গয়নার বাক্সটা তো ঠিক ওপরেই ছিল। ওকি তুমি জামা গায়ে দিচ্ছ কেন ?

—বেরব একটু।

—কোথায় ?

—হাঁসপাতালে একটা রুগী এসেছে। এক্ষুনি আসছি—

—না, আমার ভারি ভয় করবে তুমি যেওনা।

—ভয় কি, যোগেন তো রইল, টর্চটা দাও তো।

—কি বিচ্ছিরি চাকরি বাপু ভাল লাগে না আমার !

—এখুনি আসছি আমি—

বিমল বাহির হইয়া সোজা থানায় চলিয়া গেল।

থানার দারোগা বিমলের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন—ছেড়ে দেবো বলেন কি !

—আমার বিশেষ অনুরোধ !

ভৈরবের স্ত্রী বারান্দার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া আবার বলিল—ওর ঢের শাস্তি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন এবার।

দারোগাবাবু আড়চোখে একবার ভৈরবের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনার কথা ঠেলা তো মুশ্‌কিল, আচ্ছা দেখি—

বিমল হাসপাতালের ডাক্তার, দারোগাবাবুর বাড়ি বিনা পয়সায় দেখে সুতরাং বিমলের কথা তিনি ঠেলিতে পারিলেন না। ভৈরব ছাড়া পাইয়া গেল।

পরদিন সকালে একটা সুসংবাদও পাওয়া গেল, মণি পাস করিয়াছে।

৪

শ্রীযুক্ত হীরালাল মৌলিক তাঁহার দশ পার্সেণ্ট শুগার সত্ত্বেও আহার কমাইতে প্রস্তুত নহেন। বিনা চিনিতে চা খাওয় যায় না কি ! দুই বেলা অনাহারের পর মধুরেণ সমাপয়েৎ করাটাও তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, রাবড়ি-সন্দেশ রোজ তাঁহার চাই-ই তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতে হইলে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ অনিবার্য এবং নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া নিক্তির ওজনে চলাও অসম্ভব। এবম্প্রকার নানাবিধ মুশ্‌কিলের কথা বিবৃত করিয়া হীরালালবাবু

আসল কথাটি পরিশেষে বলিলেন—আসল কথা জানেন কি ডাক্তারবাবু, ভয়ানক লোভী লোক আমি, কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। বাঙালীর ছেলে ভাত না খেয়ে থাকতে পারি না, আলুটা আমার অতি প্রিয় খাদ্য, মিষ্টির তো কথাই নেই! আর সব রকম খাওয়া যদি আপনারা বন্ধই ক'রে দেবেন তাহলে বেঁচেই বা লাভ কি বলুন পৃথিবীতে, মরে গেলেই হয়!

হীরালালবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিলে তাঁহার খুত্ খুত্ খুত্ খুত্ করিয়া একটা শব্দ হয়, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া যায়, চিবুকের তলায় চর্ব্বি আন্দোলিত হইতে থাকে।

বিমল বুঝিল হীরালালবাবুকে আহার-সংযমের উপদেশ দেওয়ার মানে অরণ্যে রোদন করা। 'ইন্সুলিন্' ইনজেকশনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। তাহাই করিল। হীরালালবাবু বলিলেন—রোজ নিতে হবে?

—রোজ।

—লাগবে না কি?

সকলেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করে, সকলকেই বলিতে হয় 'কিছু না', সকলেই সে কথা অবিশ্বাস করে, তবু সকলেই ইনজেকশন লয়।

হীরালালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনজেকশন নিলে তো আর খাওয়ার বাধা থাকবে না?

—না বরঞ্চ বেশী ক'রে খাবেন।

—বেশ, লাগান তাহলে।

বিমল হীরালালবাবুকে চিকিৎসা সুরু করিয়া দিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আর একটি রুগীর ভার আপনাকে নিতে হবে, আমার মেজদা'র।

—কি হয়েছে তাঁর ?

—তাঁর হয়েছে···মানে, চলুন নিজের চোখেই দেখবেন। তিনি ঐ পেয়ারা-বাগে আছেন। কলকাতার ডাক্তাররা ওঁকে আলাদা থাকতে বলেছেন, চলুন।

মোটরে করিয়াই যাইতে হইল। পেয়ারা-বাগ নিতান্ত কাছে নয়। হীরালালবাবুদের প্রকাণ্ড একটা পেয়ারাবাগান আছে, তাহারই মধ্যে ছোট বাঙ্লোটির নাম পেয়ারা-বাগ। পেয়ারা-বাগে মতিলালবাবু একটি চাকর মাত্র সম্বল করিয়া একাই বাস করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়াই বিমল বুঝিতে পারিল মতিলালবাবুর কি হইয়াছে। ফোলা নাক, ফোলা কান, ভুরুর উপরও ফোলা, ফোলা ভুরুতে চুল নাই, সিংহের মত মুখভাব—কুষ্ঠ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। নমস্কার-বিনিময়াদির পর মতিলালবাবু বলিলেন—আমার ব্যায়রাম কি তা দেখেই বুঝতে পারছেন আশা করি। কলকাতা গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁরা একটা ওষুধ খেতে, একটা লাগাতে আর একটা ইনজেকশন করতে দিয়েছেন। জগদীশ-বাবুকে ডেকেছিলাম তিনি আপনার কথাই বললেন! বললেন বুড়ো হয়ে গেছি ওসব ইনট্রাডারমল ইনজেকশন আমার দ্বারা ভাল হবে না, বিমলবাবুকে ডাকুন আপনারা।

বিমল বলিল—কতকগুলো ইনজেকশন দিতে বলেছেন ওঁরা ?

—অন্ততঃ একশোটা।

বিমল এখানে আসিলে সাধারণতঃ দশ টাকা করিয়া 'ফি' লয়। একশোটা ইনজেকশন দিতে হইবে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসচক্ষে এক হাজার টাকার অঙ্কটা ভাসিয়া উঠিল। এক হাজার টাকা তুচ্ছ

করিবার মত জিনিস নয়। বলিল—ইনজেকশন দেবার পিচকিরি-টিচকিরি কিন্তু আপনাকে কিনতে হবে, এখানেই থাকবে সেগুলো।

—সব এনেছি আমি।

মতিলালবাবু একটি চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া দেখাইলেন, সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। মতিলালবাবুর চিকিৎসার ভারও বিমল লইল। সেই দিনই একটা ইনজেকশন দিয়া দিল। মতিবাবুর ওখান হইতে ফিরিবার মুখে বিমল হিরালালবাবুকে সাবধান করিয়া দিল।

—আপনি যেন ওখানে যাবেন না বার-বার, আপনার ডায়াবিটিস রয়েছে, আমার উচিত আপনাকে সাবধান করে দেওয়া, ছোঁয়াচে রোগ তো!

হীরালালবাবু বলিলেন—তা জানি সব, কিন্তু নিজের দাদা, তাকে তো ত্যাগ করিতে পারি না। একবার অন্ততঃ যেতেই হবে রোজ খোঁজখবর করতে, উনি আবার ভারী অভিমানী লোক।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আরে ছেড়ে দিন মশাই আপনাদের ও-সব থিয়োরি-ফিয়োরি! যিনি যতই সাবধান হন সব মিঞাকেই এক দিন মরতে হবে, মাঝথেকে ছোটলোক হয়ে মরি কেন—

খুত্ খুত্ করিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠিলেন, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া গেল এবং চিবুকের নীচে চর্ব্বি থলথল্ করিতে লাগিল। মোটর থামিলে হীরালাল বলিলেন—আপনাকে আর একটি রুগী দেখাব ডাক্তারবাবু, ঠিক রুগী অবশ্য নয়, আসুন—ওরে কমলিকে ডাক—

উভয়ে আবার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু পরেই কমলি আসিল। সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে।

—দেখুন ত একে, মুখময় ব্রণ হয়েছে মশাই, কিছুতে সারছে না।

গেলে গেলে মুখময় দাগ ক'রে ফেলেছে। বিয়ের বাজার বুঝতেই পারছেন মুখময় দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেলে বিশ্রী দেখতে হবে, কেউ তখন পছন্দ করবে না।

বিবাহপ্রসঙ্গে কমলি লজ্জিত হইয়া একটু মাথা নীচু করিল।

বিমল ব্রণগুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি যাও—

কমলি চলিয়া গেল।

—কি উপায় করা যায় বলুন তো! ইনজেকশন, মলম, লোশন সব রকম হয়ে গেছে।

বিমল নূতন একটা পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিল, সেইটাই লিখিয়া দিল।

—দেখুন এটাতে যদি সারে।

বিমল বাড়ি ফিরিবার মুখে একখানি খামের চিঠি পাইল। মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা ; সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। পথেই দাঁড়াইয়া সে চিঠিখানি খুলিল, খুলিয়া বিস্মিত হইল। বিনোদিনীর চিঠি! লিখিয়াছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটি বিশেষ কথা জানবার জন্যেই আপনাকে গোপনে এ চিঠিখানি লিখছি, আশা করি কিছু মনে করিবেন না। আপনার বন্ধু আজকাল দিনরাত্রি দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে চারিদিকে অন্ন-বস্ত্র-চাঁদা সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন, নাইবার খাবার অবসর নেই, বাড়িতে অধিকাংশ দিনই রাত্রে আসেন না। দূরের সব গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রায়ই ফিরতে পারেন না। আমি যে তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর একটু সাহায্য করব তা তো হবার উপায় নেই জানেন, তিনি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান সব সময় আমি তা জানতেও পারি না। কোথায় খান,

কি খান, কোথায় শোন কিছুই জানি না; সুতরাং ওঁর সম্বন্ধে আমার ভয়ানক একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। তার ওপর সেদিন আর একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ভয়ানক চিন্তিত হয়েছি আমি। সেদিন বাড়ি এসেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কি একটা ওষুধ খাচ্ছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে ফেললেন সেটা। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার, ওষুধ খাচ্ছ কেন—হেসে বললেন কিছু হয় নি। অনেক ধরাধরি করাতে বললেন, ভাল হজম হয় না ব'লে বিমল একটা হজমের ওষুধ দিয়েছে। ব'লেই বেরিয়ে গেলেন, আজ তিন দিন হ'ল এখনও ফেরেন নি! আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতেই পারছেন। ওঁর কি হয়েছে? দয়া ক'রে আমাকে সব খুলে লিখবেন কিছু লুকোবেন না। ওঁকে তো চিনেনই, খামখেয়ালী মানুষ, একটা-না-একটা কিছু সর্ব্বদাই নিয়ে মেতে থাকেন। ধর্ম্ম নিয়ে দিনকতক মেতে কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, থিয়েটার নিয়ে দিনকতক কাটালেন, এইবার দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়েছেন। এর পরই কলকাতায় খেলার হিড়িক লাগবে তখন নিশ্চয়ই কলকাতা চলে যাবেন। চারদিকে এত হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে কি ক'রে বলুন তো। আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল ক'রে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আপনার কথা খুব মানেন। আর আমাকে একটু জানাবেন দয়া ক'রে সত্যি ওঁর কোন অসুখ হয়েছে কিনা। নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হ'লে ওষুধ খাবেন কেন শুধু শুধু। অসুখটা কি সেটা আমি জানতে চাই। আশা করি অবিলম্বে আপনি আমার চিন্তা দূর করবেন। মণিমালাকে নিয়ে আসুন না, আমাদের বাড়ি। মণি ও আপনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। ইতি

বিনোদিনী

হঠাৎ বিমলের মনে হইল পিছন দিকে কে দাঁড়াইয়া আছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল গুপিবাবু কম্পাউণ্ডার, চশমার কাচের উপর দিয়া পত্রটার পানেই চাহিয়া আছেন। বলিলেন—হাসপাতালে একটা 'ফ্র্যাক্চার কেস্' এসেছে।

—কোথায় ভেঙেছে ?

—বাঁ হাতটা।

—চলুন যাচ্ছি, আপনি সব ঠিক করুন গে।

—যে আজ্ঞে।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল চিন্তিত মুখে চিঠিখানি পকেটস্থ করিয়া হাসপাতালের দিকে নয়, বাড়ির দিকেই অগ্রসর হইল। বড় ক্লান্ত লাগিতেছে। সর্ব্বাগ্রে এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনীকে সে কি উত্তর দিবে! মিথ্যা কথাই কিছু একটা লিখিতে হইবে। রোগীর গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহার স্ত্রীর কাছেও না।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অমরও আসিয়া পড়িল।

ফ্র্যাক্চারটা বাঁধিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় মহাসমারোহে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া, পতাকা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে অমরের দল ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইল। দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা চাই। বিমলের সহসা মনে হইল ইহাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ, যে কোন একটা জিনিসকে উপলক্ষ্য করিয়া সে উৎসব করিবে। হুজুগে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করিতে পারে না। দেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ঠিক এই ভাবে দ্বারে দ্বারে চাঁদা চাহিয়া না বেড়াইলে কেহই চাঁদা দিবে না। অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখে বিগলিত

হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা পাঠাইয়া দিবে এরূপ লোকের সংখ্যা কম। চাঁদা আদায় করিতে হইবে; এই আদায় করা ব্যাপারটাকে বাঙালী তাহার স্বকীয় প্রতিভাবলে একটু মনোরম করিয়া লইয়াছে মাত্র।

চাঁদা দিয়া বিমল অমরকে বলিল—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, তুই কি ঐ দলের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে ঘুরবি না কি এখন?

—আমি না ঘুরলেও চলে, ওরাই যথেষ্ট।

তাহলে ওদের যেতে বলে দে, চল্ আমরা একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

—চল্।

বিমল অমরকে বিনোদিনীর পত্রখানি দেখাইয়া বলিল—এই খানিকক্ষণ আগে পেয়েছি! কি ওষুধ খাচ্ছিলি তুই?

অমর একটা কবিরাজি পেটেণ্ট ওষুধের নাম করিল। বলিল—খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

—বিনুকে তোমার এখন কি লিখি বল!

—সত্যি কথাটা ছাড়া আর যা খুশী লিখতে পার।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—এমন ক'রে হৈ হৈ ক'রে ঘুরিস কেন, বিনুর কাছাকাছি থাকলে অন্ততঃ সে বেচারা একটু সন্তুষ্ট থাকে! তোদের ওই হারেমের মধ্যে একা একা সে বেচারির কি কষ্ট বল্ তো!

—কি করব বল্, উপায় কি, তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখতে পাই না!

—তা ব'লে দিনরাত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবি, বেশ তো!

ম্লান হাসিয়া অমর বলিল—মর্ফিয়া দিয়ে তোরা যেমন শরীরের যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দিস, কাজ নিয়ে তেমনি আমি মনের যন্ত্রণাটা ভুলে

থাকবার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে হচ্ছে আর যেন পাচ্ছি না! আমার দোষ হয়েছে তা এক-শ' বার স্বীকার করছি, কিন্তু একবার পা ফস্‌কালেই সারাজীবন ধরে তার শাস্তি চলবে এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার ভাই। এর ওষুধও নেই, ক্ষমাও নেই?

—ক্ষমা আছে কি নেই তা তো তুমি যাচাই ক'রে দেখ নি এখনও, বিনু তো কিছুই জানে না।

অমর নিস্তব্ধ হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিমল অমরকে বলিল—আমার মনে হয় বিনুকে সব কথা খুলে বলা উচিত। যার সঙ্গে আজীবন বাস করতে হবে তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা ক'রে চিরকাল চলা শক্ত। তাকে বলাই ভাল।

অমর হাসিয়া বলিল—এখন সে হয় না ভাই, আমি যে এত দিন ভণ্ডামী ক'রে এসেছি, তার কাছে অকলঙ্কিত ধার্ম্মিক ব'লে নিজেকে দেখিয়েছি, হঠাৎ এখন কি ক'রে তাকে বলব যে আমি একটা চরিত্র-হীন ব্যাধিগ্রস্ত লোক—

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—শান্তি পাবার ঐ এক-মাত্র উপায়। পাপকে চেপে রাখতে নেই। আমরা যেমন শরীরের কোথাও পুঁজ হ'লে সেটাকে বের করে দি, তেমনি মনের গ্লানিও বের ক'রে দেওয়া উচিত। তাতে শান্তি পাওয়া যায়।

অমর কিছু বলিল না—দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। অস্তমান সূর্য্যকিরণে জল-স্থল-আকাশ সুরঞ্জিত। পাল তুলিয়া দুইখানা নৌকা কেমন চমৎকার ভাসিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ একটা নৌকার পাল যদি ছিঁড়িয়া যায়, হঠাৎ যদি ঐ সুরঞ্জিত আকাশপটে কেহ

খানিকটা আলকাতরা লাগাইয়া দেয়, হঠাৎ যদি এই গলিত স্বর্ণবৎ নদীজল পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইয়া উঠে—

দূরে হার্মোনিয়াম ও গানের আওয়াজ শোনা গেল।

অমর বলিল—এইবার ওঠা যাক্।

—কোথা যাবি এখন?

—কুবেরগঞ্জ।

—সে তো দশ মাইল এখান থেকে—

অমর একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

৫

বিমলের ইচ্ছা করিতে লাগিল জমিরুদ্দিন সাহেবের মুখের উপর শুনাইয়া দেয় যে আপনার ঐ টাঙানো কম্বলটা তো ঠিক আছে, ওটা তো দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে না, আমি তো ওইটাই রোজ দেখিতেছি! রোগিণীকে দেখিতেই পাই না, তাঁহার ভাল-মন্দের দায়িত্ব কি করিয়া লইব। ইচ্ছা করিল, কিন্তু সত্য সত্যই সে কথা বলিতে পারিল না। আমাদের অধিকাংশ সদিচ্ছাই মনে মনে থাকিয়া যায়—বাঙ্ময় হইতে পায় না। যদিই বা সেটাকে প্রকাশ করিতে পারি, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। আমরা চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর নই।

বনিয়াদি মুসলমান পরিবার; পর্দ্দার খুব বাড়াবাড়ি। রোগী তো বোর্কা পরিয়া আছেই, তাহার বিছানার সামনে প্রকাণ্ড একটা কম্বলও টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রোগী কম্বলের ভিতর দিয়া হাতটা একটু বাহির করিয়া দেয়, বিমল দুটি আঙুল দিয়া নাড়ীটা দেখিবার একটু সুযোগ পায়। ঐ নাড়ী দেখিয়াই যতটুকু হয়। আজ জমিরুদ্দিন

সাহেব বলিলেন যে রোগের অবস্থা ভাল নয়, দিন দিন যেন খারাপই হইতেছে।

বিমলের শুনিয়া রাগ হইল, কিন্তু রাগ সে প্রকাশ করিল না। ভূধরবাবুর কথাটা তাহার মনে পড়িল, আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হালে বসবে!

অসুখ সারুক আর না সারুক তাহার তো প্রত্যহ কয়েকটা করিয়া টাকা হইতেছে। অপ্রিয় কয়েকটা সত্য কথা ইহাদের শুনাইয়া দিয়া লাভ নাই। সে যদি রাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর এক জন আসিয়া ঐ অদৃশ্য রোগীরই চিকিৎসা করিতে বসিবে, এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবে না, তাহার স্পষ্টবাদিতার সুযোগ লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহার স্থানটি দখল করিয়া বসিবে।

বিমল চিন্তিত মুখে বলিল—সিভিল সার্জ্জন আর লেডী ডাক্তারকে ডাকা দরকার।

—বেশ

রোগীটিকে যে ভাল করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখা দরকার তাহা বলিয়া লাভ নাই। সেকালের কবিরাজ এবং হাকিমরা নাড়ী দেখিয়াই সব কিছু করিতেন, রোগীর হাতে সুতা বাঁধিয়া সেই সুতাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আগেকার অসাধারণ চিকিৎসকগণ অলৌকিক সব কাণ্ড করিয়াছেন, একালেই বা সমগ্র রোগীটাকে দেখিবার জন্য এ আগ্রহ কেন! একাল-সেকালের তুলনায় একালকেই চিরকাল হার মানিতে হয়। হার মানিয়া চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিমল টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

৬

এক দিন সকালে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

—ডাক্তার, এবার নন্দী-মহাশয়কে একটু সন্তুষ্ট না করলে চলছে না। সে-বার হেরে গিয়ে উনি বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন।

মিউনিসিপালিটির ব্যাপারের বিমল ইদানীং কোন খবরই রাখিত না। সুতরাং সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

—কিসের ব্যাপারে ?

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আহা ঐ যে ইলেকট্রিক স্কীম !

বিমল শঙ্কিত হইয়া বলিল—আবার প্রবন্ধ লিখতে হবে না কি ?

—না, তার চেয়েও বেশী, ক্যানভাস করতে হবে।

—বলেন কি ?

বদিবাবু বলিলেন—আপনার তো আজকাল সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার। মথুরবাবু, সৌরীনবাবু, হীরালালবাবু, জমিরুদ্দিন, চৌধুরি-মশাই এমন কি হরেন বোস অবধি আপনার করায়ত্ত হয়ে গেছেন, সবাইকে একবার ক'রে ব'লে দেবেন যেন নন্দীকেই ভোট দেয়। এবার হেরে গেলে নন্দী ক্ষেপে যাবে।

বিমল বলিল—আচ্ছা, এই শহরে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেবার মতন কি মিউনিসিপালিটির অবস্থা! গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে! আপনি কি মনে করেন ?

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমরা উন্মাদ হ'তে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তো আর উন্মাদ নয়! আমরা অনুরোধ করলেও গবর্ণমেণ্ট টাকা দেবে না। খালি নন্দী মশায়ের মুখরক্ষের জন্যই এ-সব করা আর কিছু নয়। আপনি একটু চেষ্টা করবেন!

—আচ্ছা। মথুরবাবু কিন্তু শুনবেন না আমার কথা।

—এক জন না শুনলে আর কি হবে!

নন্দী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বদ্দিবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা বলিলেন—অনেকেরই তো চিকিৎসা করেছেন, এবার আমারও একটু চিকিৎসা করুন।

—কি হয়েছে আপনার ?

—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোন অসুখ করেছে। অবশ্য টাকাটাকে যদি অসুখের মধ্যে গণ্য করেন তাহলে—

বদ্দিবাবু অকৃত্রিম আনন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

—বেশ বলেছেন এটা।

তাহার পর আরও খানিকক্ষণ দাঁতন ঘষিয়া বলিলেন—না, শরীরের কিছু গড়বড় হয়েছে, সেদিন পাটনায় সেটা বুঝলাম।

—পাটনায় গিছলেন না কি ?

—হ্যাঁ, পাটনা হাইকোর্টে একটা কাজ ছিল। সেদিন পাটনায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশাই গল্প করছি হঠাৎ একটা টমটমওয়ালা এক ছোট ছেলেকে চাপা দিয়ে ছুট! বদ্দি চাটুজ্যের কাছে এ চালাকিটি চলবার উপায় নেই! আমিও ছুটলাম তার পিছনে, ধরলাম কিছু দূর গিয়ে, খুব উত্তম-মধ্যম দিলাম বেটাকে! চাপা না হয় দিয়ে ফেলেছিস, টমটমটা থামিয়ে ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌছে দে, তা নয় পালাচ্ছিস্। বদ্দি চাটুজ্যের সামনে এ চালাকি চলবে কেন ?

বদ্দিবাবু বিমলের মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।

—ঠিক করি নি ?

—ঠিক করেছেন।

—ও ব্যাপার তো মিটে গেল, কিন্তু আমার হাঁপানি আর কিছুতে থামে না মশাই, প্রায় ঘণ্টাখানেক ব'সে হাঁপালাম। আমাদের [illegible]র ফুটবল টিমে লেফট্ উইঙে খেলতাম আমি, আমার নাম ছিল ঝড়!

ভীষণ ছুটতে পারতাম আমি, কই সেকালে কখনও এত হাঁপিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

বিমল হাসিয়া বলিল—বয়স বাড়ছে! চলুন আপনার হার্টটা দেখি—আসুন ঐ বাহিরের ঘরটায়—

বাহিরের ঘরটায় ঢুকিবার মুখে কয়েকটা পেঁয়াজের খোসা লক্ষ্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—আপনি খুব মাংস খান শুনেছি—

—প্রত্যহ।

—বলেন কি! শাকসব্জী খান না একেবারে?

বিমল হাসিয়া বলিল—না।

—শুনেছি শাকসব্জীতে খুব ভিটামিন আছে!

— থাকতে পারে কিন্তু আমি ও-সবের ধার ধারি না।

বদিবাবুর হার্টটা দেখিয়া বিমল বলিল—না বিশেষ কিছু নয়; আপনি কিছু দিন বিশ্রাম নিন।

—তা তো আপাতত অসম্ভব! আচ্ছা খবরের কাগজে কিছু দিন আগে হার্ট নিয়ে যে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল—

—ওগুলো পড়বেন না! খবরের কাগজের ঐ সস্তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সবাইকে সবজান্তা ক'রে দিয়ে মহা মুশকিলে ফেলেছে আমাদের!

—কেন ওগুলোতে কি ভুল খবর থাকে না কি?

—ভুল ঠিক নয়, কিন্তু পুরো খবর থাকে না! আর ঐ স্বল্প বিদ্যা আহরণ ক'রে ভয়ঙ্কর মুশকিল হচ্ছে, আপনাদেরও আমাদেরও!

বদিবাবু কিছুক্ষণ বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—আমার কোন ওষুধ টষুধ ব্যবস্থা ক'রবেন না কি।

—বিশ্রামই আপনার ওষুধ, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন কিছু দিন !

—সে তো অসম্ভব। আচ্ছা চলি তাহলে !

বদিবাবু চলিয়া গেলে পরেশ-দা আসিলেন।

—তোমার যে আজকাল টিকিই দেখা যায় না হে ?

—না থাকলে দেখবেন কি ক'রে ! কোথা যাচ্ছেন ?

—আমি যাচ্ছি 'হরিমোহন মেমোরিয়াল' কাপের টাইগুলো সব ঠিক করতে! তুমি কমিটিতে আছ জান তো ?

—শুনেছি। আমাকে কেন ওর মধ্যে ঢোকালেন শুধু শুধু।

কেন ঢুকাইয়াছেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখাইয়া পরেশ-দা হাসিমুখে বলিলেন—বাঃ, সে কি হয় ! হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার বউদির ঐ ওষুধটাই চলিবে না কি !

—জ্বর ছেড়ে গেছে তো ?

—কালই।

—আরও চলুক এক দিন।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল বাড়ির ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স-কালেক্টার ভুবনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—ওহে ডাক্তার, আমার সর্ব্বাঙ্গ যে খোসে ভরে গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা কর ভাই। রক্তটাকে যদি পরীক্ষা করতে চাও তাই না হয় কর, আর তো পেরে উঠছি না।

বিমল দেখিয়া বলিল—কি ওষুধ লাগাচ্ছেন ?

—সব রকম লাগিয়েছি, গাঁজার তেল, গন্ধক, শেয়ালকাঁটা গাছের শেকড়, আলকাতরা, তুঁত—

বিমল হাসিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—তুমি তো এ অঞ্চলের ইনজেকশন-সম্রাট হয়ে উঠেছ, তাই তোমার কাছে এলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার!

বিমল বলিল বেশ, আজ হাসপাতালে যাবেন, একটা ইনজেকশন দেব আপনাকে। কিন্তু আমার হাসপাতালের ওষুধ যে আবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, এইবার আপনি কিছু ট্যাক্স আদায় ক'রে দিন। হয়েছে কিছু ট্যাক্স আদায়? এত দিন তো আমি ভিক্ষে ক'রে চালালাম—

ভুবনবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন—ট্যাক্স কাদের বাকী জান?

—কাদের?

—ঐ সব চোমরা-চোমরাদের! এক মথুরবাবু ছাড়া আর সকলের কাছে ট্যাক্স পাওনা রয়েছে! কিন্তু ওঁরা মালিক, ওঁদের কাছে তো আর বার-বার তাগদা করতে পারি না। নন্দী-মশায়কে একটু তাগাদা করেছিলমে, তিনি এমন ভাবে চোখ গরম ক'রে চাইলেন আমার দিকে যে আমার পিত্তি শুকিয়ে যাবার জোগাড়!

বিমল এ-কথা জানিত না, চুপ করিয়া রহিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—যত তম্বি গরীবদের উপর, তারা ট্যাক্স না দিলে তাদের ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি বিক্রী কর, অথচ ওঁদের যে প্রত্যেকেরই এক কাঁড়ি ক'রে বাকি রয়েছে সেদিকে কারও দৃকপাত নেই।

বিমল বলিল—আচ্ছা হাসপাতালে চলুন আপনি, আমি যাচ্ছি একটু পরে!

ভুবনবাবু বৃদ্ধ লোক। বিমলকে খুব স্নেহ করেন। তাই বোধ হয় এই গোপন কথাগুলি বলিলেন। গমনোন্মুখ বিমলকে ডাকিয়া

আবার বলিলেন—এ-সব কথা যেন প্রকাশ না পায়, দেখো! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি—চাকরিটা গেলে খেতে পাব না!

—না, না, আমি কাউকে কিছু বলব না।

৭

সুপ্রিয়া সরকারকে ইন্‌জেকশন দিতে গিয়া বিমল দেখিল বাহিরের ঘরটাতে এক সুব্রতবাবু ছাড়া আর কেহ নাই। এই শীর্ণকায় উন্নতনাসা লোকটাকে দেখিলে বিমলের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। সুব্রতবাবু পড়িতেছিলেন বিমলকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া আসিলেন,—ও আপনি এসে গেছেন। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন, আজ সেটা আমরা আন্দাজই করতে পারি নি। বসুন, খবর পাঠাই একটা—

বিমল উপবেশন করিল, সুব্রতবাবু বাহির হইয়া গেলেন। ভদ্রলোকের কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে বেশ সুমার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, লেখাপড়াও জানেন, প্রথম শ্রেণীর এম্‌, এ, যখন, নিশ্চয়ই জানেন, অথচ কেমন যেন একটা শ্রীহীন ভাব ভদ্রলোকের! দেখিলেই মন বিমুখ হইয়া যায়। একটি চাকরকে বাইসিকেল-পৃষ্ঠে রওনা করিয়া দিয়া সুব্রতবাবু আসিয়া বসিলেন।

—আচ্ছা, সুপ্রিয়াকে কি রকম দেখেছেন বলুন ত! কাল আবার প্যালপিটেশন হয়েছিল খুব।

—তাই না কি?

বিমল চিন্তিত হইয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল!

সুব্রতবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ওর অসুখটা কি বলুন ত?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—একটা কথা বলব যদি না মনে করেন!

—কি বলুন।

—আপনার সন্তান না হ'লে অসুখ সারবে না।

সুব্রতবাবু খানিকক্ষণ বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—কিন্তু মুশকিল এই যে সুপ্রিয়া ছেলে চায় না!

—কেন?

সুব্রতবাবু ইহার উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বলিলেন না, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার বিয়ে করাই ভুল হয়েছিল।

বিমল মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে হয়ত কোন বেদনার স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তবু সে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না।

—কি হিসেবে ভুল বলছেন?

—সে আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি ঘর-জামাই নন!

সুব্রতবাবু যে ঘর-জামাই বিমল তাহা জানিত না, মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। বাহিরে কিন্তু হাসিয়া বলিল—তাতে কি হয়েছে!

—অনেক কিছু হয়েছে। তার জন্যেই সুপ্রিয়া ছেলে চায় না, বলে শঙ্করাকে ডেকে আর দরকার নেই, নিজেদের ঠাঁই হয়েছে তাই যথেষ্ট!

বিমল বলিল—বেশ তা আলাদা থাকুন আপনারা, এখানে থাকবার দরকার কি?

সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া সুব্রতবাবু বলিলেন—চেষ্টা করছি না ভাবছেন, কিন্তু হচ্ছে না—কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পারছি না।

এ, তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েও কিছু সুবিধে হয় নি। একটা কলেজে চাকরি খালি হয়েছে, দরখাস্ত ত করেছি, দেখি যদি হয়। ভরসা কিছু নেই, জীবনে অনেক দরখাস্তই করেছি অনেক জায়গায়।

সুব্রতবাবু হাসিলেন। করুণ হাসি!

—কোন্ কলেজে?

সুব্রতবাবু কলেজের নাম বলিলেন। কি আশ্চর্য্য বিমলের শ্বশুরই যে সে কলেজের প্রিন্সিপাল! সেকথা বলিতেই সুব্রতবাবুর চোখে মুখে যেন আলো জ্বলিয়া উঠিল। অবিন্যস্ত কেশভার বাঁ-হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সরাইয়া তিনি বলিলেন—একটু চেষ্টা করবেন দয়া ক'রে।

—নিশ্চয়! কলেজ-কমিটির আরও দু-এক জনের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, কালই চিঠি লিখব আমি।

—চলুন না যাই এক দিন। চিঠিপত্তর লিখে এসব ব্যাপার তেমন ঠিক হয় না। সুপ্রিয়াকে আর এক বার কলকাতা নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল, চলুন না সব যাই একসঙ্গে।

—যাওয়া মুশকিল।

—না না, চলুন ডাক্তারবাবু প্লীজ—

দুই হাত দিয়া সুব্রতবাবু বিমলের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন। শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুইখানির দিকে চাহিয়া বিমল "না" বলিতে পারিল না। বলিল—চেষ্টা করব। ছুটি না পেলে ত যেতে পারি না। আমারও ত চাকরি—

—আপনার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার আমি নিচ্ছি। কাকাবাবু ঐ ওধারের বারান্দায় আছেন, চলুন তাঁকে গিয়ে এখুনি বলি,—তিনি চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

—সৌরীনবাবু আছেন না কি বাড়ীতে?

—আছেন, আসুন।

সুব্রতবাবুর পিছনে পিছনে বিমল বারান্দায় গিয়া হাজির হইল। বারান্দার এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য চেয়ারের উপর সিগার-হস্তে সৌরীন-বাবু বসিয়াছিলেন, সম্মুখে একটি মিস্ত্রি বসিয়া কি যেন প্রস্তুত করিতে-ছিল। পদশব্দ শুনিয়া সৌরীনবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইলেন এবং বিমলকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আসুন আসুন, কতক্ষণ এসেছেন, ওরে ফকির চেয়ার বার কর।

বিমল দেখিল প্রকাণ্ড একটা খাঁচার মতন কি যেন প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ছোটবড় নানা মাপের এতগুলো আয়না কেন! গোল, তিনকোণা, চৌকোণা নানা রকম আয়না।

—এ-সব কি ?

সৌরীনবাবু সিগারে মৃদুগোছের একটা টান দিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, আমাদের হীরেমনটার মাথা খাবার চেষ্টা করছি!

—তার মানে ?

—তার মানে ওর একটা বড়গোছের খাঁচা তৈরি করিয়ে তাতে নানা রকম আয়না 'ফিট' করে দিচ্ছি। মানুষের সঙ্গে যখন বাস করছে তখন অতটা নিশ্চিন্ত ওকে থাকতে দেব কেন? কি বল সুব্রত! নিজেরই ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া ভাব যা হোক একটা কিছু করুক, আমরা দেখি। পাখীর মুখে কেষ্ট নাম শুনে কি আর চারটে হাত বেরুবে! তার চেয়ে ও যদি আয়নায় নিজের ছায়াটার সঙ্গে ঝাপটাঝাপটি করে, দেখে সুখ হবে খানিকটা! কি বলেন ডাক্তার বাবু!

ভদ্রলোকের উদ্ভাবনীশক্তি দেখিয়া বিমল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—শুধু নিজের ছায়াই নয়, বাইরের অনেক কিছু দেখেও অকারণে ভয় পাবে কিংবা খুশী হবে। বেরালের ছায়া

দেখে ভাববে, ওই রে বুঝি বেরাল খাঁচার ভেতরে ঢুকেচে—প্রাণপণে চেঁচাবে। অন্য একটা পাখীর ছায়া পড়লে আশ্চর্য্য হয়ে ভাববে, এ আবার কোথা থেকে এল! কিংবা হয়ত কিছুই করবে না, মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকবে—দেখাই যাক্। নানা রকম আয়না ত এনে জোটানো গেছে! ও যদি একদম কিছুই না করে তাহলে আপনাকে একদিন 'কল' দিতে হবে!

—আমাকে? কেন!

—ওকে তাহলে একটু মদ খাওয়াব, মাত্রাটা ঠিক ক'রে দেবেন আপনি! সুস্থমস্তিষ্কে যদি ও কিছু না করে, মাতাল হ'লে করতে পারে!

—পাখীটাকে শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করচেন কেন?

—কারণ আমি মানুষ!

সৌরীনবাবুর সমস্যা এবং সুব্রতবাবুর সমস্যা এতই বিভিন্ন রকমের যে সুব্রতবাবুর কথাটা চট করিয়া পাড়া গেল না। বদিবাবুর কথাটাও বিমলের মনে পড়িল। পাঁচ রকম কথায় পাছে কথাটা ভুলিয়া যায় সেই জন্য বলিল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—কি বলুন।

—এবার মিউনিসিপাল মিটিঙে আপনার ভোটটা নন্দীমশায়কেই দেবেন।

—বেশ, ফকির আমার ডায়েরিটা নিয়ে এস ত। কবে মিটিং?

—২৭শে।

ফকির নামক ভৃত্যটি ডায়েরি আনিল, সৌরীনবাবু লিখিয়া লইলেন।

বিমল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বিষয়ে ভোট, কিসের মিটিং কিছুই জিগ্যেস করলেন না যে বড়!

—আজ পর্য্যন্ত জীবনে কোন জিনিসের ভাল মন্দ বিচার ক'রে ভোট দিই নি। বরাবর অনুরোধে পড়ে দিয়েছি। যে প্রথমে অনুরোধ করে তাকেই ভোট দিই, যদি কেউ অনুরোধ না করে কোন পক্ষেই দিই না। কি বিষয় কি বৃত্তান্ত তা নিয়ে মাথা-ঘামানো সুতরাং বৃথা। সবারই বোধ হয় আমার মত দশা : এ যুগে স্নেহের বরং চোখ আছে, ভোট একেবারে অন্ধ !

মোটর থামিবার শব্দ পাওয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়ার মা ও সুধীর আসিয়া হাজির হইলেন। সুপ্রিয়ার মায়ের হাতে অসমাপ্ত সোয়েটারটা রহিয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই। সেটার দিকে চাহিয়া সৌরীনবাবু মন্তব্য করিলেন, ওটা শেষ হ'লে কি করবে বোউদি ভেবে রাখ এখন থেকে! আমার মোজা, কমফর্টার, সোয়েটার, সুপ্রিয়ার ব্লাউস, মাফলার সব ত হ'ল, সুব্রতরও ত কি একটা হয়েছে !

ভগবতী দেবী দেবরের এ-সব মন্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং আপন মনে বুনিতে লাগিলেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—আমার যদি বুদ্ধি নাও একটা নতুন জিনিষ বাৎলাতে পারি। এই সোয়েটারটা হয়ে গেলে উল-টুলের ভেতর আর যেও না তুমি! আমাদের যে ঐ গ্রামোফোনটা আছে, নিছক গান শোনান ছাড়া ওটার ত আর কোনই কাজ নেই, ঐ মেশিনটাকে যদি কোন কাজে লাগাতে পার মন্দ হয় না। ধর যদি ওতে আরও কিছু জুড়ে-টুড়ে এমন করা যায় যে দম দিয়ে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে গানও হবে, সঙ্গে ঘোল মওয়াও হবে, কিংবা ঐ রকম একটা কিছু—

ভগবতী দেবী উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রিয়া বলিলেন—কি যে আপনি কাকাবাবু, খালি খালি মাকে রাগাবেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—তোরা বুঝিস না, ওতে তোর মা খুশী হয়। না করলেই চটে যাবে। বাল্যকাল থেকে এ-কাজ করছি, আমাদের দু-জনের পরিচয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যে, সে-কথা ভুলে যাস কেন!

বিমল বলিল—চলুন আপনার ইনজেকশনটা সেরে ফেলি।

—আপনাদের জ্বালায় আর পারি না আমি।

সৌরীনবাবু ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চক্ষু বুজিয়া সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন।

ইনজেকশন শেষ করিয়া বিমল বাহিরে আসিতেই সৌরীনবাবু বলিলেন—সুব্রত কাজের লোক হয়ে উঠতে চাইছে, শুনেছেন?

—শুনেছি।

—এটা অহমিকার লক্ষণ, সুতরাং দুর্লক্ষণ, কি বলেন?

বিমল কিছু বলিল না, একটু হাসিল মাত্র।

—শুধু হাসিলে চলবে না; হাঁ-না কিছু একটা বলুন, তর্ক অন্ততঃ একটা জমে উঠুক। বসুন।

বিমল বলিল—না আর বসব না, কাজ আছে আমার!

—কাজের লোক হওয়ার এই একটা প্রধান দোষ; সুব্রতও দিনকতক পরে ওই হয়ে পড়বে!

বিমল বলিল—সুপ্রিয়ার অসুখ সারাবার জন্যেই সুব্রতবাবুর চাকরি নেওয়া উচিৎ!

—মানে ইনজেকশনে কিছু হবে না?

—আমার ত মনে হয় না!

সৌরীনবাবু হতাশভাবে বলিলেন—ডাক্তারের প্রেসক্রপশনের উপর ত হাত নেই!

সুপ্রিয়া সরকারকে ইনজেকশন দিয়া বিমল হীরালালবাবুর ওখানে গিয়াছিল। সেখানে হীরালালবাবু এবং মতিলালবাবুর ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল। ইনজেকশনেরই যুগ পড়িয়াছে! ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইনজেকশন দিতে হয়। হীরালালবাবু ইনজেকশন লইয়া অনেকটা ভাল আছেন, কিন্তু মতিবাবুর ত কোন উন্নতিই হইতেছে না। ভদ্র-লোকের ওখানে বেশীক্ষণ বসিতে ইচ্ছা করে না, অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়িতে চান না। এই কুষ্ঠরোগীদের অপরের সহিত মাথামাখি করিবার দিকে কেমন যেন একটা ঝোক আছে! কত রকম লোকের সহিতই ডাক্তারদের রোজ সাক্ষাৎ হয়, কত রকম লোকের সমস্যা। সুপ্রিয়া, সুব্রত, সৌরীনবাবু, ভগবতী দেবী, নন্দীমহাশয়, অমর, বিনোদিনী প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সমস্যা! রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে, নিদাঘ দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে, বিমল একা বসিয়া ভাবিতেছে, বুক-পকেটটা টাকার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা বিমলের নজরে পড়িল ডান দিকের মাঠে গাছতলায় একটা লোক যেন পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা যে আরাম করিয়া এই দুপুরে ওখানে শুইয়া আছে তাহা ত মনে হয় না। শুইবার ভঙ্গীটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক, যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে! বিমল মটর থামাইতে বলিল। কাছে গিয়া যাহা সে দেখিল তাহাতে সে নির্ব্বাক হইয়া গেল। প্রচুর রক্ত জমিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জরসার একটা লোক

উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত, এই উত্তপ্ত নিষ্করুণ ধরণীকেই সে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া তাহার নাড়ীটা দেখিল—কোন স্পন্দন নাই! আর একটু ঝুঁকিয়া বাঁ-হাত দিয়া তাহার মাথাটা সরাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল! এ কি, এ যে সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারী বুড়োটা যাহাকে সে এক দিন চড় মারিয়া হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ভিখারীর সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে, কি করিবে কিছুই তাহার মাথায় আসিল না। সহসা তাহার চমক ভাঙিল। ড্রাইভারটা বলিতেছে—ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ওর!

—মরে গেছে।

ড্রাইভার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাহলে আর কি হবে! চলুন। আমাকে আবার চারটের সময় সোয়ারি দিতে হবে। দিদিরা সতীশবাবুর ওখানে যাবেন, সেখানে জলসা আছে!

ঠিক তো! তাহারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে! কলিকাতার এক বিখ্যাত নর্ত্তকী মাত্র এক রাত্রির জন্য আসিয়াছেন!

মোটরে উঠিয়া বিমল বলিল—জোরে চালাও।

আইনতঃ তাহার থানায় খবর দেওয়া উচিত, থানার দারোগার উচিত মৃতদেহটাকে সদরে পাঠানো, সদরের ডাক্তারের উচিত মৃত-দেহটাকে চিরিয়া ফাড়িয়া সন্তোষজনক বিবৃতি প্রকাশ করা। শিয়াল-কুকুর-শকুনিতে ছেঁড়াছিঁড়ি না করিয়া একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার সেটা করিবে, হয়ত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তবু বিমল মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারটার হাতে দশ

টাকার একখানা নোট দিয়া বলিল—এই টাকা দশটা দিয়া তুমি ঐ লোকটা যাতে গঙ্গা পায় তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হইয়া গেল।

বিমল বলিল—হীরালালবাবুকে আমার নাম ক'রে ব'লো, তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। খরচটা আমিই দিচ্ছি! ওতে কুলুবে ত?

ড্রাইভার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—টাকাটা আপনি রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি টাকা নিয়েছি শুনলে ছোটবাবু আমার উপর রাগ করবেন!

—না, না কিছু না, আমার নাম ক'রে ব'লো তুমি।

বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া পারঘাটার নৌকায় চড়িল।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিল আর এক সমস্যা! মণিমালার পা পুড়িয়া গিয়াছে। ফুটন্ত দুধের কড়াটা নামাতে গিয়া হাত ফসকাইয়া এই কাণ্ড। আরও এক মুশ্‌কিল হইয়াছিল, ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, অবশেষে রেলের ডাক্তার জগুবাবু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দুলু নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়াছিল। বিমল দেখিল জগুবাবু সুব্যবস্থাই করিয়াছেন, এমন কি ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক একটা সিরাম পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন; সবই হইয়াছে কিন্তু বিমল মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রাঁধুনী বামুন রাখা লইয়া মণির সহিত তাহার গোড়ায় গোড়ায় বেশ ঝগড়া হইয়া গিয়াছিল, বিমল ইচ্ছা করিয়াই রাঁধুনি রাখে নাই, দুইজনের মাত্র রান্না তার জন্যেও রাধুনী! তাহার চেয়ে হোটেল হইতে আনাইয়া খাইলেই হয়। মণি যে হঠাৎ

পুড়িয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনাটার কথা তাহার মনেই হয় না। তাহার উপর সে অন্তঃসত্ত্বা! বিমল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। যদিও জ্বালা অনেক কমিয়াছে, তবু নানা রকম উপসর্গ হইতে পারে। মণির দিকে বিমল চাহিয়া দেখিল মণির চোখে একটা দুষ্টুমিভরা হাসি উঁকি দিতেছে, ভাবটা যেন রাঁধুনী রাখতে চাও নি যে, কেমন হয়েছে এবার।

৮

মণিমালা ভাল হইয়া গেল।

মণিমালা ভাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু ঘোষেদের বাড়ীর যে-মেয়েটি পুড়িয়া গিয়াছিল সে আর ভাল হইল না। সে বাঁচিতে চাহেও নাই, চাহিলে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া তাহা কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া নিজ হাতে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত না সতর-আঠারো বছরের অবিবাহিতা মেয়ে, নানা কারণে জীবন তাহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ কথাগুলি বিমলের কাণে বাজিতেছিল,—আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তারবাবু, আমাকে তুমি যেন বাঁচিয়ে দিও না গো!

এই ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়, প্রায়ই শোনা যায়। তবু বিমলের মনটা কেমন যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। নন্দী-মহাশয়ের পুত্র রমেনের নাম মেয়েটার সহিত যুক্ত করিয়া যে-সব কুৎসা রটিতেছে তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি বিমলের ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল আমরা কোথায় চলিয়াছি! আমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-আড়ম্বর কোন কিছুই ত মনের গুহাবাসী পশুটার নখ-দন্তের তীক্ষ্ণতা এতটুকু কমাইতে পারিতেছে না। বরং নানা ছুতায়

আমরা সেই নখদন্তকে শাণিততর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। আজকাল এই যে ঘরে ঘরে মারি স্টোপ্‌স্‌, ফ্রয়েড এবং হ্যাভেলক এলিস পড়ার ধূম—তাহা কি কেবল নিছক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য? এই যে আজকাল পথে ঘাটে অশ্লীল গল্প-কবিতার ছড়াছড়ি এ কি নিছক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই? এই যে দলে দলে লোক সিনেমায় নাচে যায়, এই যে রাশি রাশি অশ্লীল ছবি গোপনে ও প্রকাশ্যে ক্রীত-বিক্রীত হয় ইহা কি নির্জলা আর্টপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নহে? আমরা নানা উপায়ে পশুটাকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছি, অথচ তাহার আহার জুটাইবার সঙ্গতি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না, অভদ্রভাবে অসদুপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নানা ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ছদ্মবেশটা ধরা পড়িয়া গেলে অনেক সময় লজ্জিত হই বটে, কিন্তু সেটা চক্ষুলজ্জা, সামাজিক লজ্জা, আন্তরিক নৈতিক লজ্জা নহে। নীতি আবার কি! বাঁচিয়া থাকা এবং যত দূর সম্ভব জাকজমক করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই ত শ্রেষ্ঠ নীতি! সকলেই বুদ্ধিমান্‌, সকলেই বুদ্ধির আলোক দিয়া সব জিনিষ যাচাই করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে এবং তাহারই জোরে ভগবান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কারগুলিকে অনায়াসে বাতিল করিয়া দিয়াছে। যে অন্ধবিশ্বাসের বলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত এবং পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, সে অন্ধবিশ্বাস ত আর নাই। আজকাল সকলেই চক্ষুষ্মান—সকলেই প্রত্যেক জিনিসটার লাভ-ক্ষতি খতাইয়া দেখিতে জানে। প্রাচীন ধাপ্পায় আজকাল আর কেহ ভোলে না! বিবাহ আজকাল অবশ্যকরণীয় সামাজিক কর্ত্তব্য নহে, বিবাহ আজকাল ইচ্ছাধীন ব্যাপার। নানা দিক্‌ দিয়া অঙ্ক কষিয়া যদি সুবিধাজনক মনে হয় তবেই লোক

বিবাহ করে, সাধ করিয়া এত বড় দায়িত্ব কে লইতে যাইবে, কেহই লইতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে হয়ত বাড়্‌তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলাও কাটিয়া ফেলিয়া মানুষ নিজেকে আরও হাল্‌কা করিয়া ফেলিবে, দেহরক্ষার জন্য এখন যতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন ততটা হইবে না। সব জিনিসই লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করাই বৈজ্ঞানিক রেওয়াজ। ঘরে ঘরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য ফলও ফলিতেছে! নারীরা জননী বলিয়াই তাহাদের শাস্তি বেশী। আমরা জননী লইয়া কবিতা লিখি, উচ্ছ্বসিত হই, কিন্তু জননীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাই না, বরং মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দিই। ব্যভিচারী পুরুষ দরিদ্র হইলে তাহার নিন্দা করি, হয়ত শাস্তিও দিই, কিন্তু ধনী হইলে চুপ করিয়া থাকি এবং প্রয়োজন হইলে পূজাও করি। অর্থাৎ আজকাল সমাজে টাকাই ভগবান্‌, কুবেরেরই জয়-জয়কার! বিমল ভাবিতে লাগিল সে নিজেই বা কি করিতেছে! সে-ও কি কুবেরেরই উপাসনা করিতেছে না? কই আজকাল ত সে আর আগেকার মত ঠিক সময়ে হাসপাতালে যায় না। এ-পারের 'কল'গুলা সারিয়া হাসপাতালে পৌঁছিতে প্রায়ই তাহার ন-টা সাড়ে ন-টা বাজিয়া যায়। গুপিবাবুকে সে বলিয়া দিয়াছে যে, পুরাতন রোগীগুলার ঔষধ যেন তিনি 'রিপিট' করিয়া দেন অর্থাৎ পুরাতন ঔষধই যেন আবার দিয়া দেন। প্রথম যেদিন সে গুপিবাবুকে এ-কথা বলিয়াছিল এবং এ-কথা শুনিয়া গুপিবাবু তাঁহার চশমার কাচের উপর দিয়া যে-ভাবে বিমলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, তাহা বিমলকে লজ্জিত করিয়াছিল! গুপিবাবুর সে নীরব দৃষ্টি যেন ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিতেছিল—এই যে এইবার মুখোসটা খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! প্রথম-প্রথম সকলেই অমন ভাল-গিরি ফলায়,

বাহাদুরিটা শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু টিকে না। এই বয়সে অনেক দেখিলাম। মুখে কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন—যে আজ্ঞে, তাই করব। সেদিন ওপারে একটা 'কল' ছিল, অনেকগুলো কালাজ্বর রোগীর ইনজেকশনও বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে দিতে গিয়া দুইজন রোগীর শিরার বাহিরে পড়িয়া গেল। ভীষণ যন্ত্রণা। গুপিবাবু এবং জানকীর ধমকের চোটে বেচারারা স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেও পারিল না। সেদিন একটা টিউমার কাটিয়াছে, সেপটিক হইবার কথা নয় কিন্তু সেটা সেপটিক হইয়া গিয়াছে, পূঁজ দেখা দিয়াছে, জ্বর হইতেছে! কই, আগে ত এমন সেপটীক হইত না! আগে সে নিজে যত্ন করিয়া ড্রেস করিত, এখন যা করে দুলু। ঐ শূয়ারে-চেরা রোগীটার কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে ভাল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য তাহার পেটের মাঝামাঝি একটা হার্ণিয়ার মত হইয়া থাকিবে, তা থাকুক, প্রাণে ত বাঁচিয়াছে! ছেলেটির নাম কাঙালী। সে বলিতেছে যে বিমলকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবেন না, বিমলই তাহার জীবন বাঁচাইয়াছে, বিমলের সেবাতেই সে জীবনটা নিয়োজিত করিবে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, সচ্ছন্দে থাকিবে। বেতন চাই না, শুধু দুটি খাইতে পাইলেই যথেষ্ট।

—ডাক্তারবাবু?

—কে?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল নন্দী-মহাশয়ের এক জন কর্ম্মচারী।

—কি?

—গুরুঠাকুরের জ্বর হয়েছে কাল থেকে, আপনি একবার চলুন, ভূধরবাবু জগদীবাবু ব'সে আছেন।

—চল।

ভৈরবের স্ত্রীও এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কোলে

ছোট একটি শিশু। সে বলিল যে ছেলেটির দুইদিন হইতে জ্বর হইয়াছে, সে কম্পাউণ্ডার বাবুর নিকট হইতে অবস্থা বলিয়া দুই দিন ঔষধ লইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হইতেছে, ডাক্তারবাবুর যদি একটু দয়া করিয়া দেখেন—

নন্দী-মহাশয়ের কর্ম্মচারিটি বলিলেন—এখন ডাক্তারবাবু আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, পরে আসিস।

বিমল তাহাকে বলিল—তুমি হাসপাতালে যাও, নন্দী-মশায়ের ওখান থেকে ঘুরে এখুনি যাচ্ছি আমি।

নন্দী-মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বিমল দেখিল আবহাওয়া বেশ গুরুগম্ভীর। নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেব এই প্রথম তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং আসিয়াই জ্বরে পড়িয়া গিয়াছেন। নন্দী-মহাশয়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হইয়াছে। বিমল আসিতেই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে বীজননিরত ভৃত্য দুইটিকে আরও জোরে বাতাস করিবার ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার পর ডাক্তার তিন জনের দিকে বাষ্পাকুল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন আপনারা!

গুরুদেব এ কি পরীক্ষায় ফেললেন আমাকে!

জগদীশবাবু বলিলেন—কাতর হয়ে ত লাভ নেই, ব্যায়ারাম তার নিজের রাস্তায় ঠিক যতক্ষণ চলবার তা চলবে।

বিমল বলিল—ক-দিনের জ্বর?

নন্দী-মশায় বলিলেন—প্রকাশ পেয়েছে কাল থেকে, উনি ত সহজে কিছু বলেন না, আমার বিশ্বাস কয়েক দিন আগে থেকেই হয়েছে!

ভূধরবাবু বলিলেন—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-গোছের মনে হচ্ছে!

জগদীশবাবু ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া

ছাতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা হাসিয়া বলিলেন—তা কি বলা যায় চট ক'রে!

কথাটা বলিলেন ভূধরবাবুকে, কিন্তু চাহিলেন বিমলের দিকে। বিমল দেখিল তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি সন্তর্পণে উঁকি মারিতেছে। অদ্ভুত তাঁহার এই জিবটি!

ভূধরবাবু বিমলকে বলিল—যান আপনি দেখে আসুন, তার পর সবাই মিলে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।

মূল্যবান পালঙ্কে মহার্ঘ শয্যায় শায়িত এই বলিষ্ঠ বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে খুব পীড়িত বলিয়া ত বিমলের বোধ হইল না। জ্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। বিমলকে দেখিয়া গুরুঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও সশব্দে বার-দুই হাঁচিয়া বিমলের দিকে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—আপনিও কি ডাক্তার নাকি?

নন্দী-মহাশয়ের প্রৌঢ়া পত্নী শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন, মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনি ফিসফিস করিয়া বিমলের পরিচয় দিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন—ও, আসুন, বসুন। এই ত দু-জন দেখে গেলেন! রাখাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখছি!

প্রথামত বিমল গুরুঠাকুরের বুক পিঠ পেট জিব চোখ সবই দেখিল, বিশেষ কিছুই পাইল না। তাহারও ধারণা হইল ইনফ্লুয়েঞ্জাই হইয়াছে। তাঁহার দেখা হইয়া গেলে গুরুঠাকুর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—কি রকম দেখলেন খাঁচাখানা!

—ভালই!

—আদা দিয়ে এক কাপ চা খেতে পারি?

—বেশ ত খান না।

নীচে যাইতেই ভূধরবাবু বলিলেন—কি রকম, ইন্‌ফ্লু য়েঞ্জা নয় ?

—তাই ত মনে হচ্ছে, তবে—

বিমল কথাটাকে ইচ্ছা করিয়াই সম্পূর্ণ করিল না। জগদীশবাবু বলিলেন—পিঠের নীচের দিক্‌টায় দেখেছেন ডান দিকে ? খুব ফাইন ক্রিপিটিশনের মত রয়েছে—

বিমল শুনিতে পায় নাই তবু বলিল—হ্যাঁ তা ত আছে। তা থাকা আর অসম্ভব কি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাল নিমোনিয়া হ'তে পারে, তা যদি হয় বড় সঙীন ব্যাপার !

—নয় কি ?

জগদীশবাবু হাসিয়া ভূধরবাবুর দিকে চাহিলেন।

নন্দী-মহাশয় বলিলেন—দেখুন, ওসব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই আমি। উনি আমার গুরুদেব, ওঁর চিকিৎসা-বিষয়ে আমি কোন প্রকার খেদ রাখতে চাই না, দরকার মনে করেন কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান আপনারা। ওপারের মথুরবাবুর ভায়রাভাই দুর্লভবাবুও এঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। এক বার সেই দুর্লভবাবুর বাড়ীতে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, তিনি একটা ডাক্তার ডাকেন নি। নিজে বই দেখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছিলেন ! নারায়ণের কৃপায় বাড়াবাড়ি কিছু হ'ল না তাই, যদি হ'ত কি করতিস তুই ? দুঃখ রাখবার জীবনে জায়গা পেতিস ?

জগদীশবাবু অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিয়া বলিলেন দেখুন নন্দী-মশায়, কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে! ভাল জিনিস পৃথিবীতে বেশী থাকে না, থাকতে নেই।

পুলকিত নন্দী-মহাশয় লাল গামছাটি দিয়া বগলের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—অত প্রশংসার যোগ্য অবশ্য আমি নই, আমার গুরুদেবটি

ভাল হয়ে গেলে বাঁচি আমি! আপনারা সকলে সুচিকিৎসকও বটেন, সুহৃদও বটেন, আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম, যা ভাল বিবেচনা করেন করুন। টাকা খরচ করতে আমি পিছপাও হব না এইটুকু জানিয়ে দিয়েই আমি খালাস।

জগদীশবাবু বলিলেন—বেশ একটা দিন দেখা যাক। বিমলবাবু রক্তটাও পরীক্ষা ক'রে দেখুন!

ভূধরবাবু বলিলেন—আমি কিন্তু আগে মশাই এক ফোঁটা হোমিও-প্যাথি দিয়ে দেখতে চাই!

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত, দিন এক ফোঁটা, ক্ষতি কি!

নন্দী মহাশয়ের গুরুদেবের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। বিমল হাসপাতালে ফিরিয়া দেখিল ভৈরবের স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় তখনও বসিয়া রহিয়াছে। বিমল ছেলেটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বেশ জ্বর আছে, কেমন যেন নিঝ্ঝুম হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন কষ্ট। বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হইল, গলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ঠিকই ত, এই যে প্যাচ রহিয়াছে। ডিপথিরিয়া! গুপিবাবু দুই দিন পুরাদমে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া ছেলেটিকে আরও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন!

—গুপিবাবু, ডিপথিরিয়া অ্যান্‌টিটক্‌সিন্ একটা দিন তো।

গুপিবাবু খানিকক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও ত আর নেই, সেবারে চৌধুরী মহাশয়ের নাতির অসুখে সব খরচ হয়ে গেছে।

বিমল স্তম্ভিত হইয়া গুপিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ-

কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল—এখানে দেখুন ত জগদীশবাবুর দোকানে—

জানকী বিমলের চিঠি লইয়া ছুটিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না এখানে।

অর্থাৎ শিশুটি মরিবে!

ধনী চৌধুরী-মহাশয়কে খুশী করিবার জন্য বিমল হাসপাতালের এমন একটা মূল্যবান ঔষধ স্বচ্ছন্দে দান করিয়াছে এবং প্র্যাকটিসের তাড়ায় পুনরায় আনাইয়া রাখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

বিমল তখনই ঔষধের জন্য কলিকাতায় একটা টেলিগ্রাম করিল বটে, কিন্তু ইহাও মনে মনে বুঝিল যে ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই শিশুটি মরিয়া যাইবে।

গরীবদের জন্যই হাসপাতাল, কিন্তু গরীবদের সেখানে স্থান কোথায়? হাসপাতালের ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট রোগীদের জন্য খরচ হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই ধনী। গরীবরা সেখানে দুই বেলা ভিড় করে এবং কাঙালী বিদায় করার মত তাহাদের রোজ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, আর কিছু হয় না।

বিমলের কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল।

ভৈরবের স্ত্রী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, ছেলে কি বাঁচবে না?

—শক্ত অসুখ করেছে, এখানে ত ঔষুধ পাওয়া গেল না, তার ক'রে দিচ্ছি যদি কলকাতা থেকে এসে পড়ে তবে দিয়ে দেব।

ভৈরবের স্ত্রীর সমস্ত অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তাহার ছেলের ওষুধের জন্য ডাক্তারবাবু নিজের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় তার করিতেছেন! মানুষ না দেবতা!

বিমল হাসপাতালে একা চুপচাপ বসিয়া ছিল।

সেই টিউমার-কেসটা জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছে, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। রীতিমত সেপটিক হইয়া গিয়াছে! বিমল ধীরে ধীরে তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—বড় কষ্ট, বড় শীত।

—এখুনি কম হয়ে যাবে, জানকী আর একটা কম্বল আন তো—

জানকী আর একটা কম্বল আনিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে চাবিটা লইয়া ঔষধের আলমারিটা খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢালিয়া নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিল। আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে ব্র্যাণ্ডি খাইতে হইতেছে। হাসপাতালের বোতলটা ত ফুরাইয়া আসিল। আর এক বোতল আনাইয়া রাখিতে হইবে।

গঙ্গার ধারে গিয়া বিমল বসিয়া ছিল। নিজের স্বরূপ দেখিতে পাইয়া আজ হঠাৎ কেমন যেন সে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবের ছেলের মুখটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া অসহায় পশুর মত মারা যাইবে! বিমল বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল, আর এক বার দেখিয়া আসা যাক। যদি দরকার হয় সে শ্বাসনালীতে ফুটা করিয়া তাহাকে আজ রাতটা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, কাল সকালে 'সিরাম' নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে। গিয়া দেখিল অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হইয়া আসিতেছে,

শ্বাসনালীতে ফুটা করিবার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই, নালী ঠিক আছে। তবু সে ভৈরবের স্ত্রীকে বলিয়া আসিল যে রাত্রে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়ে তাহাকে যেন খবর দেওয়া হয়। অন্ধকারে একা একা গলির ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কানে গেল—আমাদের বিমল ডাক্তার ভৈরবের ছেলেকে নিয়ে তাহ'লে একেবারে হামলে পড়েছে বল! হরেন বোসের কণ্ঠস্বর। গুপিবাবুর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

—হ্যাঁ, আজ নিজের পয়সা খরচ ক'রে কলকাতায় তার করলেন!

—ভাল, ভাল, মাগির কপাল ভাল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—অমন জুতোমোজা-পরা শিক্ষিতা বউ ঘরে থাকতে এত নীচু নজর কেন ভদ্দরলোকের! আমাদের দারোগাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা!

ইহার উত্তরে গুপিবাবু কি বলেন তাহা শুনিবার ধৈর্য্য আর বিমলের রহিল না। সে বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িল।

—গুপিবাবু, গুপিবাবু আছেন এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ত্রস্ত গুপিবাবু বাহির হইয়া আসিল।

—আপনি তিন ডোজ্ ষ্টিমুল্যাণ্ট মিকশ্চার নিয়ে ভৈরবের বাড়ী যান, এক ঘণ্টা অন্তর তার ছেলেটাকে দেবেন, পাল্‌স্ রেসপিরেশন প্রতি ঘণ্টায় গুনে আমাকে খবর দেবেন।

গুপিবাবু নীরবে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরেন বোস বলিলেন—এটা ডাক্তারবাবু আপনার জুলুম করা হচ্ছে গুপিবাবুর উপর। উনি হাসপাতালের চাকর, আপনার ত চাকর নন।

-আপনি চুপ করে থাকুন

তাহার পর গুপিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি যদি না যান, আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করব আমি, আপনি সেদিন আমার প্রেসক্রিপশনে কুইনিন দেন নি, সে শিশিটা আমার কাছে আছে এখনও, সেটা নিয়ে যদি রিপোর্ট করি চাকরি থাকবে না আপনার।

গুপিবাবু বলিলেন—আজ্ঞে আমি যাচ্ছি এখুনি।

হরেনবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া গুপিবাবু বাহির হইয়া গেলেন। গুপিবাবু চলিয়া গেলে বিমল হরেনবাবুকে বলিল—দেখুন আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা যদি ভবিষ্যতে আপনি করেন, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আপনার।

হরেন বোস প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিমল চলিয়া গেল।

রাত্রে বিমল নিজের বাসার বাহিরের ঘরটায় বসিয়া নন্দী-মহাশয়ের গুরুঠাকুরের রক্তটা পরীক্ষা করিতেছিল। অনেক খুঁজিয়াও ম্যালেরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তবু সে খুঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার কানে গেল, দরাজ গলায় কে যেন বলিতেছে একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি। মিহি গলায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—ও-কি, অতটা সরিয়ে সরিয়ে মাপলে চলবে কেন?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল প্রতাপবাবু ও রমেশবাবু।

প্রতাপবাবু একটি কাঠি দিয়া জমি মাপিতেছেন এবং রমেশবাবু লণ্ঠন ধরিয়া আছেন। প্রতাপবাবুর বাড়ী হইতে গঙ্গার ঘাট কত দূর ইহাই তর্কের বিষয় এবং হাতে কলমে তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিমলের এই বৃদ্ধ দুইটির প্রতি সহসা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা

হইল। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিজেদের লইয়া মশগুল আছেন।

একটু পরে আসিয়া গুপিবাবু খবর দিলেন ভৈরবের ছেলেটি মারা গিয়াছে।

৯

সেদিন একটি চিঠি পাইয়া বিমলের ভারি ভাল লাগিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে এই ছোটখাট ঘটনাগুলি ভারি একটা মাধুর্য্য সঞ্চার করে। চিঠিখানি লিখিয়াছেন শম্ভুকাকা! বিমলের রক্ত-সম্পর্কের খুল্লতাত নয়, সম্পর্কটা স্নেহের। শম্ভুকাকা জাতিতে গন্ধবণিক্। এই শম্ভুকাকাই বিমলের প্রথম শিক্ষক, ইঁহারই নিকট বিমল বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস, শম্ভুকাকা অর্থাভাব-প্রযুক্ত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি উদ্যমশীল লোক, গ্রামের কয়েকটি ছেলে পড়াইয়া, ছোটখাট একটি দোকান করিয়া, সুদে টাকা খাটাইয়া কিছু অর্থ তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই জোরে, নিজের অধ্যবসায়ের গুণে এবং বিমলের পিতার সাহায্যে তিনি জোগাড়যন্ত্র করিয়া কম্পাউণ্ডারিটা পাস করিয়া ফেলেন। কিছু দিন চাকরি করিয়াছিলেন, এখন চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিমলদেরই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতেছেন। বিমলের বাল্যকালে তিনি শম্ভু মাষ্টার নামে পরিচিত ছিলেন, এখন সকলে তাঁহাকে শম্ভু ডাক্তার বলিয়াই জানে। বিমল বাল্যকালে তাঁহাকে শম্ভুকাকা বলিয়া ডাকিত। শম্ভুকাকার সহিত বহুকাল দেখা নাই, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় একবারও শম্ভুকাকার কথা তাহার মনে

পড়ে নাই। সেই শম্ভুকাকাই এত দিন পরে সহসা চিঠি লিখিয়াছেন।

প্রিয় বিমল,

অনেক দিন তোমার কুশল-সংবাদাদি পাই নাই। আশা করি সপরিবারে ভাল আছ। তুমি স্বর্গীয় সুরেনদাদার একমাত্র বংশধর, কৃতবিদ্য হইয়াছ এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তুমি অনেক দিন গ্রামে আস নাই, তোমার পৈত্রিক বাড়িটি মেরামতের-অভাবে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। নিবারণদার মুখে শুনিলাম তুমি জমির বাকী খাজনা এবং সুরেনদার ঋণগুলি শোধ করিয়াছ। শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার পৈত্রিক বাড়ীটি নিজব্যয়ে সারাইয়া তাহাতে আমি আমার ডিস্‌পেনসারি করি। বাড়ীটা গ্রামের মধ্যস্থলে, আমার সুবিধা হইবে। তুমি যে কখনো আসিয়া উহা সারাইয়া বসবাস করিবে তাহার আশা দেখি না। যদি অবশ্য কখনও তুমি আইস, আমি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিব, একথা বলাই বাহুল্য। আমার হাতে একটি পুরাতন হাঁপানি রোগী আছে, কিছুতেই সারিতেছে না। তুমি যদি একবার এ অঞ্চলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও, বড়ই ভাল হয়। লোকটির অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিছু কৃপণও বটে, পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে পারিবে না। তাহাকে তোমার কথা বলিয়াছি, রাজি হইয়াছে। যদি আসিতে চাও, কবে আসিবে জানাইবে। আমি ষ্টেশনে হাজির থাকিব। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। গ্রামের অনেকেই তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। যদি একবার এক দিনের জন্য আসিতে পার বড়ই আনন্দিত হই। আসিলে সাক্ষাতে সমস্ত

কথাবার্ত্তা হইবে। নতান্তই যদি না আসিতে পার ঐ বাড়ীটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তাহা পত্রযোগে জানাইবে। ভগবানের চরণে সততই তোমার কুশল কামনা করি। ইতি— তোমার শম্ভুকাকা।

বহুকাল পূর্ব্বে দেখা শম্ভুকাকার মুখখানি বিমলের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। এখনও কি তাঁহার তেমনি গোঁফদাড়ি আছে? মনে পড়িল বাল্যকালে ঐ গোঁফদাড়িসমন্বিত ব্যক্তিটি মনে বড়ই ত্রাস সঞ্চার করিত। বিমল তখনই শম্ভুকাকার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। লিখিয়া দিল যে তিনি স্বচ্ছন্দে বাড়ীটি সারাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। তাহার এখন যাইবার সুবিধা নাই। সুবিধা পাইলেই সে গিয়া হাঁপানি রোগীটিকে দেখিয়া আসিবে। যাইবার পূর্ব্বে জানাইবেন।

—কাকে চিঠি লিখছ?

পিছনে মণিমালা আসিয়া দাঁড়াইল।

—শম্ভুকাকাকে।

কে তিনি?

—তুমি চেন না, আমাদের গ্রামের লোক। আমাদের বাড়ীটাকে নিজের খরচে সারিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারি করিতে চান। লিখে দিলাম তাই করিতে, কি বল?

—যা তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব?

—বাঃ তুমি হ'লে সহধর্ম্মিণী, তুমি বলবে না ত কে বলবে!

—আহা!

বিমল চিঠির ঠিকানাটা লিখিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এই ত এলে, আবার যাচ্ছ কোথায়?

—নন্দী-মশায়ের ওখানে যেতে হবে, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আসছে, হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

—তুমি তাহ'লে একটু খেয়ে যাও।

—কি ?

চোখমুখ রহস্যময় করিয়া ভুরু নাচাইয়া মণিমালা বলিল—একটা জিনিস করেছি আজ।

—কি ?

—পেয়ারার জেলি।

—ফের তুমি উনুন-গোড়ায় গেছ।

—আহা চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না কি! আর না তোমার ঠাকুর!

মণিমালা বাহির হইয়া গেল এবং একটা প্লেটে করিয়া খানিকটা পেয়ারার জেলি আনিয়া বলিল—দেখ কেমন সুন্দর রং হয়েছে।

—চমৎকার হয়েছে, বাঃ খেতে ও সুন্দর।

জেলিটুকু খাইতে খাইতে বিমল পুনরায় বলিল—তুমি কিন্তু আর উনুন-গোড়ায় যেও না, ফের কি কাণ্ড ক'রে বসবে!

—ভাল লাগে না চুপ ক'রে ব'সে ব'সে।

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—একটা গ্রামোফোন কিনে দাও তাহলে বসে বসে বাজাই।

বিমল হাসিয়া বলিল—পাড়ার লোকে বিরক্ত হবে তা'হলে।

মণি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ভারি বয়ে গেছে!

বিমল আর বেশীক্ষণ বসিল না, নন্দী-মহাশয়ের ওখানে এখনই যাওয়া দরকার। গুরুঠাকুরের জ্বরটা ছাড়ে নাই।

নন্দী-মহাশয় একাই বসিয়া ছিলেন। বিমলকে দেখিয়া বলিল—কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি, ফাঁক আর পাচ্ছি না।

—কি বলুন ত ?

—ঘোষেদের ঐ যে হতভাগী মেয়েটা পুড়ে মোলো তা নিয়ে আবার কিছু গোলমাল হবে না ত মশাই, শুনেছেন ত সব ঘটনা—

শুনেছি। গোলমাল আর কি হবে, সে ত যা হবার চুকে বুকে গেছে।

—কিছু বলা যায় না ত, শত্রুর ত অভাব নেই!

তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চক্ষু দুইটি পাকাইয়া নন্দী-মহাশয় বলিলেন—একমাত্র পুত্র না হ'লে গুলি ক'রে মেরে ফেলতাম আমি ওকে। নচ্ছার কুলাঙ্গার কোথাকার!

বিমল বুঝিল রমেনের কথাটা নন্দী-মহাশয়ের কানে গিয়াছে পুত্রের উপর খুবই চটিয়াছেন তিনি। কিন্তু ক্ষণপরেই বিমলের সে ধারণা অপনোদিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমেন প্রবেশ করিল এবং নন্দী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বাবা রমেন, গুরুদেবের জন্যে কলকাতা থেকে ফলটা এল কি না ইষ্টিশানে একবার খোঁজ কর ত বাবা! গাড়ীটা নিয়েই না হয় যাও!

অতি মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কিছুমাত্র উত্তাপ নাই।

রমেন চলিয়া গেলে নন্দী-মহাশয় বলিলেন—আমাদের ঘোষালবাবু খাসা লোক ছিলেন, জিনিষপত্র এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এ লোকটা জুটেছে অতি ব্যাদড়া! ঘোষালবাবু সম্প্রতি বদলি হইয়া গিয়াছেন

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, নন্দী-মহাশয় আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া বলিলেন—ওরে হাওয়া কর।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—গুরুদেব কেমন আছেন?

—এ বেলা জ্বরটা যেন কিছু কম। তবে শ্লেষ্মা এখনও বেশ রয়েছে! কলকাতা থেকে ত উনি আসছেনই আজ রাত্রে, তার কি সব ব্যবস্থা

করতে হবে আপনারা তিন জনে ব'সে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলুন। কেসের হিষ্টিটা ভূধরবাবু টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ভূধরবাবু ইদিকে বেশ হয়ে আছেন! ডাকতে পাঠিয়েছি সব, এলেন বলে।

ভূধরবাবু ও জগদীশবাবুর প্রত্যাশায় বিমল বসিয়া রহিল।

## ১০

চালতাপুর নামক একটি দূর গ্রামে বিমল রোগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামটি বেশ দূর আছে। নদী পার হইয়া কিছু দূর মোটরে গিয়া তাহার পর হস্তিপৃষ্ঠে যাইতে হইয়াছিল। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নয়। দুই তিন জন পাস-করা ডাক্তারই আছেন। রোগীর টাইফয়েড হইয়াছে, বিশেষ কিছু করিবার নাই, যাহা কর্ত্তব্য তাহা ওখানকার ডাক্তাররাই করিতেছিলেন। কিছু করিবার থাকিলেও এত দূর হইতে গিয়া আধ ঘণ্টা বড়জোর ঘণ্টাখানেক রোগীর নিকট বসিয়া তাহা করা যায় না। কিন্তু যেহেতু শ্রীমান্ ভুলুর উক্ত গ্রামে মামার বাড়ী এবং যেহেতু উক্ত রোগীর বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ ভুলুর মামাদের বাধ্য সেই হেতু বিমলকে যাইতে হইয়াছিল। বেশ মোটা টাকাই পাওয়া গিয়াছে। বিমল চালতাপুর হইতে মোটরযোগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিতেছিল, মথুরবাবুর বাড়ীতে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। কলিকাতা হইতে আগত বিখ্যাত চিকিৎসকটি আসিবার ঘণ্টা দুই পরেই নন্দী মহাশয়ের গুরু-ঠাকুরের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার ডাক্তারের একদাগ মাত্র ওষুধ পেটে পড়িয়াছিল। রোগী সারাইতে হইলে ভাগ্য থাকা চাই। মথুরবাবুও কলিকাতার ডাক্তারবাবুকে আজ বৈকালে 'কল' দিয়াছেন,

তাঁর কন্যা শেফালির মাঝে মাঝে হাঁপানির মত হইতেছে, তাহাকে দেখাইবেন। পাঁচটার সময় তাঁহার আসিবার কথা, বিমলকে তাহার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। বিমল হাত-ঘড়িটা এক বার দেখিল, পৌনে চারটে। পাঁচটার মধ্যে ঠিক পৌঁছিতে পারিবে, দশ মাইল যাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে।

মোটরে বসিয়া বিমল চালতাপুরের ডাক্তার গাঙ্গুলীমহাশয়ের কথা ভাবিতে লাগিল গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কায়দাকরণ একেবারে অন্য প্রকার। অন্য ডাক্তার রোগী আসিলে খুশী হয়, গাঙ্গুলী-মহাশয় চটিয়া যান। সহজে দেখাই করিতে চান না, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া যান। দেখিতেও প্রিয়দর্শন নহেন, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, রোগা চেহারা।

কেহ অসুখের কথা বলিলে বলেন—তোমার অসুখ হয়েছে তাতে আমার কি!

—একটু ওষুধ।

—ওষুধ-ফসুদ আমার কাছে নেই, বিরক্ত ক'রো না।

লোকে তবু ছাড়ে না, ঐ কটুভাষ কুদর্শন লোকটির দ্বারে ধরণা দেয়। কাতারে কাতারে রোগী বসিয়া আছে, বিমল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাই বলিয়া গাঙ্গুলি-মহাশয় যে একেবারেই চিকিৎসা করেন না তাহা নয়। অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক পীড়াপীড়ির ফলে কটুকাটব্য করিতে করিতে দুই-চারিটি রোগী তিনি বেশ মোটা দক্ষিণা লইয়া তবে চিকিৎসা করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি স্পর্শই করেন না। লোকের তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস, বাড়ীর সামনে সর্ব্বদা ভিড়।

মথুরবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া বিমল দেখিল কেহ তখনও আসে নাই।

মথুরবাবু একা বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন। বিমল জিজ্ঞাসা করিল —অমর কই?

—দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধান ক'রে তিনি কলিকাতা গেছেন। এবার কোন খেলোয়াড়ের ফর্ম কি রকম, রেফারি চরিত্রবান্ লোক কি না, যে দল জিতবে তার জেতবার ন্যায্য দাবী আছে কি না—এই সব নানা মূল্যবান্ খবর সংগ্রহ করতে সময় লাগবে ত কিছু দিন! ফিরতে দেরি আছে।

বিমল হাসিয়া একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে বিমলের দিকে চাহিয়া মথুরবাবু বলিলেন— বড়লোকের ছেলে, করবেই না বা কেন! এদেশে বড়লোকের ছেলেরা আগে বেড়ালের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই, এই জিনিষ নিয়ে থাকত, ওই সবেই হাজার হাজার টাকা খরচ করত। আজকাল রুচিটা বদলেছে!

বিমল বলিল—শেফালির হাঁপানিটা কি বেড়েছে না কি আজকাল?

—বাড়া-কমা ত কিছু বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন হয় খুবই কষ্ট পায়। দেখি তোমাদের বড় ডাক্তার কি বলেন।

বিমল একটু হাসিল।

মথুরবাবু বলিলেন—হ্যাঁ আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তোমার নামে একটা দরখাস্ত গেছে কাল সিভিল-সার্জ্জনের কাছে; আমিও তাতে সই করেছি। হরেন বোস এনেছিল দরখাস্তটা।

—কি লেখা ছিল তাতে?

—সত্যি কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল যে তুমি আজকাল ক্রমাগত প্র্যাকটিস ক'রে বেড়াচ্ছ, হাসপাতাল মোটেই দেখছো না। গুপিই এখন হাসপাতালের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! গুপি

হাসপাতালে বসেই রীতিমত পয়সা নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন এপারেই একটি গরীব লোক বলছিল যে পয়সা না দিলে ঘায়ে লাগিয়ে দেয়। তুমিত অপারেশন ক'রে খালাস, ড্রেস করে ত ওই!

—দু-জনে মিলে করে, গুপিবাবু আর দুলু।

—গুপিবাবুকে পয়সা না দিলে গুপিবাবু ঘায়ে খোঁচা দিয়ে ঘা আরও বাড়িয়ে দেন শুনেছি।

বিমল বলিল—বাজে কথা।

—না, না, একটুও বাজে কথা নয়। জগদীশবাবু নিজে আমাকে একথা বলেছেন! মোট কথা, আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে কি না! পঁচাত্তর টাকাতে একটা ভাল লোক থাকবে কি ক'রে। এই যে আমরা আমাদের আমলাদের কারো মাইনে পাঁচ টাকা, কারো দশ টাকা ক'রে দিই, তার মানে আমরা তাদের চুরি করতে বলি। আমি এবার আমলাদের মাইনে সব বাড়িয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সকলের তাতে আপত্তি, এমন কি তোমার বন্ধু অমরের পর্য্যন্ত। বলে, যা চলেছে চলুক! বেশ চলুক, আমি আর ক'দিন আছি। দিন-পনর পরেই সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে।

—কোথায় যাবেন?

—মথুরা

—মথুরা! হঠাৎ মথুরা কেন?

—আর এ-দেশ ভাল লাগে না। কাঁহাতক সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে 'বাথরুমে' ব'সে থাকি, বল! কারো সঙ্গে মতে মেলে না। এ-দেশে চিন্তায় আর কার্যে এত আকাশ-পাতাল তফাৎ যে কোন কিছুই হবার উপায় নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সমান! বরং শিক্ষিতগুলো বেশী পাজি। সবাই জানে পণপ্রথা খারাপ তবু সবাই

পণ দিচ্ছে নিচ্ছে, সবাই জানে ঘুষ দেওয়া খারাপ, সবাই ঘুষ দিচ্ছে নিচ্ছে! কোন্ উচিত কার্য্যটা আমরা করি! একটাও না! এই যে তুমি একটা শিক্ষিত ডাক্তার পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে জুটে গেলে, তুমি কি জানতে না যে পঁচাত্তর টাকায় তোমার চলা অসম্ভব, তোমাকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে হবে এবং তা করলেই হাসপাতালের ক্ষতি হবে!

—কি করি বলুন, কিছু ত একটা করতে হবে।

—আরে এ-কথা ত একটা অশিক্ষিত কুলিও বলে! তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, বড় আদর্শের জন্যে তোমরাই ত লড়বে, তোমরা যদি 'কিছু ত একটা করতে হ'বে' ব'লে অন্ত্যজের দলে ভিড়ে যাও তাহ'লে চলে কি করে!

বিমল বলিল—কটা লোক বড় আদর্শ অনুসারে চলতে পারে বলুন।

মথুরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দাও, কোন আদর্শটা মানি আমরা? জানালা খুলে শোওয়া খুব একটা বড় আদর্শ? যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা খুব একটা বড় আদর্শ? আসল কথা কি জান, আমাদের আদর্শ-ফাদর্শের বালাই নেই, আদর্শ সুবিধাবাদী, যখন যা সুবিধা তাই করি। ছেলেরা লেখাপড়া শেখে মানে কতকগুলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষার সময় সেগুলো উগ্‌রে দিয়ে আসে একটা ডিগ্রীর লোভে। চাকরী যদি পায় ভালই, যদি না পায় রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায়! শিক্ষিত হ'লে এ দুর্দ্দশা হত না।

বিমল বলিল—তাহলে এ-দেশে উপায় কি?

—উপায় বাথরুমে লুকিয়ে ব'সে থাকা, আর তা অসহ্য হয়ে উঠলে মথুরায় পালান।

বিমল চুপ করিয়া রহিল

মথুরবাবু বলিলেন—মথুরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, মথুরাতেই দেহত্যাগ করব। আর ফিরছি না এ-দেশে!

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মথুরবাবু আবার বলিলেন—তোমার নামে কিন্তু খুব সঙীন দরখাস্ত গেছে কাল! তোমার সে পেটোয়া সিভিল-সার্জনও বদলি হয়ে গেছে, এসেছে সায়েব, সুতরাং সাবধান!

বিমল হাসিয়া বলিল—যা হবার হবে, আমারও আর ভাল লাগছে না চাকরি!

মথুরবাবু হাসিয়া বলিলেন—চাকরী ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একবার যে ও-স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে ছাড়া কঠিন, অনেকটা আপিঙের নেশার মত। চাকরিতে অনেক কষ্ট, কিন্তু মাসের শেষে মাইনের করকরে টাকাগুলো হাতে এলে সব কষ্টের অবসান হয়ে যায়। জননীর সন্তান-দর্শনের মত; ছেলের মুখটি দেখলেই দশ মাসের এত দুঃখকষ্ট আর কিছু মনে থাকে না।

মথুরবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। মথুরবাবু বলিলেন—ঐ বোধ হয় কলকাতার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে জগদীশবাবু এলেন! চল, অভ্যর্থনা করা যাক।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার ডাক্তারবাবু বলিলেন—আমি একটা ইনজেকশন লিখে দিচ্ছি, ওটা আনিয়ে ওকে অন্ততঃ দুটো কোস দেবেন, অর্থাৎ সবসুদ্ধ চব্বিশটা।

একটা কাগজে তিনি ইনজেকশনের নামটা লিখিয়া মথুরবাবুর হাতে দিলেন।

মথুরবাবু জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা আর আমি

নিয়ে কি করব, আপনি ওষুধটা পাঠিয়ে দেবেন, কিংবা আপনি একেবারে এনে ইনজেকশন সুরুই ক'রে দিন কাল থেকে !

—কাল ত আমার অবসর নেই বোধ হয়, বিমলবাবুই না হয় এসে দিয়ে যাবেন !

—না, বিমলকে আমি ডাকি না, কারণ ও ফি নিতে চায় না।

—বেশ আপনি ইন্‌জেকশনটা পাঠিয়ে দিন, আমি না হয় ভূধরকে ডাকতে পাঠাব।

জগদীশবাবু এতক্ষণ ইনজেকশনটা কি তাহা পড়িয়া দেখেন নাই। পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই ইনজেকশন তো আমার কাছে নেই।

কলিকাতার ডাক্তারবাবু তখন বলিলেন—এ কলকাতায় হয়ত পেতে পারেন, হয়ত বলছি এই জন্যে যে সেদিন এক জন পায় নি। বম্বেতে অবশ্য পাবেন ঠিক !

মথুরবাবু বললেন—এ ইনজেকশন কি খুব বেশী ব্যবহার করেন নি আপনি ? এত দুষ্প্রাপ্য যখন—

এরূপ প্রশ্নের জন্য ডাক্তারবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—মানে খুব নতুন বেরিয়েছে এটা, জার্ম্মেনীতে অবশ্য অনেকে—

মথুরবাবু বলিলেন—আপনি নিজে বেশী ব্যবহার করেন নি ?

—নিজে অবশ্য বেশী করি নি, তবে জিনিসটা ভাল !

মথুরবাবু জগদীশবাবুর হাত হইতে প্রেসক্রিপশনখানি লইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়া দিলেন। এক-আধ টাকা নয়, অনেকগুলি টাকা।

ডাক্তারবাবু তাঁহার ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—ছ-টা বাহান্নতে ট্রেন বললেন বুঝি নন্দীমশায় ?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে ত এবার উঠতে হয়। আচ্ছা চলি তবে, নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। আপনার মেয়ে কেমন থাকেন জানাবেন আমাকে।

মথুরবাবু ডাক্তারবাবুকে গাড়ীতে চড়াইয়া প্রায় তাঁহার সামনেই একটু ঘুরিয়া প্রেসক্রুপশনখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন! ডাক্তারবাবু দেখিতে পাইলেন কি না ভগবান জানেন। তিনি আবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার!

মথুরবাবু স্মিতমুখে হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

বিমল বলিল—এ কি করলেন ?

মথুরবাবু বলিলেন—আমার মেয়ের শরীর এক্সপেরিমেণ্ট করবার জায়গা নয়।

জগদীশবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে তাঁহার জিহ্বা সকৌতুকে উঁকি দিতে লাগিল।

## ১১

সুব্রতবাবুর অনুরোধ এড়ানো গেল না। ছুটি লইয়া কলিকাতা যাইতে হইল। সুপ্রিয়া সঙ্গে গেলেন, মণিমালাও ছাড়িল না। বিমল ব্যবস্থা করিয়াছিল যে দুই দিন সে থাকিবে না পরেশ-দা'র স্ত্রী রাত্রে আসিয়া শুইবেন, বাহিরের ঘরটায় দুলুও আসিয়া শুইবে। এতৎসত্ত্বেও মণি বলিল, সে একা থাকিতে পারিবে না। তা ছাড়া বাবা-মাকে সে কত দিন দেখে নাই, মন কেমন করে না বুঝি! এখানে ঘরে একা একা

বসিয়া বসিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে. . . . . . . . .

বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় মোটরে, নৌকায়, পাল্‌কিতে, হাতীতে! তাহার যে কি করিয়া দিন কাটে তাহা সে-ই জানে। এখানকার লাইব্রেরির সমস্ত বই তাহার পড়া, দুই-চারিখানা অপঠিত ছিল তাহাও সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। এমন হতভাগা লাইব্রেরি যে কিছুতেই নূতন বই আনাইবে না। না, সে কোন কথা শুনিবে না, সে যাইবে। ঠোঁট ফুলাইয়া যখন সে এই কথাগুলি বলিল তখন তাহা অগ্রাহ্য করা বিমলের পক্ষে শক্ত হইল। সুতরাং বাক্স-প্যাটরা গুছাইয়া মণিও সঙ্গ লইল। তোরঙ্গ এবং গহনার বাক্স এখানে রাখিয়া যাইবে কাহার ভরসায়! যা চোরের উপদ্রব। তাহার জিনিসপত্র সবই সে সঙ্গে লইল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সে মণিকে লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুব্রতবাবু এবং সুপ্রিয়া হোটেলে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া মণির বাবা মা খুবই সুখী হইলেন। হঠাৎ আগমনের কারণ শুনিয়া মণির বাবা বলিলেন—বেশ, আমি খুব চেষ্টা করব। ভদ্রলোক ফার্স্ট ক্লাস যদি হন, হয়ে যাবে বোধ হয়। তোমার সঙ্গে ত চেনা আছে আমাদের কমিটির দু-চার জনের। তাঁদেরও গিয়ে ধর। এ-সব ছাড়া আর একটা সুপারিশ যদি জোগাড় করতে পার তা হ'লে ত নির্ঘাত হয়ে যায়।

তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিলেন।

বিমল বলিল—আমার সঙ্গে ঠিক চেনা নেই, তবে ওঁর ছেলের সঙ্গে পড়তাম। আচ্ছা দেখি চেষ্টা ক'রে—

বিমল চা জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সুব্রতবাবুর কপাল ভাল, বেশী বেগ পাইতে হইল না! সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিও ভাগ্যক্রমে বাড়ীতে ছিলেন এবং তিনি পুত্রের

অনুরোধে একটা সুপারিশ-পত্রও দিয়া দিলেন। যোগাযোগ যখন ঘটে তখন এমনই ভাবেই ঘটিয়া যায়। সাধে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করে।

কলিকাতায় গেলে সিনেমা-দেখা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ী, আলোয় আলোয় চতুর্দ্দিক যেন দিনের মত হইয়া রহিয়াছে! প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল যে অপূর্ব্ব শিল্পকলা চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিবেন তাহার তুলনায় প্রবেশ-মূল্য কিছুই নয়। এমন একটা প্রাসাদের সুশীতল আবেষ্টনীতে অমন সুন্দর আরাম-জনক একখানা আসনে দুই ঘণ্টা নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পাওয়ারই কি মূল্য কম! বিমল, মণিমালা, সুব্রত ও সুপ্রিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক একটু আগে গিয়া উপস্থিত হইল। বসিতে-না-বসিতে আলো নিবিয়া গেল, সাদা পরদা বিচিত্র হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর, রুদ্ধশ্বাসে সকলেই দেখিতেছে। একটি আসন খালি নাই, সমস্ত পরিপূর্ণ। সব বয়সের, সব অবস্থারই লোক রহিয়াছে। থাকিবে না কেন, না-থাকাটাই অস্বাভাবিক। বাহা স্বপ্ন তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ছায়া-লোকে মূর্ত্ত দেখিতে সকলে চায়। অপূর্ণ সাধ, অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ কামনার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ মন অল্প ক্ষণের জন্যও এই মায়ালোকে বসিয়া সেই ছবি দেখে যাহা সে জীবনে পায় নাই, পাইবে না। ছবিতে দেখিয়াও তবু খানিকটা তৃপ্তি আছে। ছবি দেখিয়াই সে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে চায়। খানিক্ষণের জন্য নিজকে ভুলিয়া থাকাটাই কি কম লাভ! চতুর্দ্দিকের নানা প্রলোভনে সকলেই অহরহ পীড়িত, চেতন ও অবচেতন মনের নানা অসম্ভব তাগিদে সকলেরই অন্তর পরিশ্রান্ত, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর কদর্য্যতায় সকলেরই সমস্ত সত্তা যেন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে বাহিরে শান্তি কোথাও নাই, শান্তির

আশা নাই, শান্তি অর্জ্জন করিবার মত মানসিক সম্পদও নাই। দুর্ব্বল বিলাস-লোলুপ আর্ত্ত নরনারীর দল তাহাদের ব্যর্থ জীবনযাত্রার ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা দ্বন্দ্বের উপর খানিকক্ষণের জন্য ঐ সুরঞ্জিত পরদাখানা টাঙাইয়া ধরে, উহারই আড়ালে আত্মগোপন করিয়া খানিক ক্ষণের জন্যও নিজকে ভুলাইয়া রাখে। বিমলের দুখীরামকে মনে পড়িল, সে বেচারা তাড়ি খায়! উদ্দেশ্য একই, আত্মবিস্মৃতি। তাড়ি খাইয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়াটা বর্ত্তমান সভ্য-জগতে অচল, তাই দুখীরাম ঘৃণ্য। সভ্য-জগতে সিনেমার এখনও জাত মারা যায় না, তাই ফরসা কাপড়-জামা-পরা শিক্ষিত দুখীরামের দল এখানে আসিয়া রোজ ভিড় করে। আর্ট? কয় জন লোক আর্ট বোঝে? রসোত্তীর্ণ ভাল ছবিতে কই এত ভিড় হয় না ত? মদও ত পরিমিত মাত্রায় পান করিলে উপকার হয়! কিন্তু শরীরের উপকারের জন্যই কি দুখীরাম তাড়ি খায়? ও-সব কিছু নয়, আসল কথা নেশা। এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রলোভন-ময় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় নেশা না হইলে কাহারও চলে না। মানুষ কোন রকমে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, না হইলে অন্তরের হাহাকার শুনিতে শুনিতে সে পাগল হইয়া যাইবে। এই অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে যাহারা ঐ সকল ছায়া-ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহারা সকলেই অর্দ্ধ-উন্মাদ, যাহাতে একেবারে উন্মাদ না-হইয়া যায় তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বিমলের সহসা সেই ভিখারীটার কথা মনে পড়িল, তাহার মৃত দেহটার ছবি মুহূর্ত্তের জন্য মানসপটে ফুটিয়া উঠিল,—রক্তের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে কি কখনও সিনেমা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল? ঐ যে মোহিনী নায়িকাটি ক্ষণে ক্ষণে নানা ছুতায় নিজের দেহের মাধুরী অনাবৃত করিতেছে, তাহার খবর পাইবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল কি? হয়ত হয় নাই, সুদূর মফস্বলে ভিক্ষা করিয়া এবং

রোগে ভুগিয়াই তাহার জীবনটা কাটিয়াছে! কলিকাতা শহরে থাকিলে হয়ত সে সুযোগ পাইলেও পাইতে পারিত। মাত্র কয় গণ্ডা পয়সা ত! হয়ত এই দলের মধ্যে ভিখারীও অনেক আছে···কে জানে!

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহার করিবার সময় শাশুড়ীঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া বসিলেন। একথা-সেকথার পর বলিলেন—আমি মনে করছি বাবা, মণিকে না হয় রেখেই দিই এ ক-মাস! ছেলে-টেলে হ'লে একেবারে যাবে, কি বল?

বিমল বলিল—তার ত এখন অনেক দেরি।

—ছ-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটা প্রথম বার কিনা তাই ভয়, এখানে কল্‌কাতা শহরে সব রকম সুবিধা আছে। তোমাদের মফস্বল জায়গা, তুমি হয়ত বাড়ীতে থাকবে না—তার চেয়ে ও থাকুক এ ক-মাস!

বিমল কিছু না বলিয়া আহার করিতে লাগিল।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন—ওর যে পা পুড়ে গেছল সে কথা ত আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাও নি কিছু তোমরা! ভাগ্যিস বেশী কিছু হয় নি। ঠাকুর না হ'লে কি চলে বাবা, ও কি পারে রাঁধতে, রান্নার জানেই বা কি।

একটা অপ্রিয় কথা বিমলের তুণ্ডাগ্রে আসিয়া থামিয়া গেল। সে নীরবেই আহার সমাধা করিল। শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তাহলে মণি থাক, কি বল?

—দেখি, মণিকে জিগ্যেস করি!

—ও ত থাকতে পেলে আর কিছু চায় না। তোমাদের ঐ মফস্বল জায়গায় না আছে সিনেমা, না আছে রেডিও, মেয়ে ত একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছেন।

বিমল কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।

সেদিন রাত্রে মণিমালাও বিমলকে ওই কথাই বলিল।

—মায়ের কাছে থাকি, কেমন ?

—বেশ।

—না, তুমি ভাল মুখে বল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল বলিল—বেশ ত থাক না।

—রাগ করছ তুমি !

—রাগ করব কেন, থাক।

—মন কেমন করলে চলে যাব, কেমন ?

—বেশ।

পরদিন বিমল একাই ফিরিয়া আসিল। মণি, সুব্রত, সুপ্রিয়া কেহ আসিল না।

১২

দেখিতে দেখিতে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল।

ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন যেমন ভাবে চলে তেমনি ভাবে চলিতে লাগিল। রোগী আসে যায়, বাঁচে, মরে। মাঝে মাঝে এক-আধটা রোগী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কেহ হয় ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়া যায়, কেহ অপ্রত্যাশিত ভাবে মরে, অপ্রত্যাশিত উপায়ে মাঝে মাঝে দুই-একটা রোগ-নির্ণয়ও হইয়া যায়। যাহাকে কালাজ্বর বলিয়া মনে হইতেছিল হঠাৎ দেখা যায় তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, যে অসহ্য মাথা ধরার যন্ত্রণায় চশমার পর চশমা বদলাইয়া, খাদ্য সংযম করিয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না, হঠাৎ রক্ত পরীক্ষা করিয়া জানা যায় পিতার পাপের শাস্তি সে ভোগ করিতেছে। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের

গোলমাল লইয়া বিকটাকার কোন রোগী হয়ত হাজির হয়, তাহাকে লইয়া খানিক ক্ষণ বেশ কাটে। এই ভাবেই চলিতেছিল। হরেন বোসের দল দরখাস্ত করিয়া বিমলের কিছু করিতে পারে নাই, কারণ সাহেব সিভিলসার্জন বিমলের নিকট সমস্ত সত্য কথা শুনিয়া কাগজে কলমে কিছু করিলেন না, মুখে বিমলকে আর একটু ট্যাক্‌ট্‌ফুল অর্থাৎ কৌশলী হইতে উপদেশ দিলেন, বলিলেন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করিলে চলে না তাহা ঠিক, কিন্তু সব দিক বাঁচাইয়া তাহা করিতে হইবে। ইউ মাস্‌ট্‌ বি ট্যাক্‌ট্‌ফুল !

মথুরবাবু সত্য সত্যই সস্ত্রীক মথুরা চলিয়া গিয়াছেন। নন্দী-মশায় নিরঙ্কুশভাবে চেয়ারম্যানগিরি করিতেছেন। তাহার ইলেকৃট্রিক স্কীম সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মথুরবাবু মিটিঙে ছিলেন না, সুতরাং একটি লোকও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বদ্দিবাবু সম্প্রতি একটি মন্দির-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন। কোথায় একটা পাহাড়ের উপর না কি একটা মন্দির আছে, জৈনেরা সেটাকে নিজেদের মন্দির বলিয়া দাবী করিতেছে এবং হিন্দুদের সেখানে ঢুকিতে দিতেছে না। বদ্দিবাবু হিন্দুদের পক্ষ লইয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল তিনি এখানে নাই, বম্বেতে এই উপলক্ষেই গিয়াছেন! তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই। ইনসিউলিন লইয়া হীরালালবাবু অনেকটা সুস্থ আছেন, মতিলালবাবুর ইন্‌জেকশন এখনও চলিতেছে। সুব্রতবাবুর চাকুরি হইয়াছে এবং তিনি সুপ্রিয়াকে লইয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন! সৌরীনবাবু ঠিক তেমনিই আছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজের এলাকার সমস্ত গরুর পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বলিতেছেন এটা ব্যাপকভাবে করিতে পারিলে গোধূলিটা সত্যই মনোরম হইয়া উঠিবে! বর্ত্তমানে গোধূলিতে ধূলি ছাড়া আর কিছু নাই।

পরেশ-দা বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনি মুসলমান, বিমলের সহিত এখনও তেমন আলাপ হয় নাই। বিনোদিনীকে লইয়া অমর প্রকাশ্য দিবালোকেই এক দিন তাহার বাসায় আসিয়াছিল। অমর বিনোদিনীকে এখনও তাহার পাপের কথা বলিতে পারে নাই। এ-অঞ্চলে যাহাতে 'নাইট স্কুল' হয় তাহারই চেষ্টায় সে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীর সহিত বিমলও প্রকাশ্যভাবে নানা স্থানে আজকাল ঘুরিতেছে। মথুরবাবু নাই, সুতরাং পরদা ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হরেন বোস গুপিবাবুর দলে কানাঘুসাও চলিতেছে। প্রতাপবাবু ডাক্তার এবং রমেশবাবু মোক্তার ভাঙা চৌকিতে বসিয়া এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই তর্ক করিয়া চলিয়াছেন। সেদিনই হাসপাতালে যাইতে যাইতে বিমল শুনিতে পাইল রমেশবাবু বলিতেছেন যে আজকাল যে এত অনাবৃষ্টি তাহার কারণ পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপবাবুর মত ভিন্ন প্রকার, তাঁহার মতে ইংরেজ রাজত্বই ইহার কারণ! উভয়ের তর্ক চলিতে লাগিল, বিমল সবটা শুনিতে পাইল না।

মণিমালা ভাল আছে, প্রায়ই চিঠি লেখে। প্রায়ই চিঠি লেখে বটে, চিঠিতে বিমলের জন্য উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করে, কিন্তু কেমন যেন মন ভরে না। বিমলের মনে হয় সে রেডিও, সিনেমা, ভাই-বোন, মা-বাবা, শাড়ী-ব্লাউজ এই সকল লইয়াই বেশী মাতিয়া আছে, লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্যই মাঝে মাঝে তাহাকে চিঠি লেখে। চিঠিতে নানা রকম কথা থাকে, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাবও থাকে, ঠিক যে সেটা কি তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। তাহার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মণিমালা বোধ হয় তাহাকে পছন্দ করে নাই, তাহার স্বামীর আদর্শের অনুরূপ হয়ত সে নয়। সে ত প্রায়ই গল্প করিত তাহার কোন

বান্ধবী আই. সি. এস. কে বিবাহ করিয়াছে, কাহার খুব বড় জমিদারের ঘরে বিবাহ হইয়াছে,' একজনের স্বামী নাকি ব্যারিস্টার, তাহাদের না কি তিন খানা মোটর, আর এক জনের নাকি কোন এক দালালের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে সে না কি 'অসম্ভব' বড়লোক। ইহাদের কাহারও সহিত বিমল পাল্লা দিতে পারে না, মানুষ হিসাবে সে হয়ত ইহাদের সমকক্ষ, কিন্তু মানুষটাকে মণিমালা চিনিয়াছে কি? বিমল ঠিক বুঝিতে পারে না। হয়ত এ-সব কিছুই নয়, সমস্তই তাহার কল্পনাপ্রবণ মনের সৃষ্টি, হয়ত মণিমালা সত্যই তাহাকে ভালবাসে!

আর একটা বিষয়েও বিমলের মনে অশান্তি ছিল। তাহার বিবেকের সহিত তাহার আচরণের কিছুতেই মিল হইতেছিল না। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খরস্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, ইচ্ছা করিলেও সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, হাসপাতালের দীন দরিদ্র রোগীর দল গুপিবাবুর কবলেই পড়িতেছিল, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও বিমলের কিছু করিবার উপায় ছিল না। ডাক আসিলে যাইতেই হয়, অর্থের জন্য না হইলেও খাতিরে পড়িয়া যাইতে হয়। কাহাকে ফিরাইবে সে! দুই-চারি বার কনসালটেশনে আসিয়া সাহেব সিভিল-সার্জনের উগ্রতাও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হরেন বোস তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আর কিছু করিতে পারিবে না। হরেন বোস ইদানীং আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহেও না, বরং তাহার সহিত ভাব করিবার জন্যই ব্যগ্র! এমনি করিয়াই দিনের পর দিন কাটিতেছিল এবং আরও কিছু দিন হয়ত কাটিত কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সহসা এক দিন সকালে আয়নায় মুখ দেখিতে গিয়া বিমল লক্ষ্য করিল তাহার মুখময় লাল লাল চাকা চাকা কি যেন বাহির হইয়াছে। মতিবাবুর

সিংহের মত মুখখানা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সে সভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আয়নাটার দিকে চাহিয়া রহিল।

১৩

অন্য কোথাও নয়, মুখে—সুতরাং খবরটা চাপা রহিল না। নানা ছুতায় অনেকেই আসিয়া বিমল ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া গেল এবং খবরটা প্রত্যক্ষ করিয়া রং চড়াইয়া রাষ্ট্র করিতে লাগিল। হরেন বোস বিমলকে কোন প্রকারে কায়দায় আনিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এইবার কে কাহার পিঠের চামড়া তোলে দেখা যাক! হুঁ হুঁ বাবা, ভগবানের কাছে চালাকি নয়! লোকটা যে অতিশয় ইতর তাহা তিনি গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন কিন্তু একা কি করিবেন, সকলেই উহার পক্ষে। এমন কি চৌধুরী মহাশয়কেও পর্য্যন্ত ছোকরা হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এইবার! আগুন এবং পাপ বেশীদিন চাপা দিয়া রাখা যায় না, এক দিন না এক দিন ফুটিয়া বাহির হইবেই। একেবারে মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হইবে না? ভৈরবের স্ত্রীকে লইয়া যা ঢলাঢলি আজকাল আবার মথুরবাবুর পুত্রবধূটার সঙ্গে জুটিয়াছে! একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া হয়। মথুরবাবুর ছেলেটাও যেমন বখাটে, পুত্রবধূটাও কি ঠিক তেমনি জুটিয়াছে! শ্বশুর-শাশুড়ী যাইতে না যাইতেই দিগ্বিজয় সুরু করিয়া দিয়াছে! নমস্কার বাবা আজকালকার মেয়েদের চরণে! আমাদের বউ-ঝি মুখ্যু-সুখ্যু আছে, মুখ্যু-সুখ্যুই ভাল! —গুপিবাবুর সহিত এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া হরেন বোস দুইটি অস্ত্র চালনা করিলেন। প্রথম, সিভিল সার্জ্জনের কাছে আর

একটি দরখাস্ত দিলেন, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে যেন অবিলম্বে হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয়। দ্বিতীয় যে-কাজটি তিনি করিলেন তাহা তাঁহারই মত প্রতিভাবান্ লোকের পক্ষে সম্ভব। তিনি যে কবিতা লিখিতে পারেন তাহা কে জানিত। তিনি বিমল, ভৈরবের স্ত্রী, বিনোদিনী এবং কুষ্ঠ, এই চারিটি বিষয়কে জড়াইয়া একটি পয়ার রচনা করিলেন এবং সেটি অপরের দ্বারায় কার্বন কাগজ সহযোগে নকল করাইয়া এক দিন রাত্রে চতুর্দ্দিকে সাঁটিয়া দিলেন।

বিমলের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাহার চোখের সামনে যেন তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, সে অসহায়ের মত বসিয়া দেখিতেছে। তাহার বারম্বার মনে হইতেছে আর কিছু নয়, পাপের শাস্তি। নিদারুণ অর্থগৃধ্নুতার নিদারুণ পরিণাম! হাসপাতালের গরীব অসহায় রোগীদের প্রাণ লইয়া সে যে এত দিন ছিনিমিনি খেলিয়াছে, চিকিৎসার নামে প্রতারণা করিয়াছে—এ তাহারই সাজা। সেই অসহায় ভিখারীটার কথা, ভৈরবের ছেলেটার কথা, যে টিউমার কেসটা সেপটিক হইয়া মারা গিয়াছিল তাহার কথা—সব তাহার মনে পড়িতে লাগিল! আরও যে কত মরিয়াছে তাহার ঠিক কি! গুপিবাবুর হাতেই ত সে আজকাল সকলের চিকিৎসার ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে ত নিজে কিছুই দেখিত না, দেখিবার অবসরই ছিল না। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত তাহার অবসর ছিল না, এখন কিন্তু তাহার অনেক অবসর। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর হইতে তাহার ডাক কমিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে কে ডাকিবে! দুই দিন হইতে সে হাসপাতাল যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে! এই মুখ লইয়া সকলের সামনে বাহির হইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তাহার কাছে আসিতেও সকলে কেমন সঙ্কুচিত হয়।

যোগেন চাকরটা পর্য্যন্ত কাল হইতে আসিতেছে না। ঠাকুরটা আগেই পলাইয়াছে। কেবল যায় নাই কাঙালী—সেই শূয়ারে-চেরা ছেলেটা। সে ভাল হইয়া গিয়াছে এবং বিমলের কাছেই আছে। আজ বিমল জগদীশবাবু ও ভূধরবাবুকে ডাকিয়াছে, তাঁহাদের মত এবং পরামর্শ লইবার জন্য।

জগদীশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সারা মুখটাতেই বেরিয়েছে দেখছি যে. ছুঁলে বেশ বুঝতে পারেন ত, কোন অ্যানিস্থেসিয়া নেই?

—না।

—জ্বালাটালা করে?

—না।

জগদীশবাবু চশমাটি খুলিয়া বলিলেন—একবার কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুন মশায়!

—আপনার কি মনে হয়?

জগদীশবাবু হাসিলেন, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি বার-দুই উঁকি মারিয়া গেল। কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন—আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলব আমি!

জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে ভূধরবাবু আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিমলকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—ও-সব একদম বাজে কথা। মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন আপনি! আপনি অত্যধিক মাংসটাংস

খান, এই গরমে লিভার-টিভার খারাপ হয়ে কিছু হয়েছে একটা। একটা কোর্স ক্যালসিয়াম নিন আর ম্যাগশালফ খেয়ে ফেলুন খানিকটা —ও কিছু নয়, দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল বলিল—তা না হয় যাবে, কিন্তু এখন যে সবাই একঘরে করেছে তার উপায় কি! কেস-টেস একেবারে আসছে না।

—কুছ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে ব্যাক করব। আপনার বাহিরে যাবার দরকার নেই, ঘরে বসেই আপনার মাইক্রস্কোপের কাজ করুন আপনি, আমি আপনাকে কেস পাঠাবো। ভয় কি!

—বামুনটা পর্য্যন্ত পালিয়েছে।

—তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ী থেকে আপনার খাবার আসবে রোজ! কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি।

হরেন বোস আমার নামে আবার দরখাস্ত করিয়েছে তা শুনেছেন ত?

—শুনেছি। ও কিচ্ছু হবে না। আপনি সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে, এ যে লেপ্রসি নয় তা যে কোন ডাক্তার বুঝতে পারবে। আপনি হরেন বোসের নামে ডিফামেশন কেস ক'রে দিন একটা। ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া! ওই পত্রটা যে ওই লিখেছে তার প্রমাণ আমার হাতে আছে, যে-ছোকরা কপি করেছিল সে আমার চেনা লোক, তার কাছেই শুনলাম সব। দিন কেস্ ক'রে প্রুফ আছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—ভারি দমে গেছি, কিছু ভাল লাগছে না।

—স্ট্রাগল ফর এগ্‌জিস্টেন্স জীবন-যুদ্ধে দমে গেলে কি চলে মশাই, যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। ওই যে যেখানে ইটের ভাটা করেছি সেই জমিটার 'লিজ' নিয়ে নবীনবাবুর সঙ্গে কি কম ফাইটটা করতে হয়েছে আমাকে! শেষকালে মিথ্যে দুটো ফৌজদারী

কেসই ক'রে দিলাম আমি ওর নামে, বাছাধন দেখলেন আমার সঙ্গে ট্যাঁ ফোঁ ক'রে বিশেষ সুবিধে হবে না, সুড়সুড় করে রাজি হয়ে গেলেন শেষকালে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা করতে হয়! এই যে দেখুন না, আগে মদ নইলে চলত না আমার, আজকাল আর খাই না। দেখলুম লিভার কিডনি-ফিডনিগুলো গোলমাল করছে, পয়সাও বেশ খরচ হচ্ছে, দিলাম ছেড়ে। যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। দমবেন কেন, কি হয়েছে আপনার? হরেন বোস? ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ! দিন আপনি ওর নামে একটা কেস ক'রে, আর এবার চেষ্টা করুন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যেন এক পয়সার না কন্‌ট্রাক্ট পায়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা তো সবাই আপনার হাতে। কন্‌ট্রাক্ট না পেলে দেখবেন বাছাধন মুষড়ে যাবে।

বিমল কিছু বলিল না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভূধরবাবু পকেট হইতে কাগজের ফর্দ্দটা বাহির করিয়া বলিলেন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এখনও পাঁচ জায়গাতে যেতে বাকী। ওঃ আর পারা যায় না! কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি। আমাদের বাড়ী থেকে ভাত পাঠিয়ে দেব আমি। আচ্ছা চলি এবার।

ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন।

বিপদে না পড়িলে লোক চেনা যায় না। ভূধরবাবুকে বিমল এত দিন চিনিতে পারে নাই।

সিভিল সার্জ্জন বিমলকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ঠিক কুষ্ঠ কিনা তাহা বলা শক্ত। মাস ছয়েক ছুটি লইয়া কিছু কাল অন্যত্র যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, ট্রপিক্যাল স্কুলেও একবার দেখাইয়া আসা উচিত। লেপ্রসি যদি হয় ছয় মাসের মধ্যে বোঝা যাইবে। সাহেব তাহার সহিত

যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। তাহাকে অবিলম্বে ছয় মাসের ছুটির জন্য সুপারিশ করিয়া একখানা সার্টিফিকেটও দিলেন।

ট্রপিক্যাল স্কুলে গিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল না। তাঁহারা রক্ত লইয়া, চামড়া কাটিয়া, নাকের রস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। কুষ্ঠ যে নয় তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। একটা লাগাইবার ঔষধ দিয়া বলিলেন, আবার কিছু দিন পরে আসিতে। বিমল কলিকাতায় গিয়া গোপনে একটা হোটেলে উঠিয়াছিল, গোপনেই ফিরিয়া আসিল। এই চেহারা লইয়া মণির সহিত সে দেখা করিতে পারিল না। কাহারও সহিতই সে দেখা করিল না। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না, এই জনতা হইতে দূরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সে তাহার চাকরিস্থলেও আর ফিরিয়া গেল না। কলিকাতায় বসিয়াই সে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল এবং সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট-সুদ্ধ সেটি নন্দী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। ডুলুকেও একখানি চিঠি লিখিল সে যেন তাহার জিনিসপত্র তাহার দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। সে সোজা দেশে ফিরিয়া যাইবে, এই ছয় মাস অন্য কোথাও নয়, শম্ভুকাকার আশ্রয়েই কাটাইয়া দিতে হইবে। দেশে গিয়া সে মণিকে জানাইয়া দিবে যে বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাহাকে ছুটি লইয়া দেশে আসিতে হইয়াছে, কিছুদিন দেশেই থাকিবে।

একটা জংসন ষ্টেশনে ট্রেণ বদলি করিতে হইবে।

বিমল ট্রেণের প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মের একটা অন্ধকার অংশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সে যথাসম্ভব আলোক পরিহার করিয়া চলিতেছে! হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল প্ল্যাটফর্মের ওধারে যে মহিলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তিনি যেন অনেকটা বিনোদিনীর মত।

আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! বিমল আর একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। এ কি, এ যে বিনোদিনীই। অমরও তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। ভালই হইল ইহাদের সহিত দেখাটা হইয়া গেল।

বিমল আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছেন আপনারা, অমর কই?

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেল। বিমলকে এখানে দেখিবে সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিমল পুনরায় প্রশ্ন করিল—অমর কই, যাচ্ছেন কোথা!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী বলিল—আমি একাই যাচ্ছি।

—তাই নাকি, হঠাৎ একা কেন?

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী একটা তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল—এবার একাই চলতে হবে!

—মানে?

—মানে ত আপনি জানেন। আমি এত দিন জানতাম না, কাল জেনেছি। ও-কথা জানার পর আপনার বন্ধুর সঙ্গে থাকার আমার আর প্রবৃত্তি নেই।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

—কোথা যাচ্ছেন এখন?

—যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়ী।

—তার পর?

—তার পর কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটিয়ে নেব।

বিনোদিনী এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। বিমলও কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরেই বিনোদিনীর গাড়ী আসিল, সে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া তাতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন চলিয়া গেল। বিমল বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল মণিও কি আমাকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে যদি সে জানিতে পারে আমার কুষ্ঠ হইয়াছে? অমরের ব্যাধির কারণ কাম, আমার এটা যদি কুষ্ঠই হয় তাহা হইলে ইহার কারণ লোভ। তফাৎ তো খুব বেশী নয়! অসুখ হইলে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে! সহসা তাহার ভৈরবের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সে চোর জানিয়াও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করে নাই। তাহাকে গালি দিয়াছে, গঞ্জনা দিয়াছে, এমন কি মারিয়াছে পর্য্যন্ত, কিন্তু ত্যাগ তো করে নাই!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমল তাহার আত্মজীবনী লিখিতেছিল—

এখানে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময় কত শীঘ্র কাটিয়া যায়! মনে হইতেছে এই তো সেদিন মাত্র আসিলাম। এই এক বৎসরে নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছি। দুঃখের অন্ধকারে নিজের উপর নয়, ভগবানের উপর একান্তমনে নির্ভর করিয়াছিলাম। তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখানে যে দিন প্রথম আসি সেদিন শম্ভুকাকা বাড়ীতে ছিলেন না, গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার মনে শঙ্কা ছিল আমার চেহারা দেখিয়া শম্ভুকাকাও হয়ত ভয় পাইবেন, হয়ত তিনিও কোন ছুতায়

আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন। তখন শম্ভুকাকাকে চিনিতাম না। শম্ভুকাকা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অকপটে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া তিনি আমার দিকে এমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন তিনি একটা দেবতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বলিলাম—শম্ভুকাকা, আপনিও ত্যাগ করবেন না তো?

—ত্যাগ করব! এ-ধারণা তোমার মাথায় কি ক'রে ঢুকল! নিজের সন্তানকে কেউ কখনও ত্যাগ করে?

তাহার পর সহসা তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—ত্যাগ করব! তোমাকে পূজো করা উচিত! একটা কুষ্ঠ-রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে জেনে-শুনে তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করেছ। আহত সৈনিককে কেউ কখনও ত্যাগ করে? বলছ কি তুমি!

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কোন ভয় নেই তোমার! তুমি চুপচাপ ব'সে থাক, আমিই তোমার চিকিৎসা করব! আজকাল এর তো খুব ভাল ইনজেকশন বেরিয়েছে। আজই আনতে দাও—ভয় কি, ঠিক হয়ে যাবে সব। আমিই তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি, দেখ না! সব ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভুকাকা এমন একটা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন যে সমস্ত সমস্যার তিনি সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন! এ-রোগের যখন ইনজেকশন করিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর ভাবনা কি! শম্ভুকাকার ইনজেকশনের উপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু ইনজেকশন নয় সমস্ত জিনিসেরই উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। প্রত্যেক ঔষধটির যে-সকল গুণাবলী ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে শম্ভুকাকা সমস্ত বিশ্বাস করেন। মেটিরিয়া মেডিকা তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং তাহাতে যে-সকল কথা লেখা আছে তাহা তিনি

অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন। যদি কোন ঔষধের মনোমত ফল না হয় তিনি ঔষধের দোষ দেন না, নিজের বুদ্ধির দোষ দেন। তাঁহার ধারণা ঠিকমত বাছিয়া ঠিক ঔষধটি দিতে পারিলে নিশ্চয়ই রোগ সারিবে—সারিতে বাধ্য। শম্ভুকাকার এই বিশ্বাস দেখিয়া হিংসা হয়! আমাদের এ বিশ্বাস নাই। আমরা ঔষধ দিই দ্বিধাভরে; যদি ফল হয় ভালই, না যদি হয় কি করিব! শম্ভুকাকা ঔষধ দেন নিষ্ঠাভরে, যেরূপ নিষ্ঠাভাবে ভক্ত দেবতার সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করে। শম্ভুকাকার নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হই। শম্ভুকাকার চিকিৎসা-প্রণালীও অদ্ভুত। তিনি কেবল ঔষধ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শক্ত রোগী হইলে তাহার সেবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। শক্ত রোগী হইলে এবং পয়সা খরচ করিতে সক্ষম হইলে শম্ভুকাকা সাধারণতঃ ফুরণ করিয়া চিকিৎসা করেন। অর্দ্ধেক টাকা প্রথমে দিতে হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক রোগ ভাল হইলে দিতে হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি থাকে। শম্ভুকাকা ঔষধের বাক্সটি লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসেন। নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়ান, পথ্যও নিজ হাতে প্রস্তুত করেন এবং নিজেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি সেবা করেন। রোগী যদি ভাল হয় তাহা হইলে শম্ভুকাকা সানন্দে তাঁহার বাকী অর্দ্ধেক টাকা লইয়া ফিরিয়া আসেন। রোগী মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসিয়া শোক করেন, শ্মশানে যান, তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীর জন্য এতটা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। শম্ভুকাকার ডাক্তারি বিদ্যা হয়ত তেমন গভীর নয়, কিন্তু বিদ্যার গভীরতা লইয়া কি হইবে যদি প্রাণ না থাকে! আমি যদি কখনও শক্ত অসুখে পড়ি, শম্ভুকাকার চিকিৎসাতেই থাকিব। আমার কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাও হয়ত তাঁহাকে দিয়াই করাইতাম কিন্তু তাঁহার

প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার কুষ্ঠ হয় নাই, হইয়াছিল ডারমাল্ লিশ্ম্যানিয়াসিস! যে জীবাণু কালাজ্বর রোগের কারণ, সেই জীবাণুই ইহারও কারণ। মানুষের ত্বক আশ্রয় করিয়া অনেক সময় ইহা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। আমার বিভীষিকাটা বেশী হইয়াছিল কারণ আমার বিবেকও সুস্থ ছিল না। নিজে অসুখে পড়িয়া একটা জিনিষ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি—আমাদের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্প বিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র।

বর্ত্তমানে আমার সমস্যা রোগ কিংবা রোগী নহে, বস্তুত কোন উৎকণ্ঠাজনক সমস্যাই আর আমার নাই, জীবনকে সহজ করিয়া ফেলিয়াছি। পৈতৃক জমি সামান্য যাহা ছিল তাহাই চাষ করিয়া দিন কাটাইতেছি। বিলাসের উপকরণ জুটাইতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু সুখে আছি। উন্মুক্ত বাতাসে, উদার মাঠে খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতিতে জীবন বহিয়া চলিয়াছে। সিনেমা, রেডিও অথবা বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে মোটেই কষ্ট পাইতেছি না। প্রকৃতির বিরাট নাট্যশালায় বহু সিনেমা, বহু আলো, বহু রেডিও আছে—দেখিবার চোখ এবং শুনিবার কান থাকিলেই তাহাদের পরিচয় মেলে। বিরাট আকাশ কখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন, কখনও জ্যোৎস্নাকুল, কখনও রৌদ্রতপ্ত, কখনও মেঘ-বিচিত্র, কখনও নক্ষত্রখচিত। উদার মাঠ কখনও শ্যামল শোভায় হাসিতেছে, কখনও স্বর্ণবর্ণ পক্বশস্যভারে মহিমময় হইয়া উঠিতেছে, কখনও ধূসর উষর মূর্ত্তি। নদীর জলে ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, পাখীর গানে ক্ষণে ক্ষণে কত সুর—সমস্ত প্রকৃতির কত রূপ, কত ঐশ্বর্য্য। আমরাও প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু ইহাদের সহিত সহজভাবে কণ্ঠ মিলাইয়া জীবনের স্বাভাবিক ঐক্যসঙ্গীতে

যোগদান করিতে পারি না। আমরা কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। স্বল্প জ্ঞানের অহমিকায় জীবনকে অকারণে জটিল করিয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিতেছি। আমার এই যে বর্ত্তমান জীবন ইহাও যে কম জটিল তাহা নহে, ইহাতে জটিলতা আছে। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক জটিলতা, জটিলতার মধ্যেও খানিকটা সরলতা আছে। অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি বিচলিত করে, উইপোকা, শূকর অথবা সজারুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়ি, দারুণ বর্ষায় অথবা দারুণ রৌদ্রে ঘরের মধ্যে আরাম করিয়া বসিয়া থাকা চলে না—মাঠে যাইতে হয়, জনমজুররা সকলেই শান্তশিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে, তাহারাও মাঝে মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সব জিনিস জীবনের মূল শান্তিকে বিঘ্নিত করে না—মানুষকে ভণ্ড করে না—বিবেককে বিষাক্ত করিয়া মুমূর্ষু করিয়া তোলে না। এসব জটিলতার মধ্যে কুচক্রীর কৌশল অথবা কুটিলতা নাই, এসব জটিলতা জীবনের সহজ জটিলতা, সুস্থ সবল জীবনী-শক্তির দ্বারা ইহাদের দমন করাও অসম্ভব নহে।

চাষ করি বলিয়া যে চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা নয়, চিকিৎসাও করি, কিন্তু চিকিৎসা লইয়া ব্যবসা আর করি না। কোন বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করা চলে না। বিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ব্যবসায়ী হইলে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। বর্ত্তমান সভ্যতায় বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের এত প্রভাব বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বিদ্যা সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহার শেষ নাই—ইহা লইয়া ব্যবসায় চলিবে কিরূপে? সম্পূর্ণ জিনিষটা তো আমি কখনই ক্রেতাকে দিতে পারিব না, অথচ ভাণ করিতে হইবে যে সম্পূর্ণটাই দিতেছি। শব্দের ঝঙ্কারে ভাণ্ডের শূন্যতাকে ঢাকিতে হইবে! অনেক দিন উহা করিয়াছি, আর ভাল লাগিতেছে না। বলা বহুল্য বড়লোকেরা আমাকে

ডাকে না। কারণ বড়লোকেরা ডাক্তার ডাকে ঠিক সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে-মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা মোটর কেনে, বাড়ী করে। মোটর এবং বাড়ী যেমন পছন্দসই হওয়া দরকার, ডাক্তারও তেমনি পছন্দসই হওয়া চাই। শুধু চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, বাড়ীর লোকেদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নানা ডাক্তার নানা কৌশলে ইহা করিয়া থাকে। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়, মহাদেববাবু সকলেই ইহা করিতেছেন, প্রত্যেকের ধরণটা শুধু আলাদা রকমের। আজকাল ডাক্তারির মত গুরুগিরিও একটা পেশা হইয়াছে এবং গুরুরাও শিষ্যদের মনোরঞ্জন করিয়াই নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়েই ক্রেতার মনোরঞ্জন না করিলে চলে না।

যাহারা পয়সা দিয়া ডাকে তাহাদের চিকিৎসা করার আর একটা মুশকিল তাহারা রোগ না সারলে ডাক্তারকেই দায়ী করে। তাহারা পয়সাটাকেই মানে এবং অর্থের বিনিময়ে সব কিছুই সম্ভবপর বলিয়া মনে করে। মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম তাহা তাহারা জানে হয়ত, কিন্তু মানে না। তাহারা মনে করে কিছু অর্থব্যয় করিলে বুঝি নিয়তিরও হাত এড়াইতে পারিবে এবং ডাক্তার তাহা এড়াইতে সাহায্য করে, সেই জন্যই তাকে পয়সা দেওয়া, সে যদি ঠিক মত তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে সে আবার কিসের ডাক্তার!

গরীবেরা অসুখে পড়িলে ডাক্তারকে ডাকে, ভগবানকেও ডাকে। ঝড়ে বাড়ী উড়িয়া গেলে তাহারা দড়ি, খুঁটি, চাল অথবা ঘরামিকেই পুরাপুরি দায়ী করে না, ঝড়কে এবং ঝড়ের প্রাবল্যকেও স্বীকার করে। তাহারা প্রকৃতির সহিত পরিচিত, প্রকৃতির রুদ্র, মোহন, শান্ত নানা রূপের সহিত তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহারা নিয়তিকে মানে, ভগবানে-

বিশ্বাস করে। এই সব অশিক্ষিত গরীব লোকদের চিকিৎসা করিয়া সুখ আছে, তাহাদের চিকিৎসা করিলেই তাহারা খুশী, বাঁচা-মরা ভগবানের হাত। ডাক্তার বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, পরমায়ু ছিল না তাই মরিয়া গেল, থাকিলে নিশ্চয়ই বাঁচিত। অর্দ্ধশিক্ষিত সভ্য-নামধেয় জীবদের এমন সরল বিশ্বাস নাই, বিশেষ করিয়া যাহারা ধনী তাহাদের নাস্তিকতা আরও প্রখর। তাহারা মুখে, কাগজে-কলমে, বক্তৃতায় ভগবানের অস্তিত্ব হয়ত স্বীকার করে কিন্তু মনে মনে সকলেই নাস্তিক। নাস্তিক বলিয়াই এত অশান্তি। এই দীনদরিদ্র পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোকেরই অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। তবু কিন্তু তাহাদের জীবনের একটা আদর্শ আছে, দার্শনিকের মত একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিবার মত বলিষ্ঠতা আছে। ইহারা মূর্খ কিন্তু অমানুষ নয়। ইহারা জীবনকে পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নয়, জীবনের ভিতরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জীবনের সহিত সত্য পরিচয় আছে বলিয়াই ইহারা জীবন্ত।

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যই সুখী হইয়াছি। ইহারা আমাকে টাকা দিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অমূল্য—সমস্ত প্রাণটাই হাতে তুলিয়া দেয়! তাছাড়া গাছের ফল, ঘরের দুধ, উৎসবের মিষ্টান্ন,—যখন যেটুকু পারে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনিয়া দেয়। সর্ব্বদাই যেন কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হইয়া আছে, অথচ আমি ইহাদের কতটুকু করি, কতটুকু করিবার সাধ্য আছে আমার! অধিকাংশ অসুখেরই তো ঔষধ জানা নাই। তবে এটা ঠিক, ইহাদের অসুখ সহজে সারে, ইহারা অসহায় বলিয়া প্রকৃতিও করুণা করেন। আরও একটা কথা, বড়-লোকদের মত ইহাদের অসুখ অর্থ-জনিত নহে। ইহারা সাদাসিধা সোজা অসুখেই ভোগে এবং অল্প-স্বল্প চিকিৎসাতেই সারিয়া ওঠে। কুইনিন,

টিঞ্চার আওডিন, ম্যাগসাল্‌ফ এবং ক্যাষ্টর অয়েল দিয়াই শতকরা পঞ্চাশ জনের অসুখ সারিয়া যায়। অথচ এই সব অসুখই বড়লোকের বাড়ীতে হইলে কি কাণ্ডটাই না হয়! বড়লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছি! মনে পড়িতেছে, প্রথম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে যাই তখন অনাদিবাবু অনিলের স্যুটটা আমাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এত দিন যেন সেই স্যুটটাই পরিয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম! ঢিলা জামা, ছোট প্যাণ্টালুন এবং আঁট জুতা পরিয়া কিছুতেই যেন শান্তি পাইতেছিলাম না। ধার-করা সেই স্যুটটা খুলিয়া ফেলিয়া যেন বাঁচিয়াছি।

পদশব্দ শুনিয়া বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পরেশ-দা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

—পরেশ-দা, হঠাৎ এ!

—বেড়াতে এলাম, ছুটিতে আছি এখন!

—বাঃ, বেশ হয়েছে—বসুন!

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার অসুখ-টসুখ ত সব বাজে, তুমি আবার জয়েন করছ কবে?

—আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। জয়েন করব না।

—সে কি!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বদ্দিবাবু মারা গেছেন জান ত?

—তাই নাকি! কি হয়েছিল?

—তিনি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে সেই জৈনদের মন্দিরে তালা ভাঙবার

জন্যে পাহাড়ে উঠেছিলেন এক দল ভলণ্টিয়ার নিয়ে, উঠতে উঠতেই হার্ট ফেল ক'রে মারা যান! বড় ভাল লোক ছিলেন!

বিমল নীরব হইয়া রহিল। বদিবাবুর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহার মনের ভিতর জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

পরেশ-দা আর একটা খবর দিলেন।

তোমার সেই সুপ্রিয়া সরকার আর সুব্রতবাবুকে দেখলাম সেদিন। সুপ্রিয়া সরকারের হাতে এখন আর ইংরেজী নভেল নেই, কোলে খোকা! প্যালপিটেশন্ সেরে গেছে শুনলাম। সুব্রতবাবুরও চেহারা ফিরে গেছে।

বিমল শুনিয়া একটু হাসিল।

—অমরের কোন খবর জানেন?

—জানি। ভয়ানক মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। জমিদারি ত দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে শুনেছি।

—তার স্ত্রী আর ফেরে নি?

—না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরেশ-দা বলিলেন—তুমি আর জয়েন করবে না, [illegible]? এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে? এখানে প্র্যাকটিস সুরু করেছ বুঝি!

বিমল মৃদু হাসিয়া বলিল—করি কিছু কিছু।

—এখানে কি ওখানকার মত হবে? ওখানে ফিলড্ কত বড়!

[illegible] চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার মণিমালার কি এ জায়গা পছন্দ হবে—এ যে ঘোর পাড়া-গাঁ—

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—আপনি শোনেন নি বুঝি?

—কি ?

মণি মারা গেছে !

—সে কি, কি ক'রে ?

—ছেলে হতে গিয়ে !

পরেশ-দা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিমল হাসিয়া বলিল—যেদিন খবরটা পেলাম, সেদিনই ঠিক এখানে একটা খুব শক্ত লেবার-কেস করলাম আমি, গরীব চাষার মেয়ে, বেঁচে গেল সে !

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে।

বিমল একটু হাসিল।

সমাপ্ত

# মন্ত্র-মুগ্ধ

240

# মন্ত্র-মুগ্ধ

"বনফুল"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা

241

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে 'ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

দাদামহাশয়,

শুনিয়াছি সামান্য বিল্বপত্রেই মহাদেব সন্তুষ্ট হন—তাই আমার এই দুঃসাহস।

ভাগলপুর
১০, ৩, ৩৮

প্রণত
বলাই

# নিবেদন

এই প্রহসনটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে গিয়া ইহার কয়েকটি দৃশ্য পরিবর্দ্ধিত ও দুইটি দৃশ্য একীভূত করিয়া নাটকটির অভিনয়-অসুবিধা দূর করিবার প্রয়াস পাইলাম।

একটি কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় আছে। প্রধান ভূমিকায় মনুষ্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব বাঙলা নাটকে এই বোধ হয় প্রথম।

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাগাদা দিয়া বহিখানি লিখাইয়াছিলেন বলিয়া এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস ইহার উন্নতি-কল্পে সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

১০, ৩, ৩৮ "বনফুল"

ভাগলপুর।

# মন্ত্রমুগ্ধ

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লেকের একটি নির্জন অংশ। একটি যুবক এবং একটি যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। যুবকটি শীর্ণকায়, গোঁফ দাড়ি কামানো; চক্ষু কোটরগত। চক্ষু কোটরগত, কিন্তু ভাববিহ্বল এবং চশমাবৃত। মাথার চুল অবিন্যস্ত। যুবতীটি তন্বী, শ্যামাঙ্গী, বেশ ছিমছাম। চক্ষু দুইটি বুদ্ধিদীপ্ত, চশমা নাই। হাতে একটি ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগটির ভিতরে কি আছে ভগবানই জানেন, বাহিরটি কিন্তু সুন্দর, কারুকার্যখচিত। মেয়েটি একটি দামী শাড়ি আধুনিক কায়দায় পরিধান করিয়া আছেন। ব্লাউসের হাতায় মনোহর এম্ব্রয়ডারি দেখা যাইতেছে। পায়ে জরিদার নাগরা। হাতে ছোট রিস্টওয়াচ। উভয়ের কেহই এখনও ছাত্রাবস্থা পার হন নাই। দুইজনেই এক কলেজে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। যুবকটির নাম মোহনলাল, যুবতীটির ভাল-নাম বাসন্তিকা—ডাক-নাম চুমকি। উভয়ে একটি খালি বেঞ্চির উপর পাশাপাশি উপবেশন করিলেন।

মোহনলাল। (চশমাটা খুলিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে) ইয়ে—অর্থাৎ—মানে—এ বিষয়ের একটা মীমাংসা ক'রে ফেলাই ভাল। অর্থাৎ—মানে—আমি আর থাকতে পারছি না চুমকি। কতদিন এ ভাবে থাকা যায়।

চুমকি। (লীলাভরে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া) আবার তুমি ওকথা তুলছ ?

মোহনলাল। যতদিন না উত্তর পাব ততদিন বার-বার একই কথা নানারকম রং দিয়ে বলব আমি চুমকি। আমি হয়তো সব কথা ঠিক ক'রে গুছিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু—

চুমকি। (বাধা দিয়া) আমি তো অনেকবার বলেছি এম-এ,টা পাস ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে আমি বিয়ের কথা ভাবব। বিয়ে ক'রে আমি কারও গলগ্রহ হতে চাই না।

মোহনলাল। (এই কথায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া আবেগভরে বলিলেন) তুমি কি কখনও কারও গলগ্রহ হতে পার চুমকি ? নিজেকে অত ছোট ক'রে ভাব কেন ? ফুলের মালা কি কখনও কণ্ঠের গলগ্রহ হয় ?

চুমকি। (দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া) বিয়ের

আগে ওরকম অনেক কবিত্ব অনেকের মনে আসে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তা দাঁড়ায় পাউণ্ড শিলিং পেন্সে। নিজে রোজগার করতে না পারলে কোন আত্মসম্মান থাকে না। স্বামীরা যে স্ত্রীর ওপর এত অত্যাচার করে, তার প্রধান কারণ স্ত্রীরা একটা পয়সার জন্তেও স্বামীর মুখাপেক্ষী—আমি তা হতে চাই না।

মোহনলাল। আহা, তুমি সব পুরুষমানুষকেই এক-রকম মনে করছ কেন? পৃথিবীর সব পুরুষমানুষই কি একরকম?

চুমকি। (হাসিয়া) অধিকাংশই। সব শিয়ালই হুকাহুয়া করে, যারা করে না তারা শিয়াল নয়।

মোহনলাল। (অধীরভাবে) আহা, এ সব তো আমি বহুবার শুনেছি। আমি আজ এ বিষয়ে একটা ডেফিনিট্ উত্তর শুনব ব'লে এখানে এসেছি চুমকি। আমাকে হতাশ ক'র না।

চুমকি। এক কথা কতবার বলব। এম-এ. পাস ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে আমি বিয়ে করব—তার আগে নয়।

মোহনলাল। তার মানে আরও অন্তত পাঁচ বছর পরে? আমি বলছি অন্তত—বেশিও হতে পারে।

চুমকি। (সবিস্ময়ে) পাঁচ বছর কেন? এই তো

আমার থার্ড ইয়ার চলছে—আর তিন বছর পরেই এম-এ পাস করব ; তারপরই চাকরি—

মোহনলাল। (হাসিয়া) তুমি কি মনে কর বাসন্তিকা দেবী, যে চাকরি তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছে ? যেমনই তুমি পাস ক'রে বেরুবে অমনই তোমায় বরণ ক'রে নেবে ?

চুমকি। মেয়েদের এখনও অনেক স্কোপ আছে।

মোহনলাল। মানলুম আছে। মানলুম পাস ক'রে বেরিয়েই তুমি চাকরি পেলে। কিন্তু সমস্ত যৌবনটা নিঃশেষ ক'রে দিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে লাভ আছে কোন ?

চুমকি। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) এ সব আলোচনা হবে জানলে আমি আসতামই না।

মোহনলাল। (মিনতিভরে) রাগ ক'র না। তুমি আমাকে অধিকার দিয়েছ ব'লেই না আমার এ সব আলোচনা করবার স্পর্দ্ধা হয়েছে।

চুমকি। (বসিয়া—একটু উষ্মাভরে) স্পর্দ্ধাটা তোমার একটু বেশি হয়েছে। এতটা ভাল নয়। সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা উচিত।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

মোহনলাল। ( চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ) আমাকে তুমি কি মানুষ মনে কর না চুমকি? তুমি কি মনে কর আমার প্রাণটা পাথরের?

আবার রুমাল দিয়া চোখ মুছিলেন

চুমকি। ছি ছি, তুমি কাঁদছ? আমার এই সামান্য একটা কথা যে তোমাকে এতটা আঘাত করবে তা আমি ভাবতেই পারি নি। আশ্চর্য্য কাণ্ড!

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

মোহনলাল। ( হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ) আচ্ছা, আর একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দাও তুমি।

চুমকি। কি কথা?

মোহনলাল। তুমি যদি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করবেই ঠিক ক'রে থাক, তা হ'লে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সার্থকতা কি? আমি কি তোমার ভার বহন করতে অক্ষম মনে কর?

চুমকি। ( হাসিয়া ) অক্ষম কি সক্ষম সে কথা পরে বোঝা যাবে। তার আগে আমি নিজে সক্ষম হতে চাই। তাতে নিজের একটা স্বাধীনতা থাকে। তা ছাড়া এটা কি এ যুগে একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় যে স্ত্রীলোক

হলেই একটা পুরুষের স্কন্ধে ভর ক'রে থাকতেই হবে? স্ত্রীলোকের স্বাধীন অস্তিত্ব ব'লে কিছু কি থাকতে নেই?

মোহনলাল। (সকরুণভাবে) আমি অপেক্ষা করব। যতদিন না তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াবে ততদিন আমি ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করব। কিন্তু এইটুকু শুধু বল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর আমাকেই বিয়ে করবে তো?

চুমকি। (রহস্যময় হাসি হাসিয়া) ততদিনে আমার চেয়ে ঢের ভাল টুকটুকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। কবিত্বের স্রোত তখন ভিন্ন খাতে বইবে।

মোহনলাল। (আবেগভরে) কক্ষনো না। যদি সম্ভব হ'ত সমস্ত মনখানা খুলে দেখাতাম তোমাকে এক্ষুনি।

চুমকি। তা ছাড়া তোমার বাবা মা ইণ্টার-কাষ্ট বিয়েতে রাজিই হবেন না হয়তো।

মোহনলাল। (অধীরভাবে) তাঁদের রাজি করবার ভার আমার হাতে তুমি ছেড়ে দাও না চুমকি। তাঁরা যদি রাজি না-ও হন তাঁদের অমতেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। তোমায় চাই আমি—অ্যাট এনি কষ্ট।

হঠাৎ পিছন দিক হইতে একটা গুণ্ডা আসিয়া প্রবেশ করিল। চাপদাড়ি —গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। পরিধানে লুঙ্গি। সে আসিয়াই চুমকির হাত হইতে ব্যাগটা ছিনাইয়া লইতে অগ্রসর হইল

চুমকি। ( ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ) ওগো মা গো—

গুণ্ডা। ( কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া ) চুপ —চিল্লাও মৎ।

মোহনলাল। ( এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে হক্‌চকাইয়া ) এই—এই, কেয়া করতা হ্যায় তুম—ইুপিড—

গুণ্ডা অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া মোহনলালের গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল। সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল ভূশায়ী হইলেন। নিমেষের মধ্যে গুণ্ডা চুমকির হাতের ব্যাগ ও কানের দুল ছিনাইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল

( উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও মৌখিক আস্ফালন সহকারে ) কোন্‌ দিকে গেল লোকটা —এমন আচমকা চড়টা মেরে দিলে—ব্যাটাকে টের পাওয়াচ্ছি আজ—যুযুৎসুর এমন এক প্যাঁচ কসব—গেল কোন দিকে লোকটা—

অগ্রসর হইতে গেলেন

চুমকি। ( কাতরভাবে মোহনলালের হাতটা জাপ-টাইয়া ধরিয়া ) ওগো, না না, তুমি চলে যেও না, আমার ভয়ানক ভয় করছে, হাত পা কাঁপছে, তুমি যেও না।

মোহনলাল। (দাঁড়াইলেন, তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া) এদিকে তো একটা পুলিস-টুলিসও দেখছি না! ফ্যানি!

চুমকি। (সকাতরে) উঃ, আমার বুকের ভেতরটা কেমন ধড়াস ধড়াস করছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে চল বাড়ি যাই। উঃ, কানটা বড় জ্বালা করছে।

কানে হাত দিলেন

মোহনলাল। এঃ, কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে যে! দুল দুটো নিয়ে গেছে নাকি?

চুমকি। (কোঁপাইতে কোঁপাইতে) হ্যাঁ।

মোহনলাল। (সক্রোধে) আচ্ছা রাসকেল তো! গেল কোন্ দিকে ব্যাটা—খুঁজে দেখব একটু?

চুমকি। না না, তুমি যেও না। চল, বাড়ি চল।

মোহনলাল। (যেন নিরুপায় হইয়া সম্মতি দিলেন) আচ্ছা, তাই চল। যাবার সময় না হয় থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে যাই –

চুমকি। না, থানায়-টানায় যেতে হবে না, জানাজানি হয়ে সে ভারি কেলেঙ্কারি হবে।

মোহনলাল। আচ্ছা, গুণ্ডাটা দেখতে কি রকম বল তো? আমি ভাল ক'রে ব্যাটার চেহারাও দেখতে পাই নি।

চুমকি। (কানে হাত দিতে দিতে) দাড়ি ছিল, এইটুকু দেখেছি।

মোহনলাল। হ্যাঁ, দাড়ি আমিও দেখেছি, রংটা কি রকম ?

চুমকি। সে আমি দেখি নি, চল এখন। ছি ছি, হস্টেলে গিয়ে কি যে আমি বলব এই রক্তাক্ত কান নিয়ে !

মোহনলাল। কানে কি খুব বেশি চোট লেগেছে ?

চুমকি। একটা কান একটু কেটে গেছে। দুল দুটো এমনিই একটু লুজ ছিল, বার বার পড়ে যেত।

মোহনলাল। (হঠাৎ থিয়েটারি ভঙ্গিতে) এর প্রতিশোধ আমি নেবই। এই চাপদাড়ি গুণ্ডাকে যদি না ধরতে পারি, আমার নাম মোহনলালই নয়। ধরবই একে আমি, দেখো তুমি—অ্যাট এনি কস্ট।

চুমকি। চল শিগগির, কিছু ভাল লাগছে না।

উভয়ের প্রস্থান

বাঞ্ছু মল্লিকের বৈঠকখানা। এই স্থানে পাড়ার থিয়েটারের রিহার্সাল হইয়া থাকে। বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো। ঘরের এক কোণে একটা ছোট টেবিল ও সিন্দুক রহিয়াছে। টেবিলের কাছেই দেওয়ালে একটি দেওয়াল-আলমারি। ফরাসের উপর বাঁয়া, তবলা, হার্মোনিয়াম, খঞ্জনি, করতাল, সেতার, এস্রাজ, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। রিহার্সাল শেষ হইয়া গিয়াছে। অভিনেতাগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। হারাধন বিশ্বাস ও বাঞ্ছু মল্লিক দাঁড়াইয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। হারাধন বিশ্বাস লোকটির বেশ নাদুসনুদুস হৃষ্টপুষ্ট বলী চেহারা। মুখে সযত্নলালিত এক জোড়া গোঁফ। চক্ষু দুইটি বড়-বড় ও রাঙ্গা। বাঞ্ছু মল্লিক লোকটিকে দেখিলেই বাবু বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘশীর্ণ দেহ—মুখখানিতে ধূর্তামি মাখানো। গোঁফ দাড়ি নাই। মাথার সম্মুখ দিকটায় টাক। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট ও চতুরতাব্যঞ্জক। বাঞ্ছু মল্লিক বিপত্নীক ও নিঃসন্তান, আর বিবাহ করেন নাই। বাপের পয়সা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন—তাহাই ভাঙাইয়া চলে। অবসর বিনোদনের নিমিত্ত তিনি সখের থিয়েটার, ফুটবল খেলা, তাস খেলা প্রভৃতি লইয়া থাকেন এবং এ সকল বিষয়ে তিনি পারদর্শী। পান-দোষও আছে। বাঞ্ছু মল্লিকের পরনে লুঙ্গি। হারাধন ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া আছেন।

বাঞ্ছু। বক্তিয়ারের পার্টটা তোমাকেই নিতে হবে।

হারাধন। ( সবিস্ময়ে ) আমাকে ?

বাঞ্ছু। হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ?

হারাধন। কেন, বিনোদ তো মন্দ করছে না!

বাসু। ও বিনোদের কর্ম্ম নয়। ও রকম মিউ মিউ করলে কি আর বক্তিয়ারের পার্ট হয় ?

হারাধন। (হাসিয়া) বেচারার গলার স্বরই ওই রকম তো ও আর কি করবে। ঈশ্বরের ওপর তো আর হাত নেই।

বাসু। আমি বলছি না তো যে হাত আছে। আরে, আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না, যে লোক সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মুখের ওপর বলতে পারে, 'জান না কি তাতার বালক ছুটে যায় মাতৃ-অঙ্ক হতে সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ ?'—তার বুকের পাটা কত বড়, গলার জোর কতখানি। একি চাট্টিখানি কথা হে। বিনোদের একে তো ওই কাঠির মত চেহারা, তাও না হয় মেক্-আপের জোরে সেরে নেওয়া যেত, কিন্তু ওর গলার আওয়াজ একেবারে হোপ্‌লেস। চিঁ চিঁ করলে কি আর বক্তিয়ারের চলে ? তুমিই নাও, তোমার দরাজ গলা আছে, চেহারাও মানাবে।

হারাধন। (হাসিয়া) তা হয়তো মানাবে। কিন্তু আমার তো জানই তাই কি মুস্কিল।

বাসু। অর্থাৎ পরিবার ?

হারাধন। আর ব'ল না ভাই। জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। তোমাদের মজ ভাল লাগে, থিয়েটারের দিকে

ঝোঁকও ছিল এককালে,তাই তোমার আড্ডায় এসে সন্ধ্যে-বেলায় একটু গল্প-গুজব করি। এই নিয়েই রোজ তুমুল কাণ্ড। তাঁর ইচ্ছেটা আমি রোজ সন্ধ্যে থেকে তাঁর আঁচলটি ধ'রে রান্নাঘরে ব'সে থাকি। বাঁজা বউ নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। থিয়েটারে পার্ট নিলে রিহার্সাল সেরে বাড়ি ফিরতে বারোটা একটা হয়ে যাবে, তা হলে তো তিনি গলায় দড়ি দেবেন।

ঝান্টু। (হাসিয়া) সুখে আছ তা হলে বল।

হারাধন। আর ব'ল না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দু চক্ষু যেদিকে যায় পালিয়ে যাই।

ঝান্টু। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আচ্ছা, এর মানে কি, আরও তো অনেকে থিয়েটার করেছে?

হারাধন। আরে ভাই, আমিই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি তাঁর পুত্রস্থানীয়। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে নাইয়ে পুছিয়ে জামা পরিয়ে খোকাটি বানিয়ে রাখতে চান। এতে কোন বাধা উপস্থিত হইলেই একেবারে খাপপা! আমার যাতে সুমতি হয় তার জন্যে কত পুজো, মানত, তারকেশ্বরে ধর্ণা পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, কারও কুপরামর্শে প'ড়ে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে কোন ওষুধ-কবুদ না খাইয়ে দেয়—

ঝান্টু। বশীকরণও চলছে নাকি?

হারাধন। চলছে মানে? জোর চলছে। এ নিয়ে আমার এক ঘোর দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে। কাল আমায় কি বলছিল জান?

বাসু। কি?

হারাধন। বলছিল যে, আরব্য উপন্যাসের একটা গল্পে আছে যে মন্ত্রবলে মানুষকে নাকি কুকুর বানিয়ে ফেলা যায়। সে রকম মন্ত্র যদি আমি জানতাম তোমাকে কুকুর বানিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতাম।

বাসু। (ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া) বল কি হে?

হারাধন। (হতাশভরে) কি আর বলব বল ভাই। এ নিয়ে আমার মনে এক ঘোর অশান্তি হয়েছে। অশিক্ষিত মেয়েমানুষ, কোন্ দিন কার হুজুগে প'ড়ে কি খাইয়ে দেবে, না কি করবে, কিছুই বলা যায় না।

বাসু চিন্তিতমুখে ধীরপদক্ষেপে দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া একটি হুইস্কির বোতল ও দুইটি কাচের গ্লাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে চিন্তিতমুখে ফিরিয়া আসিলেন

বাসু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, যেহেতু তোমার স্ত্রীর মাথা খারাপ সেই হেতু আমাদের প্লে-টা মাটি হয়ে যাক! বিনোদ মিউমিউ ক'রে বক্তিয়ারের পার্টটা করুক, আর তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়ে স্ত্রীর আঁচল ধ'রে ব'সে থাক!

বল তো তোমার স্ত্রীকে বেশ একটু জব্দ ক'রে দিই,—জীবনে তিনি আর তোমার ওপর বশীকরণ প্র্যাকটিস করবেন না।

হারাধন। (সাগ্রহে) পার যদি কেনা গেলাম হয়ে থাকব তোমার। মাইরি বলছি—লাইফ মিজারেব্‌ল হয়ে উঠেছে।

বাচ্চু টেবিলের নিকট ফিরিয়া গেলেন ও গ্লাস দুইটিতে নীরবে মদ ঢালিতে লাগিলেন

আমাকে বেশি দিও না, বুঝলে?

বাচ্চু কোন উত্তর দিল না। যতটুকু ঢালিবার ঢালিয়া আসিয়া গ্লাসটি হারাধনের হাতে দিল

বাচ্চু। সোডা ফুরিয়েছে ভাই। জল মিশিয়ে খাবে? আমার তো মনে হয় নীটই ভাল।

হারাধন অধিক বিতণ্ডা না করিয়া মদটুকু সটান গলায় ঢালিয়া দিলেন ও মুখবিকৃতি করিলেন

(পান শেষ করিয়া) বল তো তোমার গিন্নিকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিই। রাজি আছ?

হারাধন। আমি তো এক্ষুনি রাজি। কিন্তু সে কি সোজা কথা রে দাদা!

বাচ্চু সে কথার উত্তর না দিয়া আবার খানিকটা মদ ঢালিলেন ও পান করিয়া ফেলিলেন

বাচ্চু। (মুখ মুছিতে মুছিতে) এতও প্ল্যান মাথায় একটা এসে গেছে। সিম্‌প্লি গ্র্যাণ্ড! ঠাকুরাণীর চরম শিক্ষা হয়ে যাবে।

হারাধন। (সাগ্রহে) কি রকম?

বাচ্চু। এখন কিছু বলব না। তোমার কিন্তু কো-অপারেশন চাই, রাজি আছ?

হারাধন। নিশ্চয়। বাই দি বাই, মারধোর করবে না তো?

বাচ্চু। (সগর্বে) বাচ্চু মল্লিক ইজ এ স্পোর্টস্‌ম্যান—ভাল্‌গার কাজ সে করে না।

হারাধন। নিশ্চয়ই। কিন্তু প্ল্যানটা কি?

বাচ্চু। সে এখন ভাঙছি না। তবে ব্যাপারটা একটু রিস্‌কি। ফী-স্বরূপ এক বোতল হুইস্কির দাম দিতে হবে—ক্যাশ ডাউন। অমনিতে এ কাজে হাত দিচ্ছি না।

হারাধন। আহা, তার জন্যে আটকাবে না। তোমার প্ল্যানটা কি শুনি না?

বাচ্চু। 'অতীব সুন্দর তাহা,—কিন্তু এখন বলছি না।

হারাধন হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন

হারাধন। আচ্ছা বেশ, আমাকে কি করতে হবে বল।

বাচ্চু। (তর্জনী দেখাইয়া) প্রথমত, আমার উপর

বিশ্বাস করতে হবে ; ( মধ্যমা দেখাইয়া ) দ্বিতীয়ত, আমি যা বলব নির্ব্বিচারে শুনতে হবে ; ( অনামিকা দেখাইয়া ) তৃতীয়ত, একটি বোতল হুইস্কির দাম অগ্রিম দিতে হবে —ক্যাশ ডাউন ; ( কনিষ্ঠা দেখাইয়া ) বক্তিয়ারের পার্ট নিতে হবে।

হারাধন। রাজি আছি।

বান্টু। আচ্ছা বেশ। তা হলে ওই কোণের সিন্দুকটা থেকে দাড়িগুলো বের ক'রে আন দেখি।

হারাধন কোণের সিন্দুকটা খুলিয়া নানা আকারের ও নানা রঙের দাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন

এইবার একে একে পর তো দাড়িগুলো, দেখি।

হারাধন। ( সবিস্ময়ে ) মানে ?

বান্টু। ( আদেশের ভঙ্গিতে ) ডোন্ট কোয়েশ্চন, যা বলছি ক'রে যাও।

হারাধন একটু ইতস্তত করিয়া নারদের সাদা দাড়িটা পরিলেন

( ঘাড় নাড়িয়া ) ও হবে না, খুলে ফেল ; আর একটা পর।

হারাধন। তোমার উদ্দেশ্যটা—

বান্টু। ( বাধা দিয়া ) ডোন্ট কোয়েশ্চন।

হারাধন আবার লালগোফের লম্বা একটা দাড়ি পরিলেন

এটাও সুবিধে হচ্ছে না, রেখে দাও ; আর একটা পর।

নিরুপায় হারাধন এইবার একটা কালো লম্বা দাড়ি পরিলেন

নাঃ, লম্বা দাড়িতে মানাবে না তোমায়। চাপদাড়ি পর।

হারাধন চাপদাড়ি পরিলেন

আচ্ছা, অনেকটা হয়েছে। একটা বেশ ঘন কার্লিং-গোছের চাপদাড়ি আছে-জল্লাদের দাড়ি—সেটা বার কর নি? সেটা নিয়ে এস—সিন্দুকের কোণে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আছে—তারই ভেতর আছে বোধ হয়, আন সেটা।

হারাধন। (একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া) তোমার মৎলবটা কি?

বাসু। ডোণ্ট কোয়েশ্চন, যা বলছি ক'রে যাও।

হারাধন কার্লিং চাপদাড়ি বাহির করিয়া আনিলেন ও পরিলেন

হ্যাঁ, এইটেই ঠিক হবে। এইবার বাঁকড়া দেখে একটা চুল বার কর দিকি।

হারাধন তাহাই করিলেন

হারাধন। এটাও পরব?

বাসু। নিশ্চয়।

হারাধন পরিলেন

(একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে) পারফেক্টলি অল রাইট। চমৎকার হয়েছে।

হারাধন। এবার খুলব?

বাচ্চু। খোল। বাস্, এইবার বাড়ি চ'লে যাও তুমি। প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। হুইস্কির দামটা কিন্তু অগ্রিম চাই—ক্যাশ ডাউন।

হারাধন। (দাড়ি ও চুল খুলিতে খুলিতে) এখন তো সঙ্গে টাকা নেই, কাল সকালে দিয়ে দেব।

বাচ্চু। ঠিক?

হারাধন। ঠিক। কিন্তু প্ল্যানটা আমাকে বলবে না?

বাচ্চু। এখন নয়।

হারাধন। (সবিনয়ে) একটু—

বাচ্চু। (দৃঢ়স্বরে) একটুও নয়। এখন বললে সব পণ্ড হয়ে যাবে। তা ছাড়া সমস্ত জিনিসটা এখনও বেশ ক'রে ভেবে দেখতে হবে। (সগর্বে) বাচ্চু মল্লিক ইজ নট এ কাঁচা ছেলে। ঘাবড়ো না, যখন হাতে নিয়েছি ঠিক ক'রে দেব।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল

হারাধন। (ত্রস্ত হইয়া) ইস্, এগারোটা বাজল নাকি? ভয়ানক দেরি হয়ে গেল তো, আজ ছুহুলে ব্যাপার হবে দেখছি।

বাচ্চু। (হাসিয়া) যাও, স'রে পড়। খিড়কি

দেখে বিগলিত হয়ে সব কথা যেন ফাঁস ক'রে ফেল না, তা হলে কিন্তু মুস্কিল হবে।

হারাধন। পাগল হলে তুমি!

বাচ্চু। কাল সকালে এস, সব বলব।

হারাধন। আচ্ছা চল্লাম। (ঘড়িটার দিকে চাহিয়া) ইস্, বড্ড রাত হয়ে গেল!

হারাধন চলিয়া গেলেন

বাচ্চু। (তাহার প্রস্থানপথের দিকে তাকাইয়া) বেচারা!

বাহিরে দ্বারের কড়া নড়িল

নেপথ্য হইতে। বাচ্চুদা বাড়ি আছেন?

বাচ্চু। হ্যাঁ আছি। ভেতরে এস।

একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল

কি হে, এত রাত্তিরে?

যুবক। এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম—চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্টেড। দিল্লীতে একটা ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাব আমরা। সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনাকে যেতে হবে বাচ্চুদা। দোহাই আপনার, না বলতে পারবেন না।

বাচ্চু। আমাকে? দিল্লীতে?

যুবক। হ্যাঁ, আপনাকে ব্যাকে খেলতে হবে।

বাঙ্গু। ( সবিস্ময়ে ) বলিস কি রে! কোথাও কিছু নেই, রাত দুপুরে হঠাৎ দিল্লী।

যুবক। ( সান্ত্বনয়ে ) আপনাকে যেতেই হবে বাঙ্গুদা —আমাদের ডিফেন্স তেমন ভাল নেই।

বাঙ্গু। কবে যেতে হবে?

যুবক। তিন দিন পরে, অর্থাৎ ফোর্থ।

বাঙ্গু। হ্যাঁ, তখন আমি ফ্রী আছি বটে। (হাসিয়া) কিন্তু আমার ফী জান তো?

যুবক। ( সহাস্যে ) এক বোতল হুইস্কি তো?

বাঙ্গু। হ্যাঁ, ক্যাশ ডাউন।

যুবক। ( মনিব্যাগ বাহির করিয়া ) তা জানি, টাকা সঙ্গেই এনেছি।

টাকা বাহির করিয়া দিলেন

বাঙ্গু। ( টাকা লইয়া হাত বাড়াইয়া তাহার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন ) অল রাইট ইয়ংম্যান—লেট্‌স্‌ইট।

যুবক। ঠিক রইল তা হলে। আপনি আমাদের ক্লাবে যাবেন, সেখান থেকেই সব একসঙ্গে বেরুনো যাবে। এখন যাই। একবার চোরবাগানে যেতে হবে। সেখানে

নাম আছে—বেশ ভাল গোলকীপার। তাকেও নিয়ে যাব ভাবছি।

বাবু। আচ্ছা।

যুবক চলিয়া গেল। বাবু খানিক আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন ও হাতে গিলাসটা টানিয়া লইয়া এবং মত্তকণ্ঠে গান ধরিলেন

বাগেশ্রী

রাখিতে পারি নি যারে বাঁধিয়া,
তাহারি লাগিয়া মরি কাঁদিয়া—
নিশীথে একা।
সকল পরাণ ভরি গো
তাহারি মুখানি স্মরি গো,
চোখ দুখানি ভরি গো,
মনে মনে যদি কেহ সাধিয়া—
দাও না দেখা।

প্রভাত কাল। হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি। বিশ্বাসের স্ত্রী শুভঙ্করী এবং তাঁহার প্রতিবেশিনী ও সখী নয়নতারা কথাবার্তা বলিতেছেন। শুভঙ্করীর পরিধানে দামী শাড়ি—টকটকে লাল চওড়া পাড়। শাড়ির ভিতর দিয়া সৌখীন সায়া দৃশ্যমান। মাথায় সিঁদুর। হাতে গোছা-ভরা সোনার চুড়ি ঝকমক করিতেছে। উপরের হাতেও আর্মলেটজাতীয় একটা ভারি গহনা দেখা যাইতেছে। নয়নতারার রোগা-সোগা চেহারা। সাধারণ একটা শাড়ি পরিধান করিয়া আছেন—অঙ্গে অলঙ্কারাদির বাহুল্য নাই। কিন্তু তথাপি দেখিলেই মনে হয় যে নয়নতারা শুভঙ্করী অপেক্ষা ঢের বেশি সুখী। শুভঙ্করী যেন মনে মনে গুমরাইয়া আছেন—মুখে প্রসন্নতা নাই। নয়নতারা হাস্যমুখী। একটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়ে কথাবার্তা বলিতেছেন। বারান্দার ঠিক সম্মুখেই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সদর দরজা দেখা যাইতেছে। বারান্দা হইতে শয়নঘরের দ্বার দেখা যাইতেছে। বারান্দার এক-কোণে দাঁড়ে একটি কাকাতুয়া বসিয়াছে। শয়নঘরের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটি বড় দেওয়াল-ঘড়িও দৃশ্যমান।

নয়নতারা। কাল রাত্রে চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন ভাই তোর বাড়িতে? আমার তো চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল—মনে হ'ল চোর-টোরই বা বুঝি ঢুকল। এমন ভয় করতে লাগল। শেষকালে ওঁকে ঠেলে তুললাম। ওঁকে তোলাও কি সহজ ব্যাপার! (হাসিয়া) আপিস থেকে এসেই খেয়ে-দেয়ে সেই যে উনি শোবেন—বাস্ একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

শুভঙ্করী। (সক্রোধে) আমায় একটা শক্ত দেখে দড়ি এনে দিতে পারিস? না হয় খানিকটা বিষ?

নয়নতারা। ওমা, সে কি কথা!

শুভঙ্করী। হ্যাঁ, আমার আর ভাল লাগে না। রোজ রোজ খিচ্ খিচ্ ক'রে ক'রে আমার হাড়মাস কালী হয়ে গেল।

নয়নতারা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পরে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন) রাধাধনবাবুর বুঝি কাল ফিরতে রাত হয়েছিল? এ তোদের হয়েছে ভাল।

শুভঙ্করী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন

না হয় ভদ্রলোকের একটু আড্ডা দেওয়া অভ্যেস, তাতে তোর এত রাগ কেন বাপু? আমি ভাবলাম, বুঝি আর কিছু বা হ'ল। আড্ডা দিলেই বা একটু, অমন অনেকেই দেয়।

শুভঙ্করী। (রুষিয়া) ঝাঁটা মারি আমি অমন আড্ডা দেওয়ার মুখে। বাড়িতে আমি একা ব'সে ব'সে এখানে শুনছি, হাঁড়িতে ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যাচ্ছে, আর উনি ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন যত হাবাতেদের সঙ্গে। আর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছেন রাত্তির বারোটা একটায়—

নয়নতারা। (সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়া) বলিস কি লো! মদ ধরেছেন নাকি? সত্যি?

শুভঙ্করী। সত্যি নয় তো কি আমি গুরুজনের নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে শুধু শুধু নরকের পথ পরিষ্কার করছি? কাল রাত্তিরে যখন এল ভক্ ভক্ ক'রে মুখ দিয়ে মদের গন্ধ ছাড়ছে; কাছে দাঁড়ানো যায় না। চেঁচামেচি করেছি সাধে!

নয়নতারা। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) নাঃ, তা হলে তো ভয়ের কথা বাপু! মদ যে ভয়ানক জিনিস! মদ না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

শুভঙ্করী। আমি কি করি ভাই! যতই ভাবছি ততই যে আমার মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। উঃ ভগবান, আমার কপালে এত দুঃখ লিখেছিলে তুমি!

নয়নতারা। নাঃ, এবারে রাশ টেনে ধরা দরকার। আর আলগা দেওয়া ঠিক নয়। মদ যে বড় সাংঘাতিক জিনিস।

শুভঙ্করী। (নিরুপায় ক্ষোভের সহিত) কি ক'রে রাশ টেনে ধরব বোন। সকালবেলা উঠে এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়ে যাবে, ফিরবে বেলা এগারোটায়। এগারোটায় বাড়ি ফিরেই ঊর্দ্ধশ্বাসে নাকেমুখে চারটি গুঁজে ছুটবে শেয়ার মার্কেটে। তারপর সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরেই

চা জলখাবার খেয়েই বেরুবে আড্ডা দিতে, ফিরবে রাত্তির এগারোটা বারোটা। কখন্ রাশ টানি বল! সেই সকাল সাতটায় বেরিয়েছে এখন পর্য্যন্ত পাত্তা নেই।

নয়নতারা। আমাদের মঙ্গলহাটি গাঁয়ের নিতু ঠাকুর থাকলে একটা মাদুলি আনিয়ে দিতাম তোকে।

শুভঙ্করী সাগ্রহে শুনিলেন

শুভঙ্করী। মাদুলি? কি হয় সে মাদুলিতে?

নয়নতারা। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) ভালবাসার লোক বশ হয়।

শুভঙ্করী। সত্যি?

নয়নতারা। সত্যি নয় তো কি মিছে কথা! নিতু ঠাকুরের যে বিখ্যাত মাদুলি। সেই মাদুলির জোরে কত বারমুখো স্বামী, কত দজ্জাল বউ শায়েস্তা হয়ে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

শুভঙ্করী। (সাগ্রহে নয়নতারার দুইটি হাত ধরিয়া) আমাকে একটা আনিয়ে দে না ভাই। যা খরচ লাগে আমি দোব।

নয়নতারা। (ঘাড় নাড়িলেন) সে আর হয় না ভাই, নিতু ঠাকুর মারা গেছেন।

শুভঙ্করী। (হতাশ হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া

রহিলেন। তাহার পর বলিলেন) কি যে আমি করি! আমার কিছু ভাল লাগছে না।

নয়নতারা। এখন যা দাঁড়িয়েছে দেখছি, দৈব না করলে আর উপায় নেই। এক কাজ কর—কালীঘাটে মানসিক কর। একবার করেছিলি না?

শুভঙ্করী। করি নি আবার! দু দুবার জোড়া কালো পাঁঠা মানত করেছি, কিছু হয় নি। পীরের সিন্নি যে কতবার দিয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই। সে দিন তারকেশ্বরে কত ক'রে গিয়ে পূজো দিয়ে এলাম। ফল হ'ল উল্টো। আগে মদ খেত না, পূজো দেওয়ার পর মদ ধরলে।

নয়নতারা। (একটু ভাবিয়া) মঙ্গলহাটিতেই চিঠি লিখে একটা খবর নোব? তাই নিই না হয়। সিদ্ধু ঠাকুর কাউকে শিখিয়েও গিয়ে থাকতে পারে তো। সিদ্ধু ঠাকুরের ছেলে গোপাল ঠাকুর রয়েছে। তা ছাড়া সেখানকার শ্মশানকালীর পুরুত মুক্তিরাম আছেন, তিনিও শুনেছি অনেক মন্তর-তন্তর জানেন। তিনিও হয়তো কোন উপায় ব'লে দিতে পারেন। আমার বোন মঙ্গলহাটিতে আছে, আজ লিখছি তাকে চিঠি।

এই সহানুভূতিপূর্ণ প্রস্তাবে শুভঙ্করী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন

শুভঙ্করী। (আবার নয়নতারার দুই হাত ধরিয়া)

যা হয় একটা কিছু কর বোন। তুইই আমার একমাত্র আপনার জন। তোকে ছাড়া আমার মনের এ কথা আর কাউকে আমি বলি না। বলতে পারি না—লজ্জা হয়।

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল

নয়নতারা। আমি আজই লিখে দেব চিঠি—তুই ভাবিস নি। ভগবান একটা উপায় করবেনই। এবার আমি যাই ভাই, তাত চড়িয়ে এসেছি। :

শুভঙ্করী। আচ্ছা। আমিও রান্নাবান্নার জোগাড় দেখি। ঝিটাকে একবার বাজারে পাঠাতে হবে, উনি যাবার সময় ব'লে গেলেন ছানার ডালনা করতে।

নয়নতারা। (মৃদু হাসিয়া) ভদ্রলোকের এ দিকে খাওয়া দাওয়ার সখও আছে বেশ।

শুভঙ্করী। ওই সখ পর্য্যন্তই। পাতে তো আদ্ধেক জিনিস প'ড়ে থাকে রোজই।

নয়নতারা। এবার যাই ভাই। চিঠি আজই লিখছি।

শুভঙ্করী। আচ্ছা। আর দেখ—এ সব কথা আর কাউকে বলিস নি যেন। নিতান্ত আপনার লোক জেনেই তোকে মনের দুঃখ সব বলি খুলে।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আমি কি কচি খুকী?

শুভঙ্করী। ঝি, ও ঝি, সকাল সকাল আজ বাজার যাও বাছা, পোয়াটাক ভাল ছানা নিয়ে এস।

ঝি। ( নেপথ্য হইতে ) যাই মা।

শুভঙ্করী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল

কই মা, পয়সা দাও—বাসনমাজা হয়ে গেছে আমার।

শুভঙ্করী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

শুভঙ্করী। একটা টাকাই নিয়ে যাও। ছানা এনো ভাল দেখে পো-টাক, ঘি এনো ভাল দেখে আধপো, আর আনাজও এনো কিছু। আলুগুলো একটু ভাল ক'রে দেখে এনো—কালকের মত যেন পচা না হয়।

ঝি। আমি কি আর সাধ ক'রে মা পচা আনি! এমন মিশিয়ে দেয় মুখপোড়ারা যে চেনা মুস্কিল।

ঝি চলিয়া গেল। শুভঙ্করী দাঁড়ে টাঙানো কাকাতুয়াটাকে ছোলা দিতে লাগিলেন। ঝি যাইবার সময় দরজাটি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া গম্ভীর নিনাদে ভাসিয়া আসিল—

ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ
হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

তাহার পর দরজা খুলিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর এক হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে কমণ্ডলু, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, সর্বাঙ্গ ভস্মলিপ্ত। দুই বাহুমূলে ও গলদেশে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চক্ষু দুইটি আরক্ত। বামস্কন্ধের উপর একটি বড় পুঁটলি। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর একবার গম্ভীর নির্ঘোষে বলিলেন—

ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ
হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

সহসা সন্ন্যাসীর এই আবির্ভাবে শুভঙ্করী সচকিত হইয়া উঠিলেন। কাঁথামুড়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসী। (উদাত্ত কণ্ঠে) ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ—হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। (ভয়-ভক্তি-বিনম্র-কণ্ঠে) কি চাই বাবা?

সন্ন্যাসী। (প্রশান্ত হাসি হাসিয়া) গৃহস্থের মঙ্গল চাই মা।

এই কথা শুনিয়া শুভঙ্করী আগাইয়া আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন

(হস্তোত্তলন করিয়া) কল্যাণ হোক। স্বামীপুত্রে লক্ষ্মী-লাভ কর।

শুভঙ্করী চকিতে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন

(স্থিরদৃষ্টিতে শুভঙ্করীর দিকে চাহিয়া) আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার স্বামীর সুমতি হবে।

শুভঙ্করী সজল বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন

অমন ভাবে চেয়ে রয়েছ কেন মা? আমি আশীর্বাদ

করছি, তোমার স্বামীর সুমতি হবে। শিব স্বয়ম্ভু—শিব স্বয়ম্ভু!

শুভঙ্করী। হবে? (একটু ইতস্তত করিয়া) আমার মনের কথা কি ক'রে টের পেলে তুমি ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) তোমার মুখে সে কথা লেখা রয়েছে যে মা। পতিব্রতা সতী রমণীর মুখ নির্ম্মল আকাশের মত। সামান্য একটু মেঘোদয় হলেই বোঝা যায়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, মেঘ কেটে যাবে, তোমার স্বামীর সুমতি হবে। ভগবানকে ডাক, তিনিই সকল দুঃখ দূর করবেন তোমার। শিব স্বয়ম্ভু—শিব স্বয়ম্ভু!

শুভঙ্করী। ভগবানকে তো অনেক ডেকেছি বাবা—রোজই ডাকছি—কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছি, কই কিছু তো হ'ল না। বরং আমার স্বামী রোজ রোজ আরও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন।

সন্ন্যাসী। দেখি মা তোমার হাত? বাঁ হাতখানি পাত তো একবার—হ্যাঁ।

শুভঙ্করী বামকরতল প্রসারিত করিয়া ধরিলেন

(নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) তোমার স্বামীর মধ্যে শনি-প্রভাব খুব প্রবল। সে প্রভাবের হাত থেকে মুক্ত হতে এখনও দশটি বৎসর লাগবে দেখছি।

শুভঙ্করী। তার মানে কি বাবা?

সন্ন্যাসী। অর্থাৎ এখনও সে দশ বৎসর পশুর মত জীবন যাপন করবে। তারপর তার মনুষ্যত্ব জাগরূক হবে।

শুভঙ্করী। দশ বছর! এর কি কোন উপায় নেই বাবা?

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) উপায়? উপায় আছে বই কি মা। আর্য্যঋষিগণ সকলপ্রকার বিপন্মুক্তিরই উপায় ক'রে গেছেন। তোমার স্বামীর এই পশুজীবন দশ বৎসর থেকে দশ দিনেও কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু সে একটু শক্ত কাজ। মনের খুব জোর না থাকলে তা করা সম্ভবপর নয়। তুমি কি তা পারবে মা? শিব শম্ভু— শিব শম্ভু।

শুভঙ্করী। (সাগ্রহে) নিশ্চয় পারব। কি করতে হবে আমাকে ব'লে দিন।

সন্ন্যাসী। করতে বিশেষ কিছুই হবে না। সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি রেখে শুদ্ধান্তঃকরণে মন্ত্রপাঠ করলেই মন্ত্র কার্য্যকরী হবে। আর কিছু নয়।

শুভঙ্করী। স্বামীর প্রতি আমার তো অচলা ভক্তিই আছে। অন্তঃকরণও আমার অশুদ্ধ নয়। চিরকাল পূজো-আচ্চা নিয়েই আছি।

সন্ন্যাসী। বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আমার আপত্তি কি মা!

শুভঙ্করী। মন্ত্রপাঠ করলেই হয়ে যাবে? কোন্ মন্ত্র?

সন্ন্যাসী। শোন, তা হলে সব কথাই তোমাকে খুলে বলি মা। আমি একবার কামরূপ কামাখ্যায় গিয়েছিলাম। তখন সেখানে এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি আমাকে এই মন্ত্রটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অদ্ভুত এই মন্ত্র! অসীম এর শক্তি! মনে কর—কোন মানুষ কোন ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অবিচলিত শ্রদ্ধাভরে শুদ্ধান্তঃকরণে যদি সেই ঘরের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায় তা হলে সেই নিদ্রিত মানুষ নিমেষের মধ্যে কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এ মন্ত্রের এত শক্তি!

শুভঙ্করী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন

সেই কুকুরকে আবার মানুষও করা যায়, তার জন্যে দ্বিতীয় আর একটি মন্ত্র আছে। সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটিও অবিচলিত ভক্তিভরে পাঠ ক'রে কুকুরটির গায়ে তিন বার জল ছিটিয়ে দিলেই সে আবার মনুষ্যমূর্তি প্রাপ্ত হবে। আমার মনে হয় তোমার স্বামীকে যদি দশ দিন কুকুরে রূপান্তরিত

ক'রে রাখতে পার তা হলে দশ দিন পরে তার স্বভাব মনুষ্যোচিত হয়ে উঠবে। মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে থাকলে এই পশুত্বের গ্লানি কাটতে দশ বৎসর লাগবে, কিন্তু পশু-দেহ ধারণ করিয়ে দিলে দশ দিনেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যোম মহাদেও শঙ্কর ভোলানাথ—হর হর বিশ্বেশ্বর শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

সন্ন্যাসী থামিতে শুভঙ্করী যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন

শুভঙ্করী। মানুষ কুকুর হয়ে যায় এ কথা তো আরব্য উপন্যাসে পড়েছি। সত্যি সত্যি তা কি হয়?

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) তন্ত্র তো ছেলেখেলার জিনিস নয় মা। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দুটি শাস্ত্রই এই কলিযুগে এখনও টিকে আছে। একটি জ্যোতিষ আর একটি তন্ত্র। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

শুভঙ্করী। (সাগ্রহে) আমি যদি আমার স্বামীর ওপর এই মন্ত্রটি পরীক্ষা করি তা হলে তাঁর কোন অনিষ্ট হবে না তো?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। তবে বিধি অনুযায়ী শুদ্ধান্তঃকরণে করতে হবে। প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করলেই তিনি কুকুরে রূপান্তরিত হবেন। দ্বিতীয়টি পাঠ করলেই আবার মনুষ্যদেহ ফিরে পাবেন। অনিষ্ট কিছু হবে না।

শুভঙ্করী। (সানুনয়ে) তা হলে আপনি দয়া ক'রে আমাকে মন্ত্র দুটি শিখিয়ে দিন না বাবা। আমার স্বামীর যদি সুমতি হয় জন্ম-জন্ম আপনার কেনা দাসী হয়ে থাকব আমি।

পদধারণ

সন্ন্যাসী। (পা সরাইয়া লইয়া) অমন উতলা হয়ো না মা। মন্ত্র আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেখ, এর যেন অপব্যবহার ক'র না। ভয়ঙ্কর মন্ত্র এ।

শুভঙ্করী। কিচ্ছু অপব্যবহার করব না আমি। যেমন যেমন আপনি ব'লে দেবেন, ঠিক তেমনই আমি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব।

সন্ন্যাসী। বেশ, তা হলে একটু কাগজ আর কলম আন। দীর্ঘ মন্ত্র, মুখে বললে তোমার তো মনে থাকবে না, কাগজ কলম আন, লিখে দিই। শিব স্বয়ম্ভু—শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং লিখিবার সরঞ্জাম আদি লইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী ত্রিশূল ও কমণ্ডলু বারান্দার উপর রাখিয়া শুভঙ্করী প্রদত্ত একটি আসনে উপবেশন করিয়া লিখিতে লাগিলেন

(লেখা শেষ করিয়া) এইটি হ'ল প্রথম মন্ত্র।

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি।
স্বয়ম্ভূ-প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে॥

ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি।

কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু মহাকালি॥

এইটি প্রথম মন্ত্র। কিন্তু একটি কথা বেশ ক'রে মনে রেখ মা। তোমার স্বামী যখন ঘুমুবেন তখন বাইরে থেকে তাঁর দরজাটি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে বন্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করবে। দ্বার যেন খোলা না থাকে, তা হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

শুভঙ্করী। (তাড়াতাড়ি) না, দুয়ারে আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দেব। বলেন তো তালাও লাগিয়ে দিতে পারি।

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) সেই ভাল। তুমি বুদ্ধিমতী আছ—তুমি ঠিক পারবে দেখছি। দ্বিতীয় মন্ত্রটি হচ্ছে এই—শোন। প্রায় একই রকম—

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি।

স্বয়ম্ভু-প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে॥

ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লুং অট্ট অট্ট নিনাদিনি।

মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মহাকালি॥

এতে দ্বার বন্ধের প্রয়োজন নেই। হাতে গঙ্গাজল নিয়ে এই মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ ক'রে স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তিভরে—মনে থাকে যেন—অচলা ভক্তিভরে—কুক্কুরের

গায়ে সেই মন্ত্রপূত গঙ্গাজল তিন বার সিঞ্চন ক'রে দেবে, তা হলেই সে আবার মনুষ্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে। অচলা ভক্তিভরে—মনে থাকে যেন। পারবে তো মা?

শুভঙ্করী। ঠিক পারব। সিঞ্চন কি বাবা?

সন্ন্যাসী। সিঞ্চন ক'রে দেবে—মানে ছিটিয়ে দেবে।

শুভঙ্করী। ও, সে আমি খুব পারব। আচ্ছা, এতে আমার স্বামীর কোন অনিষ্ট হবে না তো?

সন্ন্যাসী। নাঃ, ঠিক বিধিমত করলে অনিষ্ট হবে কেন?

শুভঙ্করী। (মন্ত্র লেখা কাগজটি লইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন) আপনাকে কি দিতে হবে বাবা?

সন্ন্যাসী। কিচ্ছু না। উপকার আমরা বিক্রয় করি না মা। আমাদের সন্ন্যাসীদের কিসেরই বা প্রয়োজন। যার সন্ধানে সমস্ত ত্যাগ ক'রে অরণ্যে পর্ব্বতে গুহায় অহোরাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় পৃথিবীর আর সমস্ত জিনিসই তুচ্ছ। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভু। আচ্ছা, কিছু দিতে চাইছ দাও। গৃহস্থের বাড়ি থেকে সন্ন্যাসীর যা প্রাপ্য তাই দাও—এক মুষ্টি তণ্ডুল।

শুভঙ্করী। তণ্ডুল! তণ্ডুল কি?

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) চাল। এক মুঠো চাল দাও—আর কিছু না।

শুভঙ্করী। (লজ্জিত হইয়া) ও।

আবার তিনি ভিতরে গেলেন ও একটি পাত্রে কিছু চাউল আনিয়া সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুতে ঢালিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার পদধূলি লইলেন

সন্ন্যাসী। কল্যাণ হোক। এবার তা হলে উঠি মা, আবার আসব।

উঠিলেন

শুভঙ্করী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার ঠিকানা কি বাবা?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কোন ঠিকানা থাকে না মা, পথই আমাদের ঠিকানা। শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ—শিব স্বয়ম্ভূ।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন ও শুভঙ্করী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন

হোটেলের ভিজিটিং রুম। চুমকি ও মোহনলাল দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। ঘরটি একটি খোপ-বিশেষ—অত্যন্ত ছোট ও নিরাভরণ। খান দুয়েক চেয়ার ও একটি লম্বা-গোছের বেঞ্চি ছাড়া ঘরটিতে আর কিছু নাই।

চুমকি। (একটু বিদ্রূপময় হাসি হাসিয়া) গুণ্ডা ধরা পড়ল?

মোহনলাল। না, এখনও ধরা পড়ে নি, (উত্তেজিত স্বরে) কিন্তু এই তোমাকে ব'লে রাখছি চুমকি, সেই গুণ্ডাকে আমি ধরবই ধরব—যেমন ক'রেই হোক ধরব—অ্যাট এনি কস্ট।

চুমকি। (কৌতুকভরা চক্ষু দুইটি তুলিয়া) তাই নাকি? আশ্বস্ত হলাম।

মোহনলাল। ঠাট্টা করছ? কর। সে গুণ্ডাকে ধরা সোজা নয় তা জানি। শক্ত—খুবই শক্ত। কিন্তু হাজার শক্ত হলেও আমি তা করব। তোমার জন্যে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি, তা কি তুমি জান না চুমকি?

চুমকি। চুপ কর, কেউ শুনতে পাবে এখুনি।

মোহনলাল। (ভীতভাবে) পাশের ঘরে কেউ আছেন নাকি ?

চুমকি। হ্যাঁ। অমিয়াদি তাঁর দাদার সঙ্গে কথা বলছেন।

মোহনলাল চোখ দুইটি বড় করিয়া শিস দিলেন

মোহনলাল। (একটু পরে ও নিম্নকণ্ঠে) ইনি কি অমিয়াদির সত্যি দাদা - না, (হাসিয়া) আমার মত পোজ-করা দাদা ?

চুমকি। (সব্যঙ্গে) সকলে তো আর তোমার মত সাহসী নয়। তা ছাড়া পোজ-ই বা কিসের ? হস্টেলে তো সকলে জানে যে, তুমি আমার দাদা নও। মাসীমাও সেদিন তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন। আমি সত্যি কথাই বললাম।

মোহনলাল। (সাগ্রহে) কি বললেন তিনি ?

চুমকি। কি আবার বলবেন। একক্লাসে আমরা পড়ি—লেখা করতে এলে বলবার আর কি আছে ? আমাদের মাসীমা অত অবুঝ নন। এতে অন্যায় কিছু নেই তো।

মোহনলাল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এইবার কাজের কথা শোন। আমার এক পিস্তুতো দাদার, তারপরেই

মোহনলাল। অ্যাই এনি কস্ট্ই জোগাড় করব তুমি বলেই দেখ না—

চুমকি। গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা—"। বইটা প্রোস্‌ক্রাইব্‌ড্‌ –

মোহনলাল। আরে, 'দেশের কথা' ত আমারই ছিল। কে যেন পড়তে নিয়ে গেছে। (চক্ষু বুজিয়া) ভাবি দাঁড়াও কে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ বুজু—বুজু। ঠিক্ বুজুই নিয়ে গেছে। বুজুর কাছ থেকে এনে তোমাকে দেব—এ আর এমন শক্ত কাজ কি। আর শক্তই যদি হত তাহলেও ডু ইউ থিঙ্ক চুমকি আই উড্‌ ষ্টপ্‌ ডুইং ইট্ ফর্ ইউ। গোর্কিটা পড়তে আরম্ভ করেছ?

চুমকি। হাঁ আরম্ভ করেছি। 'দেশের কথা'টা কিন্তু আমাকে পড়তেই হবে—শুনেছি অদ্ভুত বই—

মোহনলাল। অদ্ভুত—অদ্ভুত! পড়লে শরীরের রক্ত টগ বগ করে ফুটতে থাকে—সিম্‌প্লি বয়েল্‌স্—

দড়াম করিয়া একটা শব্দ হইল ও মোহনলাল চমকাইয়া উঠিলেন

ও কিসের শব্দ?

চুমকি। (হাসিয়া) পাশের বাড়ির দোতলার খোলা জানলাটা হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল বোধ হয়। একটু হাওয়া হলেই জানলাটা দড়াম দড়াম করে। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

মোহনলাল। কার বাড়ি?

চুমকি। কি জানি—কার না কার একটা খালি বাড়ি। ভূতুড়ে বাড়ির মত প'ড়ে আছে। দোতলার সব জানলার সব কপাটও নেই। হাওয়া হলে সমস্ত রাত দড়াম দড়াম করছে—এক আপদ!

মোহনলাল। আর এক ব্যাপার ঘটেছে।

চুমকি। কি?

মোহনলাল। তোমার এখানে আসছিলাম, রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বললে, বাবু গুণ্ডায় কি আপনার কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি কি ক'রে জানলে? সে বললে, আপনি যখন পুলিসের বড়বাবুর আপিসে গিয়েছিলেন তখন আমি পাশেই ছিলাম। বাবুর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা আমি শুনেছি। ওসব পুলিস-টুলিস ছেড়ে দেন বাবু, আমার সঙ্গে আসুন, আমি সে গুণ্ডাকে ধরিয়ে দেব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পুলিসের বড়বাবুর আপিসে গেলে কি ক'রে? সে বললে, তার দাদা নাকি সেখানে কাজ করে। সে আরও বললে যে, পুলিসের বড়বাবু নাকি সমস্ত গুণ্ডাদের বাড়ি সার্চ করতে বলেছেন।

চুমকি। তা না হয় হ'ল, কিন্তু তুমি আজ কলেজ যাও নি কেন?

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) কলেজ! যা ঘ'টে গেছে তারপর কলেজ যাওয়া কি সম্ভবপর? রাত্রে আমার ঘুম হয় না তা জান?

চুমকি। এখন আর অত বাড়াবাড়ি ক'রে লাভ কি?

মোহনলাল। সে গুণ্ডাকে আমি খুঁজে বার করবই, পুলিসে যদি না খুঁজে পায়, আমি নিজে যাব সেই গুণ্ডার আড্ডায় শেষ পর্য্যন্ত। আজই সে লোকটা নিয়ে যেতে চাইছিল, গেলাম না আমি। দেখি আগে পুলিসে কতদূর কি করতে পারে।

চুমকি। কেউ কিছু করতে পারবে না, মাঝ থেকে আমার দুল দুটো গেল।

মোহনলাল। কিছু যদি না মনে কর, অর্থাৎ—

চুমকি। কি?

মোহনলাল। (পকেট হইতে একটা ছোট বাক্স বাহির করিয়া) বেশি কিছু নয়, তোমার দুল দুটো, মানে —এটা আমার কর্ত্তব্য, অর্থাৎ—

চুমকি। দুল—কিনে এনেছ নাকি? আশ্চর্য্য লোক তুমি।

মোহনলাল। (বাক্সটি দিলেন) কিছু মনে ক'র্ না তুমি। কতই বা আর দাম!

সঙ্কুচিত মুখে চুপ করিলেন

চুমকি। ( ছুল জোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন ) প্যাটার্ন'টাও ঠিক আমার সেই ছুলটারই মত। ঠিক মনে আছে তো তোমার।

মোহনলাল। ( সোচ্ছ্বাসে ) তোমার ছুলের প্যাটার্ন কি আমি ভুলতে পারি কখনও!

চুমকি। এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু। আজকাল তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ। ভারি রাগ হচ্ছে আমার।

মোহনলাল। রাগ কর, কিন্তু নাও। প্লীজ—

চুমকি চুপ করিয়া রহিলেন

নিলে তা হলে?

চুমকি। না নিলে তুমি কি সহজে ছাড়বে? এ কিন্তু অন্যায় তোমার।

মোহনলাল। ( সস্মিত মুখে ) উঃ সত্যি, আমার এমন আনন্দ হচ্ছে!

নেপথ্যে। চুমকিদি, মোহনলালবাবু এসেছেন?

চুমকি। কে, রেবা? ভেতরে আয় না।

রেবা নাম্নী মেয়েটি প্রবেশ করিল। কম বয়সী মেয়ে।

রেবা। ( চুমকির প্রতি ) তুমি যে বলেছিলে, মোহনলালবাবু এলে তাঁকে দিয়ে তুমি পাঁচ গজ আদ্দি

আনিয়ে দেবে আমাকে। দামটা কি ওঁকে এখনই দিয়ে দেব ?

মোহনলাল। (শশব্যস্ত হইয়া) না না, দামের জন্যে আটকাবে না। আছি তো ? পাঁচ গজ ? আচ্ছা, কাল নিয়ে আসব আমি।

রেবা। ধন্যবাদ।

চলিয়া গেল

মোহনলাল। এবার চলি তবে।

চুমকি। তুমি কিন্তু আর গুণ্ডার পেছনে ঘুরো না। কাল কলেজে এস, বুঝলে ?

মোহনলাল। সেই চাপদাড়ি গুণ্ডার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমায় মাপ কর তুমি চুমকি, তোমার এ কথা রাখতে পারব না। পিসতুতো দাদার তায়রাভায়ের থ্রু দিয়ে সব ব্যাটাকে আমি দেখে নেব।

প্রস্থান

চুমকি দাঁড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দুল জোড়া দেখিতে লাগিলেন

## পঞ্চম দৃশ্য

হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি। রাত্রিকাল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শুভঙ্করী হারাধনের প্রতীক্ষায় একাকিনী বসিয়া সেলাই করিতেছেন। কিছুক্ষণ সেলাই করিয়া সেলাই আর ভাল লাগিল না। সেলাইটা রাখিয়া দিয়া একটা উপন্যাস লইয়া বসিলেন। উপন্যাসও বিস্বাদ বোধ হইল। সেটা ফেলিয়া দিয়া আবার সেলাইটা লইয়াই বসিলেন। এক মনে সেলাই করিয়া চলিয়াছেন। চোখে মুখে নিরুদ্ধ ক্রোধ জমা হইয়া রহিয়াছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া সক্রোধে হাতের সেলাইটা ফেলিয়া শুভঙ্করী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শুভঙ্করী। বারোটা বেজে গেল এখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি বাড়াবাড়ি বাড়ছে। নাঃ, এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। একবার ভেবেছিলাম সন্ন্যাসীর মন্তরটা আর কাজে লাগাব না; দুদিন দেখিই না—যদি এমনিই সুমতি হয়। কিন্তু আর নয়। সে মন্ত্র আজই আমি ব্যবহার করব। (একটু থামিয়া) কুকুর হওয়াই উচিত। যার কুকুরের মত স্বভাব তার কুকুর হওয়াই দরকার। কুকুর

বুঝবেন। শেকল আর বগ্‌লস আনিয়ে রেখেছি আজ। মন্তর-লেখা কাগজখানা কোথায় রাখলাম! আর একবার ভাল ক'রে প'ড়ে নিই।

ঘরের ভিতর গেলেন। ঈষৎ মত্ত অবস্থায় হারাধনের প্রবেশ। বেশবাস অসংবৃত বগলে মদের বোতল, শরীর টলিতেছে। আসিয়াই তিনি জড়িত কণ্ঠে একটা হাঁক দিলেন—"শুভোংকরি!" শুভংকরী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং হারাধনকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্ফারিতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহা নিমেষের জন্য। পরমুহূর্তেই তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধ বাঙ্ময় হইয়া উঠিল

শুভংকরী। (ক্ষিপ্রবেগে আগাইয়া আসিয়া ও দুইটি হস্ত যুগপৎ হারাধনের মুখের সম্মুখে নাড়িয়া) বলি—ব্যাপারখানা কি? কি ভেবেছ তুমি? রাত্তির বারোটা বেজে গেছে সে খেয়াল আছে তোমার? ব্যাপারখানা কি স্পষ্ট ক'রে বল একবার।

হারাধন। (টলিতে টলিতে কবিতায় উত্তর দিতে লাগিলেন)

কি জানিতে চাহ, দেবি, বল স্পষ্ট করি!
বৃথা নষ্ট ক'র না সময়।
সময় অমূল্য ধন।

শুভংকরী। (মুখভঙ্গি করিয়া) লজ্জা করে না তোমার?

হারাধন। ( সম্মিতবদনে ) লজ্জা সখি রমণীভূষণ,
পুরুষ হইয়া যার লাজুক স্বভাব
'মেনিমুখো' সেই অভাজন।

শুভঙ্করী। ( অত্যন্ত চটিয়া গেলেন ) ফের যদি এমন ভাবে মাতলামি করেছ তা হ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন! চেন না আমাকে? ঝঁ্যাটাপেটা ক'রে বাড়ি থেকে রাস্তায় বার ক'রে দিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাব এক্ষুনি।

হারাধন। ( সুরে )

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে?
—যেও না
সখি যেও না
ধরি ওগো যেও না—

শুভঙ্করী। ( ললাটে করাঘাত করিয়া ) উঃ ভগবান, আমার মরণও হয় না!

হারাধন। ( মৃত্যুর কথা শুনিয়া—উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন )

'শাহাজাদি, সম্রাটনন্দিনি,
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?
জানো না কি তাতারবালক
ছুটে যায় মাতৃ-অঙ্ক হতে

সিংহশিশুসনে
করিবারে মল্লরণ ?'

শুভঙ্করী। ( চক্ষু দুইটি কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে মাতাল স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ধীর সংযত কণ্ঠে বলিলেন ) খাবে, শোবে ?—না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতলামি করবে সমস্ত রাত ? মতলবটা কি তোমার ?

হারাধন। ( পেটে হাত বুলাইয়া )

হে অপ্সরি, ক্ষমা কর মোরে।
পেট মম পরিপূর্ণ আজি।
খেয়েছি পাঁটার ঘুগ্‌নি আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে ;
নাহি ক্ষুধা লেশ।

শুভঙ্করী। ( স-শ্লেষে ) আমি তো অপ্সরী নই সকলেই জানে। তা নিয়ে আর ঠাট্টা করা কেন ? আমিও অপ্সরা নই, তুমিও কিন্নর নও। এত রাত্রে তা নিয়ে দুঃখ কেন ? খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তা হ'লে। না এলেই হ'ত।

হারাধন কোন উত্তর না দিয়া টলিতে লাগিলেন

সেই কোন্ সন্ধ্যে থেকে তোমার জন্যে রেঁধে অনাহারে ব'সে আছি। এতটুকু আক্কেল নেই তোমার ? এতটুকু

দয়াও নেই শরীরে? উঃ, এত বড় পাষণ্ড তুমি! সেই কোন্ বিকেল থেকে ব'সে ব'সে তোমার জন্যে রাবড়ি করলাম, আলুর দম করলাম, কাট্‌লেট করলাম, পটলের দোর্মা— এমন কি ভালবাস ব'লে পালং শাকের চচ্চড়ি পর্য্যন্ত ক'রে রাখলাম, আর তুমি স্বচ্ছন্দে বাইরে থেকে খেয়ে এলে? একবার আমার কথাটা মনেও হ'ল না? কি তুমি!

হারাধন। এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে
অতীব জটিল প্রশ্ন করিলে যে সখি!
কি আমি? কোহম্?
এ দুরূহ দার্শনিক মীমাংসার এই কি সময়?

এই বলিয়া টলিতে টলিতে শয়নঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শুভঙ্করী অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া টলায়মান স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। হারাধন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়াই বমি করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শুভঙ্করী ইহা শুনিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তাহার পরমুহূর্তেই তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া এক ঘটি জল ও একটি হাতপাখা লইয়া দ্রুতপদে আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। আরও দুই একবার 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ শোনা গেল। আবার শুভঙ্করী বাহিরে আসিলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ছোট বালতিতে এক বালতি জল এবং একটা ঝাড়ু লইয়া আবার ঘরের ভিতর গেলেন। ঘর পরিষ্কার করিবার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। একটু পরেই সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল এবং শুভঙ্করী বাহির হইয়া আসিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, অপমানে তাঁহার চোখ মুখ জ্বলিতেছিল।

শুভঙ্করী। নাঃ, আজ এর প্রতিকার করতেই হবে। সন্ন্যাসীর মন্তরের পরীক্ষা আজ করবই করব। এতে যদি

ফল হয় ভালই, না হয় কালই আমি বাপের বাড়ি চ'লে যাব। রোজ রোজ এত খোয়ার সহ্য হয় না আমার। মন্তর-লেখা কাগজখানা রাখলাম কোথায় ?

টেবিলের উপর হইতে কাগজখানা লইলেন

এই যে ! আজ এর পরীক্ষা আমি করবই।

মন্ত্রগুলি মনে মনে পড়িতে লাগিলেন।
কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

আজই করব। দেখি ঘুমুল কিনা, না ঘুমুলে তো হবে না।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন ও পা টিপিয়া
টিপিয়া ফিরিয়া আসিলেন

চোখ বুজে প'ড়ে আছে তো ; ঘুমিয়েছে বোধ হয়। আর একটু অপেক্ষা করি। মন্তরগুলোও আর একবার ভাল ক'রে প'ড়ে নিই—যা খটমট !

মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

এইবার দেখি। (আবার সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে গেলেন ও বাহির হইয়া আসিলেন) হ্যাঁ, এইবার ঘুমিয়েছে—নাক ডাকছে। এখুনি পড়ব ? আচ্ছা, আর একটু না হয় অপেক্ষা করি। সেলাইটা করি ততক্ষণ।

সেলাইটা লইয়া বসিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং মন্ত্র-লেখা কাগজটি লইয়া আরও দুই এক বার মন্ত্রগুলি মনে মনে পড়িলেন

আর একবার দেখে আসি।

দেখিয়া আসিলেন

হ্যাঁ, এইবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, এইবার পড়া যাক।

শয়নঘরের কপাটটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিলেন এবং একটা তালা আনিয়া তাহাতে লাগাইলেন

আচ্ছা, আর একবার দেখি।

তালা খুলিয়া ভিতরে গেলেন, আবার বাহিরে আসিলেন, আবার তালা লাগাইলেন এবং বদ্ধদ্বারের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

উঃ, বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। নাঃ, এ দুর্ব্বলতা জয় করতেই হবে। আস্কারা পেয়ে পেয়েই আরও উচ্ছন্ন গেছে। শিক্ষা হওয়া দরকার।

বদ্ধ তালাটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া একটি পাটের শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলেন। একটি পাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া নিজের অঙ্গে ও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন

সন্ন্যাসী বলেছেন, বেশ শুদ্ধ হয়ে মন্তর পাঠ করতে হবে।

আবার একবার গঙ্গাজল ছিটাইলেন

আচ্ছা, এইবার পড়ি।

দরজাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
স্বয়ম্ভুপ্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্লং অট্ট অট্ট নিনাদিনি
কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু কুক্কুরঃ কুরু মহাকালি ॥

এইরূপ তিনবার। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে শুভঙ্করী কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চতুর্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার পর আস্তে আস্তে শুভঙ্করী ঘরের তালা খুলিয়া সন্তর্পণে ভিতরে গেলেন ও পরমুহূর্তেই সজোরে বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

ওমা, সত্যি সত্যি কুকুর হয়ে গেল যে গো!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রাহু মল্লিকের বৈঠকখানা। গভীর রাত্রি। রাহু মল্লিকের এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাত দিয়া হারাধন বিশ্বাসের পিঠ চাপড়াইতেছেন। হারাধন বিশ্বাসের হাতেও মদের গ্লাস

রাহু। বাঃ, এই তো চাই। খুশি হলাম, প্রচুর খুশি হলাম।

হারাধন। (হাসিয়া) তোমারই চেলা তো আমি। সেদিন তুমি সন্ন্যাসীর শক্ত পার্টটা করতে পারলে আর আমি এটুকু পারব না। নূতনত্ব করবার মধ্যে এইটুকু করেছি—কবিতায় ছাড়া কথা বলি নি—ব্রেক কবিতা।

রাহু। (হারাধনকে আর একটু মদ ঢালিয়া দিয়া) নাও, আর একটু নাও। এখানে এলে কি হেঁটে নাকি?

হারাধন। পাগল! চারিদিকে চেনা লোক গিজগিজ করছে।

রাহু। ট্যাক্সিতে এলে?

হারাধন। নিশ্চয়ই। গলিটা অবশ্য হেঁটে এসেছিলাম। জানলা টপকে নীচে নেমেই তো গলি।

গলিতে প'ড়েই প্রথমে কুকুরটাকে দিলাম জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে।

বাসু। কুকুরটা কোন গোলমাল করে নি ?

হারাধন। নাঃ, কিছুমাত্র না। তুমি যেমন বলেছ ঠিক তেমনই করেছিলাম। কুকুরটাকে গলির মধ্যে বেঁধে রেখে তাকে কিছু খাবার দিয়ে গিয়েছিলাম।

বাসু। গলিতে বাঁধবার সময় কোন লোকটোক এসে পড়ে নি তো ?

হারাধন। আরে, ব্লাইণ্ড লেনে অত রাতে কে ঢুকতে যাবে—

বাসু। (আরও খানিকটা মদ খাইয়া) সো ফার —অল্‌রাইট।

হারাধন। আমার ভয় হচ্ছে শুভঙ্করী যদি পাড়ার লোকজন ডেকে হেঁকে একটা হৈ হৈ বাঁধিয়ে দেয়—

বাসু। কিছু করবে না সে—ডোণ্ট কিয়ার। তোমার পরিবারটি যাকে বলে খাঁটি সোনা—একদম ভেজাল নেই।

হারাধন। না, এদিকে লোক ভাল—যাই বল।

বাসু। বলছি ত অতিশয় ভালো। তা না হলে অত সহজে বুঝে যায় যে মন্ত্র-বলে একটা জলজ্যান্ত মানুষ কুকুর হয়ে যেতে পারে—। আমাদের শরীরে আর্যরক্ত

ও অনার্য্যরক্ত মিশে এমন একটা অদ্ভুত জগা খিচুড়ি হয়েছে যে তন্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ মাদুলি, বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্ম, দুর্গা, মিস্‌মেরিজম্ ঠিকুজি, কুষ্টি যা খুঁজবে তাই মিলে যাবে।

হারাধন। আমি ভাবছি—ওর ভাইকে না খবর দেয়! আমার শালাটি আবার উকীল কি না।

ঝান্টু। তোমাকে এই বলে দিলুম ভাই দশটি দিন তোমার স্ত্রী এখন মুখটি বুজে থাকবে—

হারাধন। দশদিন কেটে গেলে তারপর কি করতে চাও তুমি।

ঝান্টু। কুকুরটাকে কোন কৌশলে সরিয়ে ফেলে তার স্থানে তোমাকে রিপ্লেস্ করতে হবে!

হারাধন। কুকুর সরাবে কি করে?

ঝান্টু। আরে সে ভাবনা আমার—তোমার ত নয়। সে আমি ঠিক করব।

হারাধন। আমার কেমন যেন একটু এ লাগছে—

ঝান্টু। এ লাগছে মানে? তুমিই ডোবাবে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত।

হারাধন। পাগল! আমাকে যা বলবে আমি বর্ণে বর্ণে করে যাব—

ঝান্টু। আচ্ছা দেখি তোমার মনের জোর কতটা।

এই আঙুলের দিকে চেয়ে থাক। কিছুতে এর থেকে দৃষ্টি সরিও না। ওয়ান, টু, থ্রি—

তর্জনী উত্তোলন করিলেন

হারাধন। আচ্ছা বেশ।

তর্জনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন

বাসু। (উত্তোলিত তর্জনী ঠিক রাখিয়া সহসা দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন) আরে, বিনয় যে—হঠাৎ এখন কি মনে করে—

হারাধন। (তৎক্ষণাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া) কই, বিনয় এলো না কি!

বাসু। (সহাস্যে) এঃ—এই বুঝি তোমার মনের জোরের নমুনা! তুমিই না ডোবাও শেষ পর্য্যন্ত—

বাসুর এই কৌশলে হারাধন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন

হারাধন। আমি ভাবলাম—সত্যি বুঝি বিনয় এল।

বাসু। (হাসিয়া) যেমন ভাবা তেমনি দেবী! থাক্ নাউ উই মাস্‌ট্ বী আপ্ এণ্ড্ ডুইং—

হারাধন। বেশ এইবার আমায় কি করতে হবে বল।

বাসু টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া আনিলেন

বাসু। এই নাও চাবি। চ'লে যাও সেই বাড়িতে—সেই যেটা তোমায় আজ সকালে দেখিয়ে নিয়ে এলাম,

সেই মেয়েদের হস্টেলের পাশেই। স্ট্রেট সেখানে চ'লে গিয়ে কার্লিং চাপদাড়ি আর ঝাঁকড়া চুল প'রে বসবাস কর কয়েকদিন।

হারাধন। কদিন থাকতে হবে সেখানে ?

বাসু ইহার কোন উত্তর না দিয়া গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

বাসু। ( হারাধনের প্রতি ) নেবে একটু ?

হারাধন। একটু দাও, বেশী দিও না।

হারাধন গ্লাস পাতিলেন ও বাসু তাহাতে খানিকটা মদ ঢালিয়া দিয়া বোতলটা টেবিলে রাখিয়া আসিলেন। মদটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া বিকৃত মুখ মুছিতে মুছিতে

কদিন থাকতে হবে সেখানে ?

বাসু। চার পাঁচ দিন। চার পাঁচ দিনেই আক্কেল হয়ে যাবে শ্রীমতীর। জীবনে আর উনি তোমার ওপর বশীকরণ প্র্যাক্‌টিস করতে সাহস করবেন না। চরম শিক্ষা হয়ে যাবে একেবারে।

হারাধন। এত রাত্রে সেখানে গিয়ে শোব কোথায় হে ?

বাসু। বিছানাপত্তর সব পাঠিয়ে দিয়েছি। বাসু মল্লিক ইজ নট এ কাঁচা ছেলে। বিছানাপত্তর সব ঠিক আছে। সোজা গিয়ে দোতলায় চ'লে যাবে। আর মনে রেখ, দাড়ি আর চুল সর্ব্বদা প'রে থাকবে, খাজা

থেকে কষ্ট ক'রে কেউ যেন তোমায় চিনে না ফেলতে পারে। তুমি হ'লে আমার আড্ডার প্রধান মক্কেল, সবাই তোমাকে চেনে। এ সিক্রেট আউট হয়ে গেলে মুস্কিল। তোমার শালা আবার উকিল। নাও, এখনই পর তুমি। ফের ফেলে দিও না যেন।

হারাধন সিন্দুক খুলিয়া দাড়ি ও চুল বাহির করিয়া পরিতে সুরু করিলেন

হারাধন। (পরিতে পরিতে) বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে এগুলোতে—

বাসু। থাম, একটু তেল মাখিয়ে দিই—আন্‌ইউজ্‌ড কিনা।

পাশের ঘর হইতে তেল লইয়া আসিলেন এবং দাড়ি ও চুলে তাহা মাখাইতে লাগিলেন

এইবার আর কোন গন্ধ থাকবে না। এস পরিয়ে দিই।

বাসু হারাধনকে চুল ও দাড়ি পরাইয়া দিলেন এবং একটু দূরে গিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

পারফেক্‌ট্‌লি অল্‌রাইট—চমৎকার হয়েছে! চ'লে যাও।

হারাধনের পিঠ ঠুকিয়া দিলেন

হারাধন। আচ্ছা, সেখানে খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ভাই?

ঝান্টু। ঠিক পাশেই একটা ভাল হোটেল আছে, যা চাই পাবে। সঙ্গে পয়সা কড়ি কিছু নিয়েছ তো?

হারাধন। ত্রিশটা টাকা নিয়েছি।

ঝান্টু। ওতেই যথেষ্ট হবে।

ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল

যাও, আর দেরি ক'র না। ট্যাক্সি ক'রে যেও।

হারাধন। আচ্ছা, তুমি আসছ তো রোজ?

ঝান্টু। আমি? ঠিক বলতে পারি না। কাল আমি একবার বাইরে যাব। ভয় কি তোমার? পাশেই মেয়েহস্টেল আছে, সুখেই সময় কাটবে। (হাস্য)

হারাধন। তুমি কাল বাইরে যাবে! সেরেছে! কোথায় যাবে?

ঝান্টু। দিল্লীতে ফুটবল খেলতে যাব। আরে ভয় কি তোমার? আমি যাব আর আসব; ভয়টা কি তোমার? বনেও যাচ্ছ না, সাগরেও যাচ্ছ না; যাচ্ছ তো কোলকাতা শহরেই আর একটা বাড়িতে। যাও, আর দেরি ক'র না, যাও।

হারাধন। (একটু ইতস্তত করিয়া) আজ রাতটা এখানে কাটালেই হ'ত না?

ঝান্টু। (সবিস্ময়ে) মাথা খারাপ নাকি তোমার?

এক্ষুনি কেউ হয় তো এসে পড়বে! আমার আড্ডায় যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন লোক এসে পড়তে পারে।

হারাধন। তা হ'লে যাই।

বাসু। যাও, কুছ পরোয়া নেই।

হারাধন চলিয়া গেলেন

হারাধন চলিয়া গেলে বাসু আর একটু মদ খাইয়া গান ধরিলেন

অলিরে কমল যদি দুবেলা মারিত ঝাঁটা,
গায়েতে থাকিত যদি মাছের মতন কাঁটা ;
কি হ'ত তা হ'লে হায় হায় ( সখীরে— )
পিপীলিকার যদি পাখা না উঠিত রে,
আগুন দেখিয়া যদি পোকা না ছুটিত রে ;
কি হ'ত তা হ'লে হায় হায় ( সখীরে— )

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

হোটেলের ভিজিটিং রুম। চুমকি ও মোহনলাল

মোহনলাল। সত্যি?

চুমকি। সত্যি মানে? নিজের চোখে দেখেছি তাই বলছি। বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছে।

মোহনলাল। আজ পর্য্যন্ত তোমার কোন্ কথাটা অবিশ্বাস করেছি আমি। আমি কথাটা সে ভাবে বলি নি। অর্থাৎ—যাক গে। লোকটা কি রকম?

চুমকি। ভীষণ।

মোহনলাল। ভীষণ মানে?

চুমকি। মানে ভীষণ। চাপদাড়ি, ঝাঁকড়া চুল—গুণ্ডা গোছের। প্যাট প্যাট ক'রে আমার দিকে চেয়ে ছিল।

মোহনলাল। চেয়ে ছিল? সেই গুণ্ডাটা ফলো করে নি তো?

চুমকি। কি জানি, হতে পারে। আমার কিন্তু ভারি ভয় করছে। বিশ্রী চেহারা লোকটার। কি যে হবে!

মোহনলাল। (চোখ ছোট করিয়া তর্জনী আস্ফালন সহকারে) এ যদি সেই গুণ্ডা হয় চুমকি, তা হ'লে তার আয়ু শেষ।

চুমকি। কি করবে তুমি?

মোহনলাল। কি করব বলতে পারি না, কিন্তু তার আয়ু শেষ। করতে অনেক কিছু পারি আমি। বেশি কিছু করতে হবে না, যুযুৎসুর একটি প্যাঁচ কশলেই ঘাড়টি মট ক'রে ভেঙে যাবে বাছাধনের। কিন্তু আই ওয়াণ্ট টু বি ফেয়ার—নির্দোষীর শাস্তি দিতে চাই না। আগে জানতে চাই লোকটার উদ্দেশ্য কি।

চুমকি। দরকার কি তোমার ওসবের মধ্যে যাবার? তার চেয়ে আমি বরং মাসীমাকে বলি তিনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন।

মোহনলাল। (আহত অভিমানের স্বরে) এইটে কি সুবিচার হ'ল চুমকি? আমার চেয়ে মাসীমার ওপর তোমার বেশি বিশ্বাস? বই জোগাড় ক'রে দেবার বেলায় আমি, আর গুণ্ডাশাসন ক'রে দেবার বেলায় মাসীমা?

চুমকি। হ্যাঁ, সেই বইটা এনেছ?

মোহনলাল। কোন্‌টা?

চুমকি। (হাসিয়া) সেই যে বলেছিলাম সেদিন।

মোহনলাল। না, সেটা এখনও পাই নি। গোর্কিটা শেষ হ'ল?

চুমকি। হ্যাঁ, আজই দিয়ে দেব। কি চমৎকার লেখা! রিয়েলি লাভ্‌লি! পড়তে পড়তে মনে হয় আমাদের দেশের সমস্যা আর রাশিয়ার সমস্যা প্রায় একই রকম। ওদের কাছে অনেক জিনিস শেখবার আছে আমাদের, নয়?

মোহনলাল। নিশ্চয়। ওদের দেশের লেনিন্—কিন্তু চুমকি, এসব কথা এখন মোটে ভাল লাগছে না। ওই পাশের বাড়ির লোকটার একটা হদিস পাওয়া আগে দরকার। পাশের বাড়িতে এসে জুটল শেষকালে! আই মীন, সেই গুণ্ডাটার কি এতখানি সাহস হবে?

চুমকি। হতে পারে লোকটা নিরীহ। চাপদাড়ি থাকলেই যে গুণ্ডা হতে হবে এমন কোন মানে নেই।

মোহনলাল। লোকটা নিরীহ যে নয়—এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। (উচ্চকণ্ঠে) এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর, ভদ্রমহিলার দিকে প্যাটপ্যাট ক'রে চেয়ে থাকে! কেবল এইটুকু অপরাধের জন্যেই ওর চোখ দুটো গেলে দিতে চাই। (তর্জনী আস্ফালন করিয়া) অ্যাণ্ড আই শ্যাল—

চুমকি। অত চেঁচিও না, এখুনি কে শুনতে পাবে। পাশের ঘরে পুষ্প রয়েছে।

মোহনলাল। কে শুনতে পাবে, কে কি মনে করবে—এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ চুমকি ? বুঝতে পারছ না, এই চাপদাড়ির আবির্ভাবে আমার ভেতরটা কি ভীষণ তোলপাড় করছে ?

চুমকি হাসিতে লাগিলেন

তুমি হাসছো চুমকি ? হাস, ভগবান তোমাদের হাসতেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, হেসে যাও। কিন্তু এটা ঠিক জেন চুমকি, প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত আমার মুখে আর হাসি ফুটবে না। তুমি যদি জানতে চুমকি, বিরাজবাবুর—মানে পিসতুতো দাদার ভায়রাভায়ের ধ দিয়ে কত অমানুষিক চেষ্টা আমি করেছি, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, কত দিন অনাহারে পর্য্যন্ত কাটিয়েছি !

হঠাৎ পাশের বাড়িতে মোটা গলায় হারাধন গাহিয়া উঠিলেন

চমকি চমকি পাপড়ি

একেলা নদীর ঘাটে          কে তুমি বসিয়া ঠাটে

কহ লো কহ লো পাপড়ি !

( চমকাইয়া ) ও কে ?

চুমকি। ( সভয়ে ) বোধ হয় সেই লোকটা। সত্যি, আমার বড় ভয় করছে। কি যে হবে !

গান চলিল

মরি কি নয়ন দুটি
ঠোঁটে হাসি ফুটি ফুটি
কটি-তটে মরে লুটি
দেখনা মা মরি মা মরি!
চলকি ছলকি গাগরি!

চুমকি ও মোহনলাল ভয়-বিস্ফারিত-নেত্রে শুনিতে লাগিলেন গান ক্রমশ দূরে মিলাইয়া গেল, যেন গায়ক গাহিতে গাহিতে দূরে চলিয়া গেলেন

মোহনলাল। ভীষণ গলা তো!

চুমকি। নাঃ, আমি মাসীমাকে এক্ষুনি খবর দিয়ে আসি।

মোহনলাল। মাসীমাকে খবর দেবার দরকার নেই; আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অর্থাৎ—মানে—

চশমাটা খুলিয়া মুছিতে লাগিলেন

চুমকি। কি দরকার তোমার সেধে এই বিপদের মধ্যে যাবার?

মোহনলাল চশমা পরিধান করিলেন

মোহনলাল। (সবিনয়ে) আমাকে একটা চান্স দাও তুমি চুমকি।

চুমকি। কিসের চান্স?

মোহনলাল। তোমার জন্যে মরীয়া হয়ে কিছু একটা

করতে চাই—এমন কিছু করতে চাই—অর্থাৎ, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, বিরাজবাবু—মানে আমার পিস্‌তুতো দাদার ভায়রাভাই লোকটা ওয়ার্থলেস। কোন সন্ধান করতে পারলে না আজও। আমি এবার নিজে কিছু একটা করব ; আমাকে এ চান্সটা তুমি দাও, প্লীজ।

চুমকি। ( হাসিয়া ) আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ি যাও তো—আমি বইটা নিয়ে আসি।

মোহনলাল। মাসীমাকে কিছু বলতে পাবে না কিন্তু।

চুমকি। ( হাসিয়া ) আচ্ছা।

চুমকি চলিয়া গেলেন

মোহনলাল। পাশের বাড়িতে বেটা শেষে আড্ডা নিলে! উঃ, এ তো ইম্‌পসিব্‌ল সিচুয়েশন হয়ে উঠল তা হ'লে !

আবার গান

আঁধার জড়ায়ে ধরে
ও মোহন অঙ্গ,
অচল বায়ুভরে
করে কত রঙ্গ,
খোঁপাতে গুঁজেছ ফুল,
কানেতে পরেছ দুল,
মাধুরী হারায় কূল
রাখিতে পার নি আবরি !
চলকি ছলকি গাগরি !

সাংঘাতিক গলা তো লোকটার !

গান চলিল

একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি মদির ঠাটে
কহ লো কহ লো নাগরি।
চলকি ছলকি গাগরি।

গান আবার ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল

( ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ) এ তো রীতিমত অশ্লীল গান। কি ক'রে বেটার নাগাল পাওয়া যায়। কোত্থেকে জুটলো এ! হু ইজ হি?

চুমকি বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন

চুমকি। এই নাও তোমার বই। সে বইটা কবে পাব?

মোহনলাল। পরশু কিম্বা তার পরদিন—অর্থাৎ পেলেই দেব। কিন্তু পাশের বাড়ির এ লোকটা তো একটা স্কাউণ্ড্রেল দেখছি।

চুমকি। সেদিন কি কুক্ষণে লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে আর শান্তি নেই আমাদের কারও। এ লোকটা যে কোথা থেকে হঠাৎ এল, এর উদ্দেশ্যই বা কি—ভগবানই জানেন!

মোহনলাল। কুছ পরোয়া নেই। আমি বলছি—কুছ পরোয়া নেই। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমি তোমার কোন—

চুমকি। (বাধা দিয়া) ছি ছি, ভুলে যেও না এ মেয়েদের হস্টেল। কি রকম লোক তুমি !

মোহনলাল। আই অ্যাম নো লেস অ্যাণ্ড নো মো ম্যান এ লাভার। আমি তোমায় ভালবেসেছি চুমকি- এটা কি অপরাধ ?

চুমকি। সেটা অপরাধ না হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে মাতামাতি করবে তুমি এই দিন দুপুরে ? ছি !

আবার গান

চলকি ছলকি গাগরি,
একেলা নদীর ঘাটে কে তুমি নদীর ঘাটে
কহ গো কহ গো নাগরি !

অদ্ভুত কাণ্ড !

মোহনলাল। লজ্জা করে না বেটার ওই গলা নিে গান গাইতে ?

হাত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিলেন। গান চলিতে লাগিল

মরি কি নয়ন দুটি
ঠোঁটে হাসি টুটি টুটি,
কটিতটে ঘড়া দুটি
দেখলে যা মরি যা মরি !
চলকি ছলকি গাগরি।

গান আবার ঘুরে চলিয়া গেল

না:, এর ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। কদিন থেকে এসেছে লোকটা ?

চুমকি। তা ঠিক জানি না। কাল থেকে দেখছি। চাকরটা বলছিল যে পরশু থেকে নাকি এসেছে। চাকরটা আরও বলছিল যে দুপুরে একবার আর রাত্তিরে একবার নাকি বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বাইরে তালা লাগিয়ে যায়। চাকরটাই বলছিল; আমি ঠিক জানি না। আমি ঘরে গেলেই দেখি, সে জানলায় জানলায় উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। কি বিশ্রী চেহারা লোকটার!

মোহনলাল চক্ষু বুজিয়া কপালে আঙুলের টোকা মারিতে লাগিল

মোহনলাল। একটা আইডিয়া এসে গেছে।

চুমকি। কি ?

মোহনলাল। লোকটা যখন বেরিয়ে যাবে, তখন একটা চাবিওলা ডাকিয়ে একটা ডুপ্লিকেট চাবি করাব। তারপর সেই চাবি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখব আগে লোকটা কি রকম। ফট ক'রে একটা কিছু করা ঠিক নয়। আই মাষ্ট বি কেয়ার টু হিম। চট ক'রে বিরাজবাবুকে খবর দেওয়াটা উচিত হবে না। নিজে ভেতরে ঢুকে আগে হালচালটা বুঝে নিয়ে তবে প্রণীত

করব। হঠাৎ যদি এসে পড়ে, ল'ড়ে যাব। আই ডোণ্ট কেয়ার। আই শ্যাল ফাইট।

সবেগে রেবার প্রবেশ

রেবা। চুমকিদি, তুমি ওপরে চল। আমার ভারি ভয় করছে। পাশের বাড়ির সেই লোকটা জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে; আমি সেদিকে চাইতেই ভেংচি কাটলে।

মোহনলাল। ডেঞ্জারাস লোক তো!

বাহিরে কলরব শোনা যাইতে লাগিল

রেবা। সব মেয়েরাই ভয় পেয়েছে।

চুমকি। মাসীমা কোথায়?

রেবা। কি জানি কোথায় বেরিয়েছেন। ফেরেন নি এখনও।

চুমকি। আচ্ছা চল, আমি যাচ্ছি। ভয় কি? ওদিককার জানালা দুটো বন্ধ ক'রে দিলেই তো চুকে যায়।

রেবা। (মোহনলালের প্রতি) আপনি সেদিন যে আছি এনে দিয়েছিলেন তার বহর ভয়ানক ছোট।

মোহনলাল বাহিরের কলরবে ও এই আকস্মিক ব্যাপারে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন

মোহনলাল। আছি? ও! আচ্ছা, বড় বহরেরই এনে দেব। কতটা চাই আপনার?

রেবা। ও কাপড়টা কি হবে তা হ'লে ?

মোহনলাল। দিয়ে দিন আমাকে, ফেরত দিয়ে দেব।

রেবা। কাটা কাপড় ফেরত নেবে তো ?

মোহনলাল। সে আমি ব্যবস্থা করব। আপনি দিন তো। যান নিয়ে আসুন, আমি ইজ নো প্রব্লেম নাউ।

রেবা। আমার একা যেতে ভয় করছে চুমকিদি, তুমি চল।

চুমকি। কি ভীতু মেয়ে বাবা !

দুইজনেই চলিয়া গেলেন। বাহিরে মেয়েদের গীতি-কলরব শোনা যাইতে লাগিল। গানটাও আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গান শুনিতে শুনিতে মোহনলাল অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় দুরুদুরিত হইয়া উঠিল

ছলকি ছলকি গাগরি !

একেলা নদীর ঘাটে          কে তুমি নদির ঘাটে

কহ গো কহ গো নাগরি !

খোঁপাতে গুঁজেছ ফুল,

কানেতে পরেছ দুল,

মাধুরী ছাপায় কূল

রাখিতে পার কি আগরি।

ছলকি ছলকি গাগরি !

শুভঙ্করী ও কুকুর। শুভঙ্করী কুকুরটির সম্মুখে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী সাজাইয়া দিয়াছেন ও তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ভাল কার্পেটের আসন বিছাইয়া কুকুরকে তাহার উপর বসানো হইয়াছে। ভাল থালায় পরিপাটিরূপে ভাত বাড়া রহিয়াছে, বাটিতে বাটিতে নানারকম ব্যঞ্জন। পাখা দিয়া শুভঙ্করী কুকুরকে বাতাস করিতে করিতে খাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন

শুভঙ্করী। আর একটু খাও না। সবই তো প'ড়ে রইল। পালং শাকের চচ্চড়ি তো ছুঁলেও না একটু। খাও, একটু খাও। খাইয়ে দেব ?

পালং শাকের চচ্চড়ির বাটি কুকুরের মুখে ধরিলেন। কুকুর মুখ সরাইয়া লইল

খাবে না ? আচ্ছা, ও না খাও তো মোচার ঘণ্টটা খাও। তাও খাবে না ? যা যা তুমি ভালবাস তাই তো রেঁধেছি বাপু। ছানার ডালনা খাবে ? তাও তো খাচ্ছ না ভাল ক'রে ?

কুকুর এসব কথায় বিচলিত না হইয়া নিজের খুশিমত কখনও একটু খাইল, কখন খাইল না। খাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। ক্রমাগত খাইয়া খাইয়া বেচারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল

আচ্ছা, তা হ'লে এই ক্ষীরটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। খা—ও। আবার দুষ্টুমি করে! না খেলে শরীর থাকবে

কেন বাপু! খালি হাড় আর কাঁটা ছাড়া আর কিছুতে তোমার রুচি নেই। তুমি তো আর সত্যি সত্যি কুকুর নও। শুধু হাড় আর কাঁটা খেয়ে বাঁচবে কি ক'রে! আর পাঁচটা দিন কোন রকমে কেটে গেলে বাঁচি— মন্তরটি প'ড়ে মানুষ ক'রে নিই। সন্ন্যাসী ব'লে গেছেন দশ দিন পরে মন্তর পড়তে; তাই ভয়ে ভয়ে আগে পড়তেও পারছি না। কি জানি, যদি কোন অনিষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, ক্ষীর না খাও এই আচারটুকু খেয়ে নাও। কত ভালবাস তুমি তেঁতুলের আচার, খা—ও। আঃ, ভাল জ্বালাতনে পড়েছি আমি।

সদর দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ। শব্দ পাইবামাত্র শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি কুকুরটিকে সরাইয়া পাশের ঘরে লইয়া গেলেন ও কুকুরকে ঘরের ভিতর রাখিয়া ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। সদর দরজা খুলিয়া দিতেই নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

নয়নতারা। (খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া) ও, তুই খেতে বসেছিলি? এত সকাল সকাল, এখনও দশটা বাজে নি যে!

শুভঙ্করী। একা একা কি করি! (হাসিলেন)

নয়নতারা। হারাধনবাবু ফিরবেন কবে?

শুভঙ্করী। কি জানি! বলেছিলেন তো পাবনা থেকে ঢাকা হয়ে তারপর গৌহাটি যাবেন; দার্জিলিঙেও যেতে হবে নাকি। দশ পনেরো দিন লাগবে নিশ্চয়।

নয়নতারা। বাবা! এতদিন বাইরে থাকবেন? কই, এর আগে হারাধনবাবুকে কোলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরুতে তো দেখি নি! একা গেছেন, মা, কেউ সঙ্গে আছে?

শুভঙ্করী। একাই গেছেন। ব্যবসার কাজে বেরিয়েছেন।

নয়নতারা। ও।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

মঙ্গলহাটিতে আমার বোনকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাব এসে গেছে আজ। তোর কপাল ভাল, মাহুলি পাওয়া যাবে।

শুভঙ্করী। মাহুলি? মাহুলি থাক এখন। উনি আগে ফিরুন ভালয় ভালয়।

নয়নতারা। বেশ, তবে এটা জেনে রেখ, মাহুলি তোমায় ব্যাভার করতেই হবে। কারণ গৌহাটিই যান আর যেখানেই যান মানুষটি তো বদলাবে না। কথায় বলে, স্বভাব না যায় মলে—ইল্লৎ না যায় ধুলে। তা ছাড়া মদ যে বড় ভয়ানক জিনিস, হয়তো ফিরছেন না সেই কারণেই। (মুচকি হাসিয়া) মনোমত ইয়ার জুটে গেছে হয়তো।

শুভঙ্করী এসব কথায় বিরক্ত হইতেছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাবে বোঝা গেল

শুভঙ্করী। কপালে যা আছে তাই হবে, অদেষ্ট ছাড়া তো পথ নেই।

নয়নতারা। সে কথা তো একশোবার। তবু মাছুলিটা ধারণ করা ভাল—বিশেষত নিতু ঠাকুরের মাছুলি।

শুভঙ্করী। না ভাই, মাছুলি এখন থাক। ফিরুন আগে উনি, তারপর দেখা যাবে।

নয়নতারা। সেটা তুমি ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ ভাই!

শুভঙ্করী। এতে আর ভাবাভাবি কি আছে--উনি আসুন আগে তারপর মাছুলির কথা ভাবব!

নয়নতারা। পাগল না মাথাখারাপ! ওঁর আসার সঙ্গে মাছুলি ধারণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে! এসব স্বামীকে লুকিয়েই ধারণ করতে হয়—তাতে বেশী ফল হয়—

শুভঙ্করী। না ভাই, উনি আসুন আগে—

নয়নতারা। এ আচ্ছা অবুঝের পাল্লায় পড়লাম তো! ঈশ্বর না করুন, ধর - যদি উনি না ফিরে আসেন, তখন যে ওঁকে ফেরাবার জন্তেই এই মাছুলি ধারণ করতে হবে তোকে। এই সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছিস না কেন তুই!

শুভঙ্করী। উনি ফিরবেন না কেন? না ফেরবার কি আছে।

নয়নতারা। আবার বাজে তক জুড়লি তুই। পুরুষ মানুষ যে কেন বাড়িতে ফেরে না সে কথা তারাই বলতে পারে। আমি কি ক'রে জানব—আমার স্বামী তো আর বারফট্‌কা নয়। তোরই বরং একটু আধটু জানার কথা—

শুভঙ্করী। কেন ভাই, মিছে আর এ নিয়ে কথা বাড়ানো। আমি মাদুলি এখন নেব না।

নয়নতারা। এমন পাগল তো আমি দেখি নি বাপু। তোরই অনুরোধে চিঠি লিখলাম, এখন তুই নিজেই নিতে চাইছিস না! অবাক্ কাণ্ড।

শুভঙ্করী কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

এ মাদুলি কি সোজার পাওয়া যায়! আমার বোন নিজে গোপাল ঠাকুরের কাছে গিয়ে কত কাকুতি মিনতি ক'রে তবে জোগাড় করেছে। নিতু ঠাকুর যেমন দিল-দরিয়া মানুষ ছিলেন তাঁর ছেলেটি—মানে গোপাল ঠাকুর হয়েছেন ঠিক তার উল্টো। একেবারে কুচুটের ধাড়ী! কম বেগ দিয়েছে সে মাদুলি দিতে!

শুভঙ্করী। মাদুলি কি এসে গেছে নাকি?

নয়নতারা। তুই না বললে আসবে কি ক'রে! অমনি তো আর আসবে না—নগদ সওয়া পাঁচটি টাকা চাই —সওয়া সের বাতাসা চাই—সওয়া সের গাওয়া ঘি চাই —একটি কালো পাঁঠা চাই—একখানি লালপাড় শাড়ি চাই। মা কালীর পূজো দিয়ে মায়ের পায়ে সিঁদুর নিয়ে তবে না মাদুলি তৈরি হবে! হাঙ্গামা কি কম!, সব হাঙ্গাম পোয়াতে হবে আমার বোনকে। অনেক ক'রে লিখেছিলাম তাকে—

শুভঙ্করী। আমি বলি এখন থাক ওসব হাঙ্গাম।

ঘরের ভিতর কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কপাটও আঁচড়াইতে লাগিল

নয়নতারা। (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে) ঘরের ভেতর কিসের শব্দ? সেই কুকুরটা নাকি?

শুভঙ্করী। হ্যাঁ।

নয়নতারা। কুকুরকে ঘরে ঢুকিয়েছিস কেন? মঙ্গলহাটির মাদুলি যদি নাও ওসব অনাচার চলবে না বাপু—তা ব'লে দিচ্ছি। ভারি নিয়মের মাদুলি। কুকুরকে ঘরে ঢোকানো কেন? যত সব অনাছিষ্টি তোর!

কুকুর কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল

শুভঙ্করী। উনি যাবার সময় অনেক ক'রে ব'লে গেলেন কিনা, কুকুরটার যেন অযত্ন না হয়, অনেক টাকা দিয়ে কিনেছেন।

নয়নতারা। কই, হারাধনবাবুর কুকুর পোষার সখ তো আগে ছিল না। সখেরও আবার ছিরি দেখে বাঁচি না। ওই হতভাগা কুকুর টাকা দিয়ে কেনে লোকে। আমাকে তো বিনা পয়সায় দিলেও অমন খেড়ে কুকুর আমি নিই না। ছি ছি, মদ খেলে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিও লোপ পায়।

শুভঙ্করী। যাক ভাই, বার বার ওই এক কথা আর ভাল লাগে না আমার।

কুকুরটা আরও জোরে চেঁচাইতে লাগিল

দেখি, ওটার আবার কি হ'ল!

ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন

নয়নতারা। (আহার্য্য সামগ্রী দেখিয়া) বাবা! ঠাকরুণ ভোগটি তো নিয়ে বসেছেন কম নয়। আট দশ রকম তরকারি—তা ছাড়া ক্ষীর, পায়েস, দই, দু তিন রকম সন্দেশ, আচার, মোরব্বা,—বাকি আর কিছু নেই! বাবা, অত বড় মাছের মুড়োটাও একলা ব'সে ব'সে খাবে! (গালে হাত দিলেন) ধন্য প্রবৃত্তি বাবা! ওঁর একদিন

অসুখ করলে, কি কোন কারণে খাওয়া না হ'লে আমি তো নিজের জন্যে রান্নাই করি না, ইচ্ছেই করে না।

এই স্বগতোক্তি বাধা পাইল। শুভঙ্করী বাহির হইয়া আসিলেন ; সঙ্গে কুকুর

শুভঙ্করী। যাই, এটাকে চানের ঘরে বেঁধে রাখি গে। ঠাণ্ডায় না রাখলে ভারি চেঁচায়। ভাল জাতের কুকুর কিনা!

নয়নতারা। (ওষ্ঠভঙ্গি সহকারে) ভাল জাত না হাতী!

শুভঙ্করী এ কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া স-কুকুর স্নানের ঘরে ঢুকিলেন

আমি ভাই, যাই তা হ'লে এখন। মাদুলিটার কি করব জানতে এসেছিলাম। মানা ক'রে দিই তা হ'লে। আমি বলি, আনতে দিই একটা, দরকারে লাগে পরবি ; আর দরকারে লাগবেই, আজ না হয় কাল।

শুভঙ্করী। ( স্নানের ঘর হইতে ) না, এখন থাক।

নয়নতারা। ( হাত দুইটি উল্টাইয়া ) তবে থাক। তোমার ভালর জন্যেই লিখেছিলাম, এখন তোমার যদি দরকার না থাকে আমার আর গরজ কি! মাঝ থেকে আমার খরচ ক'রে চিঠি লেখাও সার হ'ল, আর তাদের কাছে মুখও রইল না।

স্নানের ঘর হইতে কোন জবাব আসিল না

চললাম তা হ'লে এখন।

একটু মানভাবে মমতারা প্রস্থান করিলেন। মমতারা চলিয়া গেলে শুভঙ্করী কুকুর লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন

শুভঙ্করী। এ দিন কটা কেটে গেলে বাঁচি। এস, খাবে এস, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আবার কে হয়তো এসে পড়বে এক্ষুনি!

কুকুরকে লইয়া আবার আসনে বসাইলেন

খাও, আর দুটিখানি ভাত খেয়ে নাও, দুটিখানি। ও কি! এমন স্বভাব তো ছিল না আগে তোমার! আচ্ছা মুড়োটা খাও তা হ'লে। না, মুড়োটা খেতেই হবে, লক্ষ্মীটি! এমন করলে শরীর টিঁকবে কেন! ছি!

কুকুরকে লইয়া সাধাসাধনা চলিতে লাগিল

**মেয়েদের হস্টেলের পাশের বাড়ির একটি কক্ষ। এইখানে হারাধন অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। ঘরে কেহ নাই। হারাধন খাইতে গিয়াছেন। নির্জন দ্বিপ্রহর। ঘরের মধ্যে একটি এলোমেলো বিছানা, দড়ির আলনায় দুই একখানি কাপড়, একটি জলের কুঁজা, একটি মদের বোতল ও একটি কাচের গ্লাস রহিয়াছে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি রহিয়াছে একটি শ্রীহীন টেবিলের উপর। ঘরের দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডারের ছবিও টাঙানো আছে। ছবিটির বিষয়—এক মেমসাহেব চটুল ভঙ্গিতে সিগারেট খাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ঘরে অন্য কোন আসবাব আর দেখা যাইতেছে না। অতি সন্তর্পণে মোহনলাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন**

মোহনলাল। (এদিক ওদিক চাহিয়া) অনেক কষ্টে তো ঢোকা গেল ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে। দেখি, এখন কোন প্রূফট্রুফ পাওয়া যায় কিনা। আই মাষ্ট বি কেয়ার। ফট ক'রে বিরাজবাবুকে খবর দেওয়াটা উচিত হবে না। যদি নির্দোষ হয় লোকটা। কিন্তু যত দূর বুঝতে পারছি—এ হয় গুণ্ডা, না হয় প্রেমিক; একটা কিছু বটেই। আর এটাও ঠিক গুণ্ডাই হোক আর প্রেমিকই হোক, এ ব্যাটার লক্ষ্য চুমকির ওপর। ড্যাম সোয়াইন।

**ঘাড় ও হস্তদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন**

কিন্তু কি ক্লু পেতে পারি? যদি গুণ্ডা হয় ছোরা-ছোঁরা একটা পাওয়া যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু প্রেমিক হ'লে কি ক্লু পাওয়া যেতে পারে?

কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল

কবিতা। প্রেমিক হ'লে নির্ঘাৎ কবিতার খাতা পাওয়া যাবে। আমার মত লোকও প্রেমে প'ড়ে কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছে। ধূমাৎ বহ্নিঃ। কবিতার খাতা পাওয়া গেলেই বুঝতে হবে যে ইন স্পাইট অফ হিজ চাপদাড়ি হি ইজ এ প্রেমিক। যাক, আর সময় নষ্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না। বিছানা-টিছানাগুলো উল্টেপাল্টে দেখা যাক, লোকটার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া করা দরকার।

বিছানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন

কই, ছোরা কবিতা কিছুই তো নেই! তবে কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে নাকি বেটা!

এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার দিকে নজর পড়িল

বাঃ, গ্র্যাণ্ড ছবিখানা তো! সুন্দর ফিগার! বিউটি-ফুল!

পিছনে খট করিয়া শব্দ হওয়াতে মোহনলাল চমকাইয়া উঠিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন চাপদাড়ি-ঝাঁকড়াচুল-সমন্বিত হারাধন প্রবেশ করিয়াছেন ও সবিস্ময়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ হারাধন চক্ষু দুইটি আরও বিস্ফারিত করিয়া হস্ত দুইটি পিছন দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া মোহনলালের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতে লাগিলেন। কিছু দূর আগাইয়া আসিয়া থামিয়া গেলেন এবং বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি মোহনলালের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে আকর্ণবিস্তৃত মুখব্যাদান করিলেন এবং এমন দুই পাটি দন্ত মেলিয়া দ্রুতপদে আবার খানিকটা আগাইয়া আসিলেন ; অর্থাৎ পাগলের অভিনয় শুরু করিলেন

হারাধন। খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

তাড়া করিয়া গেলেন

মোহনলাল। ( সভয়ে পিছাইয়া গেলেন ) এ কি !

হারাধন। ( মুখভঙ্গি করিয়া ) পেছিয়ে গেলে চলবে না যাদু। শামুকের গোঁফ দেখেছ ? কাছিমের জুলফি ?

আরও খানিকটা আগাইয়া আসিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে মোহনলাল রীতিমত ঘাবড়াইয়া আরও একটু পিছাইয়া গেলেন

দেখ নি ? কি দেখেছ তা হ'লে ? কি ব'লে ডাকব তোমায় ? ধন, চাঁদ, না মিঞা ? নামতা জান ? জরিপ ? জিওমেট্রি ? কাঁদতে ? হাসতে ? খুকেপোষ বুনতে ? চুলকোতে পার ? সুড়সুড়ি দিতে ? কি পার তা হ'লে ? উল্লুক।

হাত কিড়মিড় করিয়া দৌড়িয়া আরও খানিকটা আগাইয়া গেলেন।
মোহনলালকে নিরুপায় হইয়া কোণ আশ্রয় করিতে হইল।
হারাধন হঠাৎ অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাহিয়া উঠিলেন

সখি রে কি পুছসি অনুভব মোয়
সোহি পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

মোহনলাল। ( সভয়ে ও ক্ষীণকণ্ঠে ) আমি জানতে এসেছিলাম—আপনি কে? এখানে এমনভাবে কেন রয়েছেন? অর্থাৎ—

হারাধন। ( ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া গাহিয়া চলিলেন )

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তাহার পর অকস্মাৎ এক হাত মাথায় ও আর এক হাত কোমরে
দিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন

তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন।

মোহনলাল। ( সবিস্ময়ে ) পাগল নাকি!

হারাধন। ( পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে করিতে ) তাক্

ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া ঘুষি পাকাইয়া মোহনলালের দিকে ছুটিয়া গেলেন

চোয়াল চুরমার করব এবার।

মোহনলাল। ( সবেগে ছুটিয়া ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে চলিয়া গেলেন ) আরে বাপস্, এ যে বদ্ধ উন্মাদ! কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো! কি করি আমি!

হারাধন। ( গতিরোধ করিয়া ও মুখ ভ্যাংচাইয়া ) কি করা হয় কর্ত্তার?

মোহনলাল। আমি কলেজে পড়ি।

হারাধন। পড়? ক ইঙ্গিতে হাতী হয় বল দেখি?

মোহনলাল। হাতী?

হারাধন। ( দাঁত খিঁচাইয়া ) মারব পেটে লাথি। আই মীন গজ! ক ইঙ্গিতে গজ হয়? এবং ক ইঙ্গিতে দিগ্‌গজ?

মোহনলাল। দিগ্‌গজ? ( অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন )

হারাধন। রোমিওর দাদা অমিয়র কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? নিকোবরদ্বীপপুঞ্জ কোন্ সমাস? লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে ফেলে বনে পালাল কেন? রুট কত কি?

মূলা নক্ষত্র কোন্ রাশিতে আছে? কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশন জান? গোলাপ গাছে কোন্ সার দিতে হয়? ঔরঙ্গজেব আলমগীর হয় কোন্ সালে?

( হঠাৎ সুরে )

সামান্য বিদ্যেও নেই পেটে রে
ক্ষমা কর ভগবান বম্বেটেরে

পুনরায় পূর্ব্ববৎ নৃত্য

তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন, তাক ধিনা ধিন।

মোহনলাল। ( আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁসিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ) ইস, ঘোর উন্মাদ! এখন পালাতে পারলে বাঁচি। এখন অন্যমনস্ক আছে। এই ফাঁকে—

হারাধন। ( হঠাৎ নৃত্য থামাইয়া ) খবরদার! ওই বোতলে হাত দিয়েছিলে? ( মদের বোতল দেখাইলেন )

মোহনলাল। ( সভয়ে ) আজ্ঞে না।

হারাধন। কি আছে ওতে জান? সন্ধান পাও নি তো কি আছে ওতে?

মোহনলাল। জানি না। সিরাপ?

হারাধন। (ভ্যাংচাইয়া) জিরাফ! চশমার পাওয়ার কত?

হারাধন গিয়া বোতলের ছিপি খুলিয়া ও নাড়িয়া বোতলটা দেখিলেন ও তাহার পর তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মোহনলাল ক্রমশ এক পা এক পা করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহাকে পলায়নপর দেখিয়া হারাধন বোতলটা তুলিয়া লইয়া তাহাকে তাড়া করিলেন

হারাধন। বোতল-পেটা করব আজ। খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।

মোহনলালের সবেগে পলায়ন

এ ছোঁড়া আবার কোত্থেকে এসে জুটল, অ্যাঁ? ঢুকলই বা কি ক'রে? পাগলের পার্ট প্লে ক'রে একে তাড়ালাম বটে, কিন্তু এ বেটা তো গিয়ে আর পাঁচজনকে এক্ষুনি খবর দেবে। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। জানাজানি হয়ে গেলেই মুস্কিল। বাসুর পাল্লায় প'ড়ে এ এক মহাফ্যাসাদে প'ড়ে গেছি দেখছি। বাসুরও দেখা নেই। সে দিল্লী থেকে ফিরল কিনা কে জানে। ঠিক পাশের বাড়িতে একপাল যুবতী কিলবিল করছে, আর আমি ব্যাটা ফল্‌স গোঁফদাড়ি প'রে বেকুবের মত ক্যাল ক্যাল ক'রে চেয়ে দেখছি। এ কি ট্র্যাজিডি! এদিকে ঘরে আমার শুভঙ্করী কুকুরটাকে নিয়ে কি করছে কে জানে। নাঃ, কটা দিন গেলে বাঁচা যায়। এখন একমাত্র সান্ত্বনা এই।

মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন

কলেজ স্কোয়ার। কাল দ্বিপ্রহর। স্কোয়ার প্রায় নির্জন। একটি গাছের তলায় বেঞ্চিতে মোহনলাল বসিয়া আছেন। সম্মুখে রেবা দণ্ডায়মান। তাহার বগলে বই-খাতা। নিকটে আর কোন লোক নাই

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) বলেন কি, পাওয়া যাচ্ছে না? দিস ইজ আন্‌থিঙ্কেব্‌ল! পাওয়া যাচ্ছে না! সে কি?

উত্তেজনায় চশমাটা খুলিয়া আবার পরিলেন

রেবা। না, চুমকিদিকে আজ ভোর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি প'ড়ে গেছে।

মোহনলাল। সে কি? কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা—

রেবা। হ্যাঁ, রাত্তিরেও তো ছিল। রাত্তিরে যখন শুতে যাই, চুমকিদি আমাকে বললে মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে। সকালে উঠে দেখি চুমকিদি নেই। প্রথমটা ভাবলাম, বুঝি বাথরুম টাথরুমে গেছে। কিন্তু একটু পরেই জানাজানি হয়ে গেল। দরোয়ান বললে সদর দরজা ভোরবেলা খোলা ছিল। অথচ

মাসীমা বলছেন, তিনি ভেতর থেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তালাবন্ধ করিয়েছেন। নিশ্চয়ই তা হ'লে ডুপ্লিকেট দিয়ে খুলে বেরিয়ে গেছে।

মোহনলাল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিলেন

মোহনলাল। কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না আমার।

রেবা। আর একটা ইয়ে কি হয়েছে জানেন? (নিম্নস্বরে) সবাই আপনাকে সন্দেহ করছে।

মোহনলাল। আমাকে? মানে?

রেবা। আপনি চুমকিদির সঙ্গে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে নাকি কি সব বলছিলেন, পাশের ঘরে পুষ্প তার দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল, সে সব শুনেছে আর মাসীমাকে ব'লে দিয়েছে। আমরা সব্বাই মানা করলাম। আমি কত তর্ক করলাম পুষ্পর সঙ্গে যে, আপনি কক্‌খনও এমন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু পুষ্প মেয়েটি এমন লাগানে!

মোহনলাল। ননসেন্স!

রেবা। আপনি এখন আমাদের হষ্টেলে কয়েক দিন যাবেন না।

মোহনলাল। যাব না মানে? নিশ্চয়ই যাব। আই স্যাল মুভ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ। চুমকিকে পাওয়া

যাচ্ছে না—উঃ, এ যে ভাবতেও পারছি না আমি! পাশের বাড়ির সেই চাপদাড়ি লোকটা আছে?

রেবা। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। সত্যি, কি ভয়ানক দেখতে লোকটা! ওর মনে কি আছে কে জানে! যখনই দেখি, তখনই জানলায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা লোকটার জ্বালায়। মাসীমা হস্টেলের সেক্রেটারিকে খবর পাঠিয়ে-ছিলেন; তিনি নাকি পুলিসে খবর দিয়েছেন।

মোহনলাল। ইউস্‌লেস! ও লোকটা পাগল। আমি ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঢুকেছিলাম ওর বাড়িতে। পুওর ফেলা, দেখে দয়া হ'ল; তাই কিছু করতে আর ইচ্ছে হ'ল না, চ'লে এলাম। নেহাৎ গোবেচারি! ওকে হ্যারাস্‌ ক'রে লাভ কি?

রেবা। আপনি ঢুকেছিলেন? ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে?

মোহনলাল। হ্যাঁ, চুমকির সঙ্গে আমার এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল।

রেবা। ও, তাই বুঝি ডুপ্লিকেট চাবির কথা হয়েছিল আপনার চুমকিদির সঙ্গে? উঃ, পুষ্পটা কি সাংঘাতিক মেয়ে! কিছু না জেনে শুনে দিব্যি আপনার নামে লাগিয়ে দিলে! গিয়ে বলব তো আজ পুষ্পকে!

মোহনলাল। (তাহাকে থামাইয়া দিয়া) আমি ওসব মোটেই ভাবছি না মিস রেবা। পুষ্প টুম্প মাসীমা চাসীমা সব ঠিক হয়ে যাবে, কারণ আমি নির্দোষ। আমি শুধু ভাবছি, চুমকি গেল কোথা? চুমকিকে পাওয়া যাচ্ছে না—এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না যে মিস রেবা। সত্যিই কি তাকে গুণ্ডায় হরণ করলে শেষ পর্য্যন্ত? উঃ, নাঃ, আর ভাবতে পারছি না।

দুই হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিলেন

কি করা উচিত?

রেবা নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন

রেবা। সত্যি, কি যে হয়ে গেল।

মোহনলাল। আচ্ছা, চুমকির আসল বাড়ি কোথা জানেন? আমি অনেকবার জানতে চেয়েছি, সে বলে নি।

রেবা। কি জানি! শুনেছিলাম ওঁর বাপ মা কেউ নেই।

মোহনলাল। আশ্চর্য্য, এ কথাও আমাকে চুমকি বলে নি কোন দিন।

রেবা। ক্লাসে যাবেন না আপনি? (আবার হাত-ঘড়ি দেখিলেন) এর পরের পিরিয়ডেই তো আপনার

ক্লাস, আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি আছে। এখানে ব'সে কি হবে? তার চেয়ে চলুন ক্লাসে।

মোহনলাল। আমার কিছু ভাল লাগছে না—নাথিং। তুষকি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, অথচ আমি অক্ত মেহে ব'সে আছি! অসহ্য! একটা কিছু করা 'দরকার, এক্ষুনি।

চশমাটা পরিধান করিলেন এবং দক্ষিণ জানুর উপর বাম পদটি চাপাইয়া দিয়া তাহা আবেগভরে নাচাইতে লাগিলেন। কপালে কুঞ্চিত

রেবা। (একটু ইতস্তত করিয়া) আমি যাই তা হ'লে, আমার আবার পার্সেন্টেজ কম আছে—কামাই করা চলবে না। চললাম।

রেবা চলিয়া গেলেন। মোহনলাল কোন উত্তর না দিয়া দুই জানুর উপর দুই কনুই স্থাপন করিলেন এবং হেঁটমুখে মাথার চুলের মধ্যে দুই হাতের আঙুল চালাইতে লাগিলেন। রেবা আবার ফিরিয়া আসিলেন

আচ্ছা, আপনি বড় বছরের আভিটা কিনেছেন নাকি?

মোহনলাল। (চমকাইয়া) আভি?

রেবা। সেই যে সেদিন বলেছিলেন। না কিনে থাকেন তো থাক, এখন দরকার নেই। অমিতাদি বলছিলেন আজ মার্কেটে যাবেন।

মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন

মোহনলাল। আংটির কথা ভাবছেন আপনি এখন? চলুন, এক্ষুনি কিনে দিচ্ছি। ক খান চাই আপনার?

রেবা। (লজ্জা পাইয়া) না না, আমি তা মীন করি নি। আমি ভাবলাম, আপনার এখন হস্টেলে যাওয়াটা ঠিক নয়। হয়তো আপনি আংটিটা দেবার জন্যে যাবেন আবার, তাই বলছিলাম যদি না কিনে থাকেন—

মোহনলাল। (উত্তেজিতভাবে) ড্যাম ইট। দেখুন, আমি ক্রিমিনালও নই, কাপুরুষও নই; আমি আজই সন্ধ্যের সময় যাব আপনাদের হস্টেলে এবং আংটি নিয়েই যাব। দেখি, কি করতে পারেন আপনাদের মাসীমা! হোয়াট ক্যান ইওর মাসীমা ডু? যদি কিছু বলতে আসেন, তাঁর মুখের উপর স্পষ্টই বলব, আমি চুমকিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, এখনও চাই এবং চিরকাল চাইব। দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন ইট। (হঠাৎ ভগ্নকণ্ঠে) চুমকির হঠাৎ অন্তর্ধানে আমার মনের মেরুদণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না মিস রেবা। প্লীজ ডোন্ট বি অফেণ্ডেড! অফেণ্ডেড হ'লেই বা কি করব। আই হ্যাভ টু ফেস এভরিথিং নাউ—এভরিথিং'। চুমকির জন্য যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করতে আমি প্রস্তুত—আই অ্যাম বাউণ্ড টু—

সহসা দুই জন কনস্টেবলসহ একজন দারোগার প্রবেশ

দারোগা। (রেবার প্রতি) আমায় ক্ষমা করবেন। এঁর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

রেবা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন

(মোহনলালের প্রতি) আপনার নাম কি মোহনলাল চক্রবর্ত্তী?

মোহনলাল। হ্যাঁ। কি চান আপনি?

দারোগা। আপনি কি কলেজ ষ্টুডেন্ট?

মোহনলাল। হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

দারোগা। কোন লেডিজ' হষ্টেলে আপনার যাতায়াত আছে?

মোহনলাল। হ্যাঁ, আছে। কেন?

দারোগা। আপনাকে অ্যারেষ্ট করবার ওয়ারেণ্ট আছে। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মোহনলাল। আমাকে? অ্যারেষ্ট?

রেবা। সে কি!

দারোগা। আই অ্যাম সো সরি। কিন্তু উপায় নেই—এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।

ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন

মোহনলাল। ( শুকমুখে ) কিছু বুঝতে পারছি না তো। উইল ইউ বিলিভ মি? চুমকির ব্যাপার আমি কিছু জানি না। আমি ইনোসেণ্ট, বিশ্বাস করুন।

দারোগা। যা বলবার থানায় বলবেন। চুমকি কে?

মোহনলাল। চুমকি ব'লে একটি মেয়েকে হস্টেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ( সকাতরে ) বিশ্বাস করুন, আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না। এইমাত্র আমি শুনলাম এঁর কাছ থেকে। ( রেবাকে দেখাইলেন )

দারোগা। আসুন আমার সঙ্গে, একটু পরেই সব বুঝতে পারবেন। ( কনস্টেবল্‌দিগের প্রতি ) এই, সার্চ কর।

কনস্টেবল সার্চ করিয়া বিশেষ কিছু পাইল না

চলুন।

মোহনলাল। চললাম মিস রেবা।

মোহনলালকে লইয়া দারোগা ও কনস্টেবল চলিয়া গেলেন। রেবা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন

রেবা। উঃ, কি সাংঘাতিক মেয়ে বাবা পুষ্প!

প্রস্থান

হারাধনের বাড়ি। শয়নকক্ষ। তক্কী কুকুরকে লইয়া বিছানার উপর মুখ করিয়া বসিয়াছেন। কুকুরের গায়ে হারাধনবাবুর জামা, গলায় হারাধনবাবুর কম্ফর্টার। তক্কী কুকুরকে আদর করিতেছেন। বিছানার পাশে টিপয়ের উপর কমলালেবু, বেদানা, আঙুর, আপেল প্রভৃতি থরে থরে সাজানো রহিয়াছে।

কুকুর শয়ান।

তক্কী। আর পারি না বাপু আমি তোমাকে নিয়ে। গায়ে জামাকাপড় না রাখলে কি চলে অসুখের সময়! এ কি মুস্কিল! কুকুর হয়ে তোমার দৌরাত্ম্য আরও বেড়েছে দেখছি।

কুকুর জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

না না না, অমন করে না। লক্ষ্মীটি! অসুখ করেছে, অমন দস্যিপনা করলে কি এখন চলে। দিন কটা কেটে গেলে যে বাঁচি আমি। মন্তরটি প'ড়ে আবার মানুষ ক'রে দিই। বেদানা খাবে? খাও, দুটি বেদানা খাও।

বেদানা ভাঙিয়া একটি খাওয়াইতে দিলেন

খেলে। খাবে না? আঙুর, লেবু কিছুই তো খাচ্ছ না! লক্ষ্মীটি খাও। বাবা বাবা! ডাক্তার যে কখন আসবে বুঝতে পারছি না। খালি হাড় আর কাঁটার রুচি।

ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠিয়েছি, তিনি এসে যদি কিছু বলেন—দেখি। নয়নতারারও তো কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কয়, শুনে হাড় জ্বলে যায়। অথচ ওকে চটাতেও সাহস পাই না। ওদের সাহায্য না নিলে চলেও না। এক কোয়া নেবু খাও, আমার মাথার দিব্যি, একটি কোয়া।

নেবুর কোয়া মুখে ধরিলেন। কুকুর খাইল না

এ কি বিপদে পড়লাম আমি!

নয়নতারা। (নেপথ্য হইতে) কোথায়, ভজহরী, ঘরের ভেতর নাকি?

ভজহরী তাড়াতাড়ি কুকুরের মুখ হইতে বাটা প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন
নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

কি লো, তোর কুকুর কেমন আছে? আচ্ছা, তোর মাথা খারাপ নাকি, কুকুরকে নিয়ে বিছানায় বসে আছিস? (গালে হাত দিয়া) মাগো মা!

ভজহরী। কি করি ভাই, বড্ড অসুখ যে। ডাক্তারবাবু তো এখনও এলেন না। খবর পাঠিয়েছিলি তো?

নয়নতারা। হাঁ, পাঠিয়েছিলাম বইকি। আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি কুকুরের চিকিৎসা করতে পারবেন না। তবে তিনি কুকুরের [illegible]

একটা ঠিকানা দিলেন। চাকরটাকে তো পাঠিয়েছি সেখানে। চাকরটা তো সকাল থেকে ওই নিয়েই আছে। ডাক্তার আসবে এখুনি। কিন্তু তোর এ কি দশা হ'ল?

শুভঙ্করী। কি দশা দেখলি?

নয়নতারা। কুকুর নিয়ে তুই ক্ষেপে যাবি দেখছি শেষে। কুকুরকে বিছানায় তুলে অয়েলক্লথ পেতে শোয়ানো—এ তো বাপের জন্মে দেখি নি কখনও। ওই তো ও-বাড়ির পরেশবাবুরও কুকুর আছে। তাদের তো বাপু কুকুর নিয়ে এত আদিখ্যেতা নেই। দিব্যি শেকল দিয়ে উঠোনে বাঁধা আছে। বিষ্টি বাদলে বড় জোর বারান্দায় ওঠে। মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে চান করায়। বাস্, ফুরিয়ে গেল। তোর মতন কুকুর নিয়ে—

শুভঙ্করী। (বাধা দিয়া) তুই থাম তো। যা বুঝিস না, তা নিয়ে ভ্যানোর-ভ্যানোর করিস কেন? পরেশবাবুদের কুকুর আর এ কুকুর কি এক নাকি? এ কুকুর যে কি কুকুর তা তুই কি বুঝবি! এখন ডাক্তার তাড়াতাড়ি এলে বাঁচি, কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে সকাল থেকে।

নয়নতারা। এই সব আঙুর বেদানা নেবু—তাও কি সব কুকুরের জন্যে নাকি?

শুভঙ্করী। আনিয়ে রেখেছি, যদি ডাক্তার বলে খেতে দোব।

নয়নতারা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নয়নতারা। সত্যি কথা বলতে কি আমার কেমন যেন ভাল ঠেকছে না। হারাধনবাবু কবে ফিরবেন? চিঠিপত্তর এসেছে কোন?

শুভঙ্করী। (সস্বাঁকে) না।

নয়নতারা। তোমার রকম-সকম আমার ভাল ঠেকছে না বাপু।

শুভঙ্করী (আর সামলাইতে না পারিয়া) ভাল ঠেকছে না মানে? আমার কুকুর নিয়ে আমি যা খুশি করব। তোমার তাতে কি? আমার খুশি আমি তাকে নিয়ে বিছানায় শোব, আমার খুশি আমি তাকে আঙুর, বেদানা, নেবু, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার, মোরব্বা, পালং-শাকের ঘণ্ট—যা খুশি খাওয়াব। তোমার এতে চোখ টাটায় কেন? তোমার যদি ভাল না লাগে, আসতে হবে না তোমাকে। আমি যা পারি একলাই করব।

নয়নতারা। (সহানুভূতিভরে) যা ভেবেছি ঠিক তাই। যার স্বামী লক্ষ্মীছাড়া তার তো এ দশা হবেই। পাগলই হয়ে গেছে। আহা! কুকুরের নয়, এরই এখন চিকিৎসার দরকার আগেই দেখছি। হারাধনবাবু

বাড়ি নেই, আমাদেরই এখন কর্তব্য এর একটা ব্যবস্থা করা। কুকুরকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি—এ তো বাপু সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। না, আমার ভাল ঠেকছে না। (মাথা নাড়িলেন) ওঁকে এখুনি আমি গিয়ে বলছি। ব্যবস্থা করা দরকার একটা। আহা, কি ছিল কি হয়ে গেল।

প্রস্থান

শুভঙ্করী। এ এক ভাল বিপদে পড়েছি আমি। ইচ্ছে করছে এখুনই মন্তর প'ড়ে মানুষ ক'রে নিই। কিন্তু সন্ন্যাসী ব'লে গেছে দশ দিন রাখতে। আগে মন্তর পড়লে যদি কিছু অনিষ্ট হয়! দরকার নেই। এ কটা দিন কেটে গেলে বাঁচি।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

শুভঙ্করী। (অশ্রুাদি সম্বরণ করিয়া) এসেছেন? ডেকে নিয়ে আয় এইখানে।

ঝি চলিয়া গেলে শুভঙ্করী গায়ে মাথায় আরও ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া দিলেন এবং কুকুরটিকে বাতাস করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঝি কোটপ্যান্টপরা ডাক্তারকে লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবু আসিয়া নমস্কার করিতে শুভঙ্করী আড়-ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তারবাবু দ্বিতীয় চেয়ারটিতে উপবেশন করিলেন

ডাক্তারবাবু। বলুন বলুন, আপনি বলুন। ও, এই কুকুরের অসুখ? কি হয়েছে?

শুভঙ্করী। পেট খারাপ হয়েছে। বমিও করেছে বারকয়েক।

ডাক্তারবাবু। পেট খারাপ? খাওয়া দাওয়ার কি কোন রকম গোলমাল হয়েছিল?

শুভঙ্করী। কই? না।

ঝি। সে কথা ব'ল না বাপু। ও কুকুর যা খায় তেমন খাবার আমাদেরও জোটে না। কুকুরের পেটে কি অত সয়?

শুভঙ্করী। তুই চুপ কর, তোর সব তাতে কথা বলবার দরকার কি?

ডাক্তারবাবু একবার ঝি ও একবার শুভঙ্করীর মুখের দিকে চাহিলেন

খাওয়া অবশ্য আমরা যা খাই তাই খায়। ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, তরকারি—

ঝি। আরও বল—ক্ষীর, দুধ, দই, পায়েস, আচার, মোরব্বা—

শুভঙ্করী। কেন তুই কথা বলছিস?

ঝি। ওমা, ডাক্তারের কাছে বলব না তো কার কাছে বলব?

শুভঙ্করী। আচ্ছা, তুই বাইরে যা।

ঝি সক্রোধে বাহির হইয়া গেল

পুরোনো ঝি কিনা—ভারি বেয়াদপ। খাওয়া দাওয়ার কথা জিগ্যেস করছিলেন? তা খাওয়া দাওয়া—

ডাক্তারবাবু। বুঝেছি, খাওয়া দাওয়ার গোলমাল হয়েছে একটু।

শুভঙ্করী। আমার কিন্তু মনে হয় ডাক্তারবাবু, পেটে ঠাণ্ডা লেগেছে। কাল সমস্ত দিন ওই চান-ঘরটায় পড়ে ছিল, জলের ওপর।

ডাক্তারবাবু। ও, তাই নাকি? সাধারণত কিন্তু পেটের গোলমাল হয় খাওয়া দাওয়ার অত্যাচারে।

শুভঙ্করী। (যেন অনিচ্ছা সহকারে ডাক্তারের মত সমর্থন করিয়া) তা হ'লে কি খেতে দেব বলুন?

ডাক্তারবাবু। আজকের দিনটা উপোস করিয়ে রাখুন।

শুভঙ্করী। উপোস? একেবারে ঠায় উপোস করতে পারবে কি? বলেন তো বেদানা টেদানা কিম্বা নেবু—। খালি পেটে ও একেবারে থাকতে পারে না, জানি তো আমরাই।

ডাক্তারবাবু। (হাসিয়া) এ কি মানুষ যে অসুখ

হ'লে বেদানা খাবে? যতক্ষণ না পেট ঠিক হবে ও নিজেই কিছু খেতে চাইবে না। খেতে চাইলেও জল ছাড়া আর কিছু দেবেন না। পেট ঠিক হয়ে গেলে তখন লাইট ফুড দিতে পারেন। দেখি একটু—

কুকুরটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন

একে বিছানায় এমন ক'রে জড়িয়ে মড়িয়ে রেখেছেন কেন? কিছু দরকার নেই তো। তা ছাড়া পেট খারাপ যখন—

শুভঙ্করী। তার জন্যে আমার কোন অসুবিধে নেই। নীচে খাটজোড়া অয়েলক্লথ পাতা আছে।

ডাক্তারবাবু সম্ভবত এরূপ আভিজাত্যশালী কুকুর-রোগী ইতিপূর্বে আর দেখেন নাই। তিনি সামান্য একটু কুঞ্চিত করিলেন

ডাক্তারবাবু। অত হাঙ্গামা না করলেও পারতেন। (হাসিয়া) তবে আপনার যদি না অসুবিধে হয় আমার এতে আপত্তি আর কি!

পরীক্ষা শেষ করিলেন

শুভঙ্করী। ওষুধ কি দেবেন কোন?

ডাক্তারবাবু। ওষুধ? দেখুন না আজকের দিনটা। কুকুরকে ওষুধ খাওয়ানো আবার একটু হাঙ্গাম তো।

শুভঙ্করী। ওদের কি কোনও কারণ দেখেছেন?

ডাক্তারবাবু। না, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয় আজকের দিনটা উপোস দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

শুভঙ্করী। আপনি একবার আসবেন ওবেলা ?

ডাক্তারবাবু। ওবেলা ? ওবেলা আসার বোধ হয় দরকার হবে না। আজকের দিনটা দেখুন না। কাল সকালে খবর দেবেন, দরকার হয় কাল না হয় আসা যাবে।

শুভঙ্করী। না, আপনি ওবেলা একবার আসবেন।

ডাক্তারবাবু। ( হাসিয়া ) বেশ।

শুভঙ্করী উঠিয়া দেরাজ খুলিয়া ফী দিলেন

নমস্কার। চলি তবে।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন

শুভঙ্করী। শুনলে তো ? জল ছাড়া আর কিছু পাবে না। কেমন শাস্তি ! আর মদ খেয়ে এসে মাতলামি করবে ? আর ক'র না, কেমন ? লক্ষ্মীটি ! আর তো চার দিন মাত্র বাকি ; চারটি দিন কেটে গেলেই মন্তরটি প'ড়ে আবার তোমায় মানুষ ক'রে নেব, কেমন ? এখন গায়ে জামা-কাপড় দিয়ে লক্ষ্মীটির মত চুপ ক'রে ব'সে থাক।

আবার তাহাকে কম্ফর্টার প্রভৃতি পরাইতে লাগিলেন

ঝান্টু মল্লিকের বাড়ি। কয়েকটি ছোকরা একটি স্ট্রেচার বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। স্ট্রেচারের উপর ঝান্টু মল্লিক শায়িত

ঝান্টু। আস্তে আস্তে।

বারান্দায় স্ট্রেচার নামানো হইল

এইবার ঘরের ভেতর আমার বিছানাটা ক'রে দাও দেখি। এই নাও চাবি। (চাবি দিলেন) উঃ, পা-টা জখম ক'রে দিয়েছে একেবারে। ফ্র্যাক্চার হয় নি এই যা রক্ষে।

দুই জন ছোকরা চাবি খুলিয়া ভিতরে গেল

প্রথম ছোকরা। ঝান্টুদা, আপনি না থাকলে আমাদের নির্ঘাৎ হার হ'ত, ভাগ্যে ছিলেন আপনি।

ঝান্টু। (সস্মিত মুখে) কি রকম গোলটা বাঁচিয়েছিলাম!

দ্বিতীয় ছোকরা। ওয়াণ্ডারফুল!

ঝান্টু। যাক, ওইটেই সান্ত্বনা। এখন পা-টা ঠিক হ'লে বাঁচি—পা অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা আমার বিছানাটা ক'রে শ্রীমান নটবরকে খবর দাও দিকি একবার।

দ্বিতীয় ছোকরা। নটবর কে ?

বাসু। আমার চাকর—বামাপুকুরে থাকে।

দ্বিতীয় ছোকরা। হ্যাঁ, এক্ষুনি ডেকে আনছি।

প্রস্থান

বাসু। তোমরা আমার বিছানা টিছানা ক'রে আমাকে এক কাপ চা ক'রে দিয়ে বাড়ি চ'লে যাও। যাবার সময় চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে যেও। খাওয়া দাওয়া সেরে তারপর এস। আমি বর্দ্ধমানে যা খেয়ে নিয়েছি, আমার আর কিছু দরকার হবে না। হ্যাঁ, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে মিষ্টার দত্তকে খবর দিও তো যে আমি ব্রিজ টুর্নামেন্টে তাঁর পার্টনার হয়ে খেলতে রাজি আছি। কিন্তু ( হাসিয়া ) ফী লাগবে এক বোতল হুইস্কি—ক্যাশ ডাউন। ততদিনে পা ভাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হারাধনেরও খবরটা নিতে হবে। সে কি করছে কে জানে। আচ্ছা, আগে একটু ধাতস্থ হওয়া যাক। ওহে, আমার বেতের বাক্সটা এসেছে ? দেখ তো, তাতে হুইস্কির বোতলটা আছে। বার কর তো হে।

প্রথম ছোকরা। জিনিসপত্তর সব এখনও গাড়ি থেকে নামানো হয় নি। দেখি কোথায় আছে।

বাহিরে চলিয়া গেল

বাচ্চু। (সুরে) ভালবাসি ভালবা

টুলালালা টুলালালা লা—

বাসি ভাল বাসি ভাল

টুলালালা টুলালালা লা

যে ছেলেটি বাহিরে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল—হস্তে বেতের বাক্স

বাচ্চু। থ্যাঙ্কইউ!—এইবার বার কর দিকিন্—

বেতের বাক্স খুলিয়া ছেলেটি একটি হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া বাচ্চুর হস্তে দিল

প্রথম ছোকরা। এইবার বন্ধ করে দি বাক্সটা?

বাচ্চু। বাঃ—গেলাস দাও—এখনও বোতলে মুখ লাগিয়ে খাবার মত অবস্থা হয় নি। সোডাও দেখ আছে একবোতল—। এঃ তুমি এখনও একদম গ্রীন্ হে!

ছেলেটি অপ্রস্তুত মুখে বাক্স হইতে একটি গ্লাস ও একবোতল সোডা বাহির করিল

এই নাও ঢাল। সোডাটা খোল—

প্রথম ছোকরা। (খানিকটা মদ ঢালিয়া) আর ঢাল্‌ব?

বাচ্চু। আর ঢাল্‌বে মানে? ওতে ত ঠোঁটও ভিজবে না—

প্রথম ছোকরা। (আরও খানিকটা ঢালিয়া) এবার ?

বাচ্চু। ওতে ঠোঁট ভিজতে পারে—গলা ভিজবে না। সাহস করে ঢালই না খানিকটা—ভয় কি।

ছেলেটি বেপরোয়া হইয়া ঢালিতে লাগিল

বাস্ বাস্ আর নয়—এইবার সোডাটা খোল। সোডা খোলবারটা ওই বাক্সেই আছে দেখ—

ছেলেটি সোডা খুলিবার কাঠের ক্যাপ্‌টি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সোডার বোতল খুলিয়া ফেলিল ও সোডা-হুইস্কি বাচ্চুকে দিল

প্রথম ছোকরা। চা করব ?

বাচ্চু। (এক ঢোঁক পান করিয়া) আঃ—বাঁচা গেল ! চা ? বেশ ত কর না ! তোমরা খাও—

প্রথম ছোকরা। স্টোভ কি ভেতরে আছে ?

বাচ্চু। থাকা ত উচিত। দেখ দিকি—

প্রথম ছোকরা ভিতরে গেল। বাচ্চু মনে চুমুক দিতে দিতে গান ধরিলেন

ভালবাসি ভালবাসি
টুলালালা টুলালালা লা
বাসি ভালো বাসি ভালো
টুলালালা টুলালালা লা

জানি না কাহার লাগি
উতলা রজনী জাগি
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ
হুঁ লালালা হুঁ লালালা লা—

ভিতর হইতে ষ্টোভ জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল

যাক্ ষ্টোভটা জেলেছে তাহলে—

প্রথম ছোকরার প্রবেশ

প্রথম ছোকরা। কেৎলিটা কোথা আছে দেখতে পাচ্ছি না ত।

বাসু। মিট্ সেফের ভেতর দেখ—সব পাবে। বিছানা হল?

প্রথম ছোকরা। হচ্ছে! বালিশ খুঁজে পাচ্ছে না ওরা।

ভিতরে চলিয়া গেল

বাসু শ্রীমান নটবর কোথায় সব রেখে গেছেন গুছিয়ে। ব্যাটার গোছানর জ্বালায় পাগল করেছে আমায়।

গুনগুন করিয়া আবার গান ধরিলেন

সন্ধ্যা-বেলায় তুই
কি কথা বলিস জুঁই
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ
হুঁ লালালা হুঁ লালালালা

দূর ছাই—মনেও থাকে না গানগুলো?

353

দ্বিতীয় ছোকরার সহিত নটবরের প্রবেশ

আসুন আসুন গোল্ডেন্ মুন—আসুন।

নটবর। পায়ে কি হুজুরের—

চিন্তিত ভাবে পায়ের দিকে চাহিল

বাহু। পায়া ভারি হয়েছে! তুমি সে চিন্তা ছেড়ে ভেতরে গিয়ে বিছানা টিছানাগুলো কর দিকি। আর বাবুদের চা করে খাওয়াও।

নটবর। আজ্ঞে—(দ্বিতীয় ছোকরার প্রতি) আসুন বাবু—

দ্বিতীয় ছোকরার সহিত নটবর ভিতরের দিকে গেল

বাহু। যাক্—লোটো এল বাঁচলাম—

ছোকরা চারিজন ও নটবর আবার পুনঃ প্রবেশ করিল

বিছানা হয়ে গেছে?

নটবর। হাঁ হুজুর।

বাহু। তোল তাহলে—

সকলে ক্রোড়ে ধরিয়া তুলিল

আস্তে আস্তে আস্তে—

ক্রোড় সমেত বাহু মল্লিককে ভিতরে লইয়া গেল

মোহনলালের পিসতুতো দাদার জামাতাই বিরাজবাবুর বাসাবাটি। বারান্দার উপর বিরাজবাবু ও মোহনলাল দাঁড়াইয়া আছেন, যদিও নিকটেই একটি টেবিলের সম্মুখে দুই তিনখানি চেয়ার রহিয়াছে। বিরাজবাবু লোকটির আকৃতি মোটাসোটা চেহারা। পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তা-দেওয়া পাকা গোঁফ, ঝাঁকড়া পাকা চুল। পাকা পুলিস অফিসার। পরনে খাকি হাফশার্ট ও প্যান্ট। বাঁ হাতে চওড়া চামড়ার ব্যাণ্ডে একটি মজবুত সোনার রিস্ট-ওয়াচ। মুখ দেখিলেই মনে হয় লোকটি বুদ্ধিমান। কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত, মুখ ঈষৎ হাস্যময়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মোহনলাল যেন মুষড়াইয়া গিয়াছেন

বিরাজবাবু। দেখ ভায়া, তোমাকে অনেক কষ্টে নিজে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। এইবার কিন্তু তোমায় সাবধানে চলতে হবে। কলেজে লেখাপড়া করছ—লেখাপড়া কর। এ সব তো ভাল কথা নয়। আমার মনে হয় এইবার একটা বিয়ে ক'রে ফেল। বল তো তোমার বাবাকে চিঠি লিখি। আমার জানা-শোনা একটি পাত্রী আছে—আমারই পোষ্য। মেয়েটি ভাল—পড়াশোনা করছে।

মোহনলাল। মাপ করবেন, আমি বিয়ে করতে পারব না।

বিরাজবাবু। কেন?

মোহনলাল চুপ করিয়া রহিলেন

বিয়ে করবে না কেন? বাঙালীর ছেলে বিয়ে করবে না—এটা কি একটা কথা হ'ল?

মোহনলাল। আমি চুমকিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

বিরাজবাবু। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) হা হা হা হা হা—চুমকিকে বিয়ে করবে! মাই গড!

মোহনলাল। হাসছেন কেন? চুমকি কোথা? তার কি কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

বিরাজবাবু। দেখ, এ সব কথার জবাব আমি দিতে পারব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, চুমকির নাগাল আর তুমি পাবে না। ও-আশা ত্যাগ কর।

মোহনলাল। আজীবন আমি খুঁজব তাকে। নাগাল পাব না কেন?

বিরাজবাবু। (আবার হাসিয়া উঠিলেন) না, পাবে না। কেন পাবে না তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু পাবে না।

মোহনলাল। কেন?

বিরাজবাবু। দুনিয়ায় সব 'কেন'র কি জবাব আছে? ওটাও মনে কর সেই জাতীয় একটা প্রহেলিকা।

মনে কর, একটা ঝড়, এসেছিল, চলে গেল। ঝড়কে কেউ বিয়ে করতে পারে না। (হাস্য)

মোহনলাল। বিলিভ্ মি—ঝড় নয়—সে আমাকে কথা দিয়েছিল—উইথ্ হার ওন্ লিপ্স্।

বিরাজবাবু। কি কথা দিয়েছিল—?

মোহনলাল। কথা দিয়েছিল সে আমাকে বিয়ে করবে।

বিরাজবাবু। (আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) কথা দিয়েছিল তোমাকে বিয়ে করবে—হা হা হা হা—রিয়েলি!

মোহনলাল। (একটু চটিয়া) আপনি কি মনে করছেন আমি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি?

বিরাজবাবু। মোটেই না। তোমার এই অতি-গম্ভীর হাবভাব দেখেই বরং আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু না—আর হাসি নয়—এবার কাজের কথা হোক। চুমকি তোমাকে কোন দিন বিয়ে করবে না এটা ঠিক—শিওর অ্যাজ—

মোহনলাল। কি করে জানলেন আপনি?

বিরাজবাবু। আমি জানি—

মোহনলাল। কি জানেন?

বিরাজবাবু। আমি জানি চুমকি নামক যে যুবতীর

পাড়ায় তুমি পড়েছিলে তিনি তোমাকে কোনকালে বিয়ে করবেন না।

মোহনলাল। কি করে জানলেন আপনি?

বিরাজবাবু। তা আমি তোমাকে বলব না। গুরুতর বাধা আছে। সব কথা বলা যায় না—

মোহনলাল। কি এমন সিক্রেট থাকতে পারে তা ত আমি বুঝতে পারছি না—

বিরাজবাবু। ডোণ্ট্ ট্রাই—(হাসিলেন)

মোহনলাল। আচ্ছা, আমাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল কেন তাও বলবেন না?

বিরাজবাবু। না, তাও বলব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, আমি না থাকলে তুমি ছাড়া পেতে না। আর এটাও জেনে রাখ, বিয়ে করা ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই।

মোহনলাল। বাঃ, আমি যদি বিয়ে না করি?

বিরাজবাবু। (জোর গলায়) ইউ মাষ্ট। করবে না কেন? না করবার হেতু কি থাকতে পারে? (কণ্ঠস্বর নরম করিয়া) ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

উভয়ে চেয়ার টানিয়া বসিলেন

মোহনলাল। দেখুন, আমাকে কিছুদিন ভাববার সময় দিন অন্তত।

বিরাজবাবু টেবিলের উপর দুই কনুই স্থাপন করিয়া টেবিলে ভর দিয়া বেশ বাগাইয়া বসিলেন

বিরাজবাবু। দেখ, এ সব ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তার স্থান নেই। ভেবে কোন কূলকিনারাও করতে পারবে না; কেউ কখন পারেও নি। ফোড়া যখন পেকেছে এবং তা কাটানো ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে? ছুরিটা বসাবার বেলায় একটু লাগবে বটে, কিন্তু তারপরই আরাম।

মোহনলাল। বিয়ে এক্ষুনি করতেই হবে—এ জবরদস্তির অর্থ কি?

বিরাজবাবু। (একটু হাসিয়া) দেখ ভাই, অর্থহীন কথা আমরা বড় একটা কই না। যা বলছি তার রীতিমত অর্থ আছে। বিবাহ না করলে পুলিস তোমার পিছু ছাড়বে না। আবার ধরবে।

মোহনলাল। মানে?

বিরাজবাবু। মানে ওই। ওর চেয়ে বেশি মানে আর বলতে পারব না। (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) বলতে চাইও না। ম্যারি ইউ মাস্ট।

মোহনলাল নির্বোধের মত তাকাইয়া রহিলেন। বিরাজবাবু আবার কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া সুরু করিলেন

আমি তোমার জন্যে যে পাত্রীটি ঠিক ক'রে রেখেছি—নিজের চোখেই দেখবে এখুনি—মোটেই খারাপ নয়। গান গাইতে জানে, তা ছাড়া কলেজে পড়ছে। আজ তোমাকে এখানে নিয়ে আসব ব'লে মেয়েটিকেও আনিয়ে রেখেছি। তুমি নিজের চোখে দেখ, গান শোন। আচ্ছা, গানটাই হয়ে যাক আগে। মেয়েটি ভারি লাজুক—অচেনা লোকের সামনে গাইতে লজ্জা পায়। পাশের ঘর থেকে গাইবে, শোনার কোন অসুবিধে হবে না। ব'লে আমি দাঁড়াও।

মোহনলালকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বিরাজবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে) ভাল ক'রে জোরে গাও—ও-সব লজ্জা-টজ্জা ছাড়।

বিরাজবাবু বাহিরে আসিলেন

শোন গান। সুন্দর গায়।

নেপথ্য হইতে গান

প্রিয় কেন নাহি আসে
ফাল্গুনরাতে।
মনের কলিটি মোর চলে গো ফেলে
অচেনা নদীর স্রোতে অজানা দেশে।
কপালি জোছনা আজ নীরবে এসে
কাঁদায় মাথে।

সকল অলকার ঝলকতা,
অজানা মনের মধু গন্ধতা।
কোন্ সে সাগর কূলে বিজন বনে
গভীর আঁধারে ঘুরি আপন মনে।
মনের বাঁশীর গান কে যেন শোনে
গভীর রাতে।

কি রকম লাগল ?

মোহনলাল। বেশ সুন্দর !

বিরাজবাবু। বললাম না ? (উচ্চকণ্ঠে) এইবার চা-টা নিয়ে এস, আর দেরি ক'র না।

একটি চাকর ট্রে-তে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। পিছনে একটি প্লেটে জলখাবার লইয়া [illegible] রেবা

মোহনলাল। (সবিস্ময়ে) একি—মিস্ রেবা !

রেবা। আপনি ?

বিরাজবাবু। একি, তোমাদের আলাপ ছিল নাকি ! তা হ'লে তো আরও ভাল হ'ল।

রেবা ও মোহনলাল নির্বাক হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

শুভঙ্করী ও কুকুর। কুকুর একটি সোফার উপর বসিয়া আছে। শুভঙ্করী নিকটে বসিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন। তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। পরিধানে পট্টবস্ত্র.

শুভঙ্করী। বাঁচলাম এবার। আজ দশ দিন শেষ হ'ল। এইবার মন্তরটি প'ড়ে ভালয় ভালয় তোমায় আবার মানুষ ক'রে নিতে পারলে বাঁচি। ঝিটাকে গঙ্গাজল আনতে পাঠিয়েছি সেই কোন্ সকালে, এখনও তো এল না! ঘরে গঙ্গাজল ছিল, কিন্তু ভয় হ'ল সে বাসি পুরোনো জলে যদি কাজ না হয়! এত দেরি হচ্ছে কেন ঝিয়ের?

উঠিয়া পড়িলেন এবং আকুল প্রায় হইয়া সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া আসিলেন

কই, না, ঝিয়ের দেখা নেই। বাড়ী থেকে বেরুলেই একেবারে বাঘের মাসী। গেছে কি এখন! এক ঘণ্টার বেশি হবে। গঙ্গার ঘাটে গল্প লাগিয়েছে কারও সঙ্গে যায় কি! আলাপী লোক তো পথেঘাটে!

কুকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন ও কুকুরের মাথায় গায়ে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন

তোমারও নিশ্চয় আনন্দ হচ্ছে ? খু—ব আনন্দ হচ্ছে ? খু—ব ? সত্যি ? মাগো মাগো মাগো—

আবেগে কুকুরকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিগলিত কুকুর লেজ নাড়িতে লাগিল

আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। উঃ, সত্যি বলছি। আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না! এ দশটা দিন যে কি ক'রে কাটিয়েছি। কুকুর হয়েও কি তুমি কম জালিয়েছ আমায়! কদিন অসুখ নিয়ে কি নাকালই হ'ল আমায়। মানুষ হয়ে আর দুষ্টুমি ক'র না যেন। করবে না তো? (হাসিয়া) আবার তা হ'লে কুকুর বানিয়ে দোব। ভয়ানক মন্তর শিখে ফেলেছি। দেখলে তো মন্তরের জোর? আর আমার মনে অমন কষ্ট দেবে না তো রোজ রোজ? আর দিও না, কেমন? লক্ষ্মীটি!

কুকুর লেজ নাড়িতে লাগিল। একটু থামিয়া তরুণী আবার শুরু করিলেন

এ কদিন কত কষ্ট পেলে দেখ দিকি। এ দশ দিন কি তোমার খাওয়া হয়েছে, না, নাওয়া হয়েছে। অসুখেই তো কদিন গেল। আজ মন্তর প'ড়ে মানুষ ক'রে সামনে বসিয়ে খাইয়ে বাঁচব আমি। আজ ইলিশমাছ আনিয়ে রেখেছি মশাই। মাংসের কিমাও আনিয়েছি, কাটলেট

ক'রে দোব ওবেলা। না, এবেলা আর নয়। পেটটা তোমার স্থবিধে যাচ্ছে না। এবেলার জন্যে বুটের ডাল, মোচা, ধোঁকার ডালনার জোগাড় ক'রে রেখেছি। এর ওপর আবার কাটলেট হ'লে বড্ড বেশি গুরুপাক হয়ে পড়বে। কাটলেট ওবেলা খেও, কেমন ?

কুকুর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়িতে লাগিল

কানের ঘা-টা কেমন আছে দেখি। কেন শুধু শুধু বেরালের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়া। জানই তো, ওবাড়ির হুলোটা কি ভীষণ দস্যি! অনর্থক কানটা আঁচড়ে দিয়ে গেল। বেরালের নখে শুনেছি ভয়ানক বিষ। দেখি, কেমন আছে কানটা!

কুকুরের কান দেখিতে লাগিলেন। ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাঁকালে এক কলসি গঙ্গাজল। ঝি আসিতেই গৃহকর্ত্রী কান ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া পড়িলেন

আচ্ছা ঝি, তোর আক্কেল কি রকম ? সেই কোন্ সকালে তুই গেছিস বল দেখি ?

ঝি কলসি নামাইল

ঝি। আক্কেল আমার, না, আক্কেল তোমার ? ঘরে এক কলসি গঙ্গাজল মজুত, তাতে তোমার মন উঠল না। গঙ্গাজল যে পুরোনো হয়ে গেলে অশুদ্ধ হয়ে যায় তা তো

বাপু এই প্রথম শুনছি। গঙ্গাজলের আবার বাছ-বিচার! গঙ্গার ঘাট কি এখান থেকে কম দূর?

শুভঙ্করী। যতই দূর হোক, এতক্ষণ লাগবে তা বলে? আজ কি তুই নতুন হ'লি নাকি? গঙ্গার ঘাটে আজ কি নতুন যাচ্ছিস তুই?

ঝি। ফ্যাসাদ কি একরকমের? আদ্ধেক রাস্তা এসেছি, এক পোড়ারমুখো মেথরে এসে ছুঁয়ে দিলে। সে জল সব ফেলে দিয়ে আবার গিয়ে চান ক'রে কলসি মেজে ফের জল আনলাম। দেরি তো হবেই। হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাট কি এখানে!

শুভঙ্করী। বেশ শুদ্ধভাবে এনেছিস তো?

ঝি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! শুদ্ধভাবে না আনব তো কষ্ট ক'রে দুবার গেলাম কেন? মেথরে-ছোঁয়া জলই তো এনে দিয়ে যেতে পারতাম।

শুভঙ্করী। অনেক বাড়িতেই পুরোনো ঝি আছে, কিন্তু তোর মতন এমন ঢোপা আমি খুব কম ঝিয়েরই দেখেছি।

ঝি। (অধীরভাবে) কোথায় এখন রাখব বল?

শুভঙ্করী। কোথায় আবার রাখবি? দিন দিন তুই নতুন হচ্ছিস নাকি? পুজোর ঘরে রেখে আয়।

ঝি পূজার ঘরে গঙ্গাজল রাখিয়া ফিরিয়া আসিল

ঝি। এইবার তা হ'লে আমি যাই।

শুভঙ্করী। আচ্ছা, আসবার সময় ওবেলা ভাল মাংস কিনে আনিস আধ সের। পয়সা নিয়ে যা। ভুলিস নি যেন। বাবু আসবেন আজ।

আঁচল হইতে খুলিয়া পয়সা দিলেন

ঝি। আচ্ছা।

ঝি চলিয়া গেল। শুভঙ্করী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন এবং একটি পিতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন

শুভঙ্করী। সন্ন্যাসী ব'লে গেছেন অচলা ভক্তিভরে মন্ত্রপাঠ ক'রে তিনবার গঙ্গাজল তোমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে।

গঙ্গাজল ছিটাইতে লাগিলেন

কি আনন্দ হচ্ছে যে আমার। এইবার মন্তরের কাগজটা নিয়ে আসি। আমার আর তর সইছে না।

ঘরের ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানি লইয়া আসিলেন এবং এবারে পুনরায় চতুর্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
অয়ত্ন প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং হ্রূং অষ্ট অষ্ট নিনাদিনি
মহুতঃ ফুরু মহুতঃ ফুরু মহুতঃ ফুরু মহাকালি॥

এইরূপ তিনবার পাঠ করিলেন এবং প্রতিবার কুকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। কুকুর কিন্তু মানুষ হইল না। শুভঙ্করী বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কুকুরটার পানে চাহিয়া রহিলেন

এ কি হ'ল। হ'ল না তো। আর একবার বলি তা হ'লে।

গঙ্গাজল ছিটাইয়া আবার মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন

প্রসীদ মুণ্ডমালিনি চামুণ্ডে প্রলয়ঙ্করি
স্বয়ম্ভু প্রেয়সি শিবে করালি কঙ্কালাকৃতে।
ওঁ হ্রীং ক্লিং ক্রূং অট্ট অট্ট নিনাদিনি
মনুষ্যঃ কুরুঃ মনুষ্যঃ কুরু মনুষ্যঃ কুরু মহাকালি॥

এইরূপ তিনবার আবৃত্তি করিয়া আবার গঙ্গাজল ছিটাইলেন। কুকুর কুকুরই রহিল—মানুষ হইল না

একি! হচ্ছে না কেন! সন্ন্যাসী বলেছিলেন অচলা ভক্তিভরে মন্ত্রপাঠ করতে। ভক্তিতে কি কোন গোলমাল হচ্ছে! হয়তো ঠিক অচলা ভক্তি হচ্ছে না। না, ভাল ক'রে আর একবার বলি। একি হ'ল!

কুকুরের সম্মুখে গলবস্ত্র করজোড়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শুভঙ্করী মুদিত-নেত্রে আবার তিনবার মন্ত্রটি আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। শুভঙ্করী ভয়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে কুকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। নির্বিকার কুকুর বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল

উঃ! না, এ যে ভাবতেও পারছি না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হচ্ছে। নিশ্চয়ই ঝি মেথর-ছোঁয়া সেই কলসি ভাল ক'রে ধোয় নি। নিশ্চয়ই ধোয় নি। ঘরে যে গঙ্গাজল আছে তাই নিয়ে আসি।

পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন ও অন্ত আর একটি পাত্রে গঙ্গাজল আনিয়া চতুর্দিকে ছিটাইতে লাগিলেন। তাহার পর পূর্ববৎ গললগ্ন করজোড়ে কুকুরের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আকুলভাবে মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। গলা কাঁপিতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ শেষ হইল। এবারও কিন্তু কুকুর মানুষ হইল না

না, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হচ্ছে, আমি ধরতে পারছি না। এই কাপড়টা ছেড়ে আসব? এই কাপড় পরেই তো মেথর-ছোঁয়া জল ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ছেড়েই আসি কাপড়টা।

আবার তাড়াতাড়ি গিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিলেন এবং পুনর্বার চতুর্দিকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। কুকুরের কিন্তু কোন পরিবর্তন হইল না। তরঙ্গিণী ইহা দেখিয়া তারস্বরে প্রত্যেক কথার জোর দিয়া মন্ত্রপাঠ শুরু করিলেন। ক্রমশ তাঁহার দুটি উৎকর্ণ চুনির মত হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বর কাঁপিতে একটা আর্তভাব ফুটিয়া উঠিল, মন্ত্র-আবৃত্তি এলোমেলো মত শুনাইতে লাগিল। সহসা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করিয়া তিনি কুকুরের সম্মুখে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মানুষ হও, আর কক্ষনও তোমায় কিছু বলব না—কক্ষনও না—

কক্খনও না। মানুষ হও, ওগো, শুনছ? মানুষ হও, মানুষ হও, দয়া কর, ফিরে এস। মদ খেও, যা ইচ্ছে হয় ক'র, শুধু ফিরে এস, ফিরে এস, ওগো, ফিরে এস—

মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। কুকুর অবিচলিত। সদর দরজার কড়াটা কড়কড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই নয়নতারা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

( বিহ্বলভাবে ) তুই? নয়নতারা?

নয়নতারা। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ, আমি। এত চেঁচাচ্ছিস কেন তুই? কি হ'ল?

শুভঙ্করী। ( হাঁপাইতে হাঁপাইতে ) সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার! তোর বাড়িতে একটু ভাল গঙ্গাজল আছে? বেশ ভাল, পবিত্র?

নয়নতারা। আছে। তা থাকবে না কেন?

শুভঙ্করী একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন

শুভঙ্করী। আমায় একটু এনে দে ভাই, আমায় একটুখানি এনে দে, আমায় বাঁচা তুই। ওরে, আমার ওপর দয়া কর। পায়ে পড়ি তোর, বাঁচা আমাকে, বাঁচা —বাঁচা—বাঁচা।

পদধারণ করিতে গেলেন

নয়নতারা। (পিছাইয়া গেলেন) ওমা, একি কাণ্ড! একটু গঙ্গাজল নিবি তার জন্তে এত কেন?

শুভঙ্করী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) শুধু গঙ্গাজল নয়, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর স্বামীর প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি হয়—অচলা ভক্তি। মহাপাপী আমি, স্বামীকে কেবল শাসনই ক'রে এসেছি, ভক্তি কোনদিন করি নি। ভক্তি আমার নেই—নেই—নেই—আমার নেই। অচলা ভক্তি চাই। আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুই। ওঃ, একি হ'ল। একি হ'ল। একি হ'ল!

পাগলের মত একবার কুকুরটার দিকে, একবার অর্দ্ধলিখিত কাগজখানার দিকে ও একবার নয়নতারার দিকে তাকাইতে লাগিলেন

নয়নতারা। (যেন সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন) যা ভেবেছি তাই! ছি ছি ছি, এ একেবারে বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে গেছে দেখছি। আগেই বলেছিলাম আমি। সর্ব্বনাশ!

শুভঙ্করী। (অস্ফুট স্বরে) অচলা ভক্তি—অচলা ভক্তি—অচলা ভক্তি—

নয়নতারা নির্বাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন

মেয়েদের হস্টেলের পাশের বাড়ির কক্ষ। কাল সন্ধ্যা। হারাধন ক্রমাগত উঠ-বোস করিতেছেন। কয়েকবার উঠ-বোস করিয়া পরিশ্রান্ত হারাধন থামিলেন এবং বাম-হস্তের প্রসারিত তর্জনীর দ্বারা কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিলেন

হারাধন। উঃ, হায়রান হয়ে গেলাম। কিন্তু কিচ্ছু ফল হচ্ছে না তো। ঠিক সমানে মন-কেমন ক'রে যাচ্ছে। ( বুকে হাত দিয়া ) উঃ, এযে ভয়ানক মন-কেমন করতে লাগল। কি করি! গুবু শেষকালটায় বেশ একহাত নিলে তো। রাত্রে কাল স্বপ্ন দেখলাম যেন কুকুরটা গুবুর হাতে ঘ্যাক ক'রে কামড়ে দিলে, ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। ইচ্ছে করছে এক্ষুনি—, কিন্তু না, ইচ্ছে করলেই তো চলবে না বৎস, বাঙ্কু না এলে ইউ কান্‌ট গো প্যাদমেকম্। বাঙ্কুই বা গেল কোথা? পাঁচ দিন ছেড়ে দশ দিন পার হয়ে গেল! উঃ, এ তো আচ্ছা জাঁতি-কলে পড়া গেছে। শুভঙ্করী প্রবল প্রতাপে এসে হৃদয় দখল ক'রে বসেছে—কাল রাত্তির থেকে। এখন করা যায় কি! একটা কেতাবে পড়েছিলাম এক্সারসাইজ করলে নাকি স্ত্রী-চিন্তা মনে আসে না। একদম গাঁজা।

একৃসার্‌সাইজ ক'রে ক'রে তো সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ক'রে ফেললাম। কিন্তু শুভঙ্করীকে তো একচুল নড়াতে পারলাম না। আরও গোটাকয়েক ডন দিয়ে দেখব? তাই দেখি।

ডন দিতে লাগিলেন

( উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ) নাঃ, এ কিছু হচ্ছে না, একদম বাজে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে আরও।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন

একৃসার্‌সাইজ ক'রে চিন্তারই জোরটা বেড়ে গেল দেখছি। যতই তাড়াতে চাইছি ততই দ্বিগুণ জোরে এসে চেপে ধরছে। এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল। মদও ফুরিয়েছে, টাকাও ফুরিয়েছে। আর এই দাড়ি চুলকে চুলকে প্রাণ গেল। উঃ!

মুখভঙ্গি করিয়া চুলকাইতে লাগিলেন

( সহসা থিয়েটারি ভঙ্গিতে )

শুভু, শুভঙ্করী, প্রেয়সী আমার!
কিছুক্ষণ দেহ গো রেহাই।

হঠাৎ থামিয়া গেলেন

নাঃ, জুৎ পাচ্ছি না। সামনে কেউ নেই অথচ শূন্যকে উদ্দেশ্য ক'রে বক্তৃতা ক'রে যাচ্ছি, এত বড় নিরাকারবাদী এখনও হয়ে ওঠি নি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে এবং অবিলম্বে করতে হবে, তা না হ'লে পাগল হয়ে যাব।

পিছনে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া চিন্তিতমুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন

হয়েছে! বিষস্য বিষমৌষধম্। চিন্তাই করব, চিন্তার চরম ক'রে ছাড়ব আজ। আগে শুভঙ্করীর একটা প্রতিভূ খাড়া করা যাক। সামনে একটা কিছু না থাকলে বক্তৃতা ক'রে জুৎ পাচ্ছি না।

টেবিলটা ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিলেন এবং তদুপরি শূন্য মদের বোতলটা তাক করিয়া স্থাপন করিলেন। বোতলটির মুখে একটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি জ্বলিতেছিল। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া হারাধন কবিতায় শুরু করিলেন

প্রেয়সী-প্রতিভূ অয়ি, শূন্যগর্ভ সুরার বোতল,
ফুরায়েছে সুরা তব, কিন্তু সখি, হও নি বাতিল।
শিরে ধরি বাতি
অন্ধকার-বিনাশিনী ধরিয়াছ মূর্তি আলাময়ী।
পুরাকালে হে সুরাধারিণী,
একদিন ছিলে তুমি কবিচিত্ত-চমৎকারিণী।

জোগায়ে ইন্ধন
লক্‌লকায়িত-জিহ্বা কল্পনা-শিখারে
করেছিলে নভশ্চুম্বী !
আকাশ-বিসর্পী মোহ তার
সূর্য্য চন্দ্র মেঘে মেঘে তারায় তারায়
মহানন্দে বেড়ালো সঞ্চরি।
সহসা ভাঙিল ঘোর। দেখিনু চাহিয়া
ফুরায়েছে সুরা।
ফুরায়েছে সুরা, কিন্তু ফুরায় নি সুরার বোতল—
হইয়াছে পিলসুজ মোম-বর্ত্তিকার।
উপকারিণীর বেশ ধরিয়াছে চমৎকারিণী।
মহুয়া-বনের সাকী
গৃহলক্ষ্মীরূপে আসি ধরিয়াছে খুন্তি, বেড়ি, ঝাঁটা।
নমামি তবুও শতবার ;
ভোল্ বদলাও তুমি পার যতবার।
বুঝিয়াছি সার,
অভাগার
তুমি ছাড়া নাহি অন্য গতি।

হঠাৎ নীচে কপাটে সজোরে ধাক্কা পড়িতে লাগিল ও জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। হারাধন কবিতা থামাইয়া সন্তর্পণে গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন

ওরে বাবা, এ যে পুলিস দেখছি! লাল পাগড়ি! সর্ব্বনাশ! হঠাৎ পুলিস কেন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো!

নীচে কপাটের ধাক্কা উগ্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ধাক্কার প্রাবল্যে অবশেষে কপাটটা খুলিয়া গেল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হারাধন সহসা একটা জানলা টপকাইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাজবাবু ও চুমকি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবল।

বিরাজবাবু। (এদিক ওদিক চাহিয়া) কই, কেউত নেই দেখছি! পালাল নাকি—

কনেষ্টবলদিগের প্রতি

তুম লোগ্ বাহার মে যাকর গল্‌লিঠো দেখো—শালা ভাগা মালুম হোতা হ্যায়

কনেষ্টবলগণ চলিয়া গেল

আপনি যখন এই হষ্টেলটা ওয়াচ করছিলেন তখন আপনি দেখেছিলেন ত লোকটাকে!

চুমকি। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বৈকি। গুণ্ডাগোছের চেহারা—চাপ দাড়ী—

বিরাজবাবু। হষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্টও ত সেই কথা লিখেছেন! আপনি লোকটাকে দেখেছেন বলে

আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ব্যাটা পালাল কোন দিক দিয়ে—

চুমকি। (মোম বাতিটা দেখিয়া) এটা থেকে এখনও ধোঁয়া উড়ছে দেখুন—তার মানে একটু আগেই ছিল সে এখানে! খুব পালিয়েছে ত!

বিরাজবাবু। গেল কোন দিকে!

এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন

চুমকি। (জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া) এই পথেই সে পালিয়েছে! (সহসা) বিরাজবাবু—আমি এবার যাই। আমার এখানে থাকাটা ঠিক নয় বেশীক্ষণ—

বিরাজবাবু। তাতে আর কি হবে।

চুমকি। না সেটা ঠিক নয়—এই হষ্টেলেই আমি ছিলাম কিছুদিন—হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে—ভারি লজ্জায় পড়ব তাহলে—

বিরাজবাবু। আপনাকে একটা সুখবর এখনও দেওয়া হয়নি।

চুমকি। কি?

বিরাজবাবু। একটা নয়—ছটো

চুমকি। বলুননা—কি?

বিরাজবাবু। রেখার সঙ্গে মোহনলালের বিয়ে হয়ে

গেছে এই হল প্রথম খবর এবং মোহনলালের একটা চাকরি হয়েছে এই হল দ্বিতীয় খবর—

চুমকি। (সহাস্যে) বাঃ—ছুটোই সুখবর। রেবা মেয়েটি বেশ ভাল। শুনে সুখী হলাম।

বিরাজবাবু। আপনাকে খবর দেওয়াটা উচিত—কারণ আপনি মোহনলালের সম্বন্ধে অতটা ইন্‌টারেষ্ট নিয়েছিলেন। গুরুতর বাধা না থাকলে নেমন্তন্নও করতাম—

চুমকি। (হাসিয়া) কি করব বলুন? কিন্তু মোহনলালকে আমার কোনদিনও ডেঞ্জারাস্ ক্যারাক্‌টার বলে মনে হয়নি। কিন্তু যে সব বই ও পড়ত সন্ধান পেয়েছিলাম সে সব বই আইনের চক্ষেও নির্দ্দোষ নয়, আর ওর মত ইম্‌পালসিভ্ ছেলের পক্ষে একটু বিপজ্জনকও বটে—

বিরাজবাবু। তাত নিশ্চয়ই। আচ্ছা গুণ্ডাটা গেল কোথা। আশ্চর্য্য ত।

চুমকি। সে পালিয়েছে।—আমাকে এবার ছেড়ে দিন—মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিনা আমি এ পাড়ায়—নেহাৎ আপনি ধরে নিয়ে এলেন তাই এলাম।

বিরাজবাবু। নিয়ে এলাম কি সাধে? আপনি তাকে দেখেছেন কিনা—আইডেন্‌টিফাই করাবার জন্যে আনলাম আপনাকে—

চুমকি। সে সরে পড়েছে—চলুন যাই এবার।

বিরাজবাবু। তাইত দেখছি—দাঁড়ান দেখেনি একটু।

এদিকওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন

চুমকি। আমার আবার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দরকার আছে।

বিরাজবাবু। (চোখ টিপিয়া) নতুন শিকার বুঝি—

চুমকি। হ্যাঁ—আর বলবেননা। ভাল লাগেনা এসব। সবাই দেখি হাঁদা আর গোবর গণেশ। পুলিসে চাকরি নিয়েত কম লোক দেখলামনা—মানুষ কই।

বিরাজবাবু। চলুন তাহলে যাওয়া যাক্। হ্যাঁ—মানুষ কম জগতে।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

## তৃতীয় দৃশ্য

নয়নতারা ও তাঁহার স্বামী ভৈরব কথাবার্তা কহিতেছেন। ভৈরবের চেহারা মোটেই ভৈরব-সদৃশ নহে। অত্যন্ত শীর্ণ আকৃতি। ঝোলা গোঁফ, নিষ্প্রাণ চাহনি, কানে খড়কে গোঁজা, কাঁধে একখানি লাল রঙের ভিজা গামছা। দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া ভৈরব নগ্নগাত্রে মুদিতচক্ষে থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছেন ও নয়নতারার বক্তৃতা শুনিতেছেন। নয়নতারা নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথা বলিয়া চলিয়াছেন

নয়নতারা। না না, তুমি অমন ক'রে থেক না। সেইদিনই তোমাকে বললাম, একটা ব্যবস্থা কর এর। আহা, অমন জলজ্যান্ত মেয়েটা পাগল হয়ে গেল গা! পাগল ব'লে পাগল—একেবারে পাগল। বদ্ধ-উন্মাদ যাকে বলে। আহা, দেখে কষ্ট হয়! সেদিন আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে সে কি কান্না! কাঁদে আর বলে, আশীর্ব্বাদ কর আমার স্বামীর প্রতি যেন অচলা ভক্তি হয়। অচলা ভক্তি নেই ব'লে আমার স্বামী ফিরে আসছে না। এই ব'লে কাঁদে আর পায়ে মাথা খোঁড়ে। হাতে দেখি একটা কাগজ রয়েছে, তাতে কি একটা লেখা রয়েছে, বিড়বিড় ক'রে তাই পড়ছে আর কাঁদছে। আহা, বেচারি!

ভৈরব হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন ও তাহা মনোমত রূপে ধরাইয়া পুনরায় হুঁকায় চড়াইয়া টানিতে লাগিলেন

এ রকমটা যে হবে তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। তোমাকে এসে বলে ছিলাম তো। তুমি সে কথায় কানই দিলে না। তখন থেকেই মাথার গোলমাল হয়েছিল, তা না হ'লে কি ওরকম কুকুরকে বিছানায় শুইয়ে কেউ হাওয়া করে, না, তাকে আপেল আঙুর খাওয়াতে যায়। ঝি-মাগীর মুখে শুনলাম কুকুর নিয়ে একেবারে যা-তা কাণ্ড! (নিম্নস্বরে) কুকুরকে কাছে নিয়ে শুতো নাকি রাত্তিরে! ছি ছি ছি! সেদিনও দেখলাম ধর্ম্মষণ্ড কুকুর দিব্যি সোফার ওপর ব'সে আছেন।

ভৈরব আবার কলিকাটি নামাইলেন এবং হুঁকার মুখ লাগাইয়া সজোরে একটি ফুৎকার দিলেন। উৎসাকারে খানিকটা জল হুঁকার মাথা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভৈরব আবার কলিকাটি বসাইয়া টানিতে লাগিলেন

আহা, ভালমানুষের মেয়ে একটা হতচ্ছাড়া পাষণ্ডের হাতে প'ড়ে শেষকালে পাগল হয়ে গেল। ব্যবসার নাম ক'রে কোথায় যে উধাও হয়েছে, কোন পাত্তাই নেই। ব্যবসা ক্যাবসা ওসব মিছে কথা। কোথাও যায় নি ও। এই কলকাতা শহরেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে মজা ওড়াচ্ছে। এই আমি ব'লে রাখলাম, দেখো তুমি। এখন কিন্তু

একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই, আমাদেরই উচিত একজন ডাক্তার ডাকিয়ে ওর চিকিৎসার যা হোক একটা ব্যবস্থা করা। ওর বাপের বাড়ির ঠিকানাও জানি না যে একটা খবর দেওয়া যায়। আমাদেরই করতে হবে ব্যবস্থা, হাজার হোক এ্যাদ্দিনের আলাপ। শুনছ? আমাদের বিষ্টু ডাক্তারকেই না হয় খবর দাও আজ। এসে দেখে যাক। শুনছ? জবাবই দিচ্ছনা যে কথার, আমি সেই থেকে বকর বকর ক'রে মরছি!

ইহার উত্তরে ভৈরব হুঁকায় একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া নাকমুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হস্ত দ্বারা হুঁকার মুখটি মুছিয়া সেটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া দিলেন এবং তৎপরে কাঁধ হইতে ভিজা গামছাখানা লইয়া বাম পদে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ পদটি ঝাড়িলেন এবং পরে দক্ষিণ পদে দাঁড়াইয়া বাম পদটি ঝাড়িলেন। কয়েকবার এই কৌশলে পা ঝাড়িয়া গামছাটি তিনি স্কন্ধে পুনঃস্থাপন করিলেন এবং হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন। নয়নতারার কথা যে তিনি শুনিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া মনে হইল না। সুতরাং নয়নতারা একটু রাগতকণ্ঠে আবার সুরু করিলেন।

তোমরা মানুষ, না পাষাণ? ভগবান কি তোমাদের প্রাণ ব'লে জিনিসটাই দিতে ভুলে গেছেন? না হ'লে এত নিষ্ঠুর তোমরা হও কি ক'রে, তাই আমি ভাবি! একটা বোম্বেটের হাতে প'ড়ে অমন সতীলক্ষ্মী মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না হ'ল! হতভাগা মাতালটা দিব্যি গা-ঢাকা

দিয়ে ব'সে আছে। আর কদিন ধ'রে তোমাকে ব'লে ব'লে আমার মুখের ফেকো উড়িয়ে ফেললাম, তবু তোমাকে তাতাতে পারলাম না! তোমাদের চোখের চামড়া ব'লে কোন পদার্থ নেই নাকি? আশ্চর্য্য!

এইভাবে আক্রান্ত হইয়া ভৈরব চটিয়া একটু কাশিলেন এবং গলা খাঁকারি দিলেন। গলা খাঁকারি দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইল না। কয়েক-দিন হইতেই তাঁহার গলা বসিয়া গিয়াছিল। তথাপি আর একবার খাঁকারি দিয়া ফ্যাসফেসে কণ্ঠেই তিনি সংক্ষিপ্ত ও সাফ জবাব দিবার প্রয়াস পাইলেন।

ভৈরব। ওসব মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমি ঢুকতে চাই না। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে!

নয়নতারা। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মানে?

এই শুনিয়া ভৈরব আবার হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া উত্তেজিতভাবে টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে নয়নতারার দিকে চক্ষু পাকাইয়া তাকাইলেন এবং উত্তর দিলেন

ভৈরব। মানে অনেক। মেয়েমানুষের ফেঁড়া ন্যাতায় জড়িয়ে পুলিসের হাতে প'ড়ে চাকরিটা যাক আর কি! ওসব সহানুভূতি-টুতি দূর থেকেই ভাল। তেল দাও, আপিসের বেলা হ'ল।

পুনরায় হুঁকা তুলিয়া গোটা দুই লম্বা টান দিলেন

নয়নতারা। কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। বিষ্টু ডাক্তারকে খবর দিলে তোমার চাকরি থাকবে না? তোমারও মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

ভৈরব। (ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে) দিনকাল বড় খারাপ, কোথা থেকে কি হয় কিছু বলা যায় না। কাল আপিসে যা শুনলাম তাতে আমার আক্কেল হয়ে গেছে। মেয়েলি ব্যাপার থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

হুঁকাটি পুনরায় কোণে রাখিলেন

নয়নতারা। আপিসে কি গল্প শুনে এলে?

ভৈরব। গল্প কেন হতে যাবে, সত্যি কথা। নিছক সত্যি কথা। সুধাকরবাবু বাজে কথা কইবার লোক নন।

নয়নতারা। কি বলেছেন সুধাকরবাবু?

ভৈরব। সে আর তুমি শুনে কি করবে? দাও, তেল দাও, আপিসের বেলা হ'ল।

নয়নতারা। না না, শুনিই না, কি শুনে এলে আপিস থেকে?

ভৈরব। এ তো আচ্ছা বিপদে পড়লাম দেখছি।

এই বলিয়া তিনি হতাশভাবে হুঁকাটির পানে চাহিলেন—যেন তাহারই নিকট তিনি এই বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন

নয়নতারা। এতে আর বিপদটা কি?

ভৈরব। (যেন হাল ছাড়িয়া দিলেন) :ছাড়বে না যখন, শোন তবে। আপিসের লেট না হয়ে যায়, ভারি কড়া সায়েব।

নয়নতারা। এই তো সবে আটটা বাজল।

ভৈরব। শোন তবে—

এই বলিয়া সহসা চোখমুখ রহস্যময় করিয়া তিনি শুরু করিলেন

আমাদের সুধাকরবাবু যে পাড়ায় থাকেন, সেই পাড়ায় এক মেয়েদের হস্টেল আছে, বুঝলে? সেই হস্টেলের পাশে একটা খালি বাড়িও আছে। কার বাড়ি জানি না। সেই বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক বুঝি ভাড়াটে এসেছিলেন। নিরীহ ভদ্রলোক; অপরাধের মধ্যে ভদ্রলোকের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর দাড়ি ছিল। বাস্, তাই দেখে হস্টেলসুদ্ধ মেয়ে চ'টে লাল। ও রকম চুলদাড়িওলা লোক কেন পাশের বাড়িতে থাকবে। তাড়াও ওকে, দাও পুলিসে খবর। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিসও এসে হাজির। সুধাকরবাবু বলছিলেন, সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড মশাই। ভদ্রলোককে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ধ'রেই নিয়ে গেল। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) কোথেকে কি দাঁড়াল দেখ। যখন গোঁফদাড়ি রেখেছিলেন তখন কি ভদ্রলোক স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে এর জন্যে তাঁকে

পুলিসের হাতে পড়তে হবে। কি বিপদ। মেয়েদের হস্টেলের পাশে বাড়ি নিয়েই ভুল করেছিলেন ভদ্রলোক, খুব ভুল করেছিলেন।

নয়নতারা। তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

ভৈরব নির্বাপিতপ্রায় হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া আবার কড়াৎ কড়াৎ করিয়া টানিতে লাগিলেন

ভৈরব। (হাত উল্টাইয়া) আরে, সম্বন্ধ কি তাই যদি নির্ণয় করতে পারব তা হ'লে আর ভয়টা কিসের? স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কিছু বলবার উপায় নেই। এইটুকু সার বুঝেছি, ওসব ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে মাথাটির আশা ছাড়তে হয়। ওনাদের দূর থেকে নমস্কার করাই ভাল। ওই যে একটা শোলোকে আছে না—'শত হস্তেন—', ওই তাই।

নয়নতারা। (চটিয়া) তা হ'লে পাশের বাড়ির কারও অসুখ করলে দেখবে না?

ভৈরব। দেখব না কেন? দূর থেকে দেখব।

নয়নতারা। (সক্রোধে) দূর থেকে দেখবে? এইটে মানুষের মত ব্যাভার? এ্যাদ্দিনের আলাপ-পরিচয়, এত মাখামাখি, এসবের কোন দাম নেই বলতে চাও?

*ভৈরব টানিয়া টানিয়া হুঁকাটা হইতে আবার ধোঁয়া বাহির করিয়াছিলেন। আরও গোটা কয়েক টান মারিয়া তিনি উত্তর দিলেন। এবার তিনি একটুই রাগিয়াছিলেন।*

ভৈরব। মাথামাথি আমি করি নি, মাখামাখি করেছ তুমি। মৌখিক আলাপ অবশ্য ছিল, মাঝে মাঝে বিড়িটা-আসটা অবশ্য দিয়েছেন আমাকে হারাধনবাবু, তা মিছে কথা বলব কেন? কিন্তু এ ছাড়া ভদ্দরলোকের সঙ্গে কোন প্রকার লেন-দেনের সম্পর্ক আমার নেই। তুমি অবশ্য দিনে ছত্রিশবার নেচে নেচে ওদের বাড়ি যাও, এবং কেন যে যাও ভগবানই জানেন। আমি নির্ব্বিবাদী লোক; যত কোন ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না, ততই তুমি দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট এনে জোটাবে। তোমার স্বভাবই হ'ল ওই। সেদিন কথা নেই বার্ত্তা নেই, ফস্ ক'রে আড়াইটে টাকা খ'সে গেল। সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের সঙ্গে তোমার যেচে আলাপ করবার দরকার কি ছিল বাপু? ছম্‌দো ছম্‌দো মেয়ে রয়েছে ওদের গণ্ডা খানেক, এখন পটাপট বিয়ে হতে থাকবে। আমি ছাপোষা লোক, কাঁহাতক লৌকিকতা দিই বল তো? আড়াই টাকা দিয়েই কি নিস্তার আছে? এখন কত আড়াই যাবে ঠিক কি? বিয়ে দিতেই ওরা কলকাতায় এসেছে, তোমার মত বোকা লোকের সঙ্গে আলাপ করতেই তো ওরা চায়।

উত্তেজিতভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন

নয়নতারা। (স-ক্রোধে) আমি জন্ম জন্ম এমনই বোকাই যেন থাকি, তোমার মতন চালাক হতে চাই না। তারি তো আড়াই টাকার একখানা জ্যালজেলে শাড়ি দিয়েছ, তার আবার এত কথা!

ভৈরব চক্ষু পাকাইয়া নিরুত্তরে তামাক টানিয়া খাইতে লাগিলেন

শুভঙ্করীর সম্বন্ধে তা হ'লে তুমি কিছু করবে না? ও ওইরকম পাগল হয়ে যা-তা করুক, আর আমরা পাড়াপড়শী তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি? এইটেই তোমার ইচ্ছে? যাক, তোমার আর খোসামোদ করব না। ছেলেমেয়েরা মামার বাড়ি গেছে, ফিরে আসুক, হরুকে দিয়ে আমিই বিষ্টু ডাক্তারকে খবর পাঠাব আজ।

ভৈরব। বিষ্টু ডাক্তারের ফী-টা আমি দিতে পারব না, সাফ ব'লে দিচ্ছি।

নয়নতারা। লজ্জা ক'রে না তোমার এ সব কথা বলতে? হারাধনবাবু মদই খান আর যাই করুন, তাঁর ঋণ আমি জন্মে শুধতে পারব না। সেবার নন্তি হবার বেলায়—দুপুরে বাড়িতে কেউ নেই, আমার ব্যথা ধরল। শোনবামাত্র হারাধনবাবু নিজে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ক'রে

গিয়ে ডাক্তার নার্স নিয়ে এলেন। তাঁর সে টাকা শোধ দিয়েছিলে তুমি?

ভৈরব। (দাঁত খিঁচাইয়া) যাও যাও, জ্যানোর জ্যানোর ক'র না। যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক কর কেন? ওসব হাঙ্গাম আমি পোয়াতে পারব না—পারব না—পারব না।

প্রতি 'পারব না'র সহিত তিনি জোরে ঝুঁকিয়া হুঁকাটি উঠাইতে নামাইতে লাগিলেন। মমতাময়ী করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন

ঝাড়ু মল্লিক বিছানায় শুইয়া আছেন। বিনয় এবং অপূর্ব্ব নামক যুবকদ্বয় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। বিনয় বাতাস করিতেছে, এবং অপূর্ব্ব ষ্টোভ পাম্প করিতেছে। ঝাড়ু সুর ভাঁজিতেছে

কাল—সন্ধ্যা

ঝাড়ু। তারে নারে নারে নারে না—তারে নারে না—( হঠাৎ স্বর থামাইয়া ) চুণে-হলুদটা লাগাবেই নেহাৎ শেষ পর্য্যন্ত? অপূর্ব্ব, মতলব কি তোমার?

অপূর্ব্ব। ( ষ্টোভটা আর একবার পাম্প করিয়া ) হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল, আর বেশি দেরি নেই।

ঝাড়ু। ( হাসিয়া ) না লাগালে কি রকম হয়? একবার তো দিয়েছ সকালে।

বিনয়। না, আর একবার লাগাতে হবে। ডাক্তার-বাবু তাই তো ব'লে গেলেন।

ঝাড়ু। দাও তবে।

অপূর্ব্ব ষ্টোভের উপর হইতে চুণে-হলুদের বাটিটা তুলিয়া আনিল এবং ঝাড়ু মল্লিকের পদপ্রান্তে বসিয়া তাহা লাগাইতে লাগিল

মাই গড, উহুহুহুহু, অত গরম গরম দিও না হে। করছ কি! ফোস্কা প'ড়ে যাবে যে! সর্ব্বনাশ!

বিনয় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল

অপূর্ব্ব। না, ঝান্টুদা, গরম মোটেই নেই। এই দেখুন না, আমি হাতে ক'রে ধ'রে রয়েছি।

বাটিটা হাতে করিয়া ধরিয়া দেখাইল

ঝান্টু। বুঝেছি, তোমার সার্কাসে যাওয়ার যোগ্যতা হয়েছে। যাক, আর দিও না। আর দরকার নেই। ব্যাথাটা মনে হচ্ছে অনেকটা ক'মে এসেছে। অনেকটা —( পা নাড়িয়া দেখিলেন ) আচ্ছা, তোমরা দুজনে ধর তো, উঠে দাঁড়াতে পারি কিনা দেখি।

উভয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া ঝান্টু মল্লিক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

যাক, উঠে দাঁড়াতে তো পারা গেছে। ( সুর ভাঁজিয়া ) তারে নারে নারে নারে না—( অপূর্ব্ব ও বিনয়ের প্রতি ) এইবার তোমরা একটু ছেড়ে দাও দিকি, একটু চ'লে দেখা যাক, পারা যায় কিনা।

অপূর্ব্ব ও বিনয় ছাড়িয়া দিল। ঝান্টু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া একটু চলিতে চেষ্টা করিয়া ব্যথাসূচক মুখভঙ্গি করিলেন

ইস্, লাগছে এখনও, বেশ লাগছে। বিলিতি বুটের মার, একেবারে মজ্জায় গিয়ে জখম করেছে।

অপূর্ব্ব ও বিনয় আসিয়া আবার ধরিল

বিনয়। বাসুদা, এখন বেশি চলা-ফেরা করবেন না। ডাক্তারবাবু যখন মানা ক'রে গেছেন তখন দরকার কি ?

বাসু। দরকার অনেক। সে তোমরাও বুঝবে না, ডাক্তারবাবুও বুঝবেন না। সে জানে মিত্তির। আচ্ছা চল, শোয়াই যাক। ড্যাম ইট।

বিনয় ও অপূর্ব্ব ধরিয়া ধরিয়া আবার তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল

চুণে-হলুদ-টলুদ রাখ, এমন দগ্ধে দগ্ধে ভাল হ'তে চাই না। সতীদাহ জিনিসটা কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর ব্যাপার ছিল খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। মাই গড! এক কাজ কর দেখি। হুইস্কির বোতলটা আন। নিজের চিকিৎসা নিজেই করা যাক খানিকটা।

অপূর্ব্ব দেওয়াল-আলমারি হইতে হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া আনিল। হুইস্কির বোতল ও একটি কাচের গ্লাস শয্যাপার্শ্বে রাখিলেন। বাসু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া পান করিয়া ফেলিলেন এবং পাত্রাতে আরও খানিকটা হুইস্কি গেলাসে ঢালিয়া তাহা অপূর্ব্বর হাতে দিলেন।

নাও, এইটে ব্যথাটার ওপর স্লপ বাই স্লপ দাও তো, দেখি কি দাঁড়ায়।

অপূর্ব্ব। ( সবিস্ময়ে ) ওই চুণে-হলুদের ওপর ?

বাসু। হ্যাঁ, ওর ওপরেই দাও। চুণে-হলুদের বাবার সাধ্যি নেই হুইস্কিকে আটকায়। হুইস্কি! নট এ

ম্যাটার অফ জোক! কংক্রিট ফুঁড়ে চ'লে যাবে। নির্ভয়ে দাও তুমি।

বিনয় বাতাস করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব আহত স্থানে কোঁটা কোঁটা হুইস্কি ঢালিতে লাগিল এবং বাবু মল্লিক গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া দিলেন।

শুয়ে বিছানায়
ওগো, মন কারে চায়!

হঠাৎ গান থামাইলা

আচ্ছা, মিস্তিরকে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, এখনও তার পাত্তা নেই—ব্যাপার কি?

বিনয়। মিস্তিরকে কোথায় পাঠিয়েছেন?

অপূর্ব্ব। মিস্তির এসেছিল নাকি আজ?

বাবু। হ্যাঁ, সে তোমাদের আগেই এসেছিল, তাকে একটা খবর জানতে পাঠিয়েছি। এখনও তো তার পাত্তা নেই দেখছি। গাড়িটাড়ি চাপা পড়ল নাকি! যে রকম অন্যমনস্ক লোক, কিছু বলা যায় না। এক কাজ কর তোমরা। অপূর্ব্ব, তুমি চ'লে যাও, গিয়ে মিস্তিরের একটু খোঁজ কর। যদি পাও, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আর বিনয়, তুমি এই চেকটা কাল ভাঙিয়ে এনে দিও তাই আমাকে, কিছু টাকার দরকার। চেক-বইটা দাও তো, ওই আলমারিতেই আছে।

বিনয় আলমারি হইতে চেক-বই আনিয়া দিল। ঝাডু চেক লিখিতে লাগিলেন

এই চেকটা নাও। আর সেদিন সেই ব্রিজ-খেলার পার্টনার মশায় একটা দশ টাকার চেক দিয়েছিলেন, সেটা ও-ঘরে টেবিলের ওপরই প'ড়ে আছে বোধ হয়। সেটাও ভাঙিয়ে এন। তোমার কি একখানা বই কেনার দরকার আছে বলছিলে না? ও টাকাটা তুমিই কাজে লাগিয়ে দাও

বিনয়। না, আমি টাকার জন্যে চিঠি লিখেছি।

ঝাডু। উত্তম কথা। তোমার টাকা এলে দিয়ে দিও আমাকে। আর দেখ, হুইস্কি এন। (হুইস্কির বোতলটা তুলিয়া) এতেই চ'লে যাবে আজকের দিনটা। তবু টকে থাকা ভাল। আচ্ছা, যাও তোমরা তা হ'লে।

অপূর্ব্ব ও বিনয় গমনোদ্যত

হার্মোনিয়ামটা এনে দিয়ে যাও তো হে। একটু সঙ্গীত-চর্চ্চা করা যাক।

অপূর্ব্ব ও বিনয় হার্মোনিয়াম আনিতে পাশের ঘরে গেল। ঝাডু খানিক আবার খানিকটা হুইস্কি পান করিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতে লাগিলেন

শুয়ে বিছানায়,
ওগো, মন কারে চায়, বল
প্রাণ কারে চায়।

অপূর্ব্ব ও বিনয় হার্মোনিয়াম লইয়া আসিল

অপূর্ব্ব। আমি তা হ'লে মিস্তিরকে পেলে এক্ষুনি পাঠিয়ে দোব ?

বাঙ্কু। হ্যাঁ, পত্রপাঠ।

বিনয়। টাকাটা আপনার কখন চাই ?

বাঙ্কু। যত শিগগির আনতে পার।

অপূর্ব্ব ও বিনয় চলিয়া গেল। বাঙ্কু হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া গান ধরিলেন

শুয়ে বিছানায়,
মন কারে চায়, ওগো,
প্রাণ কারে চায়!
এমন বিছানা ঢালা
নিশুতি রাত্তি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছা, হায়!

ত্য নটবরের প্রবেশ

নটবর। বাবু, এ বেলা আপনি কি খাবেন ?

বাঙ্কু। ( নটবরের দিকে এক হস্ত প্রসারিত করিয়া ভাবভরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে )

এমন বিছানা চালা
নিশুতি রাত্তি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছে হায়—
শুয়ে বিছানায় !

নটবর। কি খাবেন বাবু, আপনি এ বেলা ?

বাচ্চু। ( থামিয়া ) পিণ্ডি, চটকে আনতে পারিস ?

নটবর সলজ্জভাবে মৃদু হাস্য করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তুমি বেটাচ্ছেলে দশ বচ্ছর রয়েছ আমার কাছে, জান না আমি কি খাই ? গান থামিয়ে তোমার বলতে হবে তা ?

নটবর। অপূর্ব্ববাবু ব'লে গেলেন আপনাকে টোষ্ট বানিয়ে দিতে।

বাচ্চু। এরা আমাকে মেরে তবে ছাড়বে। অপূর্ব্ব-বাবু ব'লে গেছেন, তা হ'লে তাই দাও। ( হাসিয়া ) ভাতও চারটি দিস, বুঝলি ? বাঙালীর ছেলে ভাত না পেলে বাঁচব কেন ? অপূর্ব্বর কাছে চেপে গেলেই হবে, বুঝলি ?

নটবর। আচ্ছা।

নটবর চলিয়া গেল। ঝান্টু আবার গান শুরু করিলেন

ঝান্টু। শুয়ে বিছানায়
মন কারে চায়, ওগো,
প্রাণ করে চায়।
এমন বিছানা ঢালা
নিশুতি রাতি নিরালা
ট্রালা লালা লালা লালা—
সবি মিছা, হায়।

মিত্তিরের প্রবেশ

এই যে মিত্তির, কি খবর হে?

মিত্তির। খবর সুবিধের নয়।

ঝান্টু। মানে?

মিত্তির। সেখানে কেউ নেই। খোঁজ ক'রে শুনলাম বাড়িতে নাকি পুলিস এসেছিল।

ঝান্টু। পুলিস? বল কি?

মিত্তির। তাই তো শুনলাম গিয়ে।

ঝান্টু। বাড়িতে কেউ নেই? ঢুকে দেখেছিলে?

মিত্তির। হ্যাঁ, ঢুকে দেখেছি বইকি। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি আমি। কেউ নেই সেখানে, মাইরি বলছি।

বাসু। (চিন্তিতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এ তো বেশ জট পাকিয়ে উঠল। ভোবালে দেখছি!

মিত্তির। আর একটা খবরও শুনলাম। হারাধন-বাবুর পাশের বাড়িতে থাকেন ভৈরববাবু, আমাদের আপিসেই চাকরি করেন, তিনি বলছিলেন, হারাধনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগল হয়ে গেছেন।

বাসু। (সচকিত হইয়া) তাই নাকি?

মিত্তির। তাই তো বলছিলেন ভৈরববাবু।

বাসু। তুমি কোন কথা কারও কাছে ভাঙো নি তো? দেখো, খুব সাবধান।

মিত্তির। (সহাস্যে) কাকে শেখাচ্ছ তুমি? (ইতস্তত করিয়া) একটু পেসাদ পেতে পারি?

বাসু। নিশ্চয়। (খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন)

মিত্তির। (পানান্তে) এইবার আমি চললাম ভাই। তোমার কাজ তো ফিনিশ ক'রে দিয়েছি। কাল সকালে আসব আবার। ওহো, বাড়িতে এক টিন বিস্কুট কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল। যাচ্চলে! টাকাই আনতে ভুলে গেছি। গোটা দুয়েক টাকা দিতে পারবে ভাই? কালই দিয়ে দোব।

বাসু। ও-ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে আছে, নিয়ে এস খুলে।

মিত্তির গিয়া টাকা লইয়া আসিল

মিত্তির। তা হ'লে চলি এখন ?

বাসু। আচ্ছা।

মিত্তির চলিয়া গেল। বাসু আবার খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

বাই জোভ! হারাধনটাকে পুলিসে ধরল নাকি শেষ-কালে? বউটা পাগল হয়ে গেছে? বলে কি? মাই গড!

আবার খানিকটা মদ খাইলেন

ওরে লোটো!

নটবরের প্রবেশ

চুণ-হলুদ গরম কর। আরে, বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ! চুণ-হলুদ—চুণ-হলুদ—খুব গরম ক'রে গরম গরম পায়ে লাগিয়ে দে। যা থাকে কপালে, আই মাষ্ট বি আপ অ্যাণ্ড অ্যাবাউট! শুয়ে থাকলে তো চলবে না! সর্ব্বনাশ!

লেকের একটি নির্জন অংশে দুইটি বেঞ্চি দেখা যাইতেছে। একটি বেঞ্চি খালি। অপরটিতে মোহনলাল ও রেবা বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। রেবার মাথায় সিন্দূর—মুখে নববধূসুলভ লজ্জাভা। মোহনলালেরও বেশবাসের একটু পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। কাল বৈকাল।

রেবা। ( সহাস্যে ) মুখে তুমি যা-ই বল, আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি কক্ষনও সুখী হও নি। চুমকিদির কথা রোজ তোমার মনে পড়ে। অত ভাব ছিল দুজনে!

মোহনলাল। ( চশমাটা খুলিয়া মুছিতে মুছিতে ) মনে পড়ে বই কি, একটা দুঃস্বপ্নের মত!

রেবা। ( ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া ) দুঃস্বপ্ন, না আরও কিছু! দুঃস্বপ্ন না ব'লে সুখস্বপ্ন বল বরং। সত্যি কথা হবে সেটা।

মোহনলাল। সুখস্বপ্ন হতে পারে না, কান্ট বি—

চশমা পুনরায় পরিধান করিলেন

রেবা। ( হাসিতে হাসিতে ) কান্ট বি বইকি, আমি যেন কিছু বুঝি না! আমাকে কচি খুকী মনে কর নাকি?

নীলাম্বরে মাথা দোলাইলেন

আসলে তুমি বিরাজ মামার অনুরোধে আমাকে বিয়ে করেছ। আমাকে তোমার মনে ধরে নি একটুও। (সহাস্তে) কি করবে বল? অদৃষ্ট। আমার মত হতকুচ্ছিৎ মেয়ে তোমার কপালে লেখা ছিল, চুমকিদির মত বউ তোমার হবে কেন?

মোহনলাল। বিলিভ মি, চুমকির সম্বন্ধে আমার মোহ একেবারে আর নেই। থাকতে পারে না। এমন হার্টলেস জানলে ওর সঙ্গে মিশতামই না আমি। কি রকম বিপদে ফেলে আমাকে স'রে পড়ল বল দেখি! বিরাজবাবু না থাকলে আমাকে জেলে প'চে মরতে হ'ত! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সাংঘাতিক পাল্লায় প'ড়ে গিয়েছিলাম—বাপ্ স্।

রেবা। আচ্ছা, চুমকিদি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কিছু বোঝা গেলনা। ভারি আশ্চর্য্য লাগে কিন্তু। তুমি তো সব জান, বিরাজ মামা তোমাকে নাকি বলেছেন। বল না, চুমকিদির কি হ'ল? জান তুমি?

মোহনলাল। তুমি কিছু মনে ক'র না রেবা, প্লীজ, কিন্তু এ বিষয়ে আমি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারবনা। সে কথা শোনার পর থেকে চুমকির প্রতি যা-ও আমার

একটু মোহ ছিল তাও লোপ পেয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস ক্যারাক্টার—আন্‌থিঙ্কেব্‌ল।

রেবা। ( সোৎসুকে ) কি কথা ?

মোহনলাল। সে আমি বলতে পারব না, প্রেস ক'র না, প্লীজ।

রেবা। ( অভিমানভরে ) বেশ, ব'ল না। ( ঘুরিয়া বসিলেন )

মোহনলাল। না না, ওরকম ক'রনা। ওরকম করলে শেষটায় আমি ব'লে ফেলব, আই মীন, বলতে বাধ্য হব। আর এ কথা প্রকাশ পেলে আমার অনিষ্ট হতে পারে, বিরাজ মামা বলেছেন, বিলীভ মি।

রেবা। ( মোহনলালের দিকে ফিরিয়া ) তাই নাকি ? থাক তা হ'লে, দরকার নেই শুনে। আমাদের কলেজে কিন্তু ভয়ানক গুজব যে চুমকিদি নাকি স্পাই ছিল।

মোহনলাল। ( ও প্রসঙ্গ থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ) থাক গে ও কথা। চুমকি কি ছিল না ছিল তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নই, শি হ্যাজ বীন এ লেস্‌ন টু মি, অ্যাণ্ড ছাট্‌স এনাফ। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, যথেষ্ট। তোমাকে পেয়েছি, অ্যাণ্ড হোয়াট্'স মোর, তোমার ভালবাসা পেয়েছি, তাই কি

আমার মত গুড-ফর-নাথিং-এর পক্ষে পরম সৌভাগ্য নয় ? বিরাজবাবুর দৌলতে একটা চাকরিও জুটে গেছে আমার ; ছোটখাটোর মধ্যে বাড়িটাও মন্দ পাওয়া যায় নি—

রেবা। বাড়িটা ভালই হয়েছে ; তা ছাড়া তোমার আপিসের কাছেও হবে। এখনও গোছগাছ কিন্তু কিছুই করা হয় নি।

মোহনলাল। ( সোল্লাসে ) সব হবে। প্রতি মুহূর্তের দরদ দিয়ে সযতনে এইবার আমরা আমাদের ছোট্ট নীড়খানি গ'ড়ে তুলব। লেট চুমকি অ্যাণ্ড দি রেস্ট গো টু হেল। ফেরবার পথে বাকি সব জিনিসপত্তরগুলো কিনে নিয়ে যেতে হবে। কি কি কিনতে হবে বল তো, একটা লিষ্ট ক'রে ফেলা যাক।

পকেট হইতে একটা পকেট-বুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া চুকিবার ভঙ্গিতে বাগাইয়া বসিলেন

রেবা। ( একটু ভাবিয়া ) লেখ তা হ'লে।—বেশ বড় দেখে নেটের মশারি একটা, বিছানার চাদর একজোড়া তোষক-টোষক তো আছেই। হ্যাঁ, টেব্‌লক্লথ একখানা, আয়না একটা, চিরুনিও একটা—চিরুনিটা ভাল দেখে নিও, আর চায়ের সরঞ্জাম—কেৎলি, টি-পট, কাপ, ছাঁকনি।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) কাপ, ছাঁকনি। তারপর ?

রেবা। রান্নাবান্নার জিনিস তো সকালে কেনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা ষ্টোভ কিনলে ভাল হয়।

মোহনলাল। বেশ, (লিখিয়া লইলেন) ষ্টোভ। তারপর ?

রেবা। আমার শাড়িরও দরকার, মানে আটপৌরে শাড়ির। বিয়েতে যা সব পেয়েছি সব সৌখিন শাড়ি। আটপৌরে ছজোড়া কিনে এন। বেশ ভাল পাড় দেখে কিনো কিন্তু। এগারো হাত।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) শাড়ি ছজোড়া —এগারো হাত - আটপৌরে—ভাল পাড়। তারপর ?

রেবা। আর কি, মনেও পড়ে না ছাই। হ্যাঁ, গামছা ছখানা—সাধারণ গামছা—একটু বড় দেখে কিনো। আর রোঁয়াওলা টার্কিশ তোয়ালেও একখানা বেশ বড় দেখে নিও। এখন একখানাই থাক, পরে আর একখানা কিনলেই হবে।

মোহনলাল। (লিখিতে লিখিতে) টার্কিশ— তোয়ালে—বড় রোঁয়াওলা—একটা। তারপর ?

রেবা। (হাসিয়া) সেই আছি এখনও কেনা হয়নি কিন্তু।

মোহনলাল। সাবুটেন্‌লি! আছি পাঁচ গজ—বড় বহরের তো?

রেবা। হ্যাঁ। আর দেখ, ভাল দেখে ব্র্যাকেট যদি পাও নিও একটা—টুকিটাকি জিনিস রাখবার মত, বুঝলে?

মোহনলাল। ব্র্যাকেট? কি রকম ব্র্যাকেট?

রেবা। বিরাজ মামার শোবার ঘরে বেশ সুন্দর কাঠের ওপর ফুল তোলা তোলা একটা ব্র্যাকেট আছে, দেখনি? ওইরকম যদি পাও নিও। সুন্দর ব্র্যাকেটটি!

মোহনলাল। ( লিখিতে লিখিতে ) কাঠের ফুলতোলা ব্র্যাকেট—বিরাজ মামা প্যাটার্ণ—একটা। তারপর?

রেবা। কই, আর তো কিছু এখন মনে পড়ছেনা। হ্যাঁ, ছবি কয়েকখানা কিনলে কেমন হয়? গোলদিঘীর ধারে সেই যে সিনারির ছবি পাওয়া যায়—নদী-নৌকো-তালগাছ-চাঁদ-মেঘ-ওলা, সেই ছবি খান চারেক নিও। সস্তাও শুনেছি।

মোহনলাল। আচ্ছা বেশ। ( লিখিয়া লইলেন ) ছবি চারখানা—নদী-নৌকা-তালগাছ-ওলা—গোলদিঘীর ধার। আর কি?

রেবা। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, দেয়াল-আলনা একটা—চারটে হুকওলা, বেশ বড় মজবুত দেখে নিও।

মোহনলাল। দেয়াল-আলনা একটা—বেশ বড় দেখে—ফোর হুকস।

লিখিয়া লইলেন ও বাম হাত দিয়া কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন—ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল

আর কি ?

রেবা। আর কিছু তো মনে পড়ছেনা এখন। পরে যদি মনে পড়ে কিনলেই হবে।

মোহনলাল। আচ্ছা।

খাতা পেন্সিল পকেটে রাখিয়া দিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে মোহনলাল কথা কহিলেন

আচ্ছা রেবা, মন্ত্রের যে :একটা শক্তি আছে একথা তুমি বিশ্বাস কর ?

রেবা। কি মন্ত্রের ?

মোহনলাল। আই মীন, বিয়ের।

রেবা। ( সলজ্জ হাসিয়া ) করি বইকি। তুমি করনা ?

মোহনলাল। আগে করতামনা। এখন করি, নাউ ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিকটের খালি বেঞ্চিটিতে একটি যুবক ও একটি যুবতী আসিয়া উপবেশন করিলেন ও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন

রেবা। ( অকস্মাৎ ) দেখ দেখ, ওই চুমকিদি না ?

মোহনলাল। ( বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিত হইয়া ) হই? হ্যাঁ, তাই তো।

নবাগতদ্বয় এ কথা যে শুনিতে পাইলেন তাহা মনে হইলনা। তাহারা জেদের কথাতেই মশগুল হইয়াছিলেন

যাই মাষ্ট স্পীক টু হার।

রেখা নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মোহনলাল আগাইয়া গিয়া াগতা যুবতীটিকে সম্বোধন করিলেন

মকি!

নবাগতা যুবতী। ( ফিরিয়া বসিয়া—বিস্মিত ভঙ্গিতে ) আমাকে কিছু বলছেন?

মোহনলাল। আমাকে চিনতে পারছনা চুমকি?

নবাগতা যুবতী। আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, ামার নাম তো চুমকি নয়।

মোহনলাল। দিস ইজ সাম্‌থিং। চুমকি নয়? তবে?

নবাগতা যুবতী। সরলা।

মোহনলাল। সরলা! তোমার আর একটা নাম াসন্তিকা ছিল, মনে পড়ছে? সরলা! ওয়েল—

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

াই অ্যাড্‌মায়ার ইউ। ইউনিক!

নবাগত যুবক। (সক্রোধে) ভদ্রমহিলার সম্মান রেখে কথা বলতে জানেননা আপনি ?

মোহনলাল। কথা বলতে জানি কিনা আপনার বান্ধবীটিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। আমার অনেক কথাই উনি শুনেছেন—দিবসে এবং নিশীথে, সরবে এবং নীরবে।

নবাগত যুবক। (সগর্জ্জনে) শাট আপ—ইউ—ফ্—উল—

আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া আসিলেন

রেবা। (ভয় পাইয়া) ওগো ওগো, তুমি চলে এস।

নবাগতা যুবতী। (নবাগত যুবকের প্রতি—অনুযোগের স্বরে) এতে তুমি রাগ করছ কেন প্রশান্ত ? উনি আমার সঙ্গে আর কারুর গোলমাল ক'রে ফেলেছেন তাই এ রকম ব্যবহার করছেন। ভুলটা বুঝতে পারলেই অনুতপ্ত হবেন নিশ্চয়ই। এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমার মত অ্যাথ্‌লেটের রাগ করা সাজেনা, চুপ কর।

যুবকটি এই কথার নিমেষে জল হইয়া গেলেন ও বসিয়া পড়িলেন

মোহনলাল। আই সে, তোমার ক্ষমতা আছে চুমকি—স্বীকার করছি, অ্যাণ্ড আই টেক অফ মাই হ্যাট।

হ্যাট টেক অফ করার ভঙ্গিতে অভিবাদন করিলেন

রেবা। কি করছ তুমি? চল আমরা যাই।
স্তাকর্ষণ )

মোহনলাল। ( হাত ছাড়াইয়া ) হ্যাঁ,চল। তা হ'লে
বাই চুমকি দেবী—অ্যালায়াস সরলা দেবী। প্লীজ
লাউ মি টু ডিপার্ট ফ্রম ইউ অ্যাণ্ড ইওর্স! আমার
পথ সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে, গুড বাই ম্যাডাম।

কারদা করিয়া অভিবাদন করিলেন

নবাগত যুবক। আপনি কিন্তু মশাই অত্যন্ত
বাড়ি করছেন। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।
নি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি একজন ভদ্রমহিলার
কথা বলছেন।

মোহনলাল। ( সব্যঙ্গে ) আই সি।

নবাগত যুবতী। ( নবাগত যুবকের প্রতি ) চুপ কর
প্রশান্ত।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত চুপ করিল

ভুল হচ্ছে। ভ্রান্ত মানুষ ক্ষমারই যোগ্য। ভুল
লে অবশ্যই উনি অনুতপ্ত হবেন। চল বরং, আমরাই
ন থেকে উঠে যাই। চল, কাজও আছে আমাদের।
হ্যাঁ, আসি তা হ'লে।

একটু মুচকি হাসিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রশান্ত
পোষা-কুকুরের মত তাহার অনুসরণ করিলেন

রেবা। দেখলে তেজ একবার, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। কলেজে যা গুজব রটেছে ঠিক তা হ'লে।

মোহনলাল। মোটেই না। শি ইজ এ কাঁচপোকা।

রেবা। কাঁচপোকা!

মোহনলাল। হ্যাঁ, কাঁচপোকা—যে কাঁচপোকা আরসোলাকে ধ'রে নিয়ে যায়। প্রথমে হুল বিঁধিয়ে চোখ দুটো অন্ধ ক'রে দেয়, তারপর সুড়সুড় ক'রে গর্তের ভেতর টেনে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে।

রেবা। খেয়ে ফেলে!

মোহনলাল। ( চক্ষু বড় বড় করিয়া ) গ্রাস করে—সোয়ালোজ। এই কাঁচপোকার হাত থেকে উদ্ধার করেছ ব'লে তোমাদের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব রেবা।

রেবা। ( মুচকি হাসিয়া ) দুদিন পরে আমাকে কি পোকা বলবে, তাই ভাবছি।

মোহনলাল। পোকা! তোমাকে? না না, রেবা, ভুল বুঝো না আমায়। পোকা বলব তোমাকে? এ কথা ভাবতেও পারি না, অর্থাৎ সিন্‌সিয়ারলি বলছি, আই মীন. তুমি হ'লে—সব কথা গুছিয়ে ঠিক মত বলতে পারছি না আমি, কিন্তু রেবা—তুমি, আই মীন—

রেবা। ( স্মিত হাস্যে ) বুঝেছি, বাড়ি চল।

হারাধন বিশ্বাসের বাটির বহির্ভাগ। গলির খানিকটা এবং হারাধনের র বড় সদর দরজা দেখা যাইতেছে। বিষ্ণু ডাক্তারকে লইয়া ভৈরব আসিয়া । করিলেন। উভয়েরই মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। বিষ্ণুবাবু ডাক্তার— ভদ্রলোক, মাথার সামনের দিকটা টাক, কাঁচাপাকা গোঁফ, গলাবন্ধ কোট ঢালী ধরণের প্যাণ্টালুন পরা। পকেটে ষ্টেথোস্কোপ। দূরে রোশন-চৌকির । শোনা যাইতেছে।

বিষ্ণুবাবু। এই বাড়ি নাকি? ডাকুন ডাকুন, ার সময় বড় কম।

ভৈরব। ( ত্রস্ত হইয়া ) আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—

দুয়ারের কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। কই, খোলে না যে! কয়েকটা সিরিয়াস রয়েছে, তাদের ওখানেই আগে যাওয়া উচিত ছিল। নি ছাড়লেন না কিছুতে। ওবেলা এলেই হ'ত

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

এগারোটা বেজে গেছে। কপাটও খোলে না যে! নিন, আবার নাড়ুন, জোরে নাড়ুন।

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—

অধিকতর জোরে কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। (অধীর হইয়া) কই মশাই, কারও
াড়াশব্দ নেই যে!

ভৈরব। অসুখের বাড়ী কি না—নিঝ্ঝুম সেই
ন্যেই বোধ হয়।

বিষ্ণুবাবু। কি মুস্কিল—নিঝ্ঝুম বলে দাঁড়িয়ে
াকলে ত চলবে না—সিরিয়স্ সব কেস রয়েছে হাতে
মামার—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ এই যে—

আবার কড়া নাড়িলেন

বিষ্ণুবাবু। ও বেলা এলেই ঠিক হত—কিন্তু নাছোড়-
বান্দা লোক আপনি। আপনাকে বুঝিয়ে বললাম
যে সাণ্ডেলদের বাড়ীর ছেলেটা পথ্যই পাবে না আমি না
গেলে—তিনটে টাইফয়েড্ এখন তখন হয়ে রয়েছে—
কিন্তু আপনি ত বুঝবেন না কোন কথা। সেই যে ধরে
বসলেন—'আপনাকে এ বেলাই একবার দয়া করতে হবে'
—সে আর কিছুতেই রদ করা গেল না। কই মশাই
এ বাড়ীতে কোন লোক আছে বলে যে বোধ হচ্ছে না—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ লোক আছে বৈকি—নিজের
চোখে দেখে গেছি আজ সকালবেলা—লোক নেই কি
বলছেন—

বিষ্ণুবাবু। কিন্তু কেউ যে সাড়া দেয় না।

ভৈরব। ডাকি দাঁড়ান—ঝি, অ ঝি—

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না

বিষ্ণুবাবু। (অধীর হইয়া) কি মুস্কিলেই পড়া গল।

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। আজ্ঞে কলেজ রো কোন দিকটায় বলতে ারেন ?

বিষ্ণুবাবু। হ্যারিসন রোডের মোড়ের এ দিকটায়।

পথিক। হ্যারিসন রোডের মোড় ? সে আবার কান দিকে—

ভৈরব। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সোজা। ঝি -অ—ঝি—

পথিক চলিয়া গেল। ঝিয়ের সাড়া পাওয়া গেল না

বিষ্ণুবাবু। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে।

একজন ঝাঁকা মুটের প্রবেশ। বিষ্ণুবাবুকে দেখিয়া তাহার হাতে একটি কাগজ দিয়া

ঝাঁকা মুটে। ঠিকানাঠো পড় দিজিয়ে তো হুজুর।

বিষ্ণুবাবু। (কাগজটা দূরে ধরিয়া) ১৭ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট—

ঝাঁকা মুটে। সত্তর নম্বর ? উ কোন বাড়ী হ্যায়।

ভৈরব। কাহে দিক করতা হ্যায়—যাও না বাবা—
ধা।

ঝাঁকা মুটে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল একজন ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী। একটি পয়সা দেন না বাবু—সমস্ত দিন
খেতে পাইনি বাবু—একটি পয়সা বাবু—

বিষ্ণুবাবু। মাপ কর বাবা—

ভিখারী। সমস্ত দিন খেতে পাইনি বাবু—

বিষ্ণুবাবু। মাপ কর বাবা—

ভৈরব। (তাড়া করিয়া গেলেন) ভাগ্ ভাগ্—
ভাগ্। যতো সব জোটে এসে।

ভিখারী চলিয়া গেল

বিষ্ণুবাবু। ডাকুন—ডাকুন—আরো জোরে ডাকুন
—অত মৃদু-স্বরে কাজ হবে না—

ভৈরব। আজ্ঞে হ্যাঁ। ঝি—অ—ঝি—

সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিলেন ও সজোরে ডাকিতে লাগিলেন।
ঝি আসিয়া কপাট খুলিয়া গলা বাড়াইল

ঝি। কি বলছেন ?

ভৈরব। তোমাদের গিন্নিমার অসুখ করেছে, না ?
তাই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।

ঝি। গিন্নিমার অসুখ ক'রে নি তো। কে বললে আপনাকে ?

বিষ্ণু ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় কুঞ্চিত করিয়া সক্রোধে ভৈরবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন

ভৈরব। শুনলাম যে, ভয়ঙ্কর অসুখ নাকি ?

ঝি। দাঁড়ান তা হ'লে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ঝি চলিয়া গেল

ভৈরব। আমার ওয়াইফ বললে যে ভয়ঙ্কর অসুখ। তাই তো আপনাকে—

ঝি ফিরিয়া আসিল

ঝি। না, গিন্নিমা বললেন, তাঁর ডাক্তার দরকার নেই।

সদর দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল

বিষ্ণু ডাক্তার। আপনার মত জরদ্গব লোক খুব কম দেখেছি আমি।

ভৈরব। আমার ওয়াইফ বললে যে—

বিষ্ণু ডাক্তার। ওয়াইফ্ বললে!

গমনোদ্যত

ভৈরব। আপনার ফী—টা—

বিষ্ণু ডাক্তার। ( সক্রোধে ) ফী আমাকে দিতে

ব না। সেই টাকায় বরং মধ্যমনারায়ণ কিনে মাথায় ন।

বিধু ডাক্তার সজোরে প্রস্থান করিলেন। ভৈরব হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া লেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া ল। সহসা দূরে রোশনচৌকি ব্যাণ্ড প্রভৃতি জোরে বাজিয়া উঠিল। পাড়ায় নিতাই মামা প্রবেশ করিলেন

নিতাই মামা। ভৈরব যে।

ভৈরব। হ্যাঁ।

নিতাই মামা। শুনছ? (চোখের ইসারা-করিলেন)

ভৈরব। কি শুনব?

নিতাই মামা। আরে, কালা নাকি, বাজনা শুনছ না?

ভৈরব। তা তো শুনছি।

নিতাই মামা। ঘোষালের বড়ছেলের বিয়ে। আমি লেছি সেইখানেই, তদ্বির তদারক করতে হবে তো। মুচকি হাসিলেন) যাই।

নিতাই মামা চলিয়া গেলেন। ভৈরব খানিকক্ষণ বাজনা শুনিয়া তাহার পর স-ক্রোধ তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন

ভৈরব। বিয়ে করতে যাচ্ছে—যাক। পরে বুঝবে ব্যাটা! উঃ, কি কুকাজই করেছি বিয়ে ক'রে। নাকে

ঘড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে আমায়, বনবন ক'রে ঘোরাচ্ছে। ঘুরছিও তো। উপায় কি।

আবার খানিকক্ষণ বাজনা শুনিলেন

সব বাজনা বেরুবে পরে। আপিসেও আজ দেখছি, বকুনি খেতে হবে। ছি ছি ছি ছি।

হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন

হারাধনের বাড়ির অন্তঃপুর। শুভঙ্করী ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাসী ওরফে বান্টু মল্লিকের সাজ-সজ্জা পূর্ব্ববৎ। জটা, দাড়ি, এক হস্তে ত্রিশূল, অন্য হস্তে কমণ্ডলু। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলায় ও বাহুমূলে, রুদ্রাক্ষ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাম গণ্ডে আঁচিল। বারান্দায় কুকুরটাও বাঁধা রহিয়াছে—

শুভঙ্করী। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কুকুর কিছুতেই আর মানুষ হচ্ছে না।

সন্ন্যাসী। (স্মিত হাস্যে) হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে। তন্ত্র তো ছেলে-খেলার জিনিস নয় মা। নিশ্চয়ই কোন প্রকার অনাচার হয়েছিল, তাই মন্ত্র কার্য্যকরী হয় নি। শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। না, কিচ্ছু তো অনাচার করি নি। আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই তেমনই করেছি—অক্ষরে অক্ষরে।

সন্ন্যাসী। (সহাস্যে) তোমার তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে কোন্ অদৃশ্য অনাচার কখন যে প্রবেশ করে বোঝবার জো নেই। কোন প্রকার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হয়েছে। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আজ আমি তোমার এখানে কেন এসেছি তা জান?

শুভঙ্করী। কেন ?

সন্ন্যাসী। আমি জানতে পেরেছিলাম যে তুমি দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধকাম হও নি। ( হাসিলেন )

শুভঙ্করী। কি ক'রে জানতে পারলেন ?

সন্ন্যাসী। ( পুনরায় হাসিয়া ) সে গুহ্যতত্ত্ব নাই বা শুনলে মা তুমি। তা বলাও যাবে না।

শুভঙ্করী। যাই হোক, আপনি এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে। এখন কি করলে মন্তর সফল হবে তাই বলুন।

সন্ন্যাসী। ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ) শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম মা তোমাকে, সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার।

শুভঙ্করী। তা হ'লে আপনি কি বলতে চান আমার মনে পাপ আছে ?

সন্ন্যাসী। মা না, তা আমি বলছি না।

শুভঙ্করী। পাকে প্রকারে তাই তো বলছেন আপনি। আপনি বলছেন, সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি দরকার —যেন আমার চিত্তশুদ্ধি নেই। সেই ছেলেবেলার পুণ্যি-পুকুর থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত একটিও ব্রত বাদ দিই নি আমি, জানেন ? এতেও যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়—

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু। আমায় ভুল বুঝো না মা। আমি বলছি না যে তোমার চিত্ত অশুদ্ধ। ভাল ক'রে

আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোন। এই মন্ত্র কার্য্যকরী হ'তে হ'লে তিনটি জিনিস দরকার। প্রথম—চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয়—স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, এবং তৃতীয়—পারিপার্শ্বিকের পবিত্রতা। মন্ত্র যখন সফল হয় নি তখন বুঝতে হবে এর একটার অভাব ঘটেছে। এই অনুমানই স্বাভাবিক নয় কি?

শুভঙ্করী। (রাগতভাবে) স্বাভাবিক হ'তে পারে; কিন্তু আমি জোর গলায় বলছি, এর একটারও অভাব ঘটে নি। চিত্ত আমার খুবই শুদ্ধ, স্বামীর প্রতি ভক্তিও আমার অচলা, আর পবিত্রতার আমি চরম করেছি। ঘরে, দোরে, উঠোনে এমন এক ইঞ্চিও জায়গা পাবেন না, যা আমি বারবার গঙ্গাজল দিয়ে ধুই নি। ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আনিয়ে নালি পর্য্যন্ত ধুয়েছি, ছাতের কড়ি-কাঠে পর্য্যন্ত ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি যতদূর পেরেছি। সোজা গঙ্গাজলটা খরচ হয়েছে। গঙ্গাজল ব'য়ে ব'য়ে ঝিয়ের কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। বাকি কিছু রাখি নি। নিজে গঙ্গাজলে নেয়েছি, কুকুরকে বারবার নাইয়েছি। সমস্ত দিন উপবাসী থেকে নতুন পাটের কাপড় প'রে আপনি যেমন যেমন ব'লে গেছলেন, ঠিক তেমনই ক'রে মন্ত্র পাঠ ক'রে কুকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছি। কিচ্ছু হয় নি।

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু।

শুভঙ্করী। আপনি নিজে এখন এসে গেছেন, আপনিই কুকুরকে মানুষ ক'রে দিয়ে যান।

সন্ন্যাসী। আমি? শিব স্বয়ম্ভু। আমার তো এতে কিছুই করবার নেই মা। যা করবার তোমাকেই করতে হবে। আমি করলে তো কোন ফল হবে না। তুমিই প্রথম মন্ত্র প্রয়োগ করেছ, দ্বিতীয় মন্ত্রও তোমাকেই প্রয়োগ করতে হবে।

শুভঙ্করী। আপনি তা হ'লে ব'সে থাকুন। আপনার সামনেই আমি যা করবার সব করছি। আমার কোথায় ত্রুটি হচ্ছে আপনি দেখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা তো করতে পারব না মা। কালীঘাটে মায়ের পূজার একটা আয়োজন ক'রে এসেছি, সেখানেই এখন আমাকে যেতে হবে।

শুভঙ্করী। না, তা আমি যেতে দেব না।

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু। একি মুস্কিল!

শুভঙ্করী। মুস্কিল? এখন আপনি মুস্কিল বলছেন? আপনারই মন্তরে, আপনারই কথামত আমার স্বামীকে আমি কুকুর বানিয়ে ব'সে আছি। এখন সে কুকুর আর কিছুতে মানুষ হচ্ছে না। আপনি যখন এসে পড়েছেন

তখন নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিয়ে যেতে হবে। মুস্কিল বললে শুনব না তো।

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। মন্ত্রের ওপর তো জোর চলে না মা। বিধির বিধান অবশ্যম্ভাবী, মুণ্ডমালিনীর যা অভিপ্রায় তাই হবে, কারও সাধ্য নেই তার পরিবর্ত্তন করে। জোরজবরদস্তি ক'র না মা।

শুভঙ্করী। ( সক্রোধে ) তা হ'লে কি আপনি বলতে চান আমার স্বামী কুকুর হয়েই থাক ?

সন্ন্যাসী। ( বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া ) আহা, আমাকে ভুল বুঝো না মা। তা আমি চাইব কেন ? শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু। আমি শুধু এই তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম যে বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানকে মেনে নেবার জন্য সকলেরই সব সময় প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। তা ছাড়া গত্যন্তরও তো নেই।

শুভঙ্করী। অর্থাৎ আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন যে আমার স্বামী কুকুর হয়েই থেকে যাক ? কুকুর হয়ে হয়ে থেকে গেলে আমার অবস্থাটা কি হবে তা ভেবে দেখেছেন একবার ?

সন্ন্যাসী। তুমি বারবার আমাকে ভুলই বুঝছ মা। তোমার স্বামী কুকুর হয়ে থেকে যাবে, একথা বলবার স্পর্দ্ধা বা অধিকার আমার তো নেই। আমি কে

তৃণাদপি ক্ষুদ্র। আমি এইটুকু শুধু অনুমান করতে পারি যে মন্ত্র যখন বিফল হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোন বিরুদ্ধ শক্তি তার জন্য দায়ী, এবং সম্ভবত মহাশক্তিরই এ লীলা।

শুভঙ্করী। ওসব শক্তি-ফক্তি আমি বুঝি না। এই নিন কুকুর।

কুকুরটাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিলেন

একে আপনি মানুষ ক'রে দিন যেমন ক'রে পারেন। আমার কাছে স্পষ্ট কথা। আমার স্বামী ফিরিয়ে দিয়ে যান আপনি।

সন্ন্যাসী। (একটু বিব্রতভাবে) শিব স্বয়ম্ভূ, শিব স্বয়ম্ভূ। আমায় বড় বিপন্ন করলে যে মা। এখন কালীঘাটে যাওয়ার আমার বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা বেশ, কাল প্রাতঃকালে তা হ'লে আসব। গঙ্গাজলাদির সব ব্যবস্থা ক'রে রেখ, আমার সামনেই সব অনুষ্ঠান ক'র [illegible], আমি চললাম তা হ'লে। (গমনোদ্যত)

এই কথায় শুভঙ্করীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, ভ্রূ কুঞ্চিত এবং নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল

শুভঙ্করী। ওসব বুজরুকি রেখে দিন, অন্য জায়গায় [illegible] লাগাবেন। ভাল চান তো কুকুরকে মানুষকে ক'রে দিয়ে যান, তা না হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি। [illegible] কি।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। কি মা ?

শুভঙ্করী। ( আদেশের ভঙ্গিতে ) সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয় তো, এই সন্নিসীর ভিটকিলিমি একবার বার করি আমি।

ঝি গিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল

( সন্ন্যাসীর প্রতি ) আসুন, এই বারান্দায় উঠে আসুন। ( উচ্চতর গ্রামে ) উঠে আসুন।

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন

( চীৎকার করিয়া ) উঠে আসুন বলছি, তা না হ'লে চেঁচিয়ে আমি পাড়া মাথায় করব। চেনেন না আপনি শুভঙ্করীকে—

সন্ন্যাসী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগাইয়া গেলেন

সন্ন্যাসী। অত অধীর হোয়ো না মা। এইবার কি করব, বল।

শুভঙ্করী। ( কুকুরকে দেখাইয়া ) এই সেই কুকুর, আর এই নিন্ আপনার মন্তরলেখা কাগজ। ( তা[illegible] হইতে পাড়িয়া কাগজখানা দিলেন ) গঙ্গাজল কতটা [illegible] বলুন, এনে দিচ্ছি। আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী। এ রকম চঞ্চল মনোভাব নিয়ে [illegible]

করলে তা সফল হবে না তো মা। চিত্তের সমতা না থাকলে—

শুভঙ্করী। ওসব লম্বা চওড়া কথা রেখে দিন আপনি। আমার স্বামী ফিরিয়ে দিন।

হঠাৎ শয়নঘরের কপাট খুলিয়া কাপড়ের কষি গুঁজিতে গুঁজিতে হারাধন আসিয়া প্রবেশ করিলেন, চক্ষু দুইটি হাস্যোজ্জ্বল। হস্তে হুঁকা

একি, তুমি বেরিয়ে এলে যে?

হারাধন। (সহাস্যে) যথেষ্ট হয়েছে, দুজনেই চমৎকার অভিনয় করেছ, আর কেন? বাঙ্কু, খুলে ফেল ভাই দাড়ি-কাড়ি, বুঝলে? সেখানে টিকতে দিলে না ভাই। উঃ, কি কষ্টে যে পালিয়ে এসেছি ভগবানই জানেন। আরে, এই বাঙ্কু, খোল দাড়ি, করছ কি?

সন্ন্যাসী। (গম্ভীরভাবে) বৎস, তুমি বাঙ্কু ব'লে কাকে সম্বোধন করছ জানি না। কিন্তু আমি সে ব্যক্তি নই। তোমার ভ্রম হয়েছে, আমি প্রকৃতই একজন সন্ন্যাসী।

শুভঙ্করী। (মুচকি হাসিয়া) বন্ধুটি তোমার সত্যিই [illegible]।

হারাধন। (আগাইয়া আসিয়া) বেশ হয়েছে। [illegible] দাড়ি খুলে ফেল এবার। কি সং সেজে রয়েছ, [illegible] রেখেছ, আর কেন? কি ভীষণ

খপ্পরে আমি পড়েছিলাম সেইটে শোন আগে। এই শুভঙ্করী, চায়ের জোগাড় কর।

শুভঙ্করী। (হাসিয়া) জল চড়ানোই আছে। ঝি, চায়ের সব নিয়ে আয় তো।

হারাধন। এই বাস্থ, কি করছ তুমি? খোল ওসব। আরে, আমি যে ভীষণ খপ্পরে পড়েছিলাম তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়। কি দারুণ মশা তোমার ওই বাড়িতে, এক একটা যেন ভীমরুল হে! তার ওপর পাশের বাড়ীতে একপাল শানিত যুবতী চকমক করছে—অন্তরে বিরহ—কুটকুটে দাড়ি—সে এক মিস্‌লেনিয়াস ফীলিং। একদিন এক ছোঁড়া এসে জুটল, শেষকালে পুলিস। বাধ্য হয়ে পালাতে হ'ল। আরে, তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলে যে! জটা-কটা খোল। আরে!

ঝি একটি ছোট টেবিল ও পরে চায়ের সরঞ্জামাদি লইয়া প্রবেশ করিল। শুভঙ্করী চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন

এই বাস্থ, মাইরি, করছ কি তুমি?

সন্ন্যাসী। (অবিচলিতভাবে) তোমার কোন কথারই অর্থই আমার বোধগম্য হচ্ছে না বৎস। কে বাস্থ?

শুভঙ্করী মুখ চাপা দিয়া হাসিতে লাগিলেন

ঝি। আমার কাজ হয়ে গেছে মা। আমি বাড়ি যাচ্ছি এবার।

শুভঙ্করী। আচ্ছা।

ঝি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে সদর দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল

হারাধন। (হাসিয়া) আরে, এ তো বেড়ে রগড় সুরু করলে তুমি! রাগ ক'র না ভাই, এই বাচ্চু! বিশ্বাস কর, পুলিসের তাড়ায় দোতলা থেকে লাফিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। পুলিস না এলেও হয়তো পালাতে হ'ত। ভয়ানক মন কেমন করছিল শুভঙ্করীর জন্যে, আপঅন গড বলছি। (হাসিয়া) শুভঙ্করী কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। ভয়ানক মন কেমন করছিল, তাই তোমার ওখানে না গিয়ে এখানেই চ'লে এলাম। ওয়াইফ-গ্রাবিটি বড় সাংঘাতিক জিনিস হে। কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত যেন কান ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল আমাকে এখানে, মাইরি বলছি। আরে, তুমি সত্যিই ওইরকম সন্ন্যাসী সেজে থাকবে নাকি? এই—

বাচ্চুর নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন

এই বাচ্চু, রাগ ক'র না ভাই, খোল ওসব, এস, ব'সে চা-টা খাওয়া যাক, শুনছ। হ্যাঁ, শুভঙ্করীর সঙ্গে আর একটা কথাও আমার হয়ে গেছে, থক্সিয়াকের পার্ট আমার

নিতে দেবে। আচ্ছা, শুভঙ্করীকে রিজিয়া ক'রে দিলে কেমন হয়, ও তো মন্দ অভিনয় করলে না!

শুভঙ্করী চা করিতে করিতে হাস্যস্নিগ্ধ স-কোপ দৃষ্টিতে হারাধনের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী অবিচলিত

সন্ন্যাসী। শিব স্বয়ম্ভু, শিব স্বয়ম্ভু।

হারাধন। কি করছ তুমি ঝান্টু, ছেলেমানুষের মত? এই—

সন্ন্যাসী আরক্ত চক্ষে কটমট করিয়া হারাধনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন

খোল, খোল, খুলবে না? দাঁড়াও তো আমি খুলে দিই টেনে।—

হারাধন হাসিয়া সন্ন্যাসীর দাড়ি জটা টানিয়া খুলিতে গেলেন

সন্ন্যাসী। (অভিশাপ দিবার ভঙ্গিতে) নরাধম্, মন্ত্রমুগ্ধ পশু, নিপাত যাও—নিপাত যাও—নিপাত যাও

এই বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সদর দরজা দিয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন

হারাধন। আরে, ক্ষ্যাপা, না পাগল! এই ঝান্টু! চ'লে গেল নাকি সত্যি!

হুঁকাটা তাড়াতাড়ি কোণে নামাইয়া রাখিলেন

শুভঙ্করী। না না, ধ'রে নিয়ে এস ওঁকে।

হারাধন বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। শুভঙ্করী দ্বারের পানে শঙ্কিত মুখে চাহিয়া রহিলেন

যবনিকাপতন

# রূপান্তর

'বনফুল'

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা—



মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসু
নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মানসপরলা প্রেস, ৫১বি, কৈলাস ব
ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# ভূমিকা

আরব্য উপন্যাসের এই সুবিদিত গল্পটি অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক 'আলিবাবা' রচনা করিয়াছিলেন। আলিবাবা হাস্যরসপ্রধান গীতিনাট্য। সেই একই গল্পকে অবলম্বন করিয়া আমি নাটকটিতে ভিন্ন রস পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

রচনার সময় নাট্যরসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব রায়ের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ইতি

১৫-৩-৪৫
ভাগলপুর

"বনফুল"

# পাত্র-পাত্রীগণ

| | | |
|---|---|---|
| আলিবাবা | ... | কাঠুরে |
| কাসিম | ... | আলিবাবার ছোট ভাই |
| সরদার | ... | ডাকাতের সরদার |
| জাফর | | |
| ফরিদ | ... | দস্যু |
| আনোয়ার | | |
| আবদালা | ... | ক্রীতদাস |
| হোসেন | ... | আলিবাবার পুত্র |
| বন-রক্ষক | ... | |
| ফতিমা | ... | আলিবাবার স্ত্রী |
| সাকিনা | ... | কাসিমের স্ত্রী |
| মরজিনা | ... | কাসিমের ক্রীতদাসী |
| প্রতিবেশী | ... | |
| ভৃত্যগণ | ... | |

# রূপান্তর

—ঃ❋ঃ—

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ান। রাজ-সরকারের সুরক্ষিত বনকর। বনের ভিতর হইতে ছাট বড় নানা আকৃতির পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে। এই ার্ব্বত্য-বনভূমির ভিতর হইতে আলিবাবা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির ইয়া আসিলেন এবং সম্মুখেই একটা গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া তাহার ধ্যে আত্মগোপন করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন-রক্ষকের াবেশ।

বন-রক্ষক

লোকটা গেল কোথা! এরা আমাকে পাগল করে ুবে দেখছি। খাজনা না দিলে এ বনে কাঠ কাটবার নেই অথচ যত ব্যাটা কাঠুরে এসে এখানে লুকিয়ে কাঠ কাটবে। ধরতে পারলে ব্যাটাকে মজাটা টের পাইয়ে দিতাম একবার!

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

গেল কোথা! এ ঠিক সেই ব্যাটা আলিবাবা! সেদিন ব্যাটাকে ধরেছিলাম—অনেক কাকুতি মিনতি করাতে ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিয়েই ভুল করেছি—সঙ্গে সঙ্গে কাজী সাহেবের ওখানে হাজির করে দিলেই চুকে যেত! এখন এ কতদিন যে আমাকে জ্বালাবে—ও বাবা, খোদ মালিকও যে এদিকে আসছেন দেখ্‌ছি!

প্রধান বন-রক্ষকের প্রবেশ। তিনি যে প্রধান বন-রক্ষক তাহা তাঁহার বেশ-বাস কথা-বার্ত্তা চাপ-দাড়ী প্রভৃতিতে সুস্পষ্ট। নিম্নতন বন-রক্ষকটি সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

প্রধান বন-রক্ষক

তুমি এদিকে কোথায় ঘুরছ হে রমজান!

বন-রক্ষক

একটা লোক চুরি করে কাঠ কাটছিল—আমাকে দেখেই এদিকে পালিয়ে এল—আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এলাম তার সঙ্গে—কিন্তু এখানে এসে আর লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না।

প্রধান বন-রক্ষক

(ভৎর্সনার সুরে) 'পাচ্ছি না' বললেই ত চলবে না। খুঁজে বার কর তাকে। সম্প্রতি দেখ্‌ছি কাজে

তুমি ভারি ঢিলে দিয়েছ। আমার কাছে ফাঁকি-টাঁকি চলবে না। আমার আগে ছিলেন নিয়ামৎ খাঁ। তিনি অতিশয় ভালোমানুষ লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তোমরা ভারি আস্কারা পেয়ে গেছ। আমি কিন্তু অত্যন্ত রাশভারি লোক তা বলে দিচ্ছি।

চক্ষু পাকাইয়া গোঁফে তা' দিতে লাগিলেন।

কে লোকটা—চিনতে পারলে ?

বন-রক্ষক

আজ্ঞে হ্যাঁ—আলিবাবা বলে একটা কাঠুরে।

প্রধান বন-রক্ষক

আলিবাবা ? আচ্ছা—আজই ব্যাটাকে আমি পাইক পাঠিয়ে ধরিয়ে আনাচ্ছি।

বন-রক্ষক

সে ত বনের ভিতর লুকিয়ে বসে আছে। হুজুর তাকে ধরবেন কি করে ? আমি তখন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি—

প্রধান বন-রক্ষক এই কথা শুনিয়া প্রথমটা একটু হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাহার পর একটু উচ্চতর স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ

প্রধান বন-রক্ষক

সে না থাকে তার ছেলে বউ যে থাকে তাকে ধরিয়ে আনাব। আমার কাছে চালাকি। তুমি সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, যদি তাকে ধরতে পার। ধরতেই হবে, যাবে কোথা—! আমি যাই তার বাড়ীতে পাইক্ পাঠাবার ব্যবস্থা করি—

চলিয়া গেলেন।

বন-রক্ষক

( এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে ) সত্যিই লোকটা গেল কোথা! এ যেন হাওয়ার মত উড়ে গেল। ওই পাহাড়ের কোলটায় খানিকটা ঝোপ মতন রয়েছে ওই দিকটাতে একবার খোঁজ করি—

হঠাৎ সেইদিকে চাহিয়া বন-রক্ষকের সমস্ত শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল একদল ভীষণ-দর্শন ডাকাত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেকের হস্তে শানিত ছোরা।

এ কি! এরা কোথা থেকে এল—

তাহার কথা শেষ হইল না। দস্যুদল নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে আসিয়া তাহার হাত মুখ বাঁধিয়া ফেলিল এবং

তাহাকে গভীর বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। একটু পরেই মৃত্যুর দারুণ আর্ত্তনাদে বনভূমি শিহরিয়া উঠিল।

দস্যুদলের পুনঃ প্রবেশ।

সরদার

(হাতের রক্তাক্ত ছোরাটার দিকে চাহিয়া) আজকের এই লোকটাকে নিয়ে পাঁচ'শ হল। পাঁচ পাঁচ'শ লোক এই ছোরার ঘায়ে শেষ হয়েছে। তোমার ছোরা ক'জন লোক খুন করেছে!

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একজন দস্যুকে প্রশ্ন করিলেন।

দস্যু

গুণে রাখিনি সর্দ্দার। কিন্তু আমারও ছোরা খুন-খোর—

ত্বরিত হস্তে সে ছোরা কোষ-মুক্ত করিয়া আবার কোষ-বদ্ধ করিল।

সরদার

কেউ তোমরা গুণে রেখেছ? কেউ কি বলতে পার যে ঐ এক ছোরা দিয়ে পাঁচ'শ লোকের বেশী খুন করেছ? পারো কেউ? আমার চেয়ে বেশী খুনী ছোরা কারো আছে?

দস্যুদল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর একটি বলিষ্ঠদেহ উন্নত-

মস্তক যুবা আগাইয়া আসিল এবং সরদারকে সেলাম করিল।

সরদার

কি বলতে চাও তুমি আনোয়ার!

আনোয়ার

অবিশ্বাস করবেন না ত?

সরদার

অবিশ্বাস! তোমাকে অবিশ্বাস করব!

আনোয়ার

(ক্ষিপ্রগতিতে নিজের ছোরা উন্মুক্ত করিয়া বলিল) আমার এই ছোরা হাজার লোক খুন করেছে। হাজার! কিন্তু তবুও আমি ভৃত্য! আপনি মালিক—আপনি সরদার!

আনোয়ারের চোখে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল।

সরদার

(আনোয়ারের দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন) কে বলেছে আমি মালিক—তোমরা ভৃত্য! আমরা সবাই সমান! তোমার ছোরা দেখে আমি খুব খুশী হলাম—এই ত চাই! তুমি আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ শিকারী! এইবার চল যাওয়া যাক—আর এখানে থাকা ঠিক নয়। একটা লোক খুন

হয়েছে এখনি হয়ত খোঁজ পড়বে! তোমরা যাও—আমি একবার এই বনের চারিদিকটা ভাল করে দেখি! তোমরা সোজা আড্ডায় চলে যাও। আমি আসছি এখনি।

দস্যুদল চলিয়া গেল

সরদার

আনোয়ারকে কোন রকমে সরাতে হবে। লোকটা শক্তিশালী। কিন্তু শক্তিশালী বলেই ওকে সরাতে হবে। আমার দলের মধ্যে একজন লোকই মাথা উঁচু করে থাকবে এবং সে লোক আমি। আমাদের দলের মূলমন্ত্র 'চল্লিশজন মোরা চল্লিশ ভাই' কিন্তু ওটা শুধু একটা মুখোস! আসলে আমিই সব—এরা আমার হাতিয়ার মাত্র!

দস্যু সরদারের মুখে এক অদ্ভুত কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি ধীরে ধীরে গভীরতর বনে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। দস্যু সরদার চলিয়া গেলে আলিবাবা তাঁহার লুক্কায়িত স্থান হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিলেন। কাছাকাছি আর কেহ নাই দেখিয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন।

আলিবাবা

এ কি ব্যাপার! এরা কারা! চোখের সামনে বন-রক্ষকটাকে হত্যা করলে! এক আধ জন নয়—একদল লোক! এদের কথাবার্ত্তা যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে এরা নিশ্চয়ই ডাকাতের দল। ওই পাহাড়টার তলা দিয়া বেরিয়ে এল দেখলাম। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা!

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আলিবাবা সেই পাহাড়টার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া হঠাৎ একটা বন্য পাখীর চীৎকারে তিনি চমকাইয়া উঠলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া আবার সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দেখা গেল তিনি অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের সানুদেশে যে গুহা ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলিবাবা চলিয়া যাইবার পর প্রধান বন-রক্ষক একজন অনুচরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আসিলেন।

প্রধান বন-রক্ষক

(এদিক ওদিক চাহিয়া) রমজান আবার কোথায় গেল। এই ত এইখানে ছিল। বড় ফাঁকিবাজ হয়েছে সব। নিয়ামৎ খাঁ ভাল লোক ছিলেন—এমন আস্কারা

দিয়ে গেছেন! এদের এখন সামলান মুস্কিল। খুঁজে দেখ্ তুই!—আলিবাবার বাড়ীর ঠিকানাটা বেশ ভাল করে জেনে নিয়ে তার পর সেখানে গিয়ে যাকে পাবি ধরে নিয়ে একেবারে কাজী সাহেবের ওখানে হাজির করে দিবি। এক গাদা খাজনা বাকী অথচ বনে লুকিয়ে কাঠ কাটছে। হুঁঃ—আমার কাছে চালাকি চলবে না! আমি নিয়ামৎ খাঁ নই—আমি রাশভারি লোক! আলি-বাবার বাড়ির ঠিকানাটা ভাল করে' জেনে নিস।

আবার গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

অনুচর

আমি হুজুর ঠিকানা জানি—

প্রধান বন-রক্ষক

ফের কথার ওপর কথা! আর একটু ভাল করে জেনে নিতে আপত্তিটা কি তোমার। (ধমক দিয়া) খুঁজে দেখ্ রমজান কোথায়।

অনুচর এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে রমজানের মৃতদেহটা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই সে "বাপরে বাপ—একি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

প্রধান বন-রক্ষক

কি হল !

অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

অনুচর

পালাই চলুন—হুজুর !

প্রধান বন-রক্ষক

( সচকিত হইয়া ) কি বল্‌লি ! ভাল করে বল না রে কি বল্‌লি—

অনুচর

পালাই চলুন—

প্রধান বন-রক্ষক

পালাব—অ্যাঁ ! একজন কর্ম্মচারী মরে গেল। খোঁজ নেওয়া উচিত কারণটা কি। আলিবাবা নয় ত ?

অনুচর

জানোয়ারে মেরে ফেলেছে হুজুর—বাঘ, শূয়ার কত কি আছে এ জঙ্গলে—! আলি ব্যাটার কি এত সাহস হবে !

প্রধান বন-রক্ষক

উহুঁ সম্ভব নয়। তুই কিন্তু আলিবাবার বাড়ীতে গিয়ে যাকে পাস ধরে একেবারে কাজী সাহেবের

এলাসে হাজির করে দিবি। নাঃ—এখানে থাকা ঠিক নয়—গাটা কি রকম ছম্‌ছম করছে।

একটা বন্য পাখী চীৎকার করিয়া উঠিল। দুইজনে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। আলিবাবা পর্ব্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আলিবাবা

একি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখলাম! রাশি রাশি মোহর আর রাশি রাশি টাকা! লাল, নীল, হলুদ, সবুজ কত রং বেরঙের চকচকে পাথরের গাদা! হীরে জহরৎ বোধ হয়। চোখ ঝলসে গেছে। ঠিক এরা ডাকাত—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এ সব লুট করা জিনিস এইখানে লুকিয়ে রাখে। এতদিন এই বনে কাঠ কাটছি এ সন্ধান ত পাই নি কোন দিন। উঃ এ ত ভয়ানক জায়গা হয়ে হয়ে উঠল! চোখের সামনে জলজ্যান্ত ওই লোকটাকে খুন করলে! অ্যাঁ! নাঃ আর এখানে থাকা ঠিক নয়—পালাই!

কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

আচ্ছা···এখন এ টাকা ধন-দৌলত যা কিছু এখানে আছে সব ত আমার হতে পারে। এ ত আমার হতগত। এর সামান্য কিছু অংশও যদি পাই তাহলে কাঠ কাটার দুঃখ আর থাকে না। আমার ঘরে সুখ শান্তি সব আছে।

ফতিমা আছে—হোসেন আছে। নেই কেবল অর্থ! সেই অর্থ ও ত এখন হতে পারে আমার। কি করি! নিয়ে যাব কিছু? কেন নেব না! কেন…? আল্লা—দয়াময়—খোদা তুমি আছ। জীবনে বড় কষ্ট ভোগ করেছি—বহুদিন অনাহারে কেটেছে—আজ তুমি আমাকে দয়া করেছ।… একি আমি করছি কি—এত চেঁচামেচি করছি কেন? আস্তে।

ধীরে ধীরে আবার সেই পর্ব্বতগুহার দিকে অগ্রসর হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—আলি তুই চুরি করছিস! চুরি?—হ্যাঁ চুরিই ত! পরের জিনিষ না বলে নেওয়ার নামই চুরি! কিন্তু এ নিলে কারো ক্ষতি নেই—এ ত ডাকাতদের লুট করা টাকা! ওরা অপরের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে ছিনিয়ে এনেছে! চুরি? হোক চুরি। আমাকে বাঁচতে হবে ত। ডাকাতে আমাদের টাকা লুট করে নেবে—এরা জোর করে খাজনা আদায় করবে, গরিব কাঠুরে বনে কাঠ কেটে দিন চালাই —তা-ও করতে দেবে না! কেন? আমি মানুষ নই— আমার রক্তমাংস নেই—প্রাণ নেই? টাকা যখন পেয়েছি ছাড়ব কেন?

পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর। একটা গাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া হোসেন বাঁশী বাজাইতেছিল। সন্ধ্যাকাল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। একটি সুশ্রী যুবক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

যুবক

জনাব, আপনার নাম কি হোসেন আলি ?

হোসেন

( বিস্মিতভাবে চাহিয়া ) হ্যাঁ। কে আপনি ?

যুবক

( একটু হাসিয়া ) আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। আমি আপনাদের বাড়ী এসে শুনলাম আলিবাবা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। আপনার মা ভারি চিন্তিত হয়েছেন। —আপনিও অনেকক্ষণ বাড়ী ফেরেন নি তাই আপনার মা আমাকে অনুরোধ করলেন—

হোসেন

( গম্ভীরভাবে ) ও—

এই বলিয়া তিনি বাঁশীটা রাখিয়া গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুবকের গোঁফ ধরিয়া এক টান দিলেন। গোঁফ খুলিয়া আসিল।

ছি—ছি—মরজিনা গোঁফটা ভাল করে জুড়তেও পার নি!

মরজিনা

( হাসিয়া উঠিল ) ঠিক ধরে ফেলেছ তুমি ত !

হোসেন

( হাসিয়া ) ও মুখ কি গোঁফ দিয়ে লুকোন যায় ! ও মুখ—

মরজিনা

( মুখের প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বলিতে লাগিল ) আলি সায়েব এখনও বাড়ী ফেরেন নি। ফতিমা বিবি ভয়ানক ভাবছেন। তুমি এখনি বাড়ী চল।

হোসেন

( কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ) তুমি এই পুরুষ মানুষের সাজ আর এই বেয়াড়া একজোড়া গোঁফ কোথা পেলে আগে বল।

মরজিনা

সে সব বাড়ী গিয়ে বলব।

হোসেন

আমি যে এখানে আছি তাই বা তুমি জানলে কি করে' ?

মরজিনা

সন্ধেবেলা তুমি যে মাঠে বসে' বাঁশী বাজাও এ ত সবাই জানে। ওসব কথা থাক এখন—বাড়ী চল। সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয় নি।

হোসেন

খেতে এখন আমার ইচ্ছে নেই। বাড়ী এখন যাব না।

মরজিনা

তোমার মা ভাবছেন খুব।

হোসেন

( তিক্ত হাসি হাসিয়া ) গরীবের মা গরীবের বউ ভাববে না একটু ? ওতে কিছু এসে যায় না। ভাবুক—

মরজিনা

(হাত ধরিয়া টানিয়া) চল চল—কি পাগলামি করছ।

হোসেন

উহু হু ছাড় ছাড়—ওখানে বড় ব্যথা—

মরজিনা

( অপ্রস্তুত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল ) কি হয়েছে ওখানে ?

হোসেন

মেরেছে,—দেখছ না ফুলে আছে।

মরজিনা

সত্যিই তারা মেরেছে তোমায় ?

হোসেন

খাজনা দিতে না পারলে মারবে না ? তারা রাজা আমরা প্রজা। খাজনা দিতে পারি নি মারবেই ত। আমাদের চেয়ে তারা বেশী শক্তিশালী।

মরজিনা

কি বললে তারা তোমায় ?

হোসেন

যা বলেছে তা পাঁচজনের কাছে বলবার মত নয়। প্রহারের সঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগ করে তা শ্রুতিমধুর নয়। সে শুনে আর কি করবে তুমি মরজিনা।

মরজিনা

এ তাদের ভারি অন্যায়। মারবে কেন ?

হোসেন

কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কে তার বিচার করবে বল। এই চিরকাল চলে আসছে। এইটেই আমরা

স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। আমি যদি জমিদার হতাম আমিও ওই করতাম। যে সব প্রজারা খাজনা দেয় না তাদের ধরে আমিও চাব্‌কাতাম !

মরজিনা

( হাসিয়া ) ককখনো তুমি তা পারতে না।

হোসেন

আমি ত পারতামই। তুমি হলে তুমিও পারতে !

মরজিনা

আমার সম্বন্ধে এই ধারণা বুঝি তোমার !

হোসেন

তোমার সম্বন্ধে কেন সমস্ত মানুষের সম্বন্ধেই আমার এই ধারণা। প্রয়োজন হলে মানুষ পশুর চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর হতে পারে।

মরজিনা

তোমার এ ধারণা ভুল, সব মানুষ সমান নয়।

হোসেন

যাক্ বাজে তর্ক ছেড়ে একটা গান কর দেখি শোনা যাক্—

মরজিনা

( সবিস্ময়ে ) এইখানে এই সময়ে গান ! কি যে বল তুমি !

হোসেন

( হাসিয়া উঠিল ) এই দেখ হাতে হাতে প্রমাণ। এই সামান্য আইনটুকুও তুমি ভঙ্গ করতে রাজী নও। বে-আব্রু অবস্থায় বসে গান গাওয়াটা তোমার আইন মতে অন্যায়, অতএব তুমি গাইবে না। রাজা তাঁর নিজের আইন অনুসারে আমাকে এক রকম সাজা দিয়েছেন তুমি তোমার আইন অনুসারে আর এক রকম সাজা দিতে উদ্যত হয়েছ। আইন অমান্য করতে কেউ রাজী নও। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তোমরা দুজনেই এক জাতের লোক —অর্থাৎ মানুষ !

মরজিনা

তোমার মত কূটতার্কিক আমি দুটি দেখি নি ! এই সময়ে এখানে গান গাওয়াটা যে কতদূর অসঙ্গত তা তুমি নিজে বুঝতে পারছ না ?

হোসেন

তোমার পক্ষে হয়ত গান গাওয়া অসঙ্গত আমার পক্ষে গান শোনা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। আমার মনে হচ্ছে

এই ত গান শোনার ঠিক সময়। অন্তরে মৌন বেদনা— বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতাও নেই অজুহাতও নেই। এ সময়ে গান বেশ লাগত।

মরজিনা একটু মৃদু হাসিল মাত্র।

কর না। আমার মনে হয়—হাল্লা হৈ হৈ সিরাজি তবলা নিয়ে যারা গান করে তারা গানের ঠিক মর্য্যাদা দেয় না। গাছের ফুল ছিঁড়ে ফুলদানি সাজানোর মত তা একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। কেবল আড়ম্বর। যারা পুষ্প-রসিক তারা গাছের ফুল কখনও ছেঁড়ে না। গাছের ফুল ছেঁড়ে শিশু আর বর্ব্বর।

মরজিনা

না গাইয়ে ছাড়বে না?

হোসেন

তুমি কি আজও বোঝনি যে সত্যিকার গান মূর্ত্ত হয় দুজনের সভায়! একজন দরদী গায়ক এবং একজন দরদী শ্রোতা। তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নেই। অনেকদিন পরে আজ যদি সে সুযোগ এসেছে ছাড়া উচিত কি!

মরজিনা

কোনটা গাইব বল—

হোসেন

যা তোমার খুসী—

**গান**

ওরে ও হাস্নুহানা
ফুটেছিস্ অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলা
পাছে তোর গোপন কথা যায় রে জানা।

গোপন কথা তবু রে তোর
রইল না ত বুকের ভেতর
সুরভিতে রূপ নিয়ে সে
আবেশে মেলেছে ডানা।

আঁধারের পরদা তুলে
এলো সে আপন ভুলে
এলো সে মধুর বেশে
কে তারে করবে মানা।

হোসেন

কেমন চমৎকার বল ত। বিশেষ করে এই গানটা তোমার মুখে শুনতে ভারি ভালো লাগে।

মরজিনা

বিশেষ করে এই গানটাই কেন?

একটু হাসিল।

হোসেন

এটা যেন তোমার নিজের জীবন-চরিত নিজের মুখে।

মরজিনা

( লজ্জিত ) তুমি থামো ! ওই কে যেন আসছে এই দিকে আমি চললাম। তুমিও চল না—

হোসেন

তুমি যাও আমি যাচ্ছি একটু পরে। মার খেয়ে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে ; তা সহ্য করা তত শক্ত নয়, কিন্তু দলে দলে লোক যে সহানুভূতি দেখিয়ে যাবে সেটা সহ্য করা আরো শক্ত। তাই একটু রাত হলে তবে ফিরব। মাকে ভাবতে বারণ করো।

মরজিনা চলিয়া গেল।

দস্যু সরদারের প্রবেশ

সরদার

সেলাম।

হোসেন

( সবিস্ময়ে ) সেলাম। মাফ করবেন আপনাকে ত চিনতে পারলুম না।

সরদার

চেনবার কথাও ত নয়। আমিও আপনাকে চিনতাম না। আজ কাজির কাছে আপনার যখন বিচার হচ্ছিল তখন আপনাকেও আমি প্রথম দেখলাম। দেখলাম এবং

দেখে মুগ্ধ হলাম। এমন অবিচলিতভাবে শাস্তি নিতে আমি আর কাউকে দেখি নি।

হোসেন সরদারের মুখের দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

হোসেন

বিচলিত হয়েছিলাম বৈকি, কিন্তু মনে মনে। বাহিরে সেটা প্রকাশ করতে লজ্জা হল।

সরদার

আগাগোড়াই আপনার ব্যবহারে এমন একটা দৃঢ়তার প্রকাশ দেখলাম যা সচরাচর দেখা যায় না। আপনি বেশ সহজভাবেই বল্লেন যে বনে কাঠ কেটে অতি কষ্টে দিন চলে—হাতে বাড়তি টাকা নেই তাই খাজনা দিতে পারি নি। তারপর তারা যখন আপনাকে শাস্তি দিলে তখনও আপনি বেশ সহজভাবে বিনা প্রতিবাদে তা নিলেন। আপনার এই অনাড়ম্বর সহজ ভাবটাই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

হোসেন

( হাসিয়া ) তা ছাড়া উপায় কি বলুন! ভিতরের দৈন্যকে চাপা দিতে হলে বাইরে আত্ম-সম্মানের আতিশয্য অবশ্যম্ভাবী। আত্মসম্মানের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করা ছাড়া আর আমাদের উপায় কি!

সরদার

উপায় আছে এবং তাই আলোচনা করতেই আপনার কাছে এসেছি।

হোসেন

( সোৎসুকে ) কি রকম ?

সবদার

সে আলোচনা এখানে এখন করা সম্ভবপর নয়। আমার বাড়ীতে যদি যান একদিন—

হোসেন

বেশ ত,—কোথায় থাকেন আপনি ?

সরদার

সে আপনি ঠিক চিনবেন না। কাল আপনি ‘এইস্থানে ঠিক এই সময়ে থাকবেন আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল আপনার নিমন্ত্রণ রইল আমার বাড়ীতে। কথাটি কিন্তু গোপন রাখবেন।

হোসেন

গোপন রাখতে হবে ? কেন ?

সরদার

মাফ করবেন, আজ আমি কিছুই বলতে পারব না।

কাল আসবেন নিশ্চয়ই। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

হোসেন

( একটু ভাবিয়া ) আচ্ছা, বেশ।

সরদার

সেলাম। আমি এখন চল্লাম।

সরদার চলিয়া গেল! হোসেন কিছুক্ষণ তাহার প্রস্থান পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বাঁশীতে ফুঁ দিল।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

আলিবাবার বাড়ী। ফতিমা ও মরজিনা কথা কহিতেছেন।

ফতিমা

এত দেরী ত কোনদিন হয় না। রাত হয়ে গেল এখনও ফিরছেন না। হোসেনকে কি খুব মার ধোর করেছে শুনলি? কার কাছে খবর পেলি তুই!

মরজিনা

( সত্য গোপন করিয়া ) সে আপনি চিনবেন না। লোকটি আমাদের ও-বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন।

তিনি মনিবকে বলছেন শুনলাম যে হোসেন নাকি মাঠে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে।

ফতিমা

আক্কেল দেখ দিকি একবার। আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আর তিনি মাঠে বসে' বাঁশী বাজাচ্ছেন!

মরজিনা

আসবে এখনই। বাঁশী আর কতক্ষণ বাজাতে পারে মানুষ—(একটু হাসিল)। আপনি ততক্ষণ রান্নার আয়োজন করুন আলি সায়েবও এখুনি এসে পড়বেন। আমি যাই। মনিব আবার রাগারাগি করবে যদি জানতে পারে যে আমি এখানে এসেছি।

ফতিমা

আমাদের বাড়ী এলে কাসিম রাগ করে নাকি?

মরজিনা

তা' একটু করেন বৈ কি। আপনি যেন একথা কাউকে বললেন না।

ফতিমা

না—না—আমি আর কাকে বলব! বড়লোকের বিধবাকে নিকে করে ত বড়মানুষ হয়েছে—ছিল ত আমাদেরই মত কাঠুরে—নবাবি দেখে আর বাঁচি না!

মুখভঙ্গী করিলেন।

মরজিনা

( একটু হাসিল ) আমি যাই তাহলে।

চলিয়া গেল।

ফতিমা

এদের নিয়ে আর পারি না আমি। কারো ফেরবার নামটি নেই। দেখি, রান্নাবান্নার যোগাড় করি।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং একটু পরেই একটি শূন্য পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

ওমা, ঘরে যে একগুঁড়ো চাল নেই। সমস্ত দিন না খেয়ে তেতে পুড়ে আসচে। এখন উপায় কি করি।···আর পারি না আমি। সংসারে নিত্যি অভাব লেগেই আছে! আজ চাল নেই—কাল কাপড় নেই—পরশু ঘর সারাতে হবে—তার পরদিন খাজনা দাও। পরিত্রাণ আর নেই। একটা না একটা লেগেই আছে। ( একটু ভাবিলেন ) দেখি পাড়ায় কেউ যদি চারটি চাল ধার দেয়।

ফতিমা চলিয়া গেলে আলিবাবা প্রবেশ করিলেন। মুখ বিবর্ণ—সমস্ত চেহারায় অপরাধীর ভাব। অতি সন্তর্পণে আসিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

আলিবাবা

এরা সব গেল কোথা! ফতিমা—হোসেন! ও ফতিমা বিবি—

এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন।

কই, কেউ ত নেই। কোথা গেল এরা? একটু পরামর্শ করা দরকার। কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না! ফিরে রেখে আসব? সেই ভাল। বেশী যদিও নিই নি তবু যেন নিয়ে পর্য্যন্ত গা কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন সাপের মাথার মণি চুরি করে এনেছি। জানতে পারলেই সাপ তাড়া করে আসবে।…ভাল কাজ করি নি। এ বোধহয় শয়তানের কারচুপি—খোদা আমায় পরীক্ষা করছেন।

জামার পকেট হইতে কতকগুলি হীরাপান্না প্রভৃতি বাহির করিলেন এবং ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কি সুন্দর দেখতে! চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। এত দামী জিনিষ কি আমার সইবে? কক্‌খনো সইবে না। …ফিরে রেখে আসি। কিন্তু কাল থেকে খাব কি? কাল থেকে বনে কাঠ কাটা বন্ধ। আজই তাড়া করেছিল। সেখানে আবার লোক খুন হয়ে গেছে আজ। এরা সব গেল কোথা? একটু পরামর্শ করে…

কথা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া আলিবাবা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিতে লাগিলেন।

এরা আমায় ছেড়ে চলে যায় নি ত। হয়ত কোনরকমে জানতে পেরেছে যে আমি চুরি করেছি! অসম্ভব। জানবে কি করে? কিন্তু গেল কোথা! হোসেন—ফতিমা—হোসেন—ফতিমা—হোসেন—

অস্বাভাবিকরূপে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ফতিমার প্রবেশ।

ফতিমা

এত চেঁচামেচি করছ কেন? মনে হচ্ছে যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে।

আলিবাবা

ডাকাত? কোথা ডাকাত?

ফতিমা

( হাসিয়া ) ডাকাত তুমি স্বয়ং—আবার কে!

আলিবাবা বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফতিমা

আজ তোমার এত দেরী হল যে হোসেনকে

কাজীর লোকে এসে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে তারও কোন পাত্তা নেই। এইমাত্র মরজিনা বলে গেল সে নাকি কোথা মাঠে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে একজন লোক দেখে এসেছে।

আলিবাবা

হোসেনকে কাজীর লোকে ধরে নিয়ে গেছে ?

ফতিমা

নিয়ে যাবে না ? এতদিনের খাজনা বাকী !

আলিবাবা

আচ্ছা একটা···( ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন )

ফতিমা

শেয়ালের যুক্তি পরে হবে এখন। আগে হাত পা ধোও—সেই কখন চারটি খেয়ে বেরিয়েছ।

আলিবাবা

হোসেনকে ধরে নিয়ে গেল ! আমাকেও আজ তাড়া করেছিল। ধরতে পারলে আমাকেও নিয়ে যেত কাজীর কাছে···

ফতিমা

রান্না চড়াতে গিয়ে দেখি ঘরে চাল বাড়ন্ত। ফুল-

বিবির কাছ থেকে চারটি ধার করে আনলাম। তুমি হাত পা ধুতে ধুতেই ভাত হয়ে যাবে। চড়িয়ে দিই তাড়াতাড়ি। হোসেনটা যে কখন আসবে—

রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আলিবাবা

আচ্ছা, ফতিমা কোথাও যদি হঠাৎ কিছু গুপ্তধন পেয়ে যাওয়া যায় কেমন হয় তাহলে—

ফতিমা

( ফিরিয়া একটু মুচকি হাসিয়া ) ওসব আজগুবি ধান্দা রেখে হাত পা ধোও দিকি।

ফতিমা রান্নার জোগাড় করিতে লাগিলেন। আলিবাবা হাত পা ধুইয়া একটু পরে ফিরিয়া আসিলেন।

আলিবাবা

মনে কর আজ আমি বন থেকে ফিরে এসে যদি বলতাম, ফতিমা অনেক টাকার সন্ধান পেয়েছি—পাহাড়ের তলায় পাথর চাপা ছিল—তাহলে কি করতিস তুই ?

ফতিমা

( অবাক হইয়া ) কি আবার করতাম !

৩১

আলিবাবা

রাগ করতিস না ত !

ফতিমা

( হাসিয়া ) রাগ করব কেন ! আমি পাগল না কি ? খোদা যদি দৌলত পাইয়ে দেন তাতে রাগ কিসের ? আমাদের কি আর তেমন কপাল যে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাব !

আলিবাবা

সত্যি আজ আমি সন্ধান পেয়েছি—সত্যি বলছি।

ফতিমা

কোথায় ?

আলিবাবা

কাউকে এখন কিছু বলিস্ না। হোসেন পর্য্যন্ত যেন জানতে না পারে। এই দেখ্—

এই বলিয়া তিনি বহুমূল্য প্রস্তরগুলি ফতিমাকে দেখাইলেন।

ফতিমা

( সন্দিগ্ধভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন ) কি এগুলো ? খুব চক্‌চক্ করছে ত ! কাঁচ না কি ? এই বুঝি তোমার গুপ্তধন। ছাই !

আলিবাবা

(এদিক ওদিক চাহিয়া—নিম্নস্বরে) ছাই নয়—এগুলো হীরে! তুই চিনিস্ না। সেখানে আরো আছে—অনেক আছে—প্রচুর আছে—হীরে আছে—সোনা আছে—মোহর আছে—রাশি রাশি আছে—একি এত চেঁচাচ্ছি কেন আমি। (আবার এদিক ওদিক চাহিয়া) শোন্ ফতিমা—ভাল করে শোন—আলিবাবা আর গরীব কাঠুরে নেই—সে আমীর হয়ে গেছে—আমীর হয়ে গেছে—আমীর—আমীর—

ফতিমা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

দস্যুদের আস্তানা। সকলেরই হস্তে পানপাত্র। সম্মুখেই একটা অগ্নিকুণ্ডে লোহার শিকে গাঁথিয়া মাংস ঝল্‌সান হইতেছে। দস্যু-সরদার নাই। আনোয়ার এবং আরও কয়েকজন রহিয়াছে।

### গান

সার করেছি অর্থ কে
দৈন্য নামে গর্ত্ত কে
ভরতে হবে সর্ত্ত যে
  মরতে হবে—মারতে হবে
    ভয় করি না—ভয় করি না—ভয় করি না!
চিত্তে আগুন লকলকে'!
দগ্ধ করি শক্তকে
তুচ্ছ করি রক্তকে
  মরতে হবে—মারতে হবে
    ভয় করি না—ভয় করি না—ভয় করি না!

একজন দস্যু

এতদিন ডাকাতি করছি লাভ হয়েছে কি আমাদের তাতে? লুঠ করে যা নিয়ে আসি সরদারই সব গ্রাস করে।

আর একজন দস্যু

সেদিন হিরাট থেকে যখন অত বড় হীরেখানা নিয়ে এলাম আমাদের সরদারের মুখে সে কি হাসি! আমার পিঠ চাপড়ে বলে দিলেন 'রহিম বড় খুসী হলাম তোমার ওপর!' বাস্ ওই পর্য্যন্তই!

তৃতীয় দস্যু

এত ধন-দৌলত জহরৎ আমরা যে এনে জমা করেছি এ সব কি একা সরদারেরই? আশ্চর্য্য বিচার।

চতুর্থ দস্যু

আমরা কিন্তু যখন দলে ঢুকেছিলাম তখন আমাদের শপথ করতে হয়েছিল যে আমরা যেখানে যা পাব সমস্ত সরদারকে এনে দেব। সরদার আমাদের যা দেবেন তাই আমাদের প্রাপ্য। এখন শপথের কথা ভুললে চলবে কেন?

প্রথম দস্যু

কিন্তু এতদিন ত কাটল—কি দিয়েছে সরদার আমাদের!

আর একজন

আমাদের ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করছে এটার দামও কি কম?

আনোয়ার

শোন ভাই সব—নিজেদের ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ আমরা নিজেরাই করতে পারতাম। মাত্র ওইটুকুর জন্য ডাকাতি করার প্রয়োজন ছিল না। আমরা বড়লোক হতে চাই, ধনী হতে চাই। তা যদি না পারি তাহলে এ ডাকাতি করার কোন অর্থ নেই।

চতুর্থ দস্যু

কিন্তু সরদার আমাদের যে কিছু দেবে না তারও কোন প্রমাণ আমরা পাই নি এখনও—

একাদশ দস্যু

ঠিক কথা। কোন প্রমাণই আমরা পাইনি—(হাস্য)।

তৃতীয় দস্যু

কি ঠিক কথা? এতদিন ত আছি, কি পেয়েছি?

ষষ্ঠ দস্যু

কিন্তু কি শপথ করে ঢুকেছিলাম তা কি ভুলে গেছ? যখন খেতে পাচ্ছিলে না, পরণে কাপড় ছিল না—তখন এই সরদারই তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়েছিল! এখন সে কথা ভুলে গেলে নিমক্‌হারামি হবে!

চতুর্থ দস্যু

হাতে হাত মিলাও ভাই! নিমকহারামির মধ্যে আমিও নেই। দুঃখের সময় সরদার আমাদের বাঁচিয়েছে, প্রয়োজন হলে জান দিয়ে তার দাম শোধ করব!

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু পরস্পর হাত মিলাইল।

আনোয়ার

( অগ্রসর হইয়া ) তোমরা নির্বোধ এবং কাপুরুষ। তোমাদের বোঝবার শক্তি নেই যে সরদার তোমাদের ঠকিয়ে তোমাদের উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে নিজে বড়লোক হচ্ছে! তোমাদের সাহস নেই যে সরদারের সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে পার। অথচ মনে মনে সকলে গুমরে মরছ! আমি বোকাও নই, কাপুরুষও নই। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে এসো আমি তোমাদের সরদার হচ্ছি। আমি আল্লার নামে এ-ও শপথ করছি যে যা যখন আমরা পাব সমান ভাগ করে নেব! সমান ভাগ! তোমরা যদি রাজী থাক, এস আজই আমরা সরদারের ভাণ্ডার লুট করি। আমাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি এস আজই আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই।

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু ব্যতীত অপর সকলে

সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল—
"রাজী আছি"।

আনোয়ার

এই লোভী স্বার্থপর সরদার আমাদের রেখেছে—লোকে যেমন কুকুর পোষে—

চতুর্থ ও ষষ্ঠ ব্যতীত সকলে

চাই না এ সরদারকে—

তাহাদের চীৎকার মিলাইতে না মিলাইতে সরদার ও হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সরদার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আনোয়ার এবং অন্যান্য সকলের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল—

সরদার

আজ তোমাদের প্রত্যেককে ছুটি দিলাম। তোমরা যাও শহরে গিয়ে যার যা খুশি আমোদ কর। এই নাও পাঁচটা করে আসরফি দিলাম আজ তোমাদের—

একটা থলি হইতে আসরফি বাহির করিয়া প্রত্যেকের হাতে গুণিয়া গুণিয়া দিলেন।

যাও খুব ফূর্ত্তি কর আজ গিয়ে। কাল কিন্তু আবার এইখানে এসে হাজির হবে সকলে। যাও এখন তোমরা —আমার এই দোস্তটি আজ এসেছেন, এঁর সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা আছে আমার।

আসরফি পাইয়া দস্যুদল সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আনন্দ-কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। আনোয়ার যাইবার সময় একটা তীব্র দৃষ্টি সরদারের প্রতি হানিয়া গেল। সরদার তাহা লক্ষ্য করিলেন।

হোসেন

( সবিস্ময়ে ) এরা সব কারা? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সরদার

( হাসিয়া ) সব কথা বলবার পূর্ব্বে আপনার একটা প্রতিশ্রুতি চাই।

হোসেন

কি প্রতিশ্রুতি?

সরদার

আমাদের এই কথাবার্ত্তা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না!

হোসেন

এত সাবধানতার দরকারটা কি বুঝতে পারছি না! আপনি সামান্য একটা ব্যাপারকে ক্রমশই জটিল করে তুলছেন মনে হচ্ছে—

সরদার

ব্যাপারটা একটু জটিল ত বটেই—

হোসেন

অর্থাৎ ?

সরদার

( একটু হাসিয়া, অথচ শান্তভাবে ) আমরা ডাকাত, আমি সরদার।

হোসেন

( সবিস্ময়ে ) আপনারা ডাকাত !

সরদার

হ্যাঁ, আমরা ডাকাত এবং তার জন্য মোটেই লজ্জিত নই। এই আমাদের পেশা।

হোসেন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সরদার

( হাসিয়া ) অমন করে চেয়ে আছেন যে ! এই আমাদের পেশা ! আমাদের রুচি এবং সামর্থ্য অনুসারে এইটেই আমাদের উপযোগী।

হোসেন

এই আপনাদের পেশা ? আর আপনি সেটা বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলছেন ?

সরদার

আপনিই ত সেদিন বলছিলেন যে শুধু শুধু অপ্রতিভ হওয়া পুরুষ মানুষের সাজে না। আর তাছাড়া এতে লজ্জারই বা আছে কি ?

হোসেন

লজ্জার কিছু নেই ? এটা কি একটা সৎকর্ম্ম ?

সরদার

সৎকর্ম্ম মানে কি ? আপনি যখন মুরগির টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলেন তখন কি সৎকর্ম্ম করেন ? অসহায় গাছ-পালা ফুলফল ছিঁড়ে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে আমরা যখন আহার করি তখন কি কোন সৎকর্ম্ম সাধিত হয় ? তবু করি কেন ? না করে উপায় নেই বলেই করি। এই

দুনিয়ায় বাঁচতে হলে অপরকে মেরে তবে বাঁচতে হবে। সৎ অসৎ এসব কথা অর্থহীন। সৎ অসৎ, ভালো মন্দ ওসব বোকাদের কথা—আর কল্পনাবিলাসীদের যাদের গাঁটে পয়সা আছে। আমার আপনার কাছে ওসব কথার কোন মানে নেই। আমাদের বাঁচতে হবে—এই হল আমাদের কাছে সহজ কথা যার মানে বুঝি !

হোসেন

আমি সবিস্ময়ে শুধু ভাবছি যে আপনি শুধু যে ডাকাত তা নন, ডাকাতির সমর্থনও করেন।

সরদার

(হাসিয়া) দেখুন, প্রত্যেকেরই নিজের পেশার স্বপক্ষে একটা যুক্তি থাকে। তা না হলে প্রাণ দিয়ে সে তা করতে পারে না। সব পেশারই উদ্দেশ্য অপরের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে অর্থশোষণ করা। ধর্ম্মের নামে, অসুখের অজুহাতে, আইনের জালে ফেলে যে নৃশংস কাণ্ড অহরহ হচ্ছে তা কি ডাকাতি নয়? সেই ভালো ধর্ম্ম-যাজক, ভালো চিকিৎসক, ভাল আইনজ্ঞ যে আপনাকে সব চেয়ে বেশী শোষণ করে। তাদের মগজে বুদ্ধি আছে তারা ওই ভাবে শোষণ করছে, আমার কব্জিতে জোর আছে আমি অন্যভাবে শোষণ করছি। তফাৎ কোথায়?

হোসেন

তফাৎটা যে ঠিক কোথায় তা আপনাকে কি করে বোঝাই! যে কখনো আলো দেখে নি—বর্ণনা করে আলোর স্বরূপ কি তাকে বোঝান যায়? এই বিচিত্র পৃথিবীতে আপনি যখন পেটের জ্বালা ছাড়া অন্য কোন মহত্তর জিনিসের সন্ধান পান নি, তখন আপনাকে—( একটু হাসিলেন )।

সরদার

না, আমাকে বোঝাতে পারবেন না। আমি বুঝতে চাইও না! জানেন? অর্থাভাবে আমি আমার মেয়েকে হাটে বিক্রি করে দিয়েছি? করতে বাধ্য হয়েছি? আমার একমাত্র মেয়েকে?

হোসেন

কি করে বাধ্য হলেন?

সরদার

কি করে হলাম? হাঃ! শুনুন তবে। আমার স্ত্রীর হল অসুখ। হাকিমের কাছে গেলাম তিনি চাইলেন অর্থ। তখন আমি সামান্য কৃষক, টাকা কোথায় তখন আমার! দ্বারে দ্বারে ধার চাইলাম, ভিক্ষা করলাম, কেউ

কিছু দিলে না ! কেউ না। দেখলাম, অর্থ সংগ্রহ না করলে স্ত্রীর চিকিৎসা হয় না। পাগল হয়ে শেষে মেয়েটাকে বিক্রি করলাম হাটে। সেই অর্থ হাকিমকে দিলাম। সে গুণে গুণে পয়সা নিলে—ঔষধও দিলে—কিন্তু স্ত্রী আমার বাঁচল না। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তখন ভাবলাম—নাঃ বেঁচে থাক্‌তে হলে এরকম করে চলবে না। দুনিয়াই শক্তিই আসল মূলধন—তা সে দেহেরই হোক্ বা মাথারই হোক। সেই দিন থেকে আমি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু এবং সেইদিন থেকে আমি সুখেই আছি।

হোসেন

অর্থাৎ একটা উন্মাদনার মধ্যে আছেন। উন্মাদনাকে আপনার সুখ বলে ভ্রম হচ্ছে। সুস্থ সামাজিক মানুষের শান্তিময় সুখ এ নয়। এতে মনুষ্যত্বের অভাব আছে।

সরদার

আপনি কি মনুষ্যত্ব মানে দুর্ব্বলতা বোঝেন ?

হোসেন

হয়ত তাই। ওই দুর্ব্বলতা আছে বলেই আমরা মানুষ, আর ওই দুর্ব্বলতা নেই বলেই পশু—পশু।

সরদার

তাহলে আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম দেখছি। আপনার মত লোককে আমি দলে টানতে চাই না।

হোসেন

( হাসিয়া ) সে আমি পারবই না। আমি লক্ষশত বৎসর গরীব থাকব, তবু ডাকাত হতে পারব না। আমি চললাম।

সরদার

আমাদের কথা কিন্তু প্রকাশ হলে প্রাণ দিয়ে আপনাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নির্ম্মম। ( হাসিলেন )

হোসেন

প্রাণের ভয় ঠিক যে করি তা নয়। তবে ভদ্রতার খাতিরে এবং শপথও করেছি—আপনাদের ব্যাপার কখনও প্রকাশ হবে না আমার দ্বারা। আচ্ছা, চলি তবে—

সরদার

আপনার যে নেমন্তন্ন আমার এখানে। খাবেন না?

হোসেন

ও, সে কথা ভুলেই গেছি। বেশ চলুন। আপনারা মানুষ খান না ত!

সরদার

( হাসিয়া ) না, ঠিক মানুষ খাই না, তবে জ্যোৎস্না, মেঘ, হাসি—এ সব খেয়েও আমাদের পেট ভরে না। চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন এখন আমরা কি খাই।

হোসেন

বেশ চলুন—

উভয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

কাসিমের বাড়ী। কাসিম টং টং করিয়া টাকা বাজাইতেছেন। একটি লোক তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। লোকটির হস্তে একটি একটি ফুলের তোড়া।

কাসিম

( টাকা বাজান শেষ করিয়া ) এই নাও, হল ত?

সেই লোকটি

হাঁ হুজুর—

কাসিম

তাহলে নিয়ে যাও—

সেই লোকটি

আপনি অসময়ে আমার বড় উপকার করলেন—আপনার এ উপকার আমি কখনও ভুলব না। আমার বাগান থেকে হুজুরের জন্য একটা ফুলের তোড়া এনেছিলাম—

ফুলের তোড়া কাসিমকে দিলেন।

কাসিম

বেশ, সুন্দর তোড়া ত। বাঃ

সেই লোকটি টাকাগুলি একটি থলিতে পুরিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। কাসিম তাহাকে ডাকিলেন।

কাসিম

সুদ কিন্তু আমাকে ঠিক মাসে মাসে দিয়ে যেতে হবে। সেটা মনে থাকে যেন!

সেই লোকটি

হাঁ হুজুর—

আবার সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কাসিম

এ তোড়াটা নিয়ে এখন কি করি। মরজিনাকে বখশিস্ করলে কেমন হয়! সাকিনা বিবির বাঁদীটি বেশ! ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমাই, কিন্তু সাকিনা বিবির ভয়ে কাছে ঘেঁষা মুস্কিল। দেখা যাক্ কতদূর কি করতে পারি! আপাতত এটা এখানে থাক্।

তোড়াটা সেইখানে একটি ফুলদানিতে রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কথা কহিতে কহিতে মরজিনা আর আবদালার প্রবেশ।

মরজিনা

পাগল না কি তুই ?

আবদালা

পাগলামিটা কোথায় দেখলি তুই। আমি হলাম জাত চাকর। কোন নোংরা কাজ করতে আমার বাধে না। কিন্তু সত্যি বলছি মরজিনা তোকে কোন নোংরা কাজ করতে দেখলে ভারি কষ্ট হয়। তাই বলছিলাম তোর কাজগুলো আমাকে করতে দে। এই ঘরটা এখন তোর ঝাড়ু দেওয়ার কথা—তোর বদলে যদি আমি দিই কি আর এমন ক্ষতি তাতে!

মরজিনা

( হাসিয়া ) ক্ষতি বিশেষ কিছু নেই। একটু মুস্কিল এই যে এই রকম করে ক্রমশঃ তুই আস্কারা পেয়ে যাবি।

আবাদালা

( হঠাৎ লজ্জা পাইয়া ) ধেৎ—! কি যে বলিস্ তুই।

মরজিনা

সর আমাকে এখন কাজ করতে দে।

একটা ঝাড়ন দিয়া আসবাবপত্র ঝাড়িতে সুরু করিতেই আবদালা গিয়া ঝাড়নটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আবদালা

দে, না, আমি ঝেড়ে দিচ্ছি—ও তোর কর্ম্ম নয়।

মরজিনা

ফের যদি আমাকে জ্বালাবি আবদালা—ভাল হবে না বলছি।

এই বলিয়া মরজিনা একটু রাগত ভাবে ঝাড়ন চালাইতে লাগিল। হঠাৎ ঝাড়নের ঘায়ে কাসিমের রাখা সেই ফুলের তোড়া ও ফুলদানি মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। ফুলদানিটা চুরমার হইয়া গেল।

আবদালা

এ কি করলি মরজিনা। মনিব যে এখুনি এসে ভয়ানক বক্‌বে।

মরজিনা

কি করি ভাই—( একটু ভাবিল ) আচ্ছা, থাম্ এক কাজ করি। তুই ততক্ষণ এগুলো কুড়িয়ে ফেলে দে—আমি বাড়ীর ভিতর থেকে আর একটা ফুলদানি নিয়ে আসি।

আবদালা কুড়াইতে লাগিল। মরজিনা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কাসিমের প্রবেশ।

কাসিম

একি, এসব ভাঙ্‌লে কে ?

আবদালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাসিম

( কর্কশ কণ্ঠে ) জবাব দিচ্ছিস্ না—ভাঙ্‌লে কে ?

আবদালা

আমি। হঠাৎ হাত লেগে পড়ে গেল হুজুর !

কাসিম

পড়ে যাওয়াচ্ছি, থাম উল্লুক !

তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। ভিতর হইতে প্রহারের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। মারের চোটে আবদালা বাহিরে চলিয়া আসিল, পিছনে পিছনে কাসিম—হাতে চাবুক।

আবদালা

( নতজানু হইয়া বসিয়া হাতযোড় করিয়া ) আর করব না, আর করব না, মাফ করুন হুজুর ( কাঁপিতে লাগিল )

ফুলদানি লইয়া মরজিনার প্রবেশ। মরজিনা ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কাসিম

( মরজিনার প্রতি ) তুমি আবার ফুলদানি কোথায় পেলে—

মরজিনা

( সভয়ে ) এখানকার ফুলদানিটা আমার হাত লেগে হঠাৎ পড়ে ভেঙে গিয়েছিল বলে বাড়ীর ভিতর থেকে এইটে নিয়ে এলাম—এখানে সাজিয়ে রাখব বলে'।

কাসিম

( আবদালার দিকে ফিরিয়া ) তবে তুই বললি যে

তোর হাত লেগে ফুলদানি ভেঙে গিয়েছিল! বদমাস মিথ্যেবাদী কোথাকার—যা' সামনে থেকে দূর হয়ে যা'!

আবদালা চলিয়া গেল।

কাসিম

(হাসিয়া) ফুলদানিতে ফুলের তোড়া কেন রেখে-ছিলাম জান মরজিনা?

মরজিনা

না (ভয়ে ভয়ে ফুল ও ফুলদানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল।)

কাসিম

তোমাকেই দেব বলে। তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি আছি। তুমি আর এই আবদালায় কত তফাৎ—

কাসিম আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সাকিনা বিবিকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেলেন।

সাকিনা

(মরজিনার প্রতি) মরজিনা, তুই ভেতরে যা,

মরজিনা চলিয়া গেল।

আচ্ছা, এটা কি দেখ ত! আলির বউ এনেছে দেখাতে।

কাসিম

কই দেখি! এ কি, এ যে হীরে—আলির বউ কোথা পেলে ?

সাকিনা

আলি নাকি বনে কাট কাঠতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছে !

কাসিম

( সবিস্ময়ে ) কুড়িয়ে পেয়েছে ? বাজে কথা, চুরি করেছে।

সাকিনা

কি যে বল তুমি ? আলি তেমন লোক ত নয়। কেন, কুড়িয়ে পাওয়া কি অসম্ভব ? কত লোকই ত কত জিনিষ কুড়িয়ে পায়।

কাসিম

( হাসিয়া ) সাকিনা বিবি, তুমি অত্যন্ত সরল। এত বড় দামী জিনিস পথে ঘাটে পড়ে থাকে না! খোঁজ নিতে হচ্ছে।

সাকিনা

যাই হোক ওদের জিনিস ওদের দিয়ে দিই, দাও।

কাসিম

ব্যস্ত কি—একটু খোঁজ করি দাঁড়াও। চমৎকার হীরেখানা। বাঃ—

লুব্ধভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

সাকিনা

আলিবাবা আসছে। আমি যাই। তুমি দিয়ে দিও ওকে। কি দরকার আমাদের ওসবের মধ্যে থাকবার।

সাকিনার প্রস্থান।

আলিবাবার প্রবেশ

কাসিম

এই যে আলি—তোমার কাছেই যাব ভাবছিলাম। কোথায় চুরি করতে যাওয়া হয়েছিল ? কোথায় পেলে এমন জিনিস ?

আলি

( অপ্রস্তুতভাবে ) না, ঠিক চুরি নয় !

কাসিম

চুরি নয় ত এ কোথায় পেলে। আমি মেয়েমানুষ নই, আমাকে সহজে ধাপ্পা দিতে পারবে না।

আলি

বলছি শোন্। কথাটা গোপনীয়, একটু আড়ালে চল্।

দুইজনে একটু সরিয়া গেলেন। আলি-বাবা কাসিমের কানে কানে সব বলিতেই কাসিম অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

কাসিম

আমি এখনি যেতে চাই সেখানে! চল কোথায় সে জায়গা আমাকে দেখিয়ে দেবে। এখনি চল!

আলি

শোন্ শোন্, অত ব্যস্ত হোস না। আগে ভেবে দেখা যাক্ ভাল করে। ভীষণ জায়গা সে!

কাসিম

(ধীরে ধীরে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া চাপা দৃঢ়-স্বরে) কিছু শুনতে চাই না আমি। যদি নিজের ভালো চাও, নিয়ে চল আমাকে সেখানে। তা না হলে আমি কোতোয়ালকে খবর দেব।

আলিবাবা

(ভীতভাবে) থাম্ একটু ভেবে দেখি!

কাসিম

এতে আর ভেবে দেখবার কি আছে! (ক্রুর হাসি হাসিয়া) একা সব নিতে চাও, না? সেটি হচ্ছে না।

## তৃতীয় দৃশ্য

দস্যুদের গুহা। সরদার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আনোয়ার বক্তৃতা করিতেছে। বাকি দস্যুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে।

আনোয়ার

স্পষ্ট কথা বলব সরদার। দিবারাত্রি এই যে আমরা নানাস্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনছি আজ আমরা জানতে চাই এ ঐশ্বর্য্য কার। তোমার একার, না আমাদেরও কিছু অংশ আছে।

অন্যান্য দস্যুগণ

আমরা জানতে চাই।

প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সরদার

(হাস্যমুখে) আর কিছু জানতে চাও!

আনোয়ার

আর জানতে চাই বরাবর তুমিই বা সরদার থাকবে কেন? আমাদের এই চল্লিশজনের মধ্যে সরদার হবার উপযুক্ত লোক আর কি কেউ নেই?

সরদার

( হাসিয়া ) বল, কে আছে। এখনি তাকে সরদার করে দিচ্ছি এই মুহূর্ত্তে! এ দায়িত্ব আমার আর নিজেরও ভাল লাগছে না! বল তোমরা কাকে সরদার করতে চাও?

আনোয়ার ব্যতীত অন্যান্য সকলে

আনোয়ার আলিকে···

সরদার

সরদার হতে হলে একটা জিনিস আমি পরীক্ষা করে নিতে চাই—তার গায়ে জোর আছে কিনা, সে তোমাদের নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি না। ( আনোয়ারের দিকে ফিরিয়া ) চলে এসো আনোয়ার আলি, দেখি তোমার পাঞ্জায় কত জোর!

আনোয়ার আলি আগাইয়া আসিয়া সরদারের পাঞ্জা ধরিল—দুইজনের

চোখে পশুর মত হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। অন্যান্য দস্যুগণ রুদ্ধশ্বাসে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সরদার আনোয়ার আলিকে পরাজিত করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সরদার

এখনও তোমার কিছু বাকী আছে আনোয়ার। হাতের কব্জীতে আর একটু বেশী শক্তি সংগ্রহ কর, তোমাকেই আমি সরদার করে দেব। এখনও তোমার কিছু দেরী আছে।

বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

হ্যাঁ, তোমাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই—এ ঐশ্বর্য্য আমার একার নয়, আমাদের সবারই। আমি ঠিক করেছি তোমাদের মধ্যেই ভাগ করে দেব সব। আজই দেব। কিন্তু একটা কথা আছে। তোমরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে নেবে আর আমি দাতার মত দান করব এ রকম হীনতায় আমি রাজী নই। তোমরা ডাকাত, তোমরা লুণ্ঠনকারী, তোমরা বীর! তোমাদের অপমান আমি করতে পারি না। তাছাড়া আমি ভাগই বা করব কি করে? এই কান্দাহারের পোখরাজটী কাকে আমি দেব? কার বাহুবলে এ ঐশ্বর্য্য আমরা লাভ করেছি তা

কি ঠিক করা সম্ভব? এই যে গোলকুণ্ডার হীরেটা— কাকে আমি দেব! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। টাকা, মোহর, হীরে, মুক্তা, মণি, মাণিক্য এই থলিটার মধ্যে পুরে আমি ওই ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি—তোমরা সবাই ওখানে যাও—যার গায়ে সব চেয়ে বেশী জোর—নিয়ে নাও। এইভাবে একথলি করে' রোজ দিয়ে দেব সকলকে। তোমরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে আমার কাছে ভিক্ষা নেবে এত বড় অপমান তোমাদের আমি করতে পারব না।

কথা বলিতে বলিতে সরদার একটা থলির মধ্যে টাকা হীরা প্রভৃতি ভরিতে লাগিলেন—থলিটা পূর্ণ হইলে পর তিনি তাহার মুখটা ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে আবার বলিতে লাগিলেন ঃ

এই নাও! বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি আছে এই থলির মধ্যে। যার গায়ে বেশী জোর আছে এ সম্পত্তি তারই। এই নাও—

ঝনাৎ করিয়া থলিটা পাশের ঘরে ছুঁড়িয়া দিলেন। ছুঁড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত আবেগে দস্যুদল সেইদিকে ছুটিয়া গেল—তাহারা সকলে চলিয়া গেলে সরদার বাহির হইতে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার

সমস্ত মুখ এক অদ্ভুত হাসিতে ভরিয়া উঠিল। একটু পরেই সেই বদ্ধ ঘরের ভিতর হইতে তুমুল কোলাহল, মৃত্যুর আর্ত্তনাদ, গালাগালি, চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। সরদার তাহা শুনিয়া আরও হাসিতে লাগিলেন।

সরদার

কুকুর! কুকুর! কুকুরের দল। একটুক্‌রো মাংসের লোভে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরছে!

চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যুর প্রবেশ। তাহারা প্রবেশ করিয়া সরদারকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আসিতেই সরদার তাহাদের দিকে আগাইয়া গেলেন।

সরদার

জাফর—ফরিদ—তোমরা দুজনেই আমার একমাত্র সহায়—একমাত্র ভরসা। সামান্য অর্থের লোভে স্বার্থে অন্ধ হয়ে ওরা ওই ঘরে মারামারি করে মরছে। তোমরা আমাকে ঠিক খবরই দিয়েছিলে—ওরা সব বিশ্বাসঘাতক বে-ইমান নিমক্‌হারাম। এসো আমরা তিনজনে মিলে আবার নতুন দল গড়ে তুলি—ওরা সব মরুক—তোমরা

এখন এখান থেকে যাও, এদের শেষ করে তবে আমি যাব।

দস্যুদয়ের প্রস্থান।

ইহারা চলিয়া গেলে ঘরের ভিতর হইতে কে একজন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—

কপাট খোলো—কপাট খোলো—কপাট খোলো—

দৃঢ়বদ্ধ কপাট কিন্তু খুলিল না। দস্যু-সরদার হাসিয়া কপাটে একটা তালা লাগাইয়া চলিয়া গেলেন।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কাসিমের বাড়ীর একটি অংশ। এই অংশে মরজিনা থাকে। মরজিনার কক্ষে হোসেন বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। মরজিনা স্মিতমুখে একটি সোফার উপর বসিয়া আছে। বাঁশী শুনিতে শুনিতে বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া মরজিনা গাহিতে লাগিল।

### গান

কত কি যে ভাবি নিরজনে
মনে মনে
কাঁদন হাসি জাগে ক্ষণে ক্ষণে
মনে মনে
নয়নে আসি কত নামে যে স্বপন
কত মোহন বরণ
ফুলেরা ফোটে ঝরে—মানে না বারণ
বনে বনে !

হোসেন

( বাঁশী থামাইয়া ) একটু নাচ না মরজিনা—

মরজিনা

( সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ও সলজ্জিত হাসি হাসিয়া ) আজ তোমার ভারি ইঁয়ে হয়েছে—না ?

হোসেন

( হাসিয়া ) এমন সুযোগ কি সহজে পাওয়া যায়। দুজন কর্ত্তাই বেরিয়ে গেছেন !

মরজিনা

এবং বলে গেছেন ফিরতে দেরী হবে।

হোসেন

( মিনতি করিয়া ) সত্যি অনেকদিন তোমার নাচ দেখি নি। নাচ একটু মরজিনা।

বাঁশী বাজাইতেই—মরজিনা গান গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে নাচিতে লাগিল। নাচ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফতিমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ চিন্তাকুল। তিনি আসি-তেই মরজিনা নাচ বন্ধ করিল এবং হোসেন বাঁশী থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফতিমা

হোসেন ওঁরা কোথা গেছেন জানিস্ ?

হোসেন

না মা-

ফতিমা

কোথায় যে গেলেন কাউকে বলে গেলেন না। আশ্চর্য্য ত—

হোসেন

আমি ত ঠিক বলতে পারছি না।

মরজিনা

আবদালাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ফতিমা

তাই নাকি?

মরজিনা

সঙ্গে তিন চারটে গাধাও গেছে।

ফতিমা

তাই নাকি? দেখ ত একটু খোঁজ কর ত কোথা গেল এরা।

সাকিনা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনিও চিন্তান্বিতা। মরজিনা চলিয়া গেল।

ফতিমা

(সাকিনার প্রতি) কই হোসেন ত কিছু বলতে পারছে না।

সাকিনা

আমার কেমন যেন ভয় করছে।

হোসেন

ভয়? কেন? দাঁড়িয়ে আছ কেন বস না তোমরা।

সাকিনা ও ফতিমা উপবেশন করিলেন।

সাকিনা

কেমন যেন একটা ছায়া আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। অদ্ভুত একটা কালো ছায়া।

সকলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ফতিমা

ছায়া? কি রকম?

সাকিনা

আমার ঘরের মধ্যে যেন ছায়াকৃতি একটা মানুষ এসে দাঁড়াল আবার চলে গেল। অদ্ভুত লম্বা আর অদ্ভুত কালো। দ্বিতীয়বার এই দেখলাম…উঃ—

হোসেন

প্রথমবার কবে দেখেছিলেন!

সাকিনা

আমার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে।

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সাকিনা হঠাৎ ফতিমার হাত দুটি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

তাকে তোমরা খুঁজে এনে দাও—যেখান থেকে হোক, খুঁজে এনে দাও—

ফতিমা

( হোসেনের প্রতি ) হোসেন তুই একটু খোঁজ করে দেখ্ ত কোথায় গেলেন ওঁরা। রাত হয়ে গেল এখনও ফিরছেন না কেউ।

হোসেন

দেখি।

প্রস্থান

ফতিমা

তুমি অত ভাবছ কেন ? এখুনি এসে পড়বে। হয়ত কোথাও বসে গল্প করছে সব।

সাকিনা

( শঙ্কিত ভাবে ) আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। আমি যাই। মরজিনা এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

প্রস্থান

সাকিনা চলিয়া যাইবার পরই মরজিনা প্রবেশ করিল।

মরজিনা

না, পাড়ায় কেউ কোন খবর ত বলতে পারছে না।

ফতিমা

হোসেনও খবর নিতে গেছে। তুই সাকিনাবিবির কাছে গিয়ে বোস্।

মরজিনা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে—ফতিমা তাহাকে ডাকিলেন।

ফতিমা

মরজিনা তোকে একটা কথা বলব—রাগ করিস্ না মা।

মরজিনা

কি কথা ?

ফতিমা

দেখ্—তোর আর হোসেনের এই মেলামেশা আমার ভাল লাগে না। হোসেন গরীব কাঠুরের ছেলে—তুই আমীরের বাঁদি। তারা টাকা দিয়ে তোকে কিনেচে। তোদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তুই ওকে আর প্রশ্রয় দিস্ না।

মরজিনা মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফতিমা

( মরজিনার হাত ধরিয়া ) আমি যদি হোসেনকে একথা বলি তাহলে সে লজ্জা পাবে—হয়ত রাগ করবে। কিন্তু তুই যদি মা আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে সরে যাস্ তাহলে সে সামলে যাবে। সে আমাদের একমাত্র ছেলে যে মা। তার ওপরে আমাদের আশা ভরসা ভবিষ্যৎ সব। তুই তাকে ভালবাসিস্ তা আমি জানি—কিন্তু কি করবি মা—তুই বড়লোকের বাঁদী—তারা টাকা দিয়ে তোকে কিনেছে—ছাড়বে কেন? আমার একমাত্র ছেলে হোসেনকে তুই নষ্ট করে দিস্ না মা।

মরজিনা তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফতিমা

কিছু বলছিস্ না যে!

মরজিনা

( হঠাৎ মুখ তুলিয়া স্পষ্ট স্বরে ) আচ্ছা, আর হোসেনকে আমি প্রশ্রয় দেব না।

ফতিমা

এই ত লক্ষ্মী মেয়ে। তুই এখন সাকিনাবিবির কাছে যা। আমিও রান্নার জোগাড় করি গে।

প্রস্থান

ফতিমা চলিয়া গেলে মরজিনা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাকাতদের গুহার অভ্যন্তর। দেওয়ালে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র টাঙান আছে। মেঝেতে কাছে ও দূরে স্তূপীকৃত ধন-সম্ভার দেখা যাইতেছে। কোথাও টাকা, কোথাও মোহর, কোথাও মুক্তা, কোথাও হীরক, কোথাও মূল্যবান পরিচ্ছদাদি পৃথকভাবে গাদা করা রহিয়াছে। গুহার ভিতর অন্ধকার—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। একটি আলো হাতে লইয়া আলিবাবা দাঁড়াইয়া আছেন। কাসিম পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিয়া একটা ছালায় পুরিতেছেন। তাঁহার মুখে লোভ, ভয় এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলিবাবার মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

আলিবাবা

ঢের হয়েছে। এইবার চল্ যাওয়া যাক্।

কাসিম

আরে থাম, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

আলিবাবা

না ভাই এখানে যে রকম পচা দুর্গন্ধ ছাড়ছে—আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌ছি না।

কাসিম

গন্ধ একটা সত্যিই ছাড়ছে। কিসের গন্ধ বল দেখি?

ছালায় জিনিস ভরিতে লাগিলেন।

আলিবাবা

পচা মড়ার গন্ধ বলে মনে হচ্ছে।

কাসিম

মড়ার? কই এখানে ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আলিবাবা

গন্ধটা মনে হচ্ছে—ওই ঘরটা থেকে আস্‌ছে।

যে ঘরে দস্যুদল বন্দী হইয়াছিল—সেই ঘরটা দেখাইয়া দিলেন।

কাসিম

(ঘাড় ফিরাইয়া) কোন ঘরটা থেকে? ও, ওখানে যে একটা ঘর আছে তা দেখতে পাইনি। এ ডাকাত ব্যাটারা এখানে বেশ কিছুদিন থেকে বসবাস করছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বেশ ঘর বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

মোহরের স্তূপ হইতে আঁজলা আঁজলা মোহর লইয়া ছালাতে ভরিতে লাগিলেন।

আলিবাবা

চল চল ঢের হয়েছে। এখানে আর টেঁকা যাচ্ছে না। চল এবার! বুঝলে—

কাসিম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। আপন মনে মণি-মাণিক্য আহরণ করিতেছেন।

কাসিম

আঃ—কেবল চল চল আর চল! একটা পরামর্শ দাও দেখি কোনটা বেশী নেওয়া ভাল—মোহর, হীরে—না টাকা? আমার ত মনে হয় টাকা নেওয়াই নিরাপদ—বেশী গোলমাল হবে না। তুমি যেমন বোকা, নিয়ে গিয়েছিলে হীরে—অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলে!

হাসিয়া ছালাটার মুখ বাঁধিতে বাঁধিতে

এই ত একটি ছালা ভরল এতক্ষণে। এটা দিয়ে এসো দিকি আবদালাকে। আমি ওই ঘরটার তালা ভাঙবার চেষ্টা করি ততক্ষণ। ও ঘরে যখন তালা দেওয়া আছে তখন ওর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও বেশী কিছু দামী মাল আছে।

আলিবাবা

আমি কিন্তু আর থাকতে পারব না। এই ছালাটা বাইরে আবদালার কাছে রেখে বাড়ী যাচ্ছি। তোর যা ইচ্ছে হয় কর।

ছালাটা তুলিয়া লইয়া কিছুদূর গেলেন, তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া মিনতির স্বরে

চল না ভাই—কি হবে আর বেশী নিয়ে। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। চল্—বুঝলি?

কাসিম

(দেওয়ালে টাঙান অস্ত্রাদি আলোটা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে) আচ্ছা—এর মধ্যে কোনটা দিয়ে তালাটা ভাঙা যায়!—আচ্ছা ওই একটা হাতুড়ির মত কি রয়েছে যেন—কি ওটা! হ্যাঁ হাতুড়িই (পাড়িয়া লইলেন), হ্যাঁ এইটে দিয়েই ঠিক হবে—তুমি একটু—

আলিবাবা

(তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া) ওসব পাগলামি করিস্ না কাসিম। বাড়ী চল—আমার কথা শোন।

কাসিম

(দাঁত মুখ খিঁচাইয়া) কি যে খালি ঘ্যানর ঘ্যানর

কর ! তোমার থাকতে ইচ্ছে না হয় তুমি চলে যাও। আবদালা থাকলেই হবে। আবদালাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাও। আমি একা পারব না নিয়ে যেতে সব।

তালায় হাতুড়ির ঘা দিলেন।

আলিবাবা

( শেষ চেষ্টা করিয়া ) যাবি না তাহলে ?

কাসিম

না---না---না---কতবার বলব---না---যাব না। সব নিয়ে তবে যাব। তার আগে নয়---

আলিবাবা

( ছালাটা মাথায় তুলিয়া ) বেশী দেরী করিস না। যে কোন সময়ে ডাকাতরা এসে পড়তে পারে।

কাসিম

( তালায় হাতুড়ির ঘা দিতে দিতে ) তোমার ভয় করে তুমি যাও।

আলিবাবার প্রস্থান

আলিবাবা চলিয়া যাইবার একটু পরেই কাসিম তালাটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। কপাটটা খুলিতেই পচা মড়ার গন্ধে একটু পিছাইয়া আসিলেন।

কাসিম

আরে বাস্‌রে! সত্যিই এর ভেতর পচেছে কিছু! ভয়ানক গন্ধ! ( একটু থামিয়া ) তা বলে কিন্তু পিছপাও হবার ছেলে কাসিম মিঞা নয়। তালা যখন ভেঙেছি তখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব। যা থাকে কপালে—

ঘরের ভিতর আলো লইয়া প্রবেশ করিলেন। কাসিম ঘরে প্রবেশ করিবার ঠিক পরেই দস্যু সরদার প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতেও একটা আলো। দস্যু সরদার আলো লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। শব্দ শুনিয়া কাসিম ঘরের ভিতর হইতে অতি সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া—অতি সন্তর্পণে কপাট ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। দস্যু সরদার কিছু জানিতে পারিলেন না।

দস্যু সরদার

( অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ) মাল সরালে কে! অনেক সরিয়েছে! মোহর সরিয়েছে—টাকা সরিয়েছে—হীরে—মণি—মুক্তো—অনেক কিছু সরিয়েছে! কে সরালে? কে সরালে? আশ্চর্য্য ব্যাপার!

উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামিয়া

এখানে আমাদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য লুকানো থাকে এ কথাত আর কেউ জানে না। পশু পক্ষী পর্য্যন্ত জানে না। তবে? (হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে—হঠাৎ তিনি হাসিয়া উঠিলেন) তবে?···ওরে বেকুব এখনও তুই জিজ্ঞাসা করছিস—তবে? এখনও মানুষকে বিশ্বাস করিস্? হা হা হা হা

বিকট অট্টহাস্যে গুহা কম্পিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সরদারের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি হিংস্র-শ্বাপদের মত জ্বলিতে লাগিল।

জাফর আর ফরিদ! এ তাদেরই কাজ! নিশ্চয়ই এ তাদেরই কাজ। সব চোর—সব পাজি—সব বিশ্বাসঘাতক —সব বে-ইমান!

খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া

নাঃ—ছাড়ব না! কাউকে ছাড়ব না!—দুনিয়ায় পথ করতে হলে অনেক আগাছা—অনেক ঘাস উপড়ে ফেলে দিতে হয়! মায়া দয়া করলে চলে না। ছাড়ব না।

ঠিক সেই সময় চতুর্থ ও ষষ্ঠ দস্যু জাফর ও ফরিদ আসিল ও সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

খবর পেলাম হুসেনাবাদের—

সরদার

( আগাইয়া আসিয়া ) চুপ ! তোমরা এখন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি একটু পরে ডাকছি তোমাদের।

আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ গুহার দ্বারের কাছে গিয়া

—জাফর—জাফর—জাফর—তুমি একা এস। ফরিদ তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

জাফর আসিয়া প্রবেশ করিল।

সরদার

সর্ব্বপ্রথমে আমার একটা কথার জবাব দাও। আমি জানতে চাই আমি যা বলব তা করতে তুমি প্রস্তুত আছ ?

জাফর

নিশ্চয়ই।

সরদার

( কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া ) এই শাণিত ছোরায় যদি গলা বাড়িয়ে দিতে বলি—দিতে পার ?

জাফর

নিশ্চয়ই

সরদার

( আর একটু আগাইয়া আসিয়া ) এখনি পার ?

জাফর

( একটু ইতস্ততঃ করিয়া ) একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন সরদার !

সরদার

তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখতে চাই। দেখতে চাই যে সত্যিই তুমি আমার কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত কি না। জবাব দাও। এখনি পার গলাটা বাড়িয়ে দিতে ?

জাফর

( একটু ভাবিয়া ) পারি।

সরদার

( সাগ্রহে ) এস তাহলে।

তাহার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গুহার অন্ধকারে অদৃশ্য

হইয়া গেলেন। ক্ষণপরেই মৃত্যুর আর্ত্তনাদ অন্ধকারকে কাঁপাইয়া তুলিল। রক্তাক্ত ছোরাটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে সরদার ফিরিয়া আসিলেন ও চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

ফরিদ—ফরিদ—শোন—শীগ্‌গির শুনে যাও—জলদি—

দ্রুতবেগে ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ শোন।

ফরিদ

( রক্তাক্ত ছোরা দেখিয়া ) এ কি সরদার !

সরদার কিছুক্ষণ নিষ্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ছোরাটা ধীরে ধীরে তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া সরদার বলিলেন।

সরদার

আমায় খুন কর তুমি !

ফরিদ

সে কি !

সরদার

তোমাদের সবার লোভ এই ঐশ্বর্য্যের উপর এবং তার অন্তরায় আমি ! জাফর এইমাত্র আমাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল—অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করেছি।

ফরিদ নির্ব্বাক্ হইয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

সরদার

ওই অন্ধকার গুহার কোণে আহত জাফর পড়ে আছে। হয় তাকে খুন করে তুমি আমার বিশ্বাসী বন্ধুরূপে থাকো, না হয় আমাকে খুন করে তোমরা দুজনে সব নিয়ে যাও। সেইটেই সবচেয়ে সোজা হবে। উঃ জাফর আলি শেষে আমাকে খুন করতে তেড়ে এল। নাঃ, আমার আর জীবনের সাধ নেই। খুন কর আমাকে তুমি।

ছোরা বাড়াইয়া দিলেন।

ফরিদ

তা পারব না সরদার।

সরদার

(দৃঢ়স্বরে) তাহলে আমার হুকুম, যাও জাফর আলিকে খুন করে এসো। খুব সম্ভবতঃ মূর্চ্ছিত হয়ে ওই অন্ধকারে নিমকহারামটা পড়ে আছে। যাও---

ফরিদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইল ; ফরিদ পশ্চাৎ ফিরিতেই শিকারী ব্যাঘ্রের মত সরদার ফরিদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

একটু পরেই ফরিদের মৃত্যু-হাহাকারও শোনা গেল। সরদার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদ রক্তাক্ত —সমস্ত মুখে হাসি।

সরদার

যাক্—সব শেষ। এইবার এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি একা। এ ঐশ্বর্য্যের খবর পৃথিবীতে এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না!

আবদালার প্রবেশ

সরদার

( চমকাইয়া উঠিলেন ) এ কে! ( আগাইয়া গেলেন ) কে তুই—!

আবদালা

আমি আবদালা।

সরদার

আবদালা কে?

আবদালা

আমি কাসিম আলির বান্দা তিনি এইখানেই এসেছেন।

সরদার

কাসিম আলি ? এইখানেঁ এসেছেন---?

আবদালা

আলিবাবা আর তিনি এখানে এসেছিলেন। আলিবাবা চলে গেছেন। আমাকে বলে গেলেন কাসিম আলিকে ডেকে নিয়ে যেতে।

সরদার

ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে---ও---তাই না কি ? আলিবাবা ? কাসিম আলি ?

হঠাৎ কপাট খোলার শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলেন কাসিম সেই ঘরটার দ্বার খুলিয়া গলা বাহির করিতেছে। সরদারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাসিম দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সগর্জ্জনে সরদার ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া গিয়া বদ্ধ দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই দারুণ আঘাতে কপাট ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কাসিমের বাড়ী—মরজিনার ঘর। মরজিনা একা বসিয়া গান গাহিতেছে ও একটা ফুলদানি সাজাইতেছে।

### গান

হায় রে
আমার গানে তাল কেটে যে যায় রে।
স্বপন গড়ি আপন মনে
ভেঙে যে যায় ক্ষণে ক্ষণে
চমক লেগে দেখি জেগে
বাঁধন বাঁধা পায় রে।
বাধন যদি এত কঠিন
স্বপন তবে কেন রঙীন
সাঁঝে কেন মেঘের খেলা
নীল আকাশের গায় রে।

হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হোসেন আসিতেই মরজিনা গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হোসেন

থামালে কেন, চলুক

মরজিনা

সাকিনা বিবির ঘরে এই ফুলদানিটা দিতে যাচ্ছি। কোন খবর পেলে ওঁদের ?

হোসেন

হঁ্যা। কিছুদূর গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন ওঁরা দুজনে বনে গেছলেন। কাসিম চাচা একটু পরে আসছেন। (নিম্নস্বরে) সেই গুপ্তধনের সন্ধানে—বুঝলে না ?

মরজিনা

আলি সায়েব ফিরে এসেছেন ?

হোসেন

না বাবাকে আবার ফিরে পাঠালাম—কাসিম চাচাকে ডেকে আনতে। বললাম সাকিনা বিবি অস্থির হয়েছেন। যাক্—তুমি গান বন্ধ করলে কেন। গানটা চলুক না ততক্ষণ !

মরজিনা

তুমি গেলে না কেন ?

হোসেন

আমি ত সে গুহার সন্ধান জানি না। (হাসিয়া)

তা ছাড়া তোমাকে একা একা পাওয়ার লোভও ছিল একটু। গানটা ধর মরজিনা—আমার বাঁশীটা এইখানেই ত কোথায় রেখে গেলাম।

এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন।

মরজিনা

না, আমাকে এখন সাকিনা বিবির কাছে গিয়ে একটু বসতে হবে। তাঁর শরীর ভাল নেই। এই ফুলদানির ফুলগুলো বদলে দিতে বললেন—তাই এসেছি। ( একটু ইতস্ততঃ করিয়া ) তুমি এমন যখন তখন আমার কাছে আর এসো না। ভাল দেখায় না।

হোসেন

( বিস্মিত ভাবে ) তার মানে ?

মরজিনা

মানে, তোমার এতদিন নিজেরই এ কথা বোঝা উচিত ছিল। লজ্জা করে না একা আমার ঘরে আসতে ? তোমার লজ্জা না করুক—আমার লজ্জা করে—আমার একটা মান ইজ্জত আছে। এসো না আমার কাছে আর।

তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

হোসেন

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মরজিনা

তুমি যাও—আর এসো না।

দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। হোসেন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও পরে বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। হোসেন চলিয়া যাইবার পর মরজিনা আবার ফিরিয়া আসিল।

একি, হোসেন চলে গেছে! তাকে সব কথা আমি খুলে বলব। তাকে বুঝিয়ে বলব যে আমি বাঁদী—আমার স্বাধীনতা নেই। আমার কিছু নেই। আমার স্নেহ ভালবাসা দেহ রূপ সব এরা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে। আমায় এরা ছাড়বে না। আমি বুঝিয়ে বলব তাকে কোথায় গেল সে...।

ভিতরের দিকে গেল। অন্য একটি দ্বার দিয়া আলিবাবা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভয়-চকিত। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া কাছেই একটি মোড়ার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটু পরেই মরজিনা আবার প্রবেশ

করিল ও আলিবাবাকে তদবস্থ দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মরজিনা

আপনি কখন এলেন? মনিব আসেন নি?

আলিবাবা

(সে কথার জবাব না দিয়া) মরজিনা, সাকিনা বিবি কোথায়?

মরজিনা

সাকিনা বিবি ভেতরে আছেন—বড় ভাবছেন তিনি। খবর দেব?

আলিবাবা

খবর?—আচ্ছা—না—না—থাম্—আর একটু ভেবে দেখি। অর্থাৎ···না আমি যে কিছু ভাবতে পারছি না—মরজিনা কিছু একটা করতে হবে—অথচ—থাম—উঃ—একি হল!

মরজিনা

(উৎকণ্ঠিত ভাবে) কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?

আলিবাবা

সর্ব্বনাশ হয়েছে মরজিনা—কাসিম আর আবদালাকে ডাকাতেরা খুন করেছে।

মরজিনা আঁৎকাইয়া উঠিল।

খুন করেছে···টুকরো টুকরো করে খুন করেছে।··· কিন্তু এখন চুপ করে থাকলে চলবে না। একটা কিছু করতে হবে—একটা কিছু—

মরজিনা

আপনি দেখে এসেছেন খুন করেছে ?

আলিবাবা

আমি নিয়ে এসেছি তাদের দেহ গাধার পিঠে করে' ছালায় পুরে !

মরজিনা

সে কি ! ( স্তম্ভিত হইয়া গেল )

আলিবাবা

হ্যাঁ নিয়ে এসেছি—গোর দিতে হবে। গোর না দিলে পরলোকে তাদের সগদতি হবে না। কিন্তু কি করে তার ব্যবস্থা করা যায়। লোকের কাছে ডাকাতদের খবর প্রকাশ করা হবে না। লোকের কাছে প্রকাশ

করতে হবে কাসিম আর আবদালা শিকার করতে গিয়ে বনে মারা গেছে। আর শোন···আর একটা বুদ্ধি রাস্তায় মনে হয়েছিল—ভুলে যাচ্ছি—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে—ঠিক্! বাবা মুস্তাফা!—হোসেন কোথা?

মরজিনা

(স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিতেছিল। হোসেনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে একটু যেন চঞ্চল লইয়া উঠিল—তাহার পর ধীর ভাবে বলিল) হোসেন? ঠিক জানি না ত। হোসেন কি করবে?

আলিবাবা

তাকে একবার বাবা মুস্তাফা মুচির কাছে যেতে হবে—খুব গোপনে—

মরজিনা

(সবিস্ময়ে) মুচির কাছে? কেন?

আলিবাবা

কাটামড়া জোড়া না লাগালে গোর দেওয়া যাবে না। কাসিমকে চার টুক্‌রো করে কেটেছে! খুব গোপনে বাবা মুস্তাফাকে ডেকে আনতে হবে। ডাকাতরা যেন না জান্‌তে পারে—কেউ যেন না জানতে পারে—তাহলে সর্ব্বনাশ!

মরজিনা

জানতে পারলে কি হবে ?

আলিবাবা

জান্‌তে পারলে সেই ডাকাতের দল কি আর ছেড়ে দেবে ?

মরজিনা

তাহলে থাক দরকার নেই মুচিকে ডাকার !

আলিবাবা

না—না—তা হয় না মরজিনা। কাসিমকে আমি নিয়ে এসেছি যখন—তখন তার গোটা দেহটা গোর দিতে হবে। তার পরলোক নষ্ট হতে দেব না।···মুচিকে ডাকতে হবে···হোসেনকে ডাক।

মরজিনা

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি বাড়ী যান আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি যান বিশ্রাম করুন।

আলিবাবা

( হতাশ ভাবে ) আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে—যা হয় কর তোরা—আমায় বাঁচা—আমার কাসিমকে বাঁচা··· ওরে—আমার একি হল—একি হল—একি হল—

চলিয়া গেলেন।

মরজিনা

হোসেনকে আমি ওই বিপদের মুখে যেতে দেব না। কিছুতেই নয়। আমি নিজেই ডেকে আনব সেই মুচিকে। সেই গোঁফ জোড়া ত আমার কাছে আছে। দেখি···

প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

আলিবাবার বাড়ী। কথা কহিতে কহিতে আলিবাবা ও হোসেন প্রবেশ করিলেন।

আলি

এ আমাদের কি হল হোসেন? কি যে আমার দুর্ম্মতি হল!

হোসেন

যা হবার তাত হয়ে গেছে। এখন আপনি একটু স্থির হোন। এ সময় আপনি যদি অস্থির হন তাহলে কিন্তু মহামুস্কিল হবে। কাল যখন নির্ব্বিঘ্নে গোর দেওয়া হয়ে গেছে—কারো মনে কোন সন্দেহ হয়নি—তখন দিন কতক আপনি একটু স্থির হয়ে থাকুন।

আলি

( তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া ) তা ঠিক···তা ঠিক। স্থির হয়ে থাকব। কিন্তু দেখ ( একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ) আমার কেমন যেন হচ্ছে! ঠিক ভয় নয়—দুঃখও নয়—কেমন যেন একটা আফশোষ—যেন আমার কি ছিল আর নেই—কি যেন ( হঠাৎ ) দেখ্—দেখ্—দেখ্ হোসেন!

হোসেন

কি?

আলি

ওই দেখ্ আমার কুড়ুলটা পড়ে আছে। ধূলোয় মাখা! অভিমান করেছে! ও যেন বলছে—ওরে অকৃতজ্ঞ—আমি দুঃখের দিনে তোর আহার জুগিয়েছি—আজ তোর টাকা হয়েছে—আর তুই আমার দিকে ফিরেও তাকাস্ না! না—না—তোকে ভুলি নি আমি—ভুলি নি।

কুড়ুলটা কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

হোসেন

বাবা আপনি এরকম করলে সবাই জানতে পারবে। তখন কিন্তু মুস্কিল হবে।

আলি

( কুড়ুলটা ফেলিয়া দিয়া ) না—না—আর কোরব না —আর কোরব না। ( অসহায় ভাবে ) হোসেন, আমি কি করি বাবা !

হোসেন

( সান্ত্বনা দিয়া ) একটু শান্ত হোন আপনি।

আলি

আচ্ছা—সেই ডাকাতদের সঙ্গে দেখা করে হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে ফেল্‌লে হয় না? তাদের মিনতি করে বলব যে আমি দোষ করেছি—তোমাদের সব ফিরিয়ে নাও—

হোসেন

তাদের দেখা পাবেন কি করে এখন! ওসব না করে এখন যাতে ব্যাপারটা চাপা পড়ে তারই চেষ্টা করুন।

আলি

কিন্তু আর যে পাচ্ছি না হোসেন! চারিদিকে যে মিথ্যার পাহাড় জমে উঠল—সত্যকে চাপা দিতে গিয়ে যে নিজে চাপা পড়ে গেছি শেষে—দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হোসেন

আমি ভাবছি কাকা মারা গেছেন। লোকজনকে ত একদিন খাওয়াতে হবে। সেদিন বেশ ধুমধাম করে সকলকে নেমন্তন্ন করা যাক্। সকলে বুঝুক যে—

আলি

( অধীর ভাবে ) কিছু করতে হবে না। কি করে বলছিস্ তুই এসব ? ধুমধাম !

হোসেন

তাহলে মরজিনাকে দিয়ে অত কষ্ট করে বাবা মোস্তাফাকে ডেকে আনাবারই কি দরকার ছিল। এত-খানি অভিনয় যখন করা গেছে—

আলি

( হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন ) উঃ—

হোসেন

কি হল ?

আলি

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মোহরের লোভে সেই শয়তান মুচিটা কাসিমের মৃত দেহকে ছুঁচ দিয়ে বিঁধ্ছে—উঃ— হোসেন—আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব।

হোসেন

চলুন আপনি বাড়ীর ভেতর। আমার কথা শুনুন; একটু স্থির হোন্—অত অধীর হলে চলে কি?

আলিবাবাকে ধরিয়া ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন। অপর দিক দিয়া মরজিনার প্রবেশ।

মরজিনা

এদের বাড়ীর দুয়ারে খড়ির দাগ দিয়ে গেল কে? আগে ত ছিল না। কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বাড়ীতে চিহ্ন দিয়ে গেছে কেউ। সেই ডাকাতরা নয় ত! রাস্তায় লুকিয়ে কোন ডাকাত হয়ত ছুরি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এ বাড়ী থেকে কেউ বেরুলেই তাকে খুন করবে। হোসেন কোথায়! সে বাড়ীর বাইরে নেই ত!

হোসেনের প্রবেশ

হোসেন

এই যে মরজিনা—তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। বাবা মোস্তাফা নামক মুচিকে ডেকে এনেছিলে তোমার সাহসকে ধন্যবাদ এবং সেই মুচির চোখ বেঁধে এনেছিলে বলে তোমার বুদ্ধিকেও ধন্যবাদ এবং—একি মুখে কথা নেই কেন? ও, ঠিক ঠিক ভুলে গেছি—তুমি কাছে আসতে বারণ করেছ। বেশ চললাম।

গমনোদ্যত

মরজিনা

শোন, এখন ব্াইরে যেও না।

হোসেন

থাকতেও পাব না—যেতেও পাব না—!

মরজিনা

না, তুমি এখন বাইরে বেরিয়ো না।

হোসেন

কেন ?

মরজিনা

তোমাদের দুয়ারে কে একটা খড়ির দাগ দিয়ে গেছে। খুব সম্ভবতঃ কেউ চিহ্ন দিয়ে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে সেই ডাকাতরা নয় ত !

হোসেন

( ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ) আমাদের দুয়ারে ? কই দেখি—

মরজিনা

না না—তুমি বাইরে যেও না। কোন ডাকাত যদি লুকিয়ে থাকে—

হোসেন

কি মুস্কিল, বাইরে বেরুলেই অমন্নি ডাকাতে মেরে ফেলবে ! পাগল না কি তুমি ! তাছাড়া ( ছদ্ম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া ) যদিই মেরে ফেলে---তুমি যখন আমায় ঘৃণাই কর তখন তোমার আর তাতে ক্ষতি তি ?

মরজিনা

আমি বলেছি তোমায় আমি ঘৃণা করি ?

হোসেন

না বললেও অনেক কথা বোঝা যায়।

মরজিনা

তা যায়। তুমি কিন্তু বোঝ নি···

হোসেন

বুঝি নি ?

মরজিনা

( কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া ) আচ্ছা, খড়ির দাগ কে দিতে পারে ? ডাকাতরা যদি না হয়-—

হোসেন

তুমি আগে বল—আমি বুঝি নি ?

মরজিনা

জানি না যাও---

হোসেন

বেশ। দেখে আসি তাহলে খড়ির দাগ কে দিলে---

মরজিনা

( পথরোধ করিয়া ) আমি যেতে দেব না তোমায়।

হোসেন

বাঃ বেশ ত। ধর যদি ডাকাতরাই দাগ দিয়ে থাকে —তারও তো উপায় করতে হবে একটা।

মরজিনা

উপায় আমি ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।

হোসেন

কি ?

মরজিনা

পাশাপাশি সমস্ত বাড়ীগুলোর গায়ে ওই রকম খড়ির দাগ দিয়ে দেওয়া। কেউ যদি চিহ্ন দিয়ে থাকে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

হোসেন

মন্দ বুদ্ধি নয়। তাই করা যাক তাহলে।

মরজিনা

তুমি যেতে পারবে না—আমি যাব।

হোসেন

কি মুস্কিল—তোমাকে যদি মারে ?

মরজিনা

মরব—

হাসিয়া চলিয়া গেল।

হোসেন

এ ত ভারি অদ্ভুত রকম হল !

হঠাৎ আলিবাবার প্রবেশ।

আলি

হোসেন—হোসেন—আমি কাঁদছি দেখে মোহরগুলো হাসছে—ভয়ানক হাসছে—দেখ—দেখ—দেখবি আয়। হো হো করে হাসছে……

## পঞ্চম অঙ্ক

আলির বাড়ি। ফতিমা ও মরজিনা দাঁড়াইয়াছিলেন।

ফতিমা

মরজিনা অনেকদিন তোর গান শুনিনি। বাড়ীতে বিপদের ওপর বিপদ যাচ্ছে কখনই বা গান শুনি। এখন কর একটা শুনি। আচ্ছা মরজিনা কাসিমের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাকিনা ত তেমন কান্নাকাটি করলে না। কি রকম যেন চুপ করে আছে! এখন কেমন আছে রে?

মরজিনা

তেমনি চুপ করেই আছেন---

ফতিমা

আচ্ছা, ও বেলা যাব একবার। তুই গান কর একটা শুনি।

### মরজিনার গান

উজলিয়া হিয়াতল
বেদনার শতদল
ফুটিয়াছে সুগোপনে
বিরহেতে ছলছল।

মধু মাধুরী ভরা
গোপন সে বেদন
তাহারি চরণেতে
করিতে নিবেদন
ব্যথিত মরমের
সে বাণী সরমের
গোপনে আঁখি কোণে
টলমল টলমল।

গান শেষ হইতেই হোসেন আসিয়া প্রবেশ করিল।

হোসেন

তোমরা এখানে গান গাইছ! সাকিনা বিবি ওদিকে যায় যায়—ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে।

ফতিমা

ওমা, তাই না কি!

হোসেন

তোমরা যাও একবার। আমি হাকিম ডাকবার ব্যবস্থা করি।

মরজিনা, ফতিমা ও হোসেনের প্রস্থান। আলিবাবার প্রবেশ।

আলি

ছিলাম কাঠুরে হয়েছি আমীর! আর কোন কষ্ট

নেই ! অন্নকষ্ট নেই—বস্ত্রকষ্ট নেই—থাকবার কষ্ট নেই —খাজনার তাগাদা নেই—কোন অসুবিধে নেই—কিচ্ছু না। অন্যায় ? অন্যায় করেছি ? কিসের অন্যায় ? ভগবান দিয়েছেন—( হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন ) ওই আবার ! কাসিম—আমায় মাপ কর—মাপ কর—আমি তোমায় পথ বলে দিয়েছিলাম—তোমায় বারণ করিনি— কেন তোমার পায়ে ধরে বারণ করি নি। উঃ—

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। মরজিনা প্রবেশ করিল।

মরজিনা

আপনি একবার ও বাড়ীতে চলুন—

আলিবাবা

( সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া ) আচ্ছা মরজিনা— তুই বলত মা—আমি দোষ করেছি ? সে নিজে জোর করে চলে গেল। আমি কি করব।

মরজিনা চুপ করিয়া রহিল।

আলিবাবা

চুপ করে রইলি কেন মরজিনা···আমি বুঝতে পারছি তোরা মনে করছিস্ আমিই যত অনিষ্টের গোড়া। তা ঠিক···তা ঠিক—আমারই দোষ···। কি করব মা লোভ

সামলাতে পারলাম না। ছিলাম গরীব কাঠুরে খেতে পেতাম না। তার ওপর বললে বনে কাঠ কাটতে দেবে না—পাইকের তাগাদা—

মরজিনা

আপনি একবার ও বাড়ীতে চলুন।

আলিবাবা

আর কাসিম বরাবরই ছিল একরোখা—আমি বলতে চাই নি—তবু সে জোর করে জেনে নিলে—জবরদস্তি করে। কেন আমি তাকে বলে দিলাম—কেন আমি তাকে যেতে দিলাম—কেন তার পায়ে ধরে বারণ করলাম না।···আহা সেই কাসিম—দুষ্টু—গোঁয়ার—সৌখীন—তবু সে আমার ভাই—আমারই ভাই।···মরজিনা আমি দোষ করেছি আমায় মাপ কর তোরা।

ফতিমার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ।

ফতিমা

ওগো সাকিনার বড় ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে।

আলিবাবা

আঁ্যা—তাই নাকি—কি করি এখন—

ফতিমা

চল

আলিবাবা, ফতিমা ও মরজিনা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া যাওয়ার পর দেখা গেল যে পিছনের একটা জানালার গরাদে বাঁকাইয়া দস্যু সরদার নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছেন। একটা ছোরা দাঁতে কামড়ান রহিয়াছে। দস্যুসরদার জানালা হইতে টপ করিয়া মেঝেতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ছোরা কোষ-বদ্ধ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোসেনের প্রবেশ।

সরদার

(অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে) এ কি দোস্ত যে! এখানে?

হোসেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল—তাহার পর অভ্যর্থনা করিল।

হোসেন

শোভনাল্লা! আপনি হঠাৎ! এসেছেন ভালই হয়েছে। আপনার কথাই ভাবছিলাম কদিন থেকে। আপনি এলেন কোন্ দিক দিয়ে?

সরদার

যে দিক দিয়েই আসি। মনের কথা টের পেয়ে তবে এসেছি। স্থির থাকতে পারলাম না। এসেছি···কিন্তু একটা কথা। আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মনে আছে ?

হোসেন

নিশ্চয়ই আছে। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ত করেছি—কোরবও।

সরদার

বেশ—আমার খোঁজ হচ্ছিল কেন ?

হোসেন

আমাদের বড় বিপদ—পরামর্শ চাই—

আলিবাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

আলি

এই যে হোসেন। হাকিম সাহেব কি বললেন ?

হোসেন

তিনি বাড়ী নেই—আবার লোক পাঠিয়েছি।

আলি

তুই আবার একবার নিজে যা বাবা—

হোসেন

আচ্ছা···( সরদারকে দেখাইয়া ) ইনি আমার একজন পুরানো দোস্ত—আমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন···

আলি

আদাব, আদাব—ভারি খুসী হলাম আপনি এসেছেন ( হোসেনের প্রতি )—তুই যা বাবা একবার—

হোসেন

( সরদারের প্রতি ) দোস্ত, আমি এখুনি আসছি। তুমি একটু আরাম কর ততক্ষণ। অনেক কথা আছে।

প্রস্থান

আলি

( চীৎকার করিয়া ) ওরে কে আছিস্---

দুইজন চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওই ঘরটা খুলে দে—একটা সতরঞ্জ পেতে দে
( সরদারের প্রতি ) আসুন—

ভৃত্যগণ পিছনের একটা ঘর খুলিয়া দিল। এই ঘরের জানালার ভিতর দিয়া কাসিমের বাড়ীর একটা প্রকাণ্ড বারাণ্ডা দেখা যাইতেছে। সেই বারাণ্ডায় দাস দাসীরা ব্যস্তসমস্তভাবে

আনাগোনা করিতেছে। সাকিনা বিবির অসুখের জন্য অন্তঃপুরে একটা সাড়া পড়িয়াছে বোঝা যাইতেছে।

সরদার

( সতরঞ্জের উপর উপবেশন করিয়া ) আপনাদের বিপদের সময় এসে হয়ত আপনাদের আরও বিপন্ন করলাম।

আলিবাবা

বিলক্ষণ ! হোসেনের দোস্ত আপনি ! আপনি যে এসেছেন এইত আমাদের পরম সৌভাগ্য। ওরে মরজিনা —কিছু সিরাজি নিয়ে আয়—

সরদার

না—না—আপনি ব্যস্ত হবেন না !

আলিবাবা

( একজন ভৃত্যকে ) মরজিনাকে বল কিছু সিরাজি আনতে—

একজন ভৃত্য চলিয়া গেল। অপর জন ঘরের আসবাবপত্র ঠিক করিতে লাগিল।

সরদার

আপনাদের বাড়ীতে কি কারো অসুখ করেছে ?

আলিবাবা

হ্যাঁ—আমার ভাইয়ের স্ত্রী ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

সরদার

এ সময়ে আপনাদের অতিথি হওয়াটা উচিত হল না।

আলিবাবা

না—না—ওসব কথা বলবেন না। আপনাকে পেয়ে যেন আমি বেঁচে গেছি...

সিরাজি লইয়া মরজিনা প্রবেশ করিল।

সরদার

( মরজিনাকে দেখাইয়া ) এটি বুঝি আপনার মেয়ে !

আলিবাবা

ঠিক মেয়ে না হলেও মেয়েরই মত...ও আমাদের বাঁদী !

সরদার

বাঁদী ?

সিরাজির সরঞ্জাম রাখিয়া মরজিনা চলিয়া গেল।

আলিবাবা

ওরে হাওয়া কর।

একজন ভৃত্য একটা বড় পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

আপনার হয়ত কষ্ট হবে—আমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই—পরিবারে উপর্য্যুপরি বিপদ যাচ্ছে কিছুদিন থেকে।

সরদার

কষ্ট আপনাদের দিলাম এবং আরও হয়ত দেব!

আলিবাবা

বিলক্ষণ! আপনাকে পেয়ে যেন আমি বেঁচে গেছি—একা একা কেমন যেন দম আটকে আসছিল—একে বাড়ীতে অসুখ—বিশেষত কাসিম মারা যাওয়াতে—কাসিম আমার ভাই, সে মরে যাওয়াতেই—তাছাড়া আমারই দোষ…

সরদার হঠাৎ কটিদেশ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরদার

আপনার ভাই কাসিম মারা গেছেন ? কি হয়েছিল ? কি ব্যায়রাম ?

আলিবাবা

( ছোরাটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন ) ব্যায়রাম হলে ত সহজ মৃত্যু হত। ব্যায়রাম নয়—সে অনেক কথা। দেখুন এসব কথা গোপন করা উচিত [ থামিয়া গেলেন ]

সরদার আবার কি মনে করিয়া ছোরাটা কোষবদ্ধ করিলেন।

----কিন্তু আর পারছি না আমি ! আমি কারো কাছে প্রাণ খুলে কাঁদতে চাই।

সরদার

গোপন কথা শুনতে চাই না। কি দরকার !

এমন সময় আর একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য

( আলিবাবাকে ) আপনি একবার অন্দরে চলুন—সাকিনা বিবির মূর্চ্ছা এখনও ভাঙে নি। হাকিম সাহেবও এখনও আসেন নি।

আলিবাবা

আপনি বসুন। আমি আসছি এখুনি, মাপ করবেন—ওরে মরজিনা—কিছু ফল এখানে দিয়ে যা!—আমি আসছি এখুনি।

আলিবাবা চলিয়া গেলেন।

আলিবাবা চলিয়া গেলে সরদার ভৃত্যদের চলিয়া যাইতে বলিলেন। ভৃত্যগণও চলিয়া গেল।

সরদার

লোকটা সরল। হোক সরল—তবু একে মারতে হবে। ফাঁক পাচ্ছি না—রাত্রে থাকতে হল দেখছি। আজ রাত্রিই এর জীবনের শেষ রাত্রি। আমি এত মানুষ খুন করে—নিজের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হত্যা করে যে টাকা উপার্জ্জন করেছি এই শয়তান তা অনায়াসে চুরি করে এনেছে। জাফর আর ফরিদের মৃত্যুর কারণ এই বদমাস! সরল!

মরজিনা ফল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য-সম্ভার আনিয়া রাখিল। সরদার একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সরদার

এঁদের কাছে কতদিন আছো তুমি?

মরজিনা

( ফল সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে ) অনেকদিন হয়ে হয়ে গেল।

সরদার

তোমার মা বাবাও কি এঁদের বাড়ীতে আছেন ?

মরজিনা

আমার মা বাবা কে আমি জানি না। সাকিনা বিবির বাবা আমাকে কিনে আনেন।

সরদার

( সাগ্রহে ) কিনে আনেন ? কোথা থেকে ?

মরজিনা

শুনেছি হিরাটের হাট থেকে।

সরদার

( রুদ্ধশ্বাসে ) হিরাটের হাট থেকে ? দেখি কাছে এস ত।

মরজিনা একটু সন্দিগ্ধভাবে কাছে সরিয়া গেল।

আরও একটু কাছে এসো। মুখটা তোল ত দেখি—

মরজিনা

কেন, কি চান আপনি ?

সরদার

( উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন ) আমি দেখতে চাই তুমি আমার মেয়ে কি না ! হিরাটের হাটে তোমাকে কিনেছিল ?---দেখি---দেখি

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মরজিনার চিবুক তুলিয়া দেখিলেন।

নাঃ----কই নেই ত। তাকে আর আমি ফিরে পাব না ?----

মরজিনা

কি বলছেন আপনি ! কাকে ফিরে পাবেন----

সরদার

( অপ্রতিভভাবে ) ও কিছু নয় ! একটু সিরাজি দাও ত----উঃ কতদিন হয়ে গেল----তার মুখও আমার ভাল মনে নেই---শুধু মনে আছে তার চিবুকের তলায় একটা কাটা দাগ ছিল---কই তোমার নেই ত ! দেখি আর একবার···

মরজিনা

আপনার আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে! কি হয়েছে আপনার।

সরদার

কিছু নয়। আমিও হিরাটের হাটে বহুদিন আগে আমার একমাত্র মেয়েকে বিক্রি করে ফেলেছিলাম। তার চিবুকের তলায় কাটা দাগ ছিল। কই তোমার ত নেই ---দেখি আর একবার---ভয় কি---আর একবার দেখতে দাও ( আর একবার দেখিলেন ) নাঃ---নেই। সে আর বেঁচে নেই। তুমি যদি আমার মেয়ে হতে! তুমি আমারই মত আর এক হতভাগার বুকছেঁড়া রত্ন। আমার নয়---আমার মেয়ে সে হয়ত আর কোথাও---কিম্বা সে হয়ত বেঁচে নেই---অত্যাচারে অত্যাচারে সে হয়ত মরে গেছে---বাঁদী দেখলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে---এতদিন ডাকাতি করেও···

হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

মরজিনা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর আত্মসম্বরণ করিয়া ফলগুলি সাজাইয়া দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক। মরজিনা ফলগুলি নিপুণভাবে সাজাইয়া দিয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিল ঃ

মরজিনা

আপনি সিরাজি চাইলেন না ? আনছি।

চলিয়া গেল।

সরদার

আর দেরী করা ঠিক নয়----ধরা পড়ে যাব। আজ রাত্রেই কাজ শেষ করতে হবে। আজ রাত্রেই বার করতে হবে আমার জিনিস কোথায় এরা লুকিয়ে রেখেছে। সন্ধান নিতে হবে—সন্ধান নিতেই হবে ( একটু ভাবিয়া ) কিন্তু কার জন্যে এত করে মরছি-- -কার জন্যে। আমার নিজের বলতে ত কেউ নেই। শেষ পর্য্যন্ত আপনার বলতে ছিল জাফর আর ফরিদ। বিশ্বাসী ---অন্তরঙ্গ। অম্লান-বদনে আমার উদ্যত ছোরার তলায় গলা বাড়িয়ে দিলে। উঃ কি ভুলই করেছিলাম। ভুল ! ভুল ! সারাজীবনটাই ভুল করে এলাম। টাকার নেশা তবু এখনও কাটল না। অথচ আমার যা আছে তাতে একটা লোক বাদশার মত কাটিয়ে যেতে পারে। কার জন্যে এ সম্পদ---এই মেয়েটা যদি আমার হ'ত।

সিরাজির বোতল ও পানপাত্র প্রভৃতি লইয়া একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল ও সরদারের সম্মুখে সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া একপাত্র সিরাজি ঢালিয়া দিল। সরদার তাহা পান করিতে

লাগিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মরজিনা দ্রুতবেগে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মরজিনা

খাবেন না ! এ কি খেয়ে ফেলেছেন ! ও যে বিষ খেলেন ! আপনি ডাকাত কি না জানি না---সন্দেহ করে সিরাজিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। আপনি ডাকাত হোন---যাই হোন----আপনি অতিথি----এ কি করলাম আমি।

সরদার

বিষ ? (পেয়ালাটা দেখিলেন) তুমি বিষ দিয়েছ আমায়। (উচ্ছ্বসিত স্বরে) তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার মেয়ে----আমি চিনতে পারছি না----দাগ ছিল মিলিয়ে গেছে। তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে বিক্রি করে-ছিলাম, তার শাস্তি দিয়েছ। আমার মেয়ে না হলে এতবড় শাস্তি আমায় কেউ দিতে পারত না। মাথা ঘুরছে---উঃ---কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে আসছে। (শুইয়া পড়িলেন) মা আমায় সাজা দিয়েছিস---এইবার মাপ কর। আমার কাছটিতে আয়---(মরজিনা কাছে গেল)

হোসেন ও আলিবাবার প্রবেশ।

( হোসেনের প্রতি ) দোস্ত চললাম।

হোসেন

এ কি ?

আলিবাবা

এ কি----এ সব কি মরজিনা ?

সরদার

মরজিনা জানে না আলি মিঞা। শোন---আমি কে জান ? সেই গুহার মালিক---আমারই রত্ন আহরণ করে তুমি আজ আমীর। কাসিমকে মেরেছি---তোমাকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে এসেছিলাম----পারলাম না। আমার সব সম্পত্তি তোমাদেরই রইল। মরজিনাকে সুখী কোরো। ওই আমায় দিয়েছে দণ্ড---দিয়েছে মুক্তি ( মৃত্যু )।

আলিবাবা

এ সব কি---হোসেন---মরজিনা---এ সব কি ? আমি চাই না---আমি চাই না---চাই না এ সব। খোদা আমায় আবার গরীব করে দাও---আবার গরীব করে দাও---আবার গরীব করে দাও !

—যবনিকা—

546

শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

# শ্রীমধুসূদন

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

সপ্তম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৪
অষ্টম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৪

মূল্য তিন টাকা

৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের দোষগুলি এ সংস্করণে বর্জন করিলাম। কবির ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি নূতন দৃশ্যও সংযোজন করিয়াছি। নাটকটির উৎকর্ষ-সাধনকল্লে উপদেশ দিয়া অনেকেই আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট।

আমার ধারণা ছিল এ নাটক কখনও অভিনীত হইবে না, কিন্তু St. Xavier's কলেজের ছাত্রবৃন্দ এবং কলিকাতা Doctors' Amusement Clubএর সভ্যগণ আমার সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত করিয়াছেন।

২৬।৬।৪২ "বনফুল"

ভাগলপুর

# উৎসর্গ

সাহিত্যরসিক বন্ধু

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায়

করকমলেষু

অমূল্যবাবু,

এই পুস্তকটি রচনা করিবার কল্পনা যখন অঙ্কুররূপে আমার মনে প্রথমে উদ্গত হইয়াছিল, তখন আপনি উৎসাহ না দিলে ইহা বিকশিত হইত কি না সন্দেহ। আপনার উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে পুস্তকটি আপনার নামের সহিত যুক্ত করিলাম।

১৫।২।৩৯

ভাগলপুর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

# ভূমিকা

এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে—যদি অবশ্য ইহা কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিবৃতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি। যদি কোন দুঃসাহসী নাট্যসম্প্রদায় নাটকখানি অভিনয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন চরিত্রগুলির আকৃতি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা স্মরণে রাখেন এবং মেক্-আপ সম্বন্ধে উদাসীন না হন—কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলি তিমিরাচ্ছন্ন পৌরাণিক চরিত্র নহে।

"বনফুল"

# পাত্রপাত্রী

## পুরুষগণ

মধুসূদন দত্ত

রাজনারায়ণ দত্ত—মধুসূদনের পিতা

গৌরদাস বসাক
ভোলানাথ চন্দ্র
রাজনারায়ণ বসু
বঙ্কুবিহারী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
বাণী
হরি
} মধুসূদনের সহপাঠিগণ

প্যারীচরণ—রাজনারায়ণ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র

রাজকৃষ্ণ বসাক—গৌরদাসের পিতা

Dr. Corbyn

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবর্ধন দত্ত—পাওনাদার

রঘু—ভৃত্য

নটবর ঘোষ—মাদ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী

( ২ )

তিনজন পণ্ডিত, ভৃত্য, রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধুগণ, রাজনারায়ণ দত্তের জনৈক আত্মীয়, শ্রীমন্ত (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভৃত্য), বয়, বালক ভৃত্য, মুন্সী।

## স্ত্রীগণ

জাহ্নবী—মধুসূদনের মাতা

বিন্ধ্যবাসিনী—কৃষ্ণমোহনের পত্নী

কমলমণি—কৃষ্ণমোহনের কন্যা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পত্নী

দেবকী—কৃষ্ণমোহনের আর এক কন্যা (কমলমণির অপেক্ষা বয়সে ছোট)

রেবেকা—মধুসূদনের প্রথমা পত্নী

হেনরিয়েটা—মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী

হরকামিনী—রাজনারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠা পত্নী

বাঈজি

মধুসূদনের ৬ বৎসরের কন্যা

দাসী

ভিখারিণী

## প্রথম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটি কক্ষ। কক্ষটি মহার্ঘ আসবাবপত্রাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকটি কেদারা-কৌচও রহিয়াছে। একদিকে প্রাচীরগাত্রে একটি বড় আয়না বিলম্বিত। মধুসূদন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই খুলিতেছেন। তাঁহার জননী জাহ্নবী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মধুসূদন ১৮ বৎসরের যুবক। কালো রঙ—পাতলা গড়ন—টানা চোখ। চোখে প্রতিভার ছটা। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ। তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন। 'টাই'টা খুলিয়া তিনি একটি কৌচে বসিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি।

মধু। মা, একটা কাউকে ডাকো না, জুতোর ফিতেগুলো খুলে দিক।

জাহ্নবী। (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—রঘু—

রঘু প্রবেশ করিল

মধু। (পা বাড়াইয়া দিলেন) ফিতেগুলো খোল্—

রঘু বসিয়া ফিতা খুলিতে লাগিল

মা, তুমি আজ কলেজে মাত্র দুটো পোষাক দিয়েছিলে কেন বল ত! এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাকে!

জাহ্নবী। দিয়েছিলাম ত তিনটেই—তোমার বেয়ারাগুলো একটা ফেলে গেছে দেখলাম শেষে—

মধু। Idiots! ওরে রঘু, বেয়ারাগুলোকে ব'লে দিস—আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে। আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর বঙ্কু ভোলানাথ আজ আসবে—মনে আছে ত, এখুনি আসবে তারা—

জাহ্নবী। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার। তুই এখন আমার কথার জবাব দে।

মধু। বলেছি তো ও আমার দ্বারা হবে না।

জাহ্নবী। বিয়ে করবি না তুই?

রঘু বুটজুতা দুইটি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একজোড়া সুদৃশ্য চটি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন চটি পায়ে দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন।

মধু। বলেছি ত, বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব।

জাহ্নবী। শোন ছেলের কথা একবার! কেন, বাঙালীর মেয়ে কি দোষ করলে ?

মধু। বাঙালীর মেয়ে! বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না।

জাহ্নবী। ক্ষেপা ছেলের কথা শোন একবার!

স-স্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

লক্ষ্মী সোনা আমার—সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন কি আর অমত করলে চলে ?

মধু। তা হয় না মা—এ আমি কিছুতেই পারব না।

জাহ্নবী। এতে পারবার কি আছে বাবা ? বেটা ছেলে বিয়ে করবি, সে আর কি এমন শক্ত—

মধু। ভীষণ শক্ত।

আয়নার সম্মুখে গিয়া কলারটা খুলিতে লাগিলেন

জাহ্নবী। না হয় শক্তই, কিন্তু তুই তো কোনদিন শক্ত কাজ করতে ভয় পাস না। ছেলেবেলায় ভায়ের সঙ্গে ভাব করবার জন্য তুই পোষা পাখীর ছানাটা কেটে ফেলেছিলি, মনে আছে ? তুই সব পারিস।

মধু। (ফিরিয়া) তার সঙ্গে এর তুলনা দিচ্ছ তুমি মা! ভায়ের চেয়ে কি পাখীর ছানা বড় ?

হাসিলেন

জাহ্নবী। বড় নয় তা মানি। কিন্তু অপর কেউ হ'লে পারত না, তুই ব'লেই পেরেছিলি। তুই ইচ্ছে করলে না পারিস কি ? ছেলেবেলায় যখন পাঠশালায় পড়তিস—রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বড় বড় বই কেমন অনায়াসে তুই প'ড়ে ফেলেছিলি। রামের কথা ভুলে গেলি ?

মধু। ভুলি নি। কিন্তু যাই বল মা, তোমাদের শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন, কোন শ্রদ্ধা নেই তাঁর প্রতি—

জাহ্নবী। ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই বাবা। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার—এ দেশের আদর্শ। ইংরেজী প'ড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি?

মধু। এতে আর ইংরেজী-বাংলা কি আছে? ইংরেজী না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, খুব পণ্ডিত হয়েছ তুমি! এখন বিয়ের কি করি তাই বল!

মধু। বললাম তো, আমি পারব না। ও আট বছরে অচেনা খুকীকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

জাহ্নবী। তুই যে অবাক করলি বাছা! অচেনা মেয়েকেই তো বিয়ে করে সবাই। আর আমাদের দেশের আট-ন বছরেই তো বিয়ে হয়। সুন্দরী—সদ্বংশের মেয়ে—তোকে কি যা-তা ধ'রে দিচ্ছি আমরা? অচেনা আবার কি!

মধু। ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা কোথা রাখলাম? এই যে। গৌরকে দিতে হবে এটা।

জাহ্নবী। আমার কথার জবাব দে—

মধু। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথা?

জাহ্নবী। ও-ঘরে আছে। জবাব দিচ্ছিস না যে আমার কথার?

মধু। (অধীরভাবে) বলেছি তো, পারব না।

জাহ্নবী। উনি কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন 'না' বললে কি চলে বাবা?

মধু। কথা দিলে কেন তোমরা? কিছুতেই আমি এ বিয়ে করব না।

জাহ্নবী। কিছুতেই না?

মধু। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ও-কথা আমায় আর ব'লো না কেউ। আমার ঢিলে পাজামা কোথায়? দাও।

জাহ্নবী। ও-ঘরে আছে বললাম তো!

**মধুসূদন পাজামা পরিতে গেলেন। জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।**

রাজনারায়ণ। লিখে দিলাম চিঠি—ওরা সুবিধেমত এসে একদিন ঠিকঠাক করে ফেলুক। শুভস্য শীঘ্রম্—কি বল! শহরের যে রকম হাওয়া, মধুকে আর বেশী দিন অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়। বিশেষ মধুর মত ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—এখুনি বেহাত হয়ে যাবে।

জাহ্নবী। মধু কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়।

রাজনারায়ণ। রাজী নয়, মানে?

**বিস্মিত হইলেন—তারপর হাসিয়া বলি:লন**

বিয়ের আগে ছেলেরা অমন ব'লেই থাকে।

জাহ্নবী। না, তা ঠিক নয়। এই তো এতক্ষণ তাকে বোঝাচ্ছিলাম, কিছুতেই রাজী নয় সে।

রাজনারায়ণ। (দৃঢ়তার সহিত) রাজী হতে হবে—সব জিনিসেই আবদার চলবে নাকি!

জাহ্নবী। ও যে রকম একগুঁয়ে, ধর, যদি বিয়ে না করে?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) যদি-টদি নেই—করতে হবেই। রাজনারায়ণ মুন্সী যখন ঠিক করেছে তখন আর 'যদি'র স্থান নেই তার মধ্যে।

**জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ বলিয়া চলিলেন**

সে কি মনে করে, আমার কথার কোন দাম নেই? কোন ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মেয়ের পাল্লায় পড়েছে আর কি! সে দিন কে যেন বলছিল কেষ্ট বন্দ্যোর বাড়ীতে খুব যাতায়াত করছে আজকাল। ওসব চলবে-টলবে না—বুঝিয়ে ব'লো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বোঝাচ্ছি তো!

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুরা তো আজ আসবে এখানে খেতে—তাদের ব'লো ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেয় যেন যে, সব স্থির হয়ে গেছে—এখন

আর পেছনো অসম্ভব। গৌরকে ডেকে ব'লো—বুঝলে, গৌরের কথা ও শোনে খুব—

ভৃত্য আসিয়া একটি আলবোলায় তামাক দিয়া গেল। রাজনারায়ণ নিকটস্থ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

তুমি ওদের সামনে আধ হাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন? ছেলের মত ওরা! মধু কোথা গেল?

জাহ্নবী। ভেতরে আছে।

রাজনারায়ণ। তাকে ডেকে দাও তো। আচ্ছা, থাক্। গৌরকেই ডেকে ব'লো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বলব।

রাজনারায়ণ। কখন আসবে ওরা?

জাহ্নবী। মধু তো বলছিল এখুনি আসবে। যাই, আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে—

জাহ্নবী চলিয়া গেলেন; রাজনারায়ণ বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন.

রাজনারায়ণ। মধু দিন দিন বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। পাদরি কেষ্ট বাঁড়ুয্যের বাড়ী খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে—তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে শুনেছি; উঁহু, এ ভাল কথা নয়। বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গৌরবাবু, ভোলানাথবাবু, বঙ্কুবাবু এসেছেন।

রাজনারায়ণ। ও, এসেছে ওরা! আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় এইখানে। আর মধুকেও খবর দে—

ভৃত্য চলিয়া গেল। একটু পরে গৌরদাস, ভোলানাথ ও বঙ্কু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলের পোষাক সেকেলে ধরনের। পরিধানে কাপড়, আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় সামলা-জাতীয় টুপি, গায়ে শাল।

এস—এস—ব'স। তার পর, খবর কি? ভাল আছ তো সব?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। তাহার পর—

রাজনারায়ণ। আচ্ছা, তোমাদের **Mathematics**-এর **professor** রিজ্ সাহেব নাকি নেপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন শুনতে পাই। কথাটা কি সত্যি ?

ভোলানাথ। তাই তো শুনেছি আমরা।

রাজনারায়ণ। তোমাদের **Captain Richardson**-ও তো মিলিটারিতে ছিলেন—**Captain** যখন, তখন নিশ্চয় ছিলেন।

বঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। যত সব **soldier** এসে মাস্টার হয়ে বসেছে এখানে! তাই বোধ হয় তোমাদের চালচলনও মিলিটারি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ! ভাল কথা, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজটার এডিটার আজকাল তোমাদের স্কুলের একজন টিচার, না?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ, রামবাবু—রামচন্দ্র মিত্র সেটা চালান আজকাল—

রাজনারায়ণ। তোমরা লেখ-টেখ তাতে ? মধু কি যেন লিখেছে তাতে শুনলাম। দেখবার আর ফুরসৎ পাই নি।

**মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও একটি শালের পাড়া-বসানো দামী গরমের ড্রেসিং গাউন।**

মধুসূদন। বাইরে একজন মক্কেল এসে ব'সে আছেন।

রাজনারায়ণ। তাই না কি ? জ্বালাতন করেছে ব্যাটারা তোমরা তা হ'লে ব'স—আমি দেখি কে আবার এলেন! এই নাও—

**এই বলিয়া আলবোলার নলটা মধুসূদনের হাতে দিলেন। মধুসূদন রাজনারায়ণের সম্মুখেই তাহাতে টান দিতে লাগিলেন।**

মধু, এদের ফিরে যাওয়ার জন্যে বেয়ারাদের ধ'রে রেখেছ তো ? সন্ধ্যে হ'লেই পালায় ব্যাটারা।

মধুসূদন। তাদের থাকতে বলেছি।

রাজনারায়ণ। তোমরা তা হ'লে ব'স। আমি যাই।

**চলিয়া গেলেন**

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) তোর হাতে উনি আলবোলার নলটা দিয়ে গেলেন যে! বাবার সামনে তুই তামাক খাস?

মধু। **My father minds not your common punctilios**—তামাক তো ছেলেমানুষ, আমি যে মদ খাই তাও উনি জানেন। ভাল কথা—

**মধু আলবোলার নলটা ভোলানাথের হাতে দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ও এক বোতল Liqueur ও কয়েকটি গ্লাস লইয়া আসিলেন।**

ভোলানাথ। (বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন) **Grand!**

বঙ্কু। মালটা কি?

ভোলানাথ। **Liqueur.**

**মধু গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন**

সেবার তোমাদের বাড়ী পোলাও যা খেয়েছিলাম, জীবনে তা ভুলব না—চমৎকার! তেমন মাংসের পোলাও আমি আর কখনও খাই নি।

মধু। আজও পোলাও হচ্ছে।

গৌরদাস। মাংসের নাকি?

মধু। হ্যাঁ।

গৌরদাস। আমি বৈষ্ণবের ছেলে, আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা! রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন।

বঙ্কু। বাবাকে জানাবার দরকার কি বাবা?

**মধুসূদন সকলের হাতে এক এক গ্লাস Liqueur দিলেন ও নিজের গ্লাসটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।**

মধু। **I loved a maid, a blue-eyed maid**
**As fair a maid can e'er be, O**
**But she, oft with disdain repaid**
**My fondness and affection, O**

For her I sighed and e'er shall sigh
Tho' she shall ne'er be mine, O
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.
To the Blue-eyed maid, O!

মদ্যপান করিলেন

ভোলানাথ। I drink to Pilau—the Czar of all dishes.

বন্ধু। I do the same.

গৌরদাস। And here is to Madhu. God bless him.

সকলে মদ্যপান করিলেন

মধু। Here is your bottle of lavender, my boy—I hope you got the pomade all right. Believe me, I could not get the lavender that day. এখানকার দোকানদারগুলো হতভাগা—beggars—

ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা আনিয়া গৌরদাসকে দিলেন

গৌরদাস। Many thanks.

মধু। Needn't mention.

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা গৌরবাবুকে ভেতরে ডাকছেন একবার।

গৌরদাস। আমাকে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। মাংস খাবি কি না তাই জানতে চাইছেন হয়তো।

ভৃত্যের সহিত গৌরদাস ভিতরে চলিয়া গেলেন

(ভোলানাথের প্রতি) Have you seen my last sonnet in the *Literary Gleaner*?

ভোলানাথ। (সোচ্ছ্বাসে) Haven't I? It is splendid. রিসার্ডসন সায়েব স্বয়ং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন।

মধু। রিচার্ডসনের প্রশংসা তুমি শুনলে কোথা থেকে?

ভোলানাথ। আপিসে সেদিন মাইনে জমা দিতে গেছলাম, দেখলাম রিচার্ডসন সায়েব তোমার সনেটটা Kerr সায়েবকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন, আর তোমার তারিফ করছেন।

মধু। (সানন্দে) তাই না কি? Did Mr. Keer say anything?

ভোলানাথ। না।

মধু। He is a rogue and an idiot combined—ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন। I can't stand the fellow.

উপরোক্ত কথাবার্তার ফাঁকে বঙ্কু "with your permission মধু" বলিয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া চুমুকে চুমুকে পান করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ। খাবার আগেই অত বেশী টেনো না—খেতে ব'সে কেলেঙ্কারি করবে শেষকালে।

বঙ্কু। (সহাস্যে) Don't fear—I am Banku Behari—দু'এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না।

গৌরদাস ফিরিয়া আসিলেন

মধু। মা ডেকেছিলেন কেন?

গৌরদাস। তুই নাকি বলেছিস বিয়ে করবি না! What nonsense!

কথাগুলি মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন

মধু। I never talked more sense in my life!

গৌরদাস। বিয়ে করবি না?

আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন

বঙ্কু। বিয়ে করবি না? This is unpoetic, my friend! বিয়ে করবি বই কি! We are certainly anxious to get a Juno for our Jupitor.

মধু। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে) I don't mind getting a Juno; কিন্তু আট বছরের এক প্যান্‌পেনে খুকী is hardly a Juno, my boy

ভোলানাথ। বুঝেছি, and I wish you good luck. (মদ্যপান)

মধু। কি বুঝেছিস ?

ভোলানাথ। বাঁড়ুয্যে সায়েবের বাড়ী থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি একদিন বন্ধু ; কিন্তু গেন্নু ঠাকুরও যাতায়াত করছে—I **warn you.**

মধু। সে আর আমি জানি না! **But he is after the elder one.**

বঙ্কু। You mean—কমলমণি ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে খৃষ্টান হবে! Capital!

মধু। But where is the harm ?

গৌরদাস। মিস্ দেবকী ব্যানার্জির কথা সত্যি নাকি মধু ?

**মধুসূদন কিছু না বলিয়া এক গ্লাস মদ ঢালিলেন ও ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন**

বঙ্কু। মধু, সত্যি নাকি ?

**মধু এক নিশ্বাসে সমস্ত মদটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন**

মধু। **Yes, boys, I am in love—I have been fascinated by her!** বাঙালীদের ঘরে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি। রূপসী অনেক থাকতে পারে ; কিন্তু আমি ভালবেসেছি তার রুচিকে, তার কাল্‌চারকে। তুমি তো জান ভাই গৌর, আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হব—**why** আকাঙ্ক্ষা—**a conviction. I am destined to be a great poet. I sigh for Albion's distant shore—the land of Shakespeare and Milton.** আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—**I cannot rest half way—I must soar up and up and up till I am tired, and even then I shall soar, I cannot tie myself to a baby.**

ভোলানাথ। By Jove!

বঙ্কু। হ্যাঁ, ওই **blue-eyed** কবিতাটা তোমারই তো ?

মধু। কেন, কি মনে হয় ?

বঙ্কু। মিস্ ব্যানার্জির উদ্দেশে ?

মধু। Miss Banerji blue-eyed ! না, কিন্তু আমি কল্পনায় যেন একজন কাকে দেখতে পাই—she ie blue-eyed—she is my dream !

অস্ফুটস্বরে আবার আবৃত্তি করিলেন

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O.

গৌরদাস। কিন্তু কপালে বোধ হয় নাচছে blue-skined, not blue-eyed. It is already fixed up.

মধু। He must unfix it. এ বিয়ে আমি করব না—করতে পারি না।

বঙ্কু। আরে, একটা বিয়ে করবি তাতে হয়েছে কি ? এ দেশে লোকে হামেসাই চার-পাঁচটা বিয়ে করছে। তুইও না হয় একটা করে ফেল্ বাপ-মার অনুরোধে—পছন্দমাফিক পরে আবার করিস।

মধু। বাপ-মায়ের চেয়ে যে ঢের বেশী exacting, সে আমায় মানা করেছে। তার অবাধ্য হওয়া অসম্ভব।

বলিয়া নিজের কপালে টোকা দিলেন

ভোলানাথ। (বঙ্কুর প্রতি) শুনলে ?

বঙ্কু। শুনলাম তো !

গৌরদাস। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ দেখে বড় কষ্ট হ'ল।

মধুসূদন কিছু না বলিয়া আরও খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

ভোলানাথ। যাকগে ওসব কথা। মধুর একটা গান শোনা যাক।

গৌরদাস। অনেক দিন গান শুনি নি তোর ! গজল হোক একখানা।

মধু। এখন গাইতে ইচ্ছে করছে না ভাই—I am not in a mood for it.

বঙ্কু। গান ধরলেই mood এসে যাবে।

গৌরদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর।

মধু। শুধু গলায় শোন তা হ'লে—এস্রার ওপরে আছে।

ভোলানাথ। শুধু গলাতেই হোক, এস্রার দরকার নেই।

মধুসূদন গুন গুন করিয়া শেষে একটি ফরাসী গজল ধরিলেন ও তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইয়া গেল—অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গৌরদাস। চমৎকার! মধু, তুই বাংলায় এগুলো লিখতে পারিস?

মধু। বাংলায়? Abominable.

বঙ্কু। You are already a Pope in our college.

মধু। যদি ইংলণ্ডে যেতে পারি, দেখিস আমি কত বড় কবি হব গৌর! তুই অমন চুপ ক'রে ব'সে আছিস কেন?

গৌরদাস। তোর মায়ের মুখটা মনে পড়ছে ভাই। মায়ের মনে কষ্ট দিস না তুই।

মধুসূদন। My dear fellow, যা আমি পারব না তা আমাকে করতে বল কেন? আমি মায়ের জন্য মরতে পারি; কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

গৌরদাস। সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্রকে চেন?

মধুসূদন। You mean বিদ্যাসাগর? চিনি মানে? আলাপ আছে—he is a brilliant Brahmin.

গৌরদাস। তার মাতৃভক্তির গল্প শুনেছ?

মধুসূদন। (অধীর হইয়া) Please don't—সকলের মাতৃভক্তি যে একই ধরনের হতে হবে, সবাইকে যে নদী সাঁতরে মাতৃভক্তি দেখাতে হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না। Believe me, I love my mother in my own way and no less.

গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া

**And I love you Gour—you, my dear G. D. Bysak, I love you with all my heart. I wish you were a girl.**

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

গৌর। ঢের হয়েছে—ছাড় ছাড়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবারের ঠাঁই হয়েছে, আপনারা চলুন।

মধু। যা, যাচ্ছি।

ভৃত্য চলিয়া গেল

মধু। তোমরা এগোও, আমি এগুলো তুলে রেখে দিই। গৌর, তুমি নিয়ে চল এদের।

গৌর। এস।

গৌর, বঙ্কু ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন। মধুসূদন মদের বোতল ও গেলাসগুলি দেওয়াল-আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেন। রাজনারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজনারায়ণ। এরা কোথায় গেল ?

মধু। ভেতরে খেতে গেছে।

রাজনারায়ণ। তুমি যাবে না ?

মধু। যাচ্ছি।

গমনোদ্যত

রাজনারায়ণ। শোন। ( মধু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ) তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, শুনেছ তো ?

মধু। শুনেছি। কিন্তু ও-বিয়ে আমি করতে পারব না।

রাজনারায়ণ। পারবে না মানে ?

মধু। পারব না।

রাজনারায়ণ। **You must.** আমার মুখের উপর সোজা বললে—পারব না! **I like your cheek!** ও-সব ছেলেমানুষি রাখ, আমি কাল তোমার জবাব চাই—**definitely.**

ভিতরে দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। **Coercion? By Gosh!**

তিনিও ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক একটি কেদারায় উপবিষ্ট ও ধূমপানে রত। তিনি যে বৈষ্ণব তাহা তাঁহার বেশভূষাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। গৌরদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান।

রাজকৃষ্ণ। লোকের মত লোক ছিল বটে হেয়ার সাহেব। লোকটা সেদিন ম'রে গেছে—সমস্ত দেশটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। এই সব দুরন্ত ছোকরাদের এখন সামলায় কে?

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ডেভিড হেয়ার গামছা হাতে ক'রে স্কুলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত—কোন ছেলেকে অপরিষ্কার দেখলে তার মুখ মুছিয়ে দিত। কলেজের ছোকরারা মিশনরিদের সঙ্গে মিশলে তাদের শাসন ক'রে দিত। এখন সে সব করবে কে? (কিছুক্ষণ পরে) মিশনরিদের লেকচার খুব শুনছ তো?

গৌরদাস। আজ্ঞে না।

রাজকৃষ্ণ। আর 'না'! (কিছুক্ষণ পরে) আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে, কিন্তু তোমাদের চালচলন কেমন যেন—

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ওই তোমার বন্ধুটি—বড়লোকের ছেলে—পড়াশোনাতেও ভাল শুনেছি, কিন্তু কেমন যেন—

আবার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌরদাস। মধুর কথা বলছেন?

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওর সঙ্গে মিশে তুমি যেন গোল্লায় যেয়ো না। মনে রেখো, ইংরিজীই পড় আর যা-ই কর, সর্বদা এটা মনে রেখো যে তুমি বৈষ্ণববংশের সন্তান। মধু বড়লোকের ছেলে, যা করবে মানিয়ে যাবে। তুমি যেন ওসব অনুকরণ করতে যেয়ো না।

গৌরদাস। আজ্ঞে না।

রাজকৃষ্ণ। কটা টাকা চাই তোমার?

গৌরদাস। আজ্ঞে দশটা। দুখানা বই কিনতে হবে।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক তো?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজকৃষ্ণ। এই নাও।

ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন

লেখাপড়া শেখা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে বাপ-পিতামহের ধর্মটা জলাঞ্জলি দিতে হবে, এমনও কোন কথা নেই। ঐ এক কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো জুটেছে—সদ্ব্রাহ্মণের ছেলে—কি দুর্মতি দেখ দেখি লোকটার! নিজে মজেছে—দেশসুদ্ধ লোককে মজাচ্ছে—ডিরোজিও সাহেব কড়মড়িয়ে মাথাটি খেয়ে গেছে ওর। ওই খিদিরপুরে তোমার মধুর বাড়ীর পাশেই থাকে এক ছোকরা—কি যে ছাই নামটাও ভুলে গেলাম, তাকেও শুনছি মজিয়েছে—

গৌর। নবীন?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ নবীন—নবীন মিত্তির—শুনছি ছোকরা খৃষ্টান হয়ে যীশু ভজছে। চেন নাকি তাকে? মিশো না ওসব নবীন-ফবিনের সঙ্গে—অতি বদ ছোকরা ওসব।

উত্তেজিত ভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌর। আজ্ঞে না, আমি তো মিশি না ওর সঙ্গে।

রাজকৃষ্ণ। না, মিশো না—খবরদার মিশো না—এই ফিরিঙ্গি ব্যাটারা এ দেশে সুক্ষণে এসেছে কি কুক্ষণে এসেছে, নারায়ণই জানেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খিদিরপুরের রাজনারায়ণ বাবু আইচেন, দেখা করবার লেগে।

রাজকৃষ্ণ। তাই নাকি? ডেকে নিয়ে এস।

ভৃত্য চলিয়া গেল

হঠাৎ রাজনারায়ণ এল কেন এ সময়!

রাজনারায়ণ দত্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

রাজকৃষ্ণ। এস ভায়া, এস। খবর সব কুশল তো?

রাজনারায়ণ। মধু এখানে এসেছে?

রাজকৃষ্ণ। না। গৌরদাস, মধু এসেছে নাকি?

গৌরদাসের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন

গৌরদাস। না।

রাজনারায়ণ। আসে নি? কোথা গেল তবে?

রাজকৃষ্ণ। ব'স, ব'স, দাঁড়িয়ে কেন? ব'স। ব'স। মধু তো আসে নি।

রাজনারায়ণ হতাশভাবে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

রাজনারায়ণ। আসে নি? আমি আশা করেছিলাম, এখানেই পাব তাকে।

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার কি বল তো?

রাজনারায়ণ। মধু কোথা চ'লে গেছে—কোন খবরই পাচ্ছি না।

রাজকৃষ্ণ। চলে গেছে?

রাজনারায়ণ। কাল থেকে সে বাড়ী যায় নি। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব, ভাবলাম সে হয়তো কোন খবর দিতে পারবে। কিন্তু তোমরা কিছুই জান না দেখছি।

গৌরদাস। আমি তো কিছু জানি না—মধু কাল থেকে কলেজেও যায় নি।

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। তামাক খাও। ওরে, কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়।

রাজনারায়ণ। থাক্, তামাক খাব না।

রাজকৃষ্ণ। এ তো বড় বিষম খবর আনলে তুমি! কোথা গেল সে?

গৌরদাস। দেখি একটু খোঁজ ক'রে। দেখি গিরীশের কাছে যদি কোন খবর পাই।

রাজনারায়ণ। বঙ্কু, ভোলানাথ, ভূদেব এরাও ওর খুব বন্ধু। হয়তো ওদের কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে।

গৌরদাস। আপনি বস্থন, আমি গিরীশের কাছে দেখি আগে—

চলিয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। ও, তুমি বুঝি বার্ডসাই খাও! তামাক খাবে না? বার্ডসাই আনাব? আমার ওসব পোষায় না ভায়া।

রাজনারায়ণ। না, কিছু দরকার নেই। ভারি দুশ্চিন্তা হয়েছে—কোথায় গেল যে ছেলেটা!

রাজকৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা তো হবেই। তবে যাবে আর কোথায়? এখুনি খবর পাবে। তার বিবাহ তো স্থির হয়েছে?

রাজনারায়ণ। ঐ বিবাহ নিয়েই যত গোলমাল, মধু কিছুতেই বিবাহ করবে না, অথচ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ কি রকম আবদার বল দেখি?

রাজকৃষ্ণ নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন ও তাহার পর কথা কহিলেন

রাজকৃষ্ণ। আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশি স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) ওই কেষ্ট বন্দ্যো:, রামগোপাল ঘোষ—ওদের কি শিক্ষিত বল তুমি?

রাজনারায়ণ। শিক্ষিত বই কি।

রাজকৃষ্ণ। বিশ্বাস করি না আমি। যত সব আচারভ্রষ্ট কুলাঙ্গার! মানুষ তো নয়, মদের পিপে এক-একটি!

রাজনারায়ণ। (সহাস্যে) কালের গতিকে রোধ করবার কারো সাধ্য নেই। ভাল কথা, রামগোপাল ঘোষ জর্জ টমসনের সঙ্গে জুটে খুব বক্তৃতা করছে আজকাল—শুনেছ তার বক্তৃতা? বক্তৃতা খুব ভালই দেয়।

রাজকৃষ্ণ। ফৌজদারি বালাখানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—না কি একটা হবে শুনেছি। ব্যাপারটা কি হে! হবে কি সেখানে?

রাজনারায়ণ। রাজনীতির আলোচনা। টমসন সাহেবের লেকচার শুনেছ?

রাজকৃষ্ণ। শুনেছি, লোকটা বাগ্মী বটে।

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এ দেশে এনে এ দেশের মহা উপকার করেছেন। এ রকম বক্তৃতা এ দেশে কেউ কখনও শোনে নি।

রাজকৃষ্ণ। তা বটে, চক্রবর্তী ফ্যাক্‌সন তো একেবারে মেতে উঠেছে!

রাজনারায়ণ। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কি লিখেছে দেখেছ? যেন ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হচ্ছে—কামানের ধ্বনিই বটে! (সহসা) কিন্তু গৌর তো এখনও ফিরল না ভাই! মনটা ভারি উতলা হয়ে উঠেছে। আমার সহধর্মিণী তো অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ। ভাই, রাগ যদি না কর তো একটা কথা বলি তোমায়।

রাজনারায়ণ। কি কথা বল, রাগ করব কেন?

রাজকৃষ্ণ। দেখ, তোমরাই অপরিমিত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। তুমি যথেষ্ট উপাজন কর—শহরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক—সবই ঠিক। তোমার ছেলেও খুব প্রতিভাশালী ছেলে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অতি বর্ষণে ভাল ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায়, অত্যধিক আদরে ভাল ছেলেও তেমনি বিগড়ে যায়। ছেলেদের হাতে বেশী কাঁচা পয়সা দেওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে—দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে।

রাজনারায়ণ। তুমি ঠিকই বলেছ—কিন্তু কি করি বল! আমার গৃহিণীই, ভাই, যত নষ্টের মূল। আর দেখ, তুমি বন্ধু লোক, তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—গৃহিণী সম্বন্ধে আমার একটু দুবলতা আছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সহজ নয়। তিনিই আদর দিয়ে দিয়ে মধুর সর্বনাশটা করেছেন। বিশেষ আমার দুটি ছেলে—প্রসন্ন আর মহেন্দ্র মারা যাবার পর মধুই হয়েছে তাঁর নয়নের মণি। আমিও যে তাকে প্রশ্রয় দিই নি তা নয়, মানে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর সহসা বলিলেন

**I mean he is my only son.** গৌর এখনও ফিরছে না কেন বল তো? গিরীশ কে?

রাজকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ ব'লে কে একজন ওদের বন্ধু আছে। আজকাল ধর্মের ভেকধারী নানারকম ছেলে-ধরা শহরে আছে কিনা, সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। (কিয়ৎকাল পরে) এদিকে ক্রিশ্চান মিশনারি—ওদিকে আবার ঠাকুর-বাড়ীর 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতাপ! তত্ত্ববোধিনী সভা—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বেরুল শেষকালে। তত্ত্ব না বুঝিয়ে আর ছাড়বে না। দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে দেবেন ঠাকুর শেষকালে স-পারিষদ ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়ল হে। রামমোহন আর ডিরোজিও ডোবালে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মকে। এখন দেখ তোমার ছেলে গিয়ে কোন দলে ভিড়ল কি না—

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক

গৌরদাস। শুনলাম মধুকে নাকি পাদরীরা নিয়ে গেছে—খৃষ্টান করবে।

রাজনারায়ণ বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান করবে!

রাজকৃষ্ণ। দেখ, নিশ্চয়ই ওই কেষ্ট বন্দ্যো আছে এর ভেতর—এ কেষ্ট বন্দ্যো না হয়ে যায় না। সাংঘাতিক লোক হে! কিছুদিন আগে 'চন্দ্রিকা-প্রকাশে' বেরিয়েছিল মনে নেই? কার এক ছেলেকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। উঃ, এ যে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল ক্রমে! ছেলে-ধরা হয়ে দাঁড়াল!

রাজনারায়ণ দত্তের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল

রাজনারায়ণ। আমার ছেলেকে ধ'রে নিয়ে খৃষ্টান করবে! স্পর্ধা তো কম নয়! খুন ক'রে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সীকে চেনে না ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেব। দেখি তো ব্যাটাদের কতদূর হিকমৎ! এস তো আমার সঙ্গে গৌর, কোথায় খবর পেলে তুমি?

গৌর। চলুন।

**রাজনারায়ণ ও গৌর বাহির হইয়া গেলেন**

রাজকৃষ্ণ। তুমি আবার ফিরে এসো এখুনি।

গৌর। (নেপথ্য হইতে) আসছি।

## তৃতীয় দৃশ্য

**হিন্দু কলেজের বারান্দা। হিন্দু কলেজের ছাত্র বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব বসিয়া গল্প করিতেছেন। সকলেই ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। ভূদেবই কেবল বাঙালী পোষাক অর্থাৎ ধুতি চাদর পিরান পরিয়া আছেন, বাকী সকলেরই বিদেশী পোষাক। কাহারও বা মুসলমানী ইজার চাপকান, কাহারও বা সাহেবী স্যুট। বঙ্কুর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। হাসিতে হাসিতে হরি প্রবেশ করিল।**

রাজনারায়ণ। (হরিকে) হাসছ যে?

হরি। গোলদীঘিতে কে এক সাহেব পাদরী ধর্মপ্রচার করছেন, কি অদ্ভুত বাংলা বাবা!

ভূদেব। আমাদের মধু নাকি ক্রিশ্চান হচ্ছে শুনলাম।

বঙ্কু। (সিগারেটে টান দিয়া) কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

ভূদেব। কিন্তু অনুচিত।

হরি। সবাই যখন জোটা গেছে, দাঁড়াও, কিছু নিয়ে আসি।

**চলিয়া গেলেন**

বঙ্কু। (ভূদেবকে) উচিত অনুচিত বুঝি না, কিন্তু মনে হচ্ছে অনিবার্য।

ভোলানাথ। **General Pollock has planted the British flag on Bala Hissar. These British people will conquer the best of us, if not all of us.**

ভূদেব। মধুর ক্রিশ্চান হবার দরকারটা কি? অনেকে ক্রিশ্চান হয় পেটের দায়ে, চাকরির লোভে।

রাজনারায়ণ। মধুর বিলেত যাবার লোভ আছে। কোন পাদরী যদি ওকে বিলেত নিয়ে যাবার লোভ দেখায় তা হ'লে এক্ষুনি ও ক্রিশ্চান হবে।

ভূদেব। বিলেত যাওয়াটাই বড় হ'ল ?

বঙ্কু। তোমার কাছে বড় না হতে পারে, তুমি বামুন-পণ্ডিতের ছেলে।

সিগারেটে টান দিলেন

ভূদেব। (ধীরভাবে সংশোধন করাইয়া) বামুন-পণ্ডিত নয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান ব'লেই বুঝতে পারছি না, খৃষ্টান হওয়ার মধ্যে কি এমন মহত্ত্ব আছে !

বঙ্কু। কি বিপদ, ওর ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছে, সমুদ্রযাত্রা করলেই তোমরা জাতিচ্যুত করবে—খৃষ্টান না হয়ে ওর উপায় আছে ?

ভোলানাথ। ইংলণ্ড কেন, এই বঙ্গদেশেই খৃষ্টধর্ম বরণ করবার স্বপক্ষে ওর প্রবল যুক্তি রয়েছে, lovely Miss Banerjee !

হাসিয়া একটি খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন.

ভূদেব। এ কথাটা সত্যি নাকি ?

রাজনারায়ণ। রিচার্ডসন সাহেবের প্রিয় ছাত্র ও—তার হাতের লেখাটা পর্যন্ত নকল করতে চায়, এ বিষয়েও যে তার অনুকরণ করবে তা আর আশ্চর্য কি ; শুনেছ তো কাপ্তেন সাহেবের কাণ্ড-কারখানা !

ভূদেব। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু। ছি-ছি, এ কি প্রবৃত্তি !

বঙ্কু। তুমি সেকেলে, মধু মডার্ন।

ভোলানাথ। **Not only that, Madhu is a rebel.**

ভূদেব। পরের নকল করার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। সেদিন মধু ফিরিঙ্গির মত চুল ছেঁটে এসে আমাকে দেখিয়ে বললে—এর জন্যে এক মোহর ব্যয় হয়েছে। এত খারাপ লাগল আমার।

বঙ্কু। খারাপ লাগবার হেতুটা ? চমৎকার দেখাচ্ছিল তো !

ভোলানাথ। **He is a genius. We must put up with his eccentricities, Bhudeb.**

ভূদেব। সে যদি পাঁচ চূড়ো, সাত চূড়ো কি ন' চূড়ো কেটে আসত জিনিয়াসের উপযুক্ত নতুন কিছু হ'ত একটা, কিন্তু ফিরিঙ্গিদের নকল করায় প্রতিভার কোন লক্ষণ দেখতে পাই না।

বঙ্কু। **Why not?** সনাতন পদ্ধতিকে কেন মেনে চলব আমরা? **The French Revolution has taught us to pull down and kick out every form of sovereignty.**

ভূদেব। কিন্তু ইয়োরোপে তার চেয়েও আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে **Prince Metternich**-এর, তিনি সভারেন্‌টিতে আস্থাবান।

রাজনারায়ণ। (পড়িতে পড়িতে সহসা) বাঃ, চমৎকার, খাসা লিখেছে। **This is modern Bengal speaking.**

ভোলানাথ। কি পড়ছ ওটা?

রাজনারায়ণ। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। রামগোপাল ঘোষ জমিয়ে তুলেছে—যাই বল।

বঙ্কু। বেশি প্রশংসা ক'রো না, ভূদেব চ'টে যাবে, রামগোরাল ঘোষ মদ খায়।

ভূদেব। (হাসিয়া) সত্যি ভাই, আমার একটুও ভাল লাগে না এসব। রামগোপাল ঘোষের মত লোক মদ খেয়ে অনাচার করবে, মধুর মত ছেলে ফিরিঙ্গিয়ানার পঙ্কে ডুবে যাবে—এসব আমার কাছে অসহ্য।

সহসা সাহেবী বেশে মধুসূদনের প্রবেশ

ভোলানাথ। নাম করতে করতেই এসে হাজির!

বঙ্কু। (ভূদেবকে) নাও, তর্ক কর এইবার।

ভূদেব। তুমি খৃষ্টান হচ্ছ নাকি?

মধু। হচ্ছি।

বঙ্কু। পাদরীটি কে? ডফ, ডিলট্রি, না, ব্যানার্জি?

গাড়োয়ান প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল

গাড়োয়ান। ভাড়াটা হুজুর ?

মধু। ও, হ্যাঁ—

পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে দিলেন। গাড়োয়ান সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

যাও।

গাড়োয়ান খুব ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

ভোলানাথ। একমুঠো টাকা গাড়ি ভাড়া! একবার গুনলি না পর্যন্ত ?

মধু। রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে কখনও কাউকে গুনে টাকা দেয় না।

ভূদেব। এমন রাজনারায়ণ দত্তের ছেলের খৃষ্টান হওয়াটা কি ভাল দেখায় ?

বঙ্কু। দাঁড়িয়ে কেন ? ব'স না, তর্কটা জমুক।

মধুসূদন। এখন বসব না।

বঙ্কু। এলে কেন তা হ'লে ?

মধুসূদন। এসেছি রেভারেণ্ড ব্যানার্জির খোঁজে। শুনলাম তিনি এই দিকেই এসেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লর্ড বিশপের সঙ্গে দেখা করতে হবে এক্ষুনি। **I am in a hurry.**

ভোলানাথ। উদ্দেশ্য ?

মধুসূদন। লর্ড বিশপ যদি রেকমেণ্ড করেন আমি ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে থাকতে পারি। বাবা শুনছি লাঠিয়াল শড়কিওয়ালা আনিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়মের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, আর—

ভূদেব। ( বিস্মিত ) ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে থাকবে ?

মধুসূদন। **Yes, if I can get in.**

ভূদেব। এতটা বীরত্ব নাই বা করলে!

মধুসূদন। দেখ ভূদেব, **you shouldn't meddle in matters beyond you.**

ভূদেব। আহা, রাগ কর কেন, আমার কথাটা শোনই না।

মধুসূদন। শতকরা নাইন্টিনাইন পয়েন্ট নাইন লোক যে কথা বলছে তুমিও সেই কথা বলবে। আমি পয়েন্ট ওয়ানের দলে, তোমাদের কথা ঢের শুনেছি and I am sick of it—

ভূদেব। শোনই না আর একবার।

মধুসূদন। ( অধীরভাবে ) কি বল ?

ভূদেব। তোমার মত রত্ন আমরা হারাতে প্রস্তুত নই।

মধুসূদন। Thanks for your compliment. কিন্তু হারাতে মানে ? রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে কি হারিয়ে গেছেন ? মহেশ ঘোষ কি হারিয়ে গেছেন ? What do mean by হারিয়ে যাওয়া ! আমি তোমাদেরই আছি, থাকবও চিরকাল। হারিয়ে যাব ! What a silly idea ! এখন আমার বক্তৃতা করবার সময় নেই, চললাম।

দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন

বঙ্কু। ( ভূদেবকে ) কেমন, হ'ল তো ?

ভূদেব। হঠাৎ এমন ক্ষেপে ওঠবার মানেটা কি ?

ভোলানাথ। মানে, ওই যে বললাম—শ্রীমতী দেবকী ব্যানার্জি।

বঙ্কু। এবং বিলেত যাওয়ার প্রলোভন। He is sighing for Albion's distant shore.

ভূদেব। মধু খৃষ্টান হবে ভাবতেও কেমন যেন লাগে !

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না, কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে না।

ভূদেব। তাই বুঝি মশায়ের দেবেন ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজে গতিবিধি হচ্ছে আজকাল !

রাজনারায়ণ হাসিলেন। হরি নামক যুবকটি এক বোতল মদ, কয়েকটি মাটির ভাঁড় ও কিছু শিককাবাব লইয়া প্রবেশ করিল।

বঙ্কু। যাক, এতক্ষণে সান্ত্বনা পাবার মত কিছু একটা পাওয়া গেল।

ভোলানাথ। স্কুলটাকে অপবিত্র ক'রে আর কি হবে, গোলদীঘিতে গিয়ে বসা যাক চল। রাজনারায়ণ, ওঠ। ভূদেব, আসছ নাকি ?

বঙ্কু। উনি সতী, উনি আসবেন মানে ?

ভূদেব। ( অপ্রতিভ ) আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না ভাই, সত্যি বলছি—

রাজনারায়ণ। **Here comes the good Macduff—I mean** গৌরদাস।

বঙ্কু। মধুময় গৌরদাস বল, আসুন, সমস্ত প্রস্তুত—

গৌরদাস বসাকের প্রবেশ

গৌরদাস। মধুর কোন খবর পেয়েছ ?

হরি আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, খানিকটা শিককাবাব মুখে দিল

বঙ্কু। তুমি অতটা খেয়ো না—বাঃ, ফুরিয়ে যাবে যে !

খানিকটা কাড়িয়া নিজের মুখে পুরিলেন

ভূদেব। মধু স্বয়ং এসেছিল এখনি।

গৌরদাস। এসেছিল নাকি ? কোথা গেল ?

ভূদেব। লর্ড বিশপের চিঠি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে গেল।

গৌরদাস। ফোর্ট উইলিয়মে ?

ভোলানাথ। বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া কুছ ভি নেহি তো থোড়া থোড়া। লেঠেল শড়কিওলা আনিয়ে ওর বাবা মিলিটারি মেজাজ দেখিয়েছে, ওই বা দেখাবে না কেন ? যাই বল **I respect the revolutionary in him.**

গৌরদাস। কতক্ষণ হ'ল গেছে ?

ভূদেব। রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জের বাড়ীতে এখনও ধরা যায় বোধ হয় তাকে।

গৌরদাস। তা হ'লে চল যাই। ওর মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

ভূদেব। হ্যাঁ, চল। ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

বঙ্কু। তোমরা এগোও, আমরা আসছি পরে।

ভূদেব ও গৌরদাস চলিয়া গেলেন

রাজনারায়ণ। আমাদেরও যাওয়া উচিত কিন্তু।

বঙ্কু। ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকতে দেবে কি আমাদের?

হরি। পাগল হয়েছ! ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দেবে। তার চেয়ে চল বাবা, বুলবুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে। পেনেটির বাগানে ভাল বাচখেলাও আছে আজ।

ভোলানাথ। আমাদের কিন্তু উচিত মধুকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা। **I think Rajnaran is right.**

বঙ্কু। সে সব পরে চিন্তা করা যাবে এখন। তবে একটি কথা ব'লে দিচ্ছি—**whatever you do, you cannot stop him.**

হরি। আপাতত চল কোথাও ব'সে এগুলো শেষ ক'রে ফেলি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে!

বাণীর প্রবেশ

বাণী। উঃ, কি কাণ্ড!

বঙ্কু। আবার কি?

বাণী। মধু আর রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে এয়সা জোরে জুড়ি হাকিয়ে চলেছে যে, একটু হ'লে চাপা দিয়েছিল আমাকে।

ভোলানাথ। কোথায়?

বাণী। এই গেটের সামনে। ফুল ফোর্সে একজোড়া ওয়েলার ছুটে চলেছে হে টগবগিয়ে।

বঙ্কু। দেখ কাণ্ড

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন

## চতুর্থ দৃশ্য

**রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী। রাজানারায়ণ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন—জাহ্নবী রোরুদ্যমানা।**

রাজনারায়ণ। এখন আর কাঁদলে কি হবে? আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চ'লে গেল। উঃ, রামকমলের পরামর্শে কি কুক্ষণেই যে তোমাদের খিদিরপুরে এনেছিলাম—সর্বনাশ হয়ে গেল আমার! (উচ্চৈঃস্বরে) প্যারি—প্যারি—

জাহ্নবী। প্যারি নেই, তাকে পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

রাজনারায়ণ। কোথায় পাঠালে তাকে? রোঘো—রোঘো—

**রঘু নামক ভৃত্যের প্রবেশ**

রঘু। কি বলছেন হুজুর?

রাজনারায়ণ। বৈঠকখানায় মুহুরীকে জিগ্যেস ক'রে আয় যে, যশোর থেকে কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছে কি না! শালাদের দেখাচ্ছি আমি।

**রঘুর প্রস্থান**

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে?

রাজনারায়ণ। কি কথা?

জাহ্নবী। এ নিয়ে আর একটা অনর্থ বাধিয়ো না তুমি। তোমার দিশী লাঠিওলা কি কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পারবে?

রাজনারায়ণ। তুমি বল কি! বাংলা দেশের লাঠির এখনও এত শক্তি আছে যে বন্দুক তার কাছে হার মেনে যাবে। আর তুমি কি মনে কর, বন্দুক আমার নেই?—না, যোগাড় করতে পারি না? আগুন ছুটিয়ে দেব দেখো তুমি। বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের। রোঘো—রোঘো—

**রঘুর পুনঃপ্রবেশ**

রঘু। কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছেন—লেঠেলরা সব এসেছে।

রাজনারায়ণ। যা তুই, বসতে বল্—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। (কম্পিতকণ্ঠে) আমার ভয় খালি মধুর জন্যে। মধু তো এখন ওদেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে ওরা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে? ওরা সব পারে—এক নীলকর সাহেব আমাদের গাঁয়ের একজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

রাজনারায়ণ। (রাগতকণ্ঠে) তা হ'লে কি করতে বল তুমি?

জাহ্নবী। আমি বলি ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে মধুকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

রাজনারায়ণ। বুঝিয়ে-সুজিয়ে! আর্চডিকন ডিলট্রি আর ব্রিগেডিয়ার পাউনি কি তোমার পদী পিসী না শান্ত মাসী যে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে বললেই বুঝে যাবে? ওরা একমাত্র যুক্তি বোঝে, যার নাম বাহুবল।

জাহ্নবী। একবার দেখ না তুমি চেষ্টা ক'রে—

রাজনারায়ণ। সে আমি পারব না। এই ফিরিঙ্গি পাদরী ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় ক'রে আমি বলতে পারব না যে, আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া ক'রে। এ অসম্ভব আমার পক্ষে।

জাহ্নবী। (সহসা রাজনারায়ণের পায়ে ধরিয়া) ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও। রাগ ক'রো না আমার ওপর—আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তা হ'লে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি, শেষকালে কি মধুকেও হারাব?

রাজনারায়ণ। (সহসা দ্রবীভূত হইলেন) ওঠ—ওঠ—কি করছ! তুমি কি মনে কর, মধু শুধু তোমারই ছেলে? আমার ছেলে নয়? ভুলে যাচ্ছ কেন, মধু আমারও একমাত্র ছেলে—একমাত্র বংশধর? দেখি, দাঁড়াও—মানে লোঠেলরা—বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ বাহির হইয়া

গেলেন। বাহিরের দিকে একটি ভিখারিণীর গান শোনা যাইতে লাগিল। একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল।

দাসী। গুপ্তকবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরী মাগী এসেছে মা। সেই যে সেই দিন বলছিলাম যার কথা—তুমি ডেকে আনতে বলছিলে, মনে নেই? ডাকব ওকে? তুমি অমন ক'রে মন গুমরে থেকো না মা, তাতে ছেলের আরও অকল্যাণ হবে। ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে দেখো। ডেকে আনি, কেমন? একটু গান শোন, মন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসী চলিয়া গেল ও ভিখারিণীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল।

ভিখারিণী। জয় হোক মা!

দাসী। তুই গুপ্তকবির সেই আগমনীটা গা তো!

ভিখারিণী খঞ্জনি বাজাইয়া শুরু করিল

ভিখারিণী। পরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এলো ওই
অমনি পাগলিনীপ্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কই, আমার উমা কই!
স্নেহে রাণী বলে, আমার উমা কি এলে?
একবার আয় গো আয় করি কোলে।
অমনি দু বাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,—
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলি
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলি!
কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই?
অমনি সরমে মরে যাই।
আমি বলি, আমার পিতে এসেছিলেন নিতে।
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

জাহ্নবী। ওকে একটা টাকা দিয়ে দে।

দাসী-সহ ভিখারিণীর প্রস্থান। রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণের প্রবেশ

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কি খবর বাবা?

প্যারীচরণ। আমরা অনেক কষ্টে কেল্লায় ঢুকেছিলাম, মধু এল না।

জাহ্নবী। এল না? আমার কথা বলেছিলি?

প্যারীচরণ। সব বলেছিলাম। কত বোঝালাম তাকে, সে কিছুতেই এল না। সেখানে ঢোকা কি সহজ ব্যাপার! আমাদের আগে গৌরদাস-বাবু ভূদেববাবু গেছলেন—কিন্তু পাদরীরা মধুর সঙ্গে দেখাই করতে দেয় নি। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল পর্যন্ত গেছলেন, তাঁকে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় নি। ব্যাটারা কি কম পাজি! কাকাকে বল, ব্যাটাদের নামে ঠুকে দিক এক নম্বর।

জাহ্নবী। আমার কথা বলেছিলি তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে?

প্যারীচরণ। বলি নি! অনেকবার বলেছি—সেখানে বেশী কথা কইবার কি যো আছে? গোরা পাহারা—পাদরী—গিজগিজ করছে।

জাহ্নবী। মধু এল না!

নিষ্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন

## পঞ্চম দৃশ্য

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে একটি কক্ষ। মধুসূদন সেই ঘরে একাকী পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার হস্তদ্বয় পিছনে নিবদ্ধ—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও গরম ড্রেসিং গাউন। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিলেন ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। Dr. Corbyn—যাঁহার বাড়ীতে মধু অবস্থান করিতেছেন—তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

Dr. Corbyn। The friend who called the other day has come again. Like to see him?

মধু। (সাগ্রহে) Has Gour come?

Dr. Corbyn। Yes, some Gourdas Bysak.

মধু। **Is there anyone else ?**

**Dr. Corbyn। No, he is alone, shall I send him ?**

মধু। **Yes, please do**

**Dr. Corbyn। All right.**

Dr. Corbyn চলিয়া গেলেন ও একটু পরে গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৌরদাস আসিতেই মধু তাঁহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন—

মধু। I am sorry, সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। ভূদেব কোথায় ? সে এল না আজ ?

গৌরদাস। না, সে আসতে পারলে না। মধু, তুই এ কি করলি ভাই ?

মধু। (সহাস্যে) **Don't give moral lectures please, believe me—I could not help it.**

গৌরদাস। Could not help it ! তুই শেষে খৃষ্টান হবি—এ যে ভাবতেও পারি না।

মধু। **Well, it requires a little imagination.** তোমার সে বালাই নেই—**so it is a surprise to you.**

গৌরদাস। **It *is* a surprise to me**—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

মধু। তোর কল্পনার দৌড় আর কতটুকু ? একটা হাউইয়ে আগুন ধরিয়ে দেবার পর সে কি করবে কল্পনা করতে পারিস ?

গৌরদাস। তার মানে ?

মধু। **The rocket has cought fire my friend, and it will shoot up. No moral lectures can stop it now.**

গৌরদাস। **Fire**টা কি তাই তো বুঝতে পারছি না। **Is it Miss Banerji ?**

মধু। **Nonsense.**

গৌরদাস। তবে হঠাৎ এমন বিদ্রোহ ?

মধু। I won't be ruled over. I shall break through bonds. I is in my nature—it is in my blood. ( একটু পরে ) Nonsense—Miss Banerji indeed !

গৌরদাস। সবাই বলছে কিন্তু।

মধু। Let them—

গৌরদাস। তোর মায়ের কথা একটু মনে হ'ল না ?

মধু। ( মিনতি করিয়া ) Please don't. Damn it ! ( সহসা উত্তেজিত হইয়া ) তোমরা পাঁচজনে এসে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবে তবে সে কথা ভাবব ? Do you take me for a dead log of wood ? How dare you ? Please let my private feelings alone—I curse them—I nurse them—but I shall never let them crush me. Never ! Do you know, she haunts me ? But I won't be dragged down—I shall stick to my principle. I will.

গৌরদাস। তোমার আবার principle আছে নাকি ? You have enough of sentiments, no doubt—কিন্তু principle ?

মধু। My sentiments are my principle.

গৌরদাস। পিতামাতার প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে তো ?

মধু। আছে। কিন্তু পিতামাতারও তো আমার প্রতি একটা কর্তব্য থাকা উচিত।

গৌরদাস। তার মানে ?

মধু। They should let me go my own way—তাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন—প্রতিপালন করেছেন—ওখানেই তাঁদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। এর পর আমার জীবনের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার ambition অনেক বেশী। I want to go to England—I want to become a great poet—why should I rot in this barbarous Hindu Society of Bengal ?

গৌরদাস। আচ্ছা, তুই একবার বাড়ী ফিরে চল্ তো—মায়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে চ'লে আসিস্।

মধু। অসম্ভব। এখন আমি কোথাও যাব না।

গৌরদাস। কাউকে কিছু না ব'লে এমন ভাবে লুকিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি তোমার।

মধু। গৌর, তুমি বৈষ্ণব তো! তোমাদের চৈতন্যদেব যদি মায়ের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকতেন, খুব ভাল কাজ হ'ত সেটা? **Believe me, my dear Gourdas, the tremendous force which swept him away from home and hearth to something Great has driven me also to Christianity**—একটু বাড়িয়ে বলছি না আমি। পাখী যখন ডিম ফুটে বেরোয় সে কি তখন খোসাটাকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থাকতে পারে? ডানা মেলে আকাশে তাকে উড়তেই হবে—**this is life**

গৌরদাস। **Well, then enjoy life. Good Bye.**

মধু। (আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) না না, রাগ করিস নি ভাই গৌর। তোরাও যদি রাগ করিস, তোরাও যদি আমাকে না বুঝিস, তা হ'লে আমি দাঁড়াব কোথা ভাই? **Let womenfolk or their like say whatever they choose—but why should you!** শোন্, এইটে লিখেছি আজ। **This will be sung on the occasion of my conversion.** ব'স্। ভাল ক'রে শোন্।

পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

1

**Long sunk in Superstition's night**
**By Sin and Satan driven**
**I saw not, cared not, for the Light**
**That leads blind to Heaven.**

2

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me
I hasten'd to Eternity
O'er errors' dreadful sea.

3

But now, at length, Thy grace, O Lord,
Bids all around me shine!
I drink Thy sweet, Thy precious word
I kneel before Thy shrine!

4

I have broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake
All, all I love beneath the skies,
Lord! I for Thee forsake!

গৌরদাস। Can you really forsake?

মধু। মিল দিয়ে কবিতা লেখার তো ঐ গোলমাল ভাই। You are forced to use words which you don't mean to. কেমন হয়েছে লেখাটা? (হাসিলেন)

গৌরদাস। Not bad.

মধু। Don't be sulky Gour, come.

Dr. Corbyn আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই গৌর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

Dr. Corbyn। Tea is ready.

মধু। (গৌরদাসকে) Will you have tea?

গৌরদাস। No, thanks. I shall go now.

**Dr. Corbyn। I hope you will tell his father that we have kept his son as nicely as our means would permit.**

গৌরদাস এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না

গৌরদাস। চললাম তা হ'লে—Good Bye.

Dr. Corbyn ও মধুর সহিত করমর্দন করিয়া চলিয়া গেলেন

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্ত মহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—জাহ্নবী তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন।

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা তো রেখেছি—লেঠেল শড়কিওলা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—হ'ল না তো কিছুই! এ কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলেত গিয়ে খৃষ্টান হ'ত তা হ'লেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হ'ত না—শহরময় এমন ঢি-ঢি পড়ত না। দ্বারিক ঠাকুর, রামমোহন রায়—শহরের দুজন ভদ্রলোক তো বিলেত গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড়, আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ—কি করতে বল আমাকে তুমি?

জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন

হাজার খানেক টাকাও তাকে পাঠিয়েছিলাম যে, খৃষ্টান হতে হয় বিলেত গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও তো সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে? আমি আর কি করব বল? একমাত্র ছেলে হ'লেও খৃষ্টান ছেলে আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুশকিল! কথা বলছ না কেন? কি করতে বল আমাকে তুমি?

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি, কিন্তু ঘরে নিতে পারি না। মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের যত বড় আঘাত দিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্তব্য সে তো করে নি!

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না। ভেবে দেখ—আমাদের কর্তব্যও আমরা করি নি।

রাজনারায়ণ। করি নি? তার জন্যে না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি, তার জন্যে জলের মত অর্থব্যয় করেছি—

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলেছি। মধু যে আজ এমন হয়েছে, তার জন্যে আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা আমি এখন গিয়ে পায়ে ধ'রে তার ক্ষমা চাই ·

জাহ্নবী। না, তার ক্ষমা চাইতে হবে না, তাকেই তুমি ক্ষমা ক'রো—তার ওপর রাগ ক'রে থেকো না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। ( উচ্চতরকণ্ঠে ) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জলপিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে, ধর্ম্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার; কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। ( ব্যাকুলভাবে ) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ। কোথা পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। ( সভয়ে ) মধুকে ডেকে আনতে।

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না - মাপ কর তাকে।

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না। খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্যাদা নষ্ট করেছে, পরকালের সদ্গতির পথ বন্ধ করেছে। সে আমার পুত্র নয়—শত্রু।

আবার উপবেশন করিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে তুমি? আবার তুমি বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ। বিয়ে করব!

জাহ্নবী। আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে, আমার আর ছেলে হবে না। যদি বিয়ে ক'রে আবার তোমার ছেলে হয় আমাদের দুজনেরই ভাল হবে। তুমি আবার বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

রাজনারায়ণ। এ তুমি বলছ কি?

জাহ্নবী। ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি। তা ছাড়া এতে মঙ্গলই হবে। তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি আবার বিয়ে কর—আবার নূতন পুত্র লাভ কর। মধু আমার একারই থাক্—তাকে তুমি ক্ষমা কর শুধু—

রাজনারায়ণ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ক্ষমা কর মানে? কি করতে হবে আমাকে?

জাহ্নবী। তার ওপর রাগ ক'রে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজানারায়ণ। বেশ। তার জন্যে কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের তো স্থান নেই। বিশপ্‌স্ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে। খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি। (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবে তো? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম, ফেরত দিয়েছে। সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ।

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু ক'রে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়তো হিন্দু হতে পারে, কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; সে অনুরোধ আমায় ক'রো না—

উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা, মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথা?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে এলো না। বলছে, ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর—

জাহ্নবী। যা তুই, ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোষাক। মধু আসিয়া জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মধু—মধু—বাবা আমার!

মধু। মা, খুব রাগ করেছ তুমি? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়। আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ ক'রো না।

জাহ্নবী। দুঃখ করব না? তুই বলছিস কি মধু! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না! আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করব না? না হয় বিয়ে তুই না-ই করতিস, খৃষ্টান হতে গেলি কেন?

মধু। খৃষ্টান হওয়া তো কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হতে চাই মা—খৃষ্টান না হ'লে বড় হওয়া যায় না। যীশুখ্রীষ্ট কত বড় লোক ছিলেন তা যদি জানতে তা হ'লে বুঝতে, আমি কোন হীন কাজ করি নি। যিনি পরের জন্যে অনায়াসে—

জাহ্নবী। আমি বুঝতে চাই না বাবা। আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না। তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে ব'সে না খাওয়ালে যে তোর খাওয়া হয় না বাবা! এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই? কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেছিলি—

অশ্রুপাত

মধু। চ্যাপলেন ভনের বাড়িতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি?

জাহ্নবী। আজই চ'লে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা। ওরা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছে, ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার—

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। এখানকার লেখাপড়া শেষ ক'রে নে—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পরে হবে 'খন।

মধু। বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায়?

জাহ্নবী। পাবি কোথায়! এতদিন যেখানে পেয়েছিস সেখানেই পাবি।

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না।

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি আত্মহত্যা করব আমি। (সস্নেহে) ছি বাবা, অমন কথা বলতে নেই। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত? কিসের? কোনও পাপ তো করি নি!

জাহ্নবী। তা না হ'লে সমাজে যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তা ছাড়া আমি বিলেত যাবই, তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি ক'রে? এ সমাজে তো বিলেত-ফেরতদেরও স্থান নেই!

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তা হ'লে?

মধু। অসম্ভব, প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? কি এমন পাপ করেছি?

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার--

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা করতে রাজী আছি; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

জাহ্নবী নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন

কেঁদো না মা। কাঁদছ কেন শুধু শুধু? কেঁদো না—কেঁদো না—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। আমি বড় হতে চাই -আজকাল খৃষ্টান না হ'লে বড় কিছু হওয়া যায় না। অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা, শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না—

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি তো যাই নি কোথাও—শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা তুই ফিরে আয়

উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন—

মধু। আমি এখন চললাম।

জাহ্নবী। এখনই?

মধু। হ্যাঁ।

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্তের তা হ'লে—

মধু। ও-কথা ব'লো না, তা হ'লে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

## প্রথম বিরতি

## সপ্তম দৃশ্য

**রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী কমলমণি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে একটি খবরের কাগজ, কমলমণি কার্পেট বুনিতেছেন।**

জ্ঞানেন্দ্র। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দেবকীর ইচ্ছেটা কি ?

কমলমণি। (মুচকি হাসিয়া) তার তো খুবই ইচ্ছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর বাধাটা কি ? মধুসূদন তো খৃষ্টান হয়েই গেছে। সুতরাং ধর্ম্মত আর কোন বাধাই নেই। তা হ'লে এবার লাগিয়ে দেওয়া যাক বিয়েটা।

কমলমণি। তোমার যে খুব উৎসাহ দেখছি !

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়। ল্যাজ-কাটা শেয়ালের গল্প শোন নি ?

কমলমণি। শুনেছি। তা ল্যাজ নিয়ে থাকলেই পারতে নিজেদের সমাজে, ল্যাজের জন্যে যখন মনে মনে এত আক্ষেপ !

জ্ঞানেন্দ্র। ওই দেখ ! রাগ করলে তো ? নাঃ, খৃষ্টধর্ম্ম তোমাদের মনে এখনও যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে নি দেখছি। তোমরা যে মেয়েমানুষ, সেই মেয়েমানুষই থেকে গেছ।

কমলমণি। তা তো ঠিকই ! কিন্তু একটা কথা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। কথাটা কি ?

কমলমণি। বড় হিন্দুবংশের সন্তান—বিশেষ ক'রে 'রিফরমার' পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে—তুমি যে খৃষ্টান হয়ে গেলে, সত্যি ক'রে বুকে হাত দিয়ে বল দিকি কেবল কি আলোকের জন্যে ?

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়। ফড়িং পর্যন্ত আলোর দিকে ছুটে আসে—আমরা তো মানুষ !

কমলমণি। হিন্দুধর্মে কি আলোকের অভাব আছে বলতে চাও ?

জ্ঞানেন্দ্র। (সামান্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) তুমি ব্যারিস্টারি করবে ?

কমলমণি। ( সবিস্ময়ে ) ব্যারিস্টারি করব মানে ?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার কথা। আমি ভাবছি, আমি ব্যারিস্টারি না প'ড়ে তোমাকে পড়ালে বেশী কাজ হবে।

হাসিলেন

কমলমণি। থাক্, ঢের হয়েছে। এ দেশে মেয়েরা করবে ব্যারিস্টারি ? তা হ'লেই হয়েছে। এমনিই তো তোমাদের গুপ্তকবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখছে তাই নিয়েই তোমাদের কত আন্দোলন, খবরের কাগজে লেখালেখি, মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা! সামান্য ইস্কুলে পড়া নিয়েই এত কাণ্ড—ব্যারিস্টারি করলেই হয়েছে! ( একটু পরে ) ভাগ্যে মিশনারিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে, তাই এ দেশের মেয়েদের বর্ণ-পরিচয় হচ্ছে। চোখ বুজে ভাবছ কি ?

জ্ঞানেন্দ্র। গুপ্তকবির সেই ছড়াটা মনে করছি—দাঁড়াও—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
 কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে—
এ, বি, শিখে বিবি সেজে
 বিলাতি বোল কবেই কবে।
আর কিছু দিন থাক রে ভাই
 পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
 গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বেড়ে লিখেছে কিন্তু—

কমলমণি। তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না যে!

জ্ঞানেন্দ্র। কি কথার ?

কমলমণি। খৃস্টান হয়েছ কেন ? সত্যি ক'রে বল তো!

জ্ঞানেন্দ্র। অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে কে না চায় ?

কমলমণি। ( গম্ভীরভাবে ) বিশ্বাস করি না।

জ্ঞানেন্দ্র। বিশ্বাস না করার হেতু ?

কমলমণি। হেতু খুব স্পষ্ট। তুমি খৃষ্টান হয়েছ আমার জন্যে, আর মধুসূদনবাবু খৃষ্টান হয়েছেন দেবুর জন্যে। আলো-টালো বাজে কথা।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমরাই তো আলো। কি মুস্কিল !

কমলমণি। ভারি খারাপ লাগে আমার।

জ্ঞানেন্দ্র। কি খারাপ লাগে ?

কমলমণি। তোমাদের এই ভণ্ডামি। বাবা কিন্তু খৃষ্টান হয়েছিলেন ধর্মের জন্যে—বিয়ে করার জন্যে নয়।

জ্ঞানেন্দ্র। গুরুজন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না।

কমলমণি। তোমরা সব ভণ্ড।

জ্ঞানেন্দ্র। ( হাসিয়া ) শুধু ভণ্ড—লণ্ডভণ্ড।

পুনরায় কমলমণি কার্পেট এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

কমলমণি। মায়েরই হয়েছে মুস্কিল! তিনি সেকেলে মানুষ—গোঁড়া বামুনের মেয়ে, কিছুতেই তিনি তোমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না। বেশী বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হয় না কিছুতে। বাবা খৃষ্টান হবার পর কিছুদিন তো তিনি আসেনই নি বাবার কাছে—জান তো এ কথা ?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি।

কমলমণি। এখনও তিনি মনে মনে গোঁড়া হিন্দুই আছেন। মা বলছিলেন, মধুসূদন খৃষ্টানই হোক, আর যাই হোক, কায়স্থ তো। সেই জন্যে মায়ের মনোগত ইচ্ছে নয় যে, দেবুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ, ভাগ্যে আমি তা হ'লে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছিলুম বল !

কমলমণি। নিশ্চয়, অন্য জাত হ'লে মা ককখনো বিয়ে দিতে রাজী হতেন না।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার বাবা যে একটি হিন্দু বিধবা যুবতীকে এনে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ক'রে বাড়িতে জিইয়ে রেখেছেন, সেটির গতি কি হবে ?

কমলমণি। শুনছি গোপালবাবু তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। কে—গোপাল মিত্তির—the famous scholar ?

কমলমণি। শুনছি তো। যাই বল বাপু, লেখাপড়াই শেখ আর যা-ই কর তোমরা পুরুষরা ভারি হ্যাংলা!

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাংলা বললে একটু বেশী অবিচার করা হয় আমাদের ওপর। আমরা ঠিক কি জান? যাকে বলে Inquisitive! নতুন কিছু দেখলেই সেদিকে ছুটে যাই—সেটাকে উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় একবার বেলুন উড়েছিল—রবার্টসন সাহেব উড়িয়েছিলেন—উঃ, সেদিনের কথাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে—সারা শহরময় সে কি হৈ-চৈ! হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্‌কা প'ড়ে গেল—ব্যাপার কি—না, একটা বেলুন উড়বে।

কমলমণি। আমাদের বিয়ে করাটা তা হ'লে সেই বেলুন দেখার মত?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে না, তা হ'তে যাবে কেন? কি মুস্কিল! আমাদের স্বভাবটা কি রকম তাই বলছিলাম—

কমলমণি। ( মাথা নাড়িয়া ) বুঝেছি—

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশভূষা হিন্দুভাবাপন্ন। পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। তিনি আসিতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও কমলমণি উঠিয়া দাড়াইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। কমলি! তুই দেখ্ তো মা গিয়ে—চায়ের সব আয়োজন ঠিকমত হ'ল কি না! আমি বাপু পাড়াগাঁয়ে মানুষ, ওসব চা-টা করা আমার ঠিক আসে না। ওঁর তো কলেজ থেকে আসবার সময় হ'ল। ঠিক-ঠাক ক'রে দে মা তুই।

কমলমণি। ( সহাস্যে ) চাকরটাকে বল না—সে তো সব জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী। না বাছা, ওসব অনাচার আমি সইতে পারব না। ম্লেচ্ছ চাকরের হাতে আমি খেতেও পারব না—কাউকে খেতে দিতেও পারব না। কি জাত তার ঠিক নেই!

কমলমণি। মাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

হাসিয়া চলিয়া গেলেন

বিন্ধ্যবাসিনী। তা ছাড়া মেলেচ্ছই হোক আর যাই হোক, আমরা থাকতে চাকরে খাবার তৈরি করবে কেন—কি বল বাবা?

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

বিন্ধ্যবাসিনী। আচ্ছা বাবা, রাজনারায়ণবাবুর ছেলে মধুসূদন তো দেবুকে বিয়ে করতে চাইছে—শুনেছ বোধ হয় সে কথা?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি। মধু ছেলে ভাল।

বিন্ধ্যবাসিনী। তা আমি জানি। কিন্তু শুধু ছেলে ভাল হ'লেই তো চলবে না—আরও অনেক কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, ওরা কায়স্থ। খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, রক্ত তো বদলাবে না! তার পর দ্বিতীয় কথা, খৃষ্টান হওয়ার জন্যে ওর বাপ হয়তো ওকে ত্যাগ করবে। বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি করে ওকে, ওর হাতে কি মেয়ে দেওয়া উচিত হবে?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন তা হ'লে কি ক'রে? আমিও তো বাবার মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টান হয়েছি।

বিন্ধ্যবাসিনী। তোমার কথা আলাদা! কত বড় বংশের ছেলে তুমি! তা ছাড়া তুমি বিলেত যাবে, ব্যারিস্টার হবে। মধু তো ছেলেমানুষ—লেখাপড়াই শেষ হয় নি এখনও ওর। মেয়ের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে!

জ্ঞানেন্দ্র। মধু পড়াশোনায় খুব ভাল—ও ছেলে উন্নতি করবেই। মধুর পড়াশোনার খরচ তো ওর বাবাই দিচ্ছেন। ত্যাজ্যপুত্র করবেন কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী। এখন না হয় খরচ দিচ্ছেন, কিন্তু ধর যদি তাঁর একটি ছেলেই হয়—তখন? বিয়ে যখন করেছেন তখন ছেলে হবেই না বা কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। মধু যে রকম ছেলে ওর ঠিক উন্নতি হবে। উনি যদি বরাবর ওকে পড়ার খরচ দেন—আর দেবেনই বা না কেন—ত্যাজ্যপুত্র করার কোন কথা তো শুনি নি।

বিন্ধ্যবাসিনী। ত্যাজ্যপুত্র করতে আর কত দেরি লাগে—করলেই

হ'ল। কিন্তু আসল কথা কি জান বাবা, আমরা নৈকষ্য কুলীনের বংশ—আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না।

জ্ঞানেন্দ্র। দেবকীর ইচ্ছেটা কি?

বিন্ধ্যবাসিনী। মেয়ে তো মধুকে বিয়ে করবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছেন, কালে কালে কতই যে দেখব বাবা! (সহসা) যাই, দেখি, ওরা কতদূর কি করলে—ওঁর কলেজ থেকে ফেরবার সময় হ'ল। তোমাকে কি চা পাঠিয়ে দেব, না, উনি এলে একসঙ্গে খাবে?

জ্ঞানেন্দ্র। একসঙ্গেই খাব।

বিন্ধ্যবাসিনী চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছনে লম্বা বেণী দুলিতেছে। মেয়েটি রূপসী। স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের কমনীয় চটুলতা তাঁহাকে আরও মনোহারিণী করিয়াছে। তাঁহার হাতে একটি পুস্তক রহিয়াছে—শেলির কাব্যগ্রন্থ।

। বাজি জিতেছি—টাকা দিন। এই দেখুন 'our' রয়েছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি? কই, দেখি?

দেবকী। এই যে দেখুন—

পাঠ করিলেন

We look before and after
And pine for what is not;
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

এই দেখুন স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'our' দু জায়গাতেই আছে।

জ্ঞানেন্দ্র। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এটা কার edition? আমরা যে edition পড়েছিলাম তাতে দুটো 'our' ছিল না। দেখি।

দেখিলেন

দেবকী। বা, যে editionই হোক না—শেলীর কবিতার কথা কি বদলে দেবে? বাজি জিতেছি আমি। টাকা দিন—ওসব চালাকি চলবে না।

জ্ঞানেন্দ্র। নাও, উপায় কি!

পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন

দেবকী। (উৎফুল্লকণ্ঠে) কেমন হারিয়ে দিলাম! ভারি যে তর্ক করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে!

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) আসল কথাটা বলি এবার তা হ'লে?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাব আমি আগেই জানতাম।

দেবকী। বাঃ, তা হ'লে বাজি রাখতে গেলেন কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাওয়ার জন্যে। শালীর কাছে হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা বিরাট আনন্দ আছে—তা তুমি কি বুঝবে! **That lift of your brow and tilt of your tone, the flickering smile on those naughty lips**—এ সবের দাম যে পাঁচ টাকার চেয়ে ঢের বেশী তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মধু **would appreciate me.**

দেবকী। যান, ভারি অসভ্য আপনি!

জ্ঞানেন্দ্র। হায়, সত্যিই যদি অসভ্য হতাম! এই সুসভ্য খৃষ্টানধর্মের একটা মহা দোষ কি জান?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এতে বহু-বিবাহ করতে দেয় না।

দেবকী। কেন, দিলে কি করতেন আপনি? বহু-বিবাহ করতেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বহু না করি—অন্তত আর একটা তো করতামই। মধুকে তা হ'লে কি ঘেঁষতে দিই তোমার কাছে!

দেবকী। যান, ভারি অসভ্য আপনি! এই নিন আপনার টাকা—চাই না।

টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহিত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহন পাদরীর পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। মধুসূদনের অঙ্গে কিন্তু অতিশয় চটকদার পরিচ্ছদ। সাদা সিল্কের কাবা—তদুপরি নানা কারুকার্যখচিত রঙীন শালের রুমাল। মাথায় উকিলদের ন্যায় শালের পাগড়ি। শালের রুমাল ও শালের পাগড়ি—বহুবর্ণ-বিচিত্রিত। নানারঙে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন। (সহাস্যে) দেখ, মধুর কীর্তি দেখ!

জ্ঞানেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ বেশ কেন? **What is this?**

মধু। (সগর্বে) **Why? This is our own national dress!** আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এই পোষাকই পরে। আমাকে **collegiate costume** যদি পরতে না দেওয়া হয়—**I must put on our own dress. I think there is no harm in it.**

কৃষ্ণমোহন। **There is much harm. College is not the place for displaying your fancy dress.**

জ্ঞানেন্দ্র। ব্যাপার কি!

কৃষ্ণমোহন। ও কিছু নয়—ব্যাপার মিটে গেছে। **It is one of his whims**—আর কি! (হাসিলেন) মধু, ব'স—চা খেয়ে যেও। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া) **Well, what's up?**

মধু। **Look at the cheek of Dr. Whithers—our Principal!** বলে কিনা—তুমি নেটিব ক্রিশ্চান, তুমি কালো ক্যাসক্ অর্থাৎ **European collegiate costume** প'রে আসতে পাবে না—তোমাকে সাদা ক্যাসক্ পরতে হবে। **Damn it. I told him straight that either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on our national dress. I won't be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College.**

জ্ঞানেন্দ্র। **Right you are**—তুমি এই পোষাকেই কলেজে গেছলে নাকি আজ ?

মধু। **Oh yes, and there was a sensation !**

জ্ঞানেন্দ্র। **Very interesting**—কি হ'ল শেষ পর্যন্ত ?

মধু। **I think the authorities had to yield. Collegiate costume** পরতে দিতে রাজী হতে হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। ( মধুর পিঠ চাপড়াইয়া ) বাঃ, এই তো চাই !

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। ভেতরেই চা দেওয়া হয়েছে—মা আপনাদের আসতে বললেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। রাজপুত্র! দেখছ কি? রূপকথার **real** রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে। ( মধুর প্রতি ) পক্ষীরাজটা কোথা রেখে এলে বন্ধু ?

মধু। ( সবিস্ময়ে ) রেখে আবার আসব কোথায়! পক্ষীরাজ কি আস্তাবলে থাকে নাকি! সে থাকে এইখানে—( বুকে টোকা দিলেন ) **whether** পক্ষীরাজ **is carrying me or I am carrying** পক্ষীরাজ **that is a problem indeed.**

জ্ঞানেন্দ্র। সাধু, সাধু! তোমরা নিভৃতে তা হ'লে একটু বিস্রম্ভালাপ কর—আমি অপসৃত হয়ে পড়ি। ওখানে তো বিশেষ সুবিধে হবে না।

হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

মধু। কেমন দেখাচ্ছে বল তো আমাকে এই পোষাকে ?

দেবকী। সুন্দর মানিয়েছে, সত্যি রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছে।

মধু। **I wonder when my princess will awake !**

দেবকী। শিগ্‌গির চল, ভারি লজ্জা করছে আমার—

মধু। তোমার লজ্জা-লজ্জা মুখখানি ভারি সুন্দর দেখায়। আজ

কুমারস্বামীর কাছে কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ছিলাম। তোমাকে দেখে তার দু লাইন মনে হচ্ছে—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

দেবকী। (হাসিয়া) আমি চললাম তা হ'লে।

মধু। না, যেও না, শোন—

দেবকী। কি?

মধু। কাল আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন দিগন্তবিস্তৃত এক মহাসাগর, তার বুক ভেদ ক'রে উঠেছে গগনচুম্বী এক বিশাল মর্মর প্রাসাদ। সেই মর্মর প্রাসাদের মিনারে দাঁড়িয়ে আমি যেন দূর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছি, আরও দূরে কি আছে—হঠাৎ তুমি পাশে এসে দাঁড়ালে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তোমার গ্রীক পোষাক দেখে। আগাগোড়া গ্রীক পোষাক প'রে আছ। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না,—যেন তুমি দেবকী নয়, আর কেউ। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে, উত্তর দিলে—আমি Sapho.

দেবকী। (হাসিয়া) সে আবার কে?

মধু। Greek poetess Sapho—নাম শোন নি?

দেবকী ইহাতে একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন

দেবকী। তারপর কি হ'ল?

মধু। পাশাপাশি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে। হঠাৎ দেখি জ্বলজ্বল ক'রে সামনেই Saturn উঠছে—এত কাছে যে তার তিনটে band, তার চাঁদগুলো সব দেখা যাচ্ছে—(সহসা আবৃত্তির সুরে)

From the west rose six moons hand in hand
Like a soft band of beauties—blushing—fair
Oh, how their beams did brighten the scene.

দেবকী। চমৎকার স্বপ্ন তো! তারপর কি হ'ল? ঘুম ভেঙে গেল?

মধু। তারপর যা হ'ল তা আরও অদ্ভুত। It was amazing.

হঠাৎ দেখি তুমি যেন রামধনু রঙের পাখা মেলে উড়ে চ'লে যাচ্ছ দূর আকাশের দিকে। কত ডাকলাম, ফিরেও চাইলে না তুমি—(সহসা) আচ্ছা, আমাদের বিয়ের কি হ'ল তা তো জানতে পারলাম না এখনও কিছু—

দেবকী। (মুচকি হাসিয়া) শুনলাম তুমি কায়স্থ ব'লে মা আপত্তি করছেন।

মধু। **Really !** কায়স্থ বলে ? **Aren't we Christians ?**

দেবকী মা ভয়ানক গোঁড়া যে।

মধু। **But this won't do.** আমি আজই তোমার বাবাকে বলব।

দেবকী। আমার সামনে ব'লো না যেন। ভারি লজ্জা করবে আমার। তুমি এস, আমি চললাম—

চলিয়া গেলেন

মধু। শোন—শোন—দেবকী—একটা কথা—

দেবকী। (নেপথ্য হইতে) এখন নয়—পরে। তুমি এস—

ক্ষুব্ধ মধু দেবকীর অনুসরণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে গৌরদাস বসাক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। Hallo—গৌর—হঠাৎ এ সময় ?

গৌর। **I hope you will excuse this intrusion into your Heaven, my friend.** কলেজে গিয়ে তোমার খোঁজ না পেয়ে শেষে এখানে এলাম—শুনলাম তুমি রেভারেণ্ড ব্যানার্জির সঙ্গে এই দিকেই এসেছ।

মধু। **I am glad to see you Gour.**

গৌর। কিন্তু এ কি বেশ! এই পোষাকেই কলেজে যাও নাকি আজকাল ? অথবা দেবী-আরাধনার জন্যেই এ বৈচিত্র্য !

মধু। **Leave my dress alone**—সে অনেক কথা—পরে বলব। বাড়ীর খবর কি ? খিদিরপুরে গিয়েছিলে আর ?

গৌর। হ্যাঁ, প্রায়ই যাই। তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন, শুনছ তো?

মধু। শুনেছি। মা কেমন আছেন?

গৌর। Need you ask that? তিনি বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত। মায়ের কথা থাক্ এখন, তোমার এদিককার খবর কি? Are yon seriously in love with Miss Banerjee? Are you really going to marry her?

মধু। Love? Well—

Shrugh করিলেন

গৌর। Are you not yet sure about your love?

মধু। I am not sure about anything, Gour; আমি আমার মনের অবস্থা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। (সহসা তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া) ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়? আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals have treated me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল, but now they are very cold about it. But go to England I must.

গৌর। খৃষ্টান হয়ে লাভ হয়েছে বল!

মধু। লাভ যে হয় নি তা নয়—I have come in contact with eminent scholars—I am studying Greek, Latin and Sanskrit; কিন্তু শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই। আবার হিন্দু হওয়া যায় না! কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। That's a degrading process.

গৌর। ওসব কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই।

মধু। I know.

খানসামা-জাতীয় একটি ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সাহেব ডাকছেন।

মধু। হ্যাঁ, যাচ্ছি—যাও তুমি।

ভৃত্য চলিয়া গেল

গৌর। তা হ'লে তুমি যাও—আমি আর একদিন আসব।

মধু। আসিস—নিশ্চয় আসিস—please don't forget.

গৌর। আসব। যাই এখন—Good-bye. (মুচকি হাসিয়া) Wish you all success with Miss Banerjee.

সাহেবী কায়দায় করমর্দন করিয়া গৌরদাস বিদায় লইতেছিলেন, এমন সময় মধুসূদন তাঁহাকে আবার ডাকিলেন—

মধু। গৌর, শোন্ ভাই।

গৌর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি?

মধু। তুই মাকে একটু দেখিস ভাই—বুঝিয়ে বলিস—যাস মাঝে মাঝে—বুঝলি?

গৌর। আচ্ছা—

গৌরদাস চলিয়া গেলেন। মধুসূদন তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

## অষ্টম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ির বৈঠকখানা। বৈঠকখানা-গৃহের প্রকাণ্ড মেঝেতে বিস্তৃত ফরাস বিছানো। বাইনাচ হইতেছে। দত্ত মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরাপানের সমস্ত সরঞ্জাম ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। আতর-দান, গোলাপ-পাশ, পানের বাটা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিসই বর্তমান। একজন মুসলমান বাইজি নৃত্যসহযোগে একটি উর্দু গান গাহিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। 'কেয়াবৎ' 'বাহবা' প্রভৃতি উৎসাহবাণী দ্বারা সকলেই গায়িকাকে সম্বর্ধিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে

না। তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নাচগান হইবার পর গায়িকা উপবেশন করিল। দুই-একজন তাহাকে রুমালে টাকা বাঁধিয়া 'প্যালা' দিলেন।

১ম ভদ্রলোক। (এক পাত্র পান করিয়া) যাই বল দাদা, এর কাছে থিয়েটার-ফিয়েটার কিছু লাগে না—যদিও আজকাল থিয়েটার একটা ফ্যাশান বটে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ—কিসে আর কিসে!

রাজনারায়ণ। আমার তো এই বেশী ভাল লাগে।

১ম ভদ্রলোক। এতে একটা সত্যিকারের খাঁটি প্রাণ রয়েছে—নকল কিছু নেই। আর থিয়েটারের হ'ল সবটাই নকল। থিয়েটারের চেয়ে কবির লড়াই ঢের ভাল। দাশু রায় মাৎ ক'রে দেয়।

৩য় ভদ্রলোক। তা ছাড়া আমাদের ভাল নাটক কোথা? শুঁড়োর বাগানে সেবার প্রসন্ন ঠাকুর থিয়েটার করালেন—নাটক উত্তররাম-চরিত—অনুবাদ করেছেন শুনলাম কে এক উইলসন সায়েব!

২য় ভদ্রলোক। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলে সায়েবে—তার অভিনয় হ'ল শুঁড়োতে—হা—হা—হা—

রাজনারায়ণ। কিন্তু সাহেবদের নিজেদের যে থিয়েটারটা আছে সেটা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। হতে পারে ভাল, কিন্তু ওসব ইংরিজি-মিংরিজি শুনে তেমন জুৎ হয় না ভায়া। অর্থাৎ ঠিক কি রকম জান? অপরকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার মত, অর্থাৎ সে যদি ঠিক জায়গাটাতে চুলকোতে না পারে সে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, এ অনেকটা তাই—সেজেগুজে সব আসছে যাচ্ছে হাত-পা নাড়ছে—বোঝা যাচ্ছে না অথচ কিছুই। ও আমাদের পোষায় না।

৩য় ভদ্রলোক। যাক, আর বাজে কথায় কাজ কি! বিবিজান, তুমি আর একটা শুরু কর। কি বলেন দত্ত মশায়?

রাজনারায়ণ। বেশ তো, হোক না আর একখানা।

দত্ত মহাশয় আর এক পাত্র পান করিলেন। সারেঙ্গীবাদক ও তবলচি সুর মিলাইতে লাগিল। বাইজি অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান ধরিয়াছে, ঠিক এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে সবেগে রঘু নামক ভৃত্যটি আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। বাবু, শিগ্‌গির ভেতরে চলুন—মা মূর্ছা গেছেন।

রাজনারায়ণ। কে? বড় বউ?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। কি হ'ল আবার! যা, আমি আসছি। (অতিথিগণের প্রতি) আপনারা তা হ'লে বসুন একটু—আমি আসছি এখুনি।

আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। বাড়ির ভিতর হইতে শশব্যস্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন দুর-সম্পর্কের আত্মীয়।

এ কি, তুমি কখন এলে?

আত্মীয়। খানিকক্ষণ হ'ল এসেছি। আপনি একবার চলুন ভেতরে, মধুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

রাজনারায়ণ। এ তো একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল দেখছি!

রাজনারায়ণ ও দুর-সম্পর্কের আত্মীয়টি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

১ম ভদ্রলোক। এঃ, এ তো ভারি রসভঙ্গ হ'ল হে!

২য় ভদ্রলোক। অসুখের ওপর তো আর হাত নেই!

৩য় ভদ্রলোক। রাজনারায়ণবাবু কেমন মন-মরা হয়ে আছেন দেখেছ? এমন একটা মাইফেলি লোক, কেমন যেন হয়ে গেছেন!

১ম ভদ্রলোক। শুধু মাইফেলি নয়, জিদ্দিও বলতে হবে। বাড়ীতে এমন ঘন ঘন বাইনাচ করানোর 'মানে—লোককে দেখানো যে ছেলে খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, কিচ্ছু কেয়ার করি না আমি।

২য় ভদ্রলোক। মদের মাত্রাটা বেশ বাড়িয়েছেন কিন্তু।

১ম ভদ্রলোক। বাড়াবে না—বল কি! হাজার হোক ছেলে তো! ছেলে ব'লে ছেলে—ছেলের মতন ছেলে। ছেলে হবার আশায় আরও

দু-দুবার বিয়ে করলেন, কিন্তু সেদিকেও তো বিশেষ আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মদের মাত্রাটা বাড়বে বইকি।

৩য় ভদ্রলোক। শুনেছি নাকি ওঁর প্রথম স্ত্রী অভিশাপ দিয়েছেন যে, যতই না কেন উনি বিয়ে করুন, ছেলে আর হবে না ওঁর।

১ম ভদ্রলোক। ওসব বাজে কথা। (মদ্যপান) তুমি থামলে কেন বিবিজান—চলুক না ততক্ষণ—বাবুজি আসছেন এখুনি।

বাইজি আবার গান শুরু করিতে যাইতেছে, এমন সময় রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। বাবু এখন গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বললেন—অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

১ম ভদ্রলোক। তাই নাকি!

২য় ভদ্রলোক। তা হ'লে তো উঠতে হয়।

৩য় ভদ্রলোক। এঃ, এমন আসরটা মাটি হ'ল!

১ম ভদ্রলোক। (বাইজির প্রতি) আর একদিন হবে, আজ চললাম তা হ'লে—আদাব!

বাইজি। আদাব—

প্রথমে ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে সকলে বাইজির নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে বাইজিও সদলবলে প্রস্থান করিল। রঘু জিনিসপত্র সরাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একটু পরেই রাজনারায়ণবাবু ও সেই আত্মীয়টি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজনারায়ণ। মূর্ছা তো ভেঙে গেল—এদের না যেতে বললেই হ'ত! হ্যাঁ, মধুর কথা কি বলছিলে তুমি? ওরে, তামাক দে—

রঘু আলবোলাটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতেই আত্মীয়টিও অদূরে উপবেশন করিলেন।

আত্মীয়। মধুর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনি, তাতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ওকে আপনার একটু সাবধান করা দরকার।

রাজনারায়ণ। কি শোন তার সম্বন্ধে?

আত্মীয়। সে সব এমন কথা যে, উচ্চারণ করাই শক্ত।

রাজনারায়ণ। যে কথা উচ্চারণই করতে পারবে না সে কথা বলতে এসেছ কেন?

আত্মীয়। মানে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর কি!

রাজনারায়ণ। সে তো আর নতুন কথা নয়—ও তো চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল—এটা উচ্ছৃঙ্খলতারই যুগ।

আত্মীয়। তবু সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা দরকার তো!

রাজনারায়ণ। উচ্ছৃঙ্খলতা জিনিসটা আপনিই কিছুদিন পরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ও নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করাটা বোকামি।

আত্মীয়। তবু—

রাজনারায়ণ। (একটু বিরক্তভাবে) এ নিয়ে তোমার এত শিরঃপীড়া কেন?

আত্মীয়। আমাদের তো শুনতে হয়—লোকের মুখ তো বন্ধ করা যায় না।

রাজনারায়ণ। নিজের কান বন্ধ করলেই পার—কানে তুলো দিয়ে থাকলেই হয়। আমাকে এসে বলছ কেন? আমি কি করতে পারি?

আত্মীয়। বাঃ, আপনি না পারলে আর পারবে কে?

রাজনারায়ণ। না, আমি পারব না। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর তোমরা যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তা হ'লে তো পাগল হয়ে যাব আমি।

আত্মীয়। কি মুশকিল! আপনাকে বিরক্ত করাই কি আমার উদ্দেশ্য নাকি! মধুর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত জিনিস শুনছি, সেটা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি। মধু যে এ সব ক'রে বেড়াচ্ছে সে তো আপনার অর্থেই।

রাজনারায়ণ। ( সক্রোধে ) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অর্থেই। আমার টাকা আছে, আমার ছেলেকে যত খুশী দেব এবং সে যেমন খুশী তা খরচ করবে। তোমার তাতে কি?

আত্মীয়। ( সক্ষোভে ) আমার কিছুই নয়, আপনাদেরই ভালর জন্তে বলা।

রাজনারায়ণ। না, আমার ভাল করতে হবে না তোমাকে—এ রকম হিতৈষণা বরদাস্ত হবে না আমার। ও নিয়ে আর কোন কথা ব'লো না আমাকে।

আত্মীয়। (এইবার একটু চটিয়াছিলেন) সমাজে থাকতে গেলে এসব শুনতে হবে বইকি। তা ছাড়া, আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার। মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু নাকি সে বাড়ীতে যাতায়াত করে, আপনাদের সঙ্গে একই বাসনপত্রে খাওয়াদাওয়া সবই চলে—এ নিয়ে অনেকে—

এইবার রাজনারায়ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল

রাজনারায়ণ। তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় হে! বাড়ীচড়াও হয়ে উপদেশ দিতে এসেছ! আমার ছেলে আমার বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া করবে না তো কার বাড়ীতে করবে? এ নিয়ে কে কি বলছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবসর আমার নেই। তা ছাড়া দুশ্চিন্তাই বা কিসের? এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজের মেরুদণ্ড ব'লে কিছু আছে নাকি! যার টাকা তারই সমাজ। টাকা সম্প্রতি আমার যথেষ্ট আছে, সুতরাং কোন ব্যাটার তোয়াক্কা করি না আমি। যাও, তুমি আমায় বিরক্ত ক'রো না।

আত্মীয়। না, বিরক্ত করব কেন! পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আপনার ভাল যদি না লাগে আমি আর কি করব বলুন! সত্য সর্বদাই অপ্রিয়—

রাজনারায়ণ। এ ছাড়া তোমার আর যদি কোন বক্তব্য না থাকে তুমি যেতে পার।

আত্মীয়। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হ্যাঁ, যাব বইকি—আপনার বাড়ীতে থাকতে আমি আসি নি, থাকবার প্রবৃত্তিও নেই।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ চিন্তিতমুখে আলবোলায় টান দিতে

লাগিলেন। একটু পরেই মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাহেবী পোষাক, ফ্রক কোট—বিভার হ্যাট—মুখে চুরুট।

মধু। **Good evening, father. How do you do ?**

রাজনারায়ণ দুই-তিনবার তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন

রাজনারায়ণ। মধু, শুনছি তুমি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছ।

মধু। ( সবিস্ময়ে ) বাড়াবাড়ি! **What do you mean ?**

রাজনারায়ণ। ( সজোরে ) **I mean** বাড়াবাড়ি—বাংলা ভুলে গেছ না কি ?

মধু। **Excuse me**—বুঝতে পারছি না ঠিক।

রাজনারায়ণ। তা পারবে কেন! অথচ তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল!

মধু। উচ্ছৃঙ্খলতা! **Well, I have done nothing unusual recently**—আমি মদ খাই—সে আপনি জানেন। পোষাকপরিচ্ছদ বিষয়ে হয়তো আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, **I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penny too much perhaps on dress !** এর বেশী তো আর কিছু করি না।

রাজনারায়ণ। তবে তোমার নামে আত্মীয়েরা নানা কথা বলে কেন ?

মধু। **Because they are heathen rascals.**

এই কথায় রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। **Heathen racals !**—খৃষ্টান হয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তো দেখছি! **Don't you know, you swine, that all your Christian glare has been bought by money earned by your heathen father ?**

মধু। ( অপ্রতিভ ) **I am sorry father—I withdraw it.**

রাজনারায়ণ। **Withdraw it !** এসো না আর এ বাড়ীতে। তোমার

টাকা—the only tie between you and me now—I shall send. আস কেন এখানে ?

মধু। আসি মাকে দেখতে।

রাজনারায়ণ। যখন খৃষ্টানই হয়ে যেতে পেরেছ, তখন মায়ের প্রতি অত টান কেন ? She is heathen too !

মধু। আমি ছাড়া এখন আর মায়ের কেউ নেই।

রাজনারায়ণ। তার মানে ?

মধু। তার মানে তো আপনার জানা উচিত। শুনলাম আপনি আবার নাকি বিয়ে করবার আয়োজন করছেন !

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। বিয়ে আমি ক্রমাগত ক'রে যাব যতক্ষণ না আমার আবার ছেলে হয়।

মধু। কেন, আমি কি আপনার ছেলে নই ?

রাজনারায়ণ। ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন তুমি আমার কেউ নও। A Christian son is no good to a Hindu father—a heathen father !

রঘুর পুনঃপ্রবেশ

রঘু। মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন।

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

রাজনারায়ণ। তুই যা, যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

রাজনারায়ণ। You need not be anxious for a heathen woman.

তাঁহার পথ রোধ করিলেন

মধু। আমাকে যেতে দেবেন না ভেতরে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। যেতে দিন আমাকে—

রাজনারায়ণ। (চিৎকার করিয়া) না—না—না—যেতে দেব না। Out you go.

দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। মধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

## নবম দৃশ্য

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ড্রয়িং-রুম। সন্ধ্যাকাল। ঘরের এক কোণে দেবকী অর্গানে একটি ইংরাজী গৎ বাজাইতেছেন। মধুসূদন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা শুনিতেছেন। মধু কিন্তু কেমন যেন অস্থির হইয়া রহিয়াছেন—মাঝে মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে খানিকক্ষণ পায়চারি করিতেছেন। আবার বসিতেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বাজনা শুনিতেছেন, আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি। মধুর পরিধানে সাহেবী পোষাক—রীতিমত স্যুট। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঢিলা পায়জামা পরিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাজাইবার পর দেবকী থামিলেন ও অর্গান হইতে উঠিয়া আসিলেন। দেবকীও বেশ সুসজ্জিতা।

মধু। Splendid!

দেবকী। এটা এখনও perfect হয় নি—নতুন শিখেছি এটা। আপনারা বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আনি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) You are rather impatient to-day Madhu! ব্যাপারটা কি?

মধু। There is a limit to my patience, I am tired of waiting.

জ্ঞানেন্দ্র। কেন, wait করলে ভালবাসা শুকিয়ে যায় নাকি?

মধু। (সহসা) You know, the gentleman who gave me hopes about England has backed out now. I have been cheated outright! এ ব্যাপারেও আমার সেই দশা হবে—শুনছি নাকি

দেবকীর মা এখন বলছেন যে আমি কায়স্থ—আমার হাতে মেয়ে দেবেন কি ক'রে! **How ridiculous!**

জ্ঞানেন্দ্র। ও কিছু নয়। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি যদি মত করেন সব ঠিক হয়ে যাবে। **You just tell him.**

মধু। তাঁকে বলেছি অনেকবার। কিন্তু তিনি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলেন না। তাঁকে বললেই বলেন—**I shall think about it to-morrow.**

**To-morrow and to-morrow and to-morrow,**
**Creeps in this petty pace from day to day.**

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেবকী আসিতেই মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। বন্ধ করলে কেন? চলুক।

মধু। না, তার চেয়ে **let us have some music.**

জ্ঞানেন্দ্র। বেশ। **If it so pleases you**—দেবকী, শুরু কর। দিদি কোথা?

দেবকী। দিদি কাট্‌লেট্ ভাজছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। অর্থাৎ তিনি আর এক প্রকার রস-সৃষ্টি করছেন—**fine!** মা ফেরেন নি এখনও?

দেবকী। না।

মধু উঠিয়া আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। রেভারেণ্ড ব্যানার্জিও লাইব্রেরিতে, সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। মধু তোমাকে কিন্তু **recitation** করতে হবে। হিন্দু কলেজে তোমার **recitation**-এর নাম ছিল খুব। নাও দেবকী, শুরু কর।

দেবকী একটু মুচকি হাসিয়া অর্গানে গিয়া বসিলেন ও আর একটি গৎ শুরু করিলেন

আরে, শুধু নিরামিষ বাজনা ভাল লাগে! গানও হোক না একখানা।

দেবকী ঘাড় ফিরাইয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন ও তৎপরে একটি ইংরাজী গান ধরিলেন। মধু পদাচারণা করিতে লাগিলেন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মনোনিবেশ করিলেন। গান শেষ হইলে মধু কথা কহিলেন—

মধু। Fine!

জ্ঞানেন্দ্র। এইবার তুমি একটা শোনাও ভাই।

মধু। কি শোনাব?

জ্ঞানেন্দ্র। যা তোমার খুশি। তোমরা পরস্পরকে যা শোনাবার শুনিয়ে যাও, আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র!

হাসিলেন

মধু। আমার যা খুশি! আচ্ছা, শুনুন তবে—**Quispuss es, haud oredo invisus caelestibus aur as—**

জ্ঞানেন্দ্র। আরে থাম, থাম—এ কি!

মধু। **This is Latin—Æneid of Virgil.**

জ্ঞানেন্দ্র। সর্বনাশ! দরকার নেই ওতে। বাংলায় কিছু বল।

মধু। বাংলায়? **Is there anything worth reciting in Bengali? Do you want me to recite from** পাঁচালি?

হাস্ত

দেবকী। (জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে) মিল্‌টন্ থেকে কিছু বলতে বলুন না ওঁকে—

জ্ঞানেন্দ্র। আপনিই বলুন না মশায়।

মধু। **Milton?**

জ্ঞানেন্দ্র। এমন একটা কিছু বল ভাই, যে, বুঝিতে পারি।

মধু পিছনে দুই হস্ত নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—

মধু। শোন তা হ'লে—**This is from Paradise Lost. Exile from Eden—**

**High in front advanced**
**The brandished sword of God before them blazed**
**Fierce as a comet; which with torrid heat**
**And vapour as the Libyan all adust.**

Began to parch that temperate clime whereat
In either hand the hast'ning angles caught
Our lingering parents, and to the eastern gate
Led them direct, and down the Cliff as fast
To the subjected plain ; then disappared.
They looking back at th' eastern side beheld
Of Paradise, so late their happy seat.
Waved over by that flaming brand the gate
With dreadful faces thronged and fiery arms ;
Some natural tears they dropped, but wiped them soon
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide.
They, hand in hand, with wand'ring steps and slow
Through Eden took their solitary way.

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পাদরীর পরিচ্ছদ—বগলে দুইখানি বই ও একটি ফাইল। তিনি মধুকে দেখিয়া একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন ও তাহার পর পাদরীর শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিয়া মস্তকের টাকে একবার হাত বুলাইলেন। তৎপরে দেবকীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

কৃষ্ণমোহন। এগুলো নাও তো মা। ফাইলটা ভাল ক'রে ধর—loose কাগজপত্র আছে ওতে—'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ফাইল ওটা।

দেবকী কাগজপত্র লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেবকী চলিয়া গেলে কৃষ্ণমোহন মধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

মধু, I want to speak to you privately.

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দিকে চাহিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। ( উঠিয়া দাঁড়াইলেন ) আপনারা এইখানেই কথাবার্তা বলুন, আমি ভিতরে যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

মধু। ( সবিস্ময়ে ) কি বলবেন আমাকে ?

কৃষ্ণমোহন। তুমি কাল কলেজে কি করেছ ?

মধু। কলেজে ? কখন ?

কৃষ্ণমোহন। কলেজে ঠিক নয়, খাবার সময়।

মধু। Oh. I see.

কৃষ্ণমোহন। I hope you are ashamed.

মধু। Ashamed ? Why ? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়ার নিয়ম—that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share ?

কৃষ্ণমোহন। He did not refuse—মদ আর ছিল না—that is a fact—ফুরিয়ে গিয়েছিল।

মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল ? সাহেবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায় ? I won't tolerate this injustice. I am simply fed up with the distinction they make between black skin and white skin.

কৃষ্ণমোহন। তাই ব'লে তুমি খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার ক'রে উঠে আসবে ?

মধু। I repent I did not smash the head of that rascal.

কৃষ্ণমোহন। I hardly expected such unchristian manners from you, Madhu. আর একটা কথা শুনলাম, তুমি নাকি বই বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কর ?

মধু। Yes, I do—but I need a lot of money to live like a gentleman there.

কৃষ্ণমোহন। ( মাথা নাড়িয়া ) You will be in deep waters if you do not check yourself, boy.

মধু। (হঠাৎ) আমি একটা কথা আপনাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই—

কৃষ্ণমোহন। কি কথা?

মধু। আমি যখন ক্রিশ্চান হই নি তখন যাঁরা আমায় আশা দিয়েছিলেন যে, ক্রিশ্চান হ'লে আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবেন এখন তাঁরা সবাই স'রে দাঁড়িয়েছেন। আমার ক্রিশ্চান হওয়ার আর একটা কারণ ছিল—**I wanted to marry your daughter** দেবকী; **you knew it and gave me hopes. May I know when are we going to be married?**

কৃষ্ণমোহন। সমস্ত দেখে-শুনে তোমার সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়েছি।

মধু। হতাশ হয়েছেন? কেন?

কৃষ্ণমোহন। **To be very candid**—তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া খিদিরপুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল এখনি—তিনি বললেন, তোমার বাবা নাকি তোমার খরচ দেওয়া বন্ধ করবেন! **Naturelly I cannot marry my daughter with a thoughtless and penniless young man. You drink too much.**

মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল।

মধু। **May I ask you one questions, sir? Are you not a disciple of the famous Derozio? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and were turned out of your own home?** আপনি আমাকে বলছেন—উচ্ছৃঙ্খল মাতাল!

কৃষ্ণমোহন। মদ খাওয়া মানেই মাতাল হওয়া বা উচ্ছৃঙ্খল হওয়া নয়।

মধু। ওসব তর্ক যাক। আমি জানতে চাই দেবকীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন কি না?

কৃষ্ণমোহন। দিতে পারি, যদি **solemnly promise** কর যে, জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না।

মধু। **I am too green a Christian yet to make such a false promise. Then, this is final?**

কৃষ্ণমোহন। **It is.**

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দেবকী। বাবা, আপনি কাপড় বদলাবেন না?

কৃষ্ণমোহন। হ্যাঁ, চল যাই।

মধুসূদন নিমেষের জন্য দেবকীর দিকে একবার তাকাইলেন। কি যেন তাঁহাকে বলিতে গেলেন, তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া টেবিল হইতে বিস্তার হ্যাটটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

মধু। চললাম তা হ'লে—**Good night.**

চলিয়া গেলেন। পিতা-পুত্রী পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

## দ্বিতীয় বিরতি

## দশম দৃশ্য

মাদ্রাজে ইয়োরোপিয়ান পদ্ধতিতে সজ্জিত একটি কক্ষে একা বসিয়া মধুসূদন একমনে লিখিতেছেন। বাহিরে কপাটে শব্দ হইল।

মধুসূদন। **Damn it!** কে আবার এল এখন! বয়—

একটি মাদ্রাজী ভৃত্য প্রবেশ করিল

**Somebody is knocking.**

ভৃত্য চলিয়া গেল। মধুসূদন অর্ধস্বগতোক্তি করিলেন

রেবেকা বাইরে গেছে, ভাবলুম এই সময়ে খানিকটা লিখে ফেলি। তা আর হ'ল না দেখছি।

মাদ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী নটবর ঘোষের প্রবেশ

নটবর। মিস্টার দত্ত বাড়িতেই আছেন দেখছি।

মধু। ( হাসিয়া ) Can't help it.

নটবর। গির্জায় যান নি যে! আমি ভাবছিলাম—

মধু। আমার সহধর্মিণী গেছেন, তাতেই আমার কাজ হবে। এমন অসময়ে আপনার আগমনের কারণ?

নটবর। বাংলাদেশের একটা সুসংবাদ পেলাম তাই বলতে এসেছি। 'হরকরা' পড়েছেন?

মধু। না। কি সুসংবাদ?

নটবর। টমসন সায়েবের বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি আর দ্বারিক ঠাকুরের Bengal Landholders' Association—এই দুটো amalgamated হয়ে British Indian Association হ'ল।

মধু। ও, এই সুসংবাদ!

নটবর। সুসংবাদ নয়? সাহেবেরা Black Act-এর ব্যাপারে চ'টে আমাদের রামগোপাল ঘোষকে Agri-horticultural Sooiety-র সহকারী সভাপতির পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে তিনি তার শোধটা তুললেন। সুসংবাদ নয়,—বলেন কি আপনি?

মধু। চমৎকার সংবাদ! আপনি বসবেন?

নটবর। বলেন তো বসি।

মধু। না, বলব না। বরং আপনি যদি যান সুখী হব।

নটবর। কি হ'ল আপনার? হঠাৎ এত রাগের কারণটা কি?

মধু। And wanderer of the wood-এর পরের লাইনটা কি হবে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা এখন অসহ্য।

নটবর। ও, লিখেছেন বুঝি! কি লিখছেন?

মধু। Captive Lady.

নটবর। ও যেটা 'সারকুলেটারে' বেরুচ্ছে?

মধু। 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখছি বটে, কিন্তু কেমন চমৎকার বাংলা বলছি দেখছেন! নিজের ভাষাতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ভাগ্যে এখানে এসে বসন্ত হয়েছিল!

নটবর। ভাগ্যে বসন্ত হয়েছিল মানে?

মধু। তাই আপনি সেবা করতে এলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল আর তাই বাংলা কথা ক'য়ে বাঁচছি। বাংলা ভাষা ভুলে যেতাম না হ'লে এতদিনে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠাতে গৌরকে লিখেছি কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু তার কোন সাড়াশব্দ নেই। সেইজন্যে আপনার রামগোপাল ঘোষের কীর্তি-কাহিনী শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তত উৎসাহ পাচ্ছি না (সহসা সজোরে) **I refuse to be interested in anything that concerns Bengal.**

নটবর। **But you shouldn't.** দেবেন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, জয়কেষ্ট মুকুজ্যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাংলাদেশের সমস্ত ভাল লোক—**the best men of the country have assembled to upon the cause of the native people.**

মধু। (ধমকের স্বরে) **Please don't—don't—don't—**

নটবর চুপ করিয়া গেলেন ও সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন

**Don't use that word 'native'—it is hateful—it is degrading. Haven't you read my article about it?**

নটবর ও, হ্যাঁ, পড়েছি বটে। হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। আমি এতদিন জানতাম না মশাই যে, টিমথি পেনপোয়েম আপনারই ছদ্মনাম। সেদিন শুনলাম। অনেক কাগজে লিখছেন আজকাল—সারকুলেটার, এথিনিয়ম, স্পেক্‌টেটার!

মধু। লিখতে হচ্ছে। **Orphan School**-এর মাস্টারি ক'রে ভদ্রভাবে থাকা যায় না—(সহসা) আচ্ছা, একটা প্যারামবুলেটারের দাম কত বলতে পারেন—আমায় বেবিটার জন্যে দরকার—

নটবর। ঠিক জানি না। খোঁজ করতে পারি। আচ্ছা, আমি চলি তা হ'লে। আপনি লিখুন।

চলিয়া যাইতে উদ্যত

মধু। (সহসা) Got it. যাবেন না, দাঁড়ান। Just a minute.

নটবর দাঁড়াইয়া রহিলেন, মধুসূদন খস খস করিয়া লিখিতে লাগিলেন

কেমন হ'ল শুনুন তো—

And on his airy-wheeled car
He wafted him to realms afar
And how the wanderer of the wood
Came home—but came to Solitude.

নটবর। বেশ হয়েছে।

মধু। Don't you think this poem will sell like hot cakes when it comes out in a neatly bound volume ?

নটবর। উচিত তো। সবাই প্রশংসা করছে।

মধু। Mr. Norton পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত। প্রফেসার-মহলে সাড়া প'ড়ে গেছে। Henrietta is almost in love with me for this.

নটবর। হেনরিয়েটা আবার কে ?

মধু। এক প্রফেসারের মেয়ে। সোফিয়া হেনরিয়েটাকে দেখেন নি আপনি ? She is wonderful.

নটবর স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

নটবর। আচ্ছা, চললাম তা হ'লে—

মধু। হাঁা, শুনুন আর একটা কথা। Would you be able to spare come cash—say hundred—yes, a huudred will do.

নটবর। এখন তো হাতে টাকা নেই আমার।

মধু। দালালি করেন হাতে টাকা নেই, বলেন কি ?

নটবর। সব সময়ে হাতে টাকা থাকে না কি! কবি মানুষ, ব্যবসার তো কিছু বোঝেন না, মাঝে মাঝে কপর্দকহীন হয়ে পড়তে হয়।

মধু। আপনার আগের ধারটা আমি শোধ করতে পারি নি যদিও—but I am confident as soon as my Captive Lady come out I shall be able to—

নটবর। না না, তার জন্যে কিছু নয়। আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি যদি পারি কিছু যোগাড় করতে।

মধু। Please do try. I am in a tight corner.

নটবর। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি—

চলিয়া গেলেন

মধু। বয়!

বয় প্রবেশ করিল

মধু। ব্র্যাণ্ডি, সোডা।

বয় ব্র্যাণ্ডি সোডা দিয়া গেল। মধুসূদন দু-এক চুমুক পান করিয়া আবার লেখায় মন দিলেন। ক্ষণপরে মিসেস্ ম্যাকটাভিস রেবেকা দত্ত প্রবেশ করিলেন। খাঁটি মেমসাহেব।

রেবেকা। Now, you are drinking again! You promised you won't.

মধু। ( অপ্রতিভ ) Just a few sips to brace my thought up. ( সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া ) অনেকখানি লিখে ফেলেছি, শুনবে ?

রেবেকা। বাইরের পোষাকটা ছেড়ে আসি, দাঁড়াও।

মধু। না, আগে শোন তুমি।

রেবেকা অনিচ্ছাভরে একটা চেয়ারে বসিলেন

মধু। The false one came at noontide hour.

And plucked its brightest fairest flow'r.

রেবেকা। One minute. I have asked them to send the pram to-day.

মধু। You have! But just now I haven't got a penny to spare. বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় নি জান তো ?

রেবেকা। **But that didn't prevent you from buying that costly bag for Henrietta the other day.**

মধু। তখন হাতে টাকা ছিল যে। তা ছাড়া, ওদের সঙ্গে অত আলাপ—ওর জন্মদিনে কিছু একটা না দিলে চলে ? **It does not look well.**

রেবেকা। কি দরকার ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি করবার ?

মধু। ওই প্রফেসাররাই তো এখানে একমাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওদের সঙ্গে মাখামাখি করব না তো কাদের সঙ্গে করব ! **I am fed up with these missionaries, shop-keepers aud indigo-planters.**

রেবেকা ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কিছুদূর চলিয়া গেলেন, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

রেবেকা। **But these are the people who gave you shelter and found you home when you were an unknown penniless vagabond in a miserable hole here.**

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

**Have you forgotten that *my* father is an indigo-planter whose favour you had to ask on bended knees to marry me ?**

মধু। **Please do understand me, darling.**

রেবেকা কোন জবাব না দিয়া চলিয়া গেলেন। মধুসূদন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি প্রকাণ্ড পার্সেল লইয়া পিওন প্রবেশ করিল ও পার্সেলটি দিয়া চলিয়া গেল। পার্সেল খুলিয়া মধুসূদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

রেবেকা! রেবেকা, রেবেকা, গৌর রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছে—দেখে যাও। রেবেকা—

রেবেকার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না

নেপথ্যে হেনরিয়েটা। **May I come in ?**

মধু। **Oh, Henrietta, certainly, my dear.**

কুমারী সোফিয়া হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, মাথায় দোদুল্যমান বেণী।

হেনরিয়েটা। Good morning, Mr. Dutt. আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। বাবা আজ একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছেন—

মধু। বাঃ, রেবেকার মতো তুমিও চমৎকার বাংলা শিখেছ দেখছি!

হেনরিয়েটা। ( সলজ্জ ) আমি ভাল পারি না। আপনি আসবেন তো? মিস্টার নর্টন আসবেন। আপনি তো আমাদের ওদিকে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। ( অনুযোগের স্বরে ) You have forgotten us it seems.

মধু। আমার সময় কই? My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine—6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit 5 to 7 Latin, 7 to 10 English. গৌরদাস রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছে, ও দুটোও পড়তে হবে। যাব কখন?

হেনরিয়েটা। What are these books?

মধু। These are the two great Epics of India, perhaps the greatest ever written anywhere.

হেনরিয়েটা। Is that so? আমারও পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি যে বাংলা অক্ষর জানি না!

মধু। If you are in earnest I shall teach you, my dear.

বেশ পরিবর্তন করিয়া রেবেকা প্রবেশ করিলেন এবং হেনরিয়েটাকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

হেনরিয়েটা। Good morning, Mrs. Dutt. বাবা আজ একটা পার্টি দিচ্ছেন—আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

রেবেকা। Thank you.

হেনরিয়েটা। Please do come—all of you. সন্ধ্যে সাতটার সময়। আমি যাই, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। Good-bye!

মধু—

রেবেকা। Good-bye.

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—ব্যাগটি ফেলিয়া গেলেন

রেবেকা। হেনরিয়েটার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা আমার ভাল লাগছে না, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি।

রোষভরে চলিয়া গেলেন। মধুসূদনের মুখে একটি স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া তিনি মদে আর এক চুমুক দিলেন ও পা দোলাইতে দোলাইতে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। রামায়ণের ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির হইল।

মধু। বাঃ, গৌর চিঠিও লিখেছে দেখছি!

পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহার পর সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিলেন—

রেবেকা—রেবেকা—

কোন উত্তর আসিল না। মধুসূদন ভাঙিয়া পড়িলেন। টেবিলে দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মনে হইল যেন তিনি কাঁদিতেছেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন এবং মধুসূদনকে এই অবস্থায় দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হেনরিয়েটা। (মৃদুস্বরে) Excuse me.—আমি ব্যাগটা ফেলে গেছি।

মধুসূদন উঠিয়া বসিলেন

মধু। Henrietta, I have lost my mother.

পত্রটি দেখাইলেন

## একাদশ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। ১৮৫১ খৃঃ অঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনারায়ণ দত্ত একটি ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছবিটি একটি বড় অয়েল পেণ্টিং—স্বর্গীয়া জাহ্নবীর প্রতিকৃতি। রাজনারায়ণের বেশ বিস্রস্ত, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কেশ অবিন্যস্ত। তিনি অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রাজনারায়ণ। কিচ্ছু হয় নি—একদম কিচ্ছু হয় নি। টাকাগুলো জলে গেছে কেবল। জাহ্নবীর চেহারা ঢের ভাল ছিল এর চেয়ে।

একেবারে অন্যরকম ছিল। সাহেব কখনও বাঙালী মেয়ের ছবি আঁকতে পারে—বিশেষত জাহ্নবীর! তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

আবার কিছুক্ষণ ছবিখানির দিকে তাকাইয়া রহিলেন

নাঃ, কিচ্ছু হয় নি। চোখের সে দৃষ্টি কই—যে দৃষ্টি থেকে—**no, I must not be sentimental !**

আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন

সবাই বলছে—**she died of a broken heart!** হতে পারে। **A tender heart is bound to break some day or other**—আমি কি তার জন্যে দায়ী? মোটেই না। আরও তিনবার বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু **each time with her permission**—সে অনুমতি না দিলে কিছুতেই বিয়ে করতাম না আমি। No—

আবার খানিকক্ষণ নীরবে মদ্যপান করিলেন

**It is that precious son of mine**—সমস্তই সেই সুপুত্রটির কীর্তি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছবিটির দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন) বুঝলে, সমস্তই তোমার পুত্রটির কীর্তি। আমি এর জন্যে বিন্দুমাত্রও দায়ী নই—হতে পারি না। বিয়ে! তিন-চারটে বিয়ে আজকাল করছে না কে? তা ছাড়া, তুমিই তো অনুমতি দিয়েছিলে!

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা করিলেন

(উচ্চৈঃস্বরে) প্যারী, প্যারী—

(নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—যাই।

শশব্যস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মধুর **Captive Lady**-খানা বাঁধিয়ে আনতে বলেছিলাম, এনেছ?

প্যারী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। নিয়ে এস। দুর্গাচরণকে খবর দিয়েছিলে?

প্যারী। দিয়েছিলাম। তিনি আসবেন বলেছেন।

**প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন ও বাঁধানো Captive Lady-খানা আনিয়া রাজনারায়ণের হস্তে দিলেন।**

রাজনারায়ণ। ( বইটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ) এ কি হয়েছে!

প্যারী। ( বুঝিতে না পারিয়া ) আজ্ঞে?

রাজনারায়ণ। এ কি হয়েছে! তোমাকে বলি নি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে আনতে?

প্যারী। ভাল ক'রেই তো এনেছি। ভাল চামড়া দিয়ে—

রাজনারায়ণ। ( অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া ) এর নাম ভাল বাঁধানো নাকি? একে ভাল বাঁধানো বল তুমি! দত্ত-বংশের ছেলে তুমি!

হতভম্ব প্যারী সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন

কি বই জান তুমি এখানা? এ বইয়ের দাম কত ধারণা আছে তোমার?

প্যারী। এটা তো মধুর 'ক্যাপটিভ লেডি'—

রাজনারায়ণ। ( উচ্চকণ্ঠে ) হঁ্যা হঁ্যা, মধুর 'ক্যাপটিভ লেডি'। এমন ক'রে বাঁধিয়ে এনেছ কেন তা হ'লে? ইডিয়ট্ কোথাকার!

প্যারী। এর চেয়ে আর কি রকম ভাল বাঁধানো হবে! চামড়া দিয়ে তো—

রাজনারায়ণ। ( প্রায় চীৎকার করিয়া ) চামড়া—চামড়া—চামড়া—ভেলভেট বাজারে ছিল না? সোনা ছিল না? সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে আনলে না কেন? কে তোমাকে বারণ করেছিল?

প্যারী। ( সভয়ে ) আমি ভেবেছিলাম—

রাজনারায়ণ। ( উত্তেজিত হইয়া ) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। তোমাদের মত অপদার্থের মুখ দেখতে চাই না আমি। বেরিয়ে যাও—

প্যারী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

বাড়ির সেরা ছেলেটা খৃষ্টান হয়ে গেল! র'য়ে গেল হাঁদাগুলো।

**নিকটস্থ টেবিলের উপর 'ক্যাপটিভ লেডি'-খানা রাখিয়া দিলেন ও আবার মদ খাইতে শুরু করিলেন। ভৃত্য রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল।**

রঘু। হুজুর, একজন মক্কেল এসেছে।

রাজনারায়ণ। এখন দেখা হবে না।

রঘু। বলছে—জরুরী কাজ।

রাজনারায়ণ। তাড়িয়ে দে। প্যারী কোথা ?

রঘু। বাইরের ঘরে ব'সে আছেন।

রাজনারায়ণ। পাঠিয়ে দে এখানে।

ভৃত্য চলিয়া গেল, ও একটু পরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিতেই রাজনারায়ণ সস্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাগ করলি বাবা! রাগ করিস নি—আয়, ব'স্। তোরা ছাড়া যে এখন আমার কেউ নেই। ( মদ্যপান করিলেন ) কেউ নেই—কেউ নেই। মধুর বইটা পড়্ তো একটু শুনি। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গল্পটা কি চমৎকার ক'রে লিখেছে! অদ্ভুত! পড়্ একটু শুনি।

প্যারী টেবিল হইতে বইটি লইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন

প্যারী। কোন্‌খান থেকে পড়ব ?

রাজনারায়ণ। গোড়া থেকেই পড়্।

প্যারীচরণ পড়িতে লাগিলেন

প্যারী। **The star of eve is on the sky**
**But pale it shines and tremblingly,**
**As if the soliude around**
**So vast, so wild, without a bound**
**Hath in its softly throbbing breast**
**Awak'd some maiden fear, unrest !**
**But soon, soon will its radiant peers**
**Peep forth from out their deep-blue spheres,**
**And soon the lady moon will rise**
**To bathe in silver earth and skies**
**The soft, pale silver of her pensive eyes.**

রাজনারায়ণ। আচ্ছা প্যারী, মধু কোন চিঠিপত্র লেখে না কেন বল্ তো! তোকে লেখে?

প্যারী। আজ্ঞে না।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাউকে লেখে? খবর রাখিস্ কিছু?

প্যারী। কাউকেই লেখে না। কাল গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল —তিনি বললেন যে, দু'বচ্ছর কোন চিঠি পান নি তিনি।

রাজনারায়ণ। দু'বচ্ছর!

উঠিয়া পড়িলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া এক নিশ্বাসে সেটা পান করিয়া ফেলিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি কাউকে! আমাকে চিঠি না লেখার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দু'বচ্ছর চিঠি না লেখার মানে কি! ওর তো সে রকম স্বভাব নয়!

প্যারীচরণ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ তাহাকে থামাইয়া দিলেন

ব'লো না—ব'লো না—তোমার যা মনে হচ্ছে ব'লো না সে কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু উচ্চারণ ক'রো না,—**not a word!** (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু নাঃ, বিশ্বাস হয় না। জাহ্নবী মরবার সময় ব'লে গেছে—মধু আবার ফিরে আসবে। সতী সাধ্বীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি। কাউকেই লেখে নি। আশ্চর্য তো! এক কাজ কর তুমি, পাল্কিটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও। গৌর, ভোলানাথ, ভূদেব, বঙ্কু—সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও—এখনি যাও—

প্যারী। এখন?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ, **immediately.**

প্যারী। এত রাত্রে কি আসবে কেউ?

রাজনারায়ণ। **Don't argue**—যা বলছি কর। কেউ না কেউ আসবেই। **I must have details**—যাও।

নিরুপায় প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ আবার সেই ছবিটার নিকট গিয়া একদৃষ্টে সেটার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

কি! ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ না কি? কিছুই বিচিত্র নয় তোমার পক্ষে।... **You jealous woman!**—তোমরা সব করতে পার।

রাজনারায়ণ যখন এইভাবে ছবির সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে হর-কামিনী—রাজনারায়ণের কনিষ্ঠতমা পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী। বয়স ষোল-সতেরো হইবে। রাজনারায়ণ তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

তোমরা সব করতে পার। দিব্যি ফেলে চ'লে গেলে তো আমাকে! অথচ যতদিন বেঁচে ছিলে আঁকড়ে ধরেছিলে—এক দণ্ড ছাড়তে চাইতে না। কি তোমরা!

হরকামিনী। রান্না হয়ে গেছে—

রাজনারায়ণ। (হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া) তুমি কখন এলে—এ ঘরে এলে কেন তুমি—মানা ক'রে দিয়েছি না যে, এ ঘরে কেউ আসবে না?

হরকামিনী। (শঙ্কিতভাবে) রান্না হয়ে গেছে—তুমি কখন খাবে তাই জানতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। আমি খাব না এখন।

হরকামিনী। কিছুই খাবে না?

রাজনারায়ণ। না।

মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। (সানুনয়ে) ওগুলো আর খেয়ো না—শুনেছি ওতে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়।

রাজনারায়ণ। আমিও শুনেছি।

হরকামিনী। তবু খাবে?

রাজনারায়ণ। সেইজন্যেই খাব।

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। এমনভাবে আত্মঘাতী হচ্ছ তুমি কোন্ দুঃখে?

রাজনারায়ণ। সে তোমরা কেউ বুঝবে না—এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ।

পুনরায় মদ্যপান

হরকামিনী। তোমার পায়ে পড়ি, ও বিষগুলো আর তুমি খেয়ো না।

রাজনারায়ণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মদ্যপান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মদ্যপান করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

রাজনারায়ণ। দেখ, এবার মনে করেছি কালীপুজো করব খুব ঘটা ক'রে। দাদা একবার যেমন সাগরদাঁড়িতে করেছিলেন। এক-আধটা কালী নয়—১০৮টা কালীর মূর্তি পূজো করেছিলেন দাদা। ১০৮টা মোষ, ১০৮টা ভেড়া, ১০৮টা ছাগল একসঙ্গে বলিদান দেওয়া হয়েছিল। ১০৮টা সোনার জবাফুল অঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল মায়ের পায়ে। এই রকম পূজো এবার আমিও করব—( কিছুক্ষণ পরে ) ছেলের কল্যাণের জন্যে।

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। তুমি যাও।

হরকামিনী চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ উঠিয়া জাহ্নবীর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। মধুসূদন পিছনের দ্বার দিয়া সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের পরিধানে সাহেবী পরিচ্ছদ—মুখে চাপদাড়ি। মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন—

মধু। বাবা!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত রাজনারায়ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

রাজনারায়ণ। কে—কে—who's there ?

মধুসূদন আর একটু আগাইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন—এই চাপ-দাড়ি যুবক যে তাঁহার পুত্র মধুসূদন তাহা প্রথমে তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষণপরেই চিনিতে পারিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া আসিলেন।

মধু—তুই—তুই—তুই এসেছিস! কখন এলি ?

মধু। আমি এইমাত্র এসেছি। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছি।

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—

রাজনারায়ণ। **Yes, your heathen mother is dead.**

মধু। আমাকে খবর দেন নি কেন ?

রাজনারায়ণ। প্রয়োজন মনে করি নি। **But that heathen lady talked of you till death stopped her**—মরবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার নাম করেছেন—প্রতি মুহূর্তে আশা করেছেন যে, তুমি আবার ফিরে আসবে—**laugh at her heathen tenacity if you like.**

মধু। আমি খৃষ্টান হয়েছি, কিন্তু অমানুষ হই নি। আপনি—

রাজনারায়ণ। না, আমি কিছু বলছি না—**I am very glad to see you, my boy**—ব'স—**please take your seat and have a glass of wine if you like.**

এক গ্লাস মদ ঢালিয়া মধুর দিকে আগাইয়া দিলেন ; কিন্তু মধু তাহা স্পর্শ করিলেন না।

হঠাৎ এলে কেন এ সময় ? অকস্মাৎ এ অনুগ্রহ !

মধু। ( উপবেশন করিয়া ) মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে থাকতে পারলাম না—**I thought it my duty to come to you**—আপনার আর ছেলে হয় নি আমি শুনেছি। ( সহসা ) ওটা কি মায়ের ছবি নাকি ?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন ও ছবিখানার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজনারায়ণ বিস্ফারিত নয়নে ইহা দেখিতে লাগিলেন।

রাজনারায়ণ। উঠে এসো।

মধু ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন

কতক্ষণ এসেছ তুমি ?

মধু। এই আসছি।

রাজনারায়ণ। **What do you want ? Money ?**

মধু। **I am always in need of money**—কিন্তু সে জন্য আসি নি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

রাজনারায়ণ। আমার কাছে ? কেন ?

মধু। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। কোথায়? মাদ্রাজে? (সবিস্ময়ে) **Are you in your senses?**

মধুসূদন নীরব রহিলেন

**Have you married?**

মধু। **Yes, I have married a Scotch girl.**

রাজনারায়ণ। **I see.**

মধু। আপনি আমার কাছে চলুন—**you will see for yourself.**

রাজনারায়ণ। হঠাৎ এতদিন পরে এ আগ্রহ কেন—**may I ask you?**

মধু। এখানে থাকলে আপনার কষ্ট হবে। পৃথিবীতে মা আর আমি ছাড়া আপনাকে আর কেউ চেনে না। মা মারা গেছেন শুনে আমার মনে হ'ল যে, আমার কাছে না থাকলে আপনি শান্তি পাবেন না—কেউ আপনাকে বুঝবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে—সেইজন্যেই এসেছি আমি।

রাজনারায়ণ। **But that is impossible, my boy**—আমার আরও দুটি স্ত্রী আছে **and I have duty towards them.** (সহসা) **Do you know you are responsible for the whole thing?** এখন এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! **It is too late.**

মধু। মা মারা গেছেন, তাই বলছি—

রাজনারায়ণ। তুমিও যে ম'রে গেছ—**you are a different person—a Michael.**

মধুসূদন স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

মধু। **The Christians are the best people in earth to-day, father.**

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণ ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Go to the best people then—there's the door—who asked you to come here ?

মধুসূদন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মধু। যাবেন না তা হ'লে আমার সঙ্গে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। চললাম তা হ'লে—Good night.

বাহির হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন

যদি কখনও কোন বিষয়ে আমাকে আপনার প্রয়োজন হয়, খবর দিলেই আমি আসব। এখন তা হ'লে চললাম—Good night.

মায়ের ছবিটার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন ও মধুসূদন চলিয়া গেলে দ্বারের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র।

## তৃতীয় বিরতি

## দ্বাদশ দৃশ্য

মাদ্রাজে মধুসূদনের পড়িবার ঘর। ঘরের চতুর্দিকে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ এবং আলমারি। যে টেবিলের সম্মুখে মধুসূদন বসিয়া আছেন তাহা প্রকাণ্ড এবং তাহাতে বই-খাতা অগোছালভাবে স্তূপীকৃত। মধুসূদন পড়াশোনায় তন্ময় হইয়া আছেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একটি কার্ড দিল। মধুসূদন ক্ষণকাল বিরক্তিভরে কার্ডটির পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন—

মধুসূদন। Show him in.

বয় চলিয়া গেল

লোকটা পাগল ক'রে তুলবে দেখছি! What does he want now ?

নটবর ঘোষ প্রবেশ করিলেন

নটবর। Good morning.

মধুসূদন। Good morning. আপনার টাকা তো পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।

নটবর। টাকা পেয়েছি। Thanks. আমি সে জন্যে আসি নি। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি—এই দেখুন।

একখানি বই দিলেন

মধুসূদন। বেতাল পঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

সবিস্ময়ে পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিলেন

নটবর। প'ড়ে দেখুন কি সুন্দর ভাষা! আমি যখন বাংলা দেশে ছিলাম তখন বাংলা গদ্যে যে সব বই বেরিয়েছিল তা সাংঘাতিক, এখনও ভাবলে পিলে চমকে ওঠে। বেদান্তচন্দ্রিকা, পাষণ্ডপীড়ন, প্রতাপাদিত্য-চরিত্র পড়েছেন কখনও? কি সঙীন ভাষা মশাই!

মধুসূদন কোন উত্তর না দিয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন

আর এর ভাষা দেখবেন কি চমৎকার, কি স্বচ্ছ, কি মিষ্টি! (একটু থামিয়া) আইন ক'রে বিধবাবিবাহ দিচ্ছে শুনে লোকটার উপর-চটেছিলাম, বই প'ড়ে এখন ভক্তি হচ্ছে।

মধুসূদন কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

নটবর। ভাবছেন কি?

মধুসূদন। কিছু নয়। আচ্ছা, প'ড়ে দেখব ভাল ক'রে।

নটবর। আপনিও বাংলায় লিখুন না কিছু।

মধুসূদন। আমি? আমার বাংলা লেখা পড়বে? বাংলা দেশ আমাকে তো চায় না। I was hounded out of Baegal. আমার লেখা কেউ পড়বে না।

নটবর। লেখা পড়বে না কি ক'রে জানলেন আপনি?

মধুসূদন। Captive Lady ছাপানোর বিল শোধ হয়নি এখনও। গৌরকে লিখেছিলাম বাংলা দেশে সে যদি কিছু বিক্রি করতে পারে। He could not secure more than eighteen customers.

নটবর। Captive Lady যে ইংরেজীতে লেখা!

মধুসূদন। My dear Natabar, believe me—বাংলা দেশে ইংরেজী

জানা লোক আঠারো জনের চেয়ে ঢের বেশী আছে। তারা কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও. সি. দত্তর ইংরেজী প'ড়ে গদগদ—আমার লেখা পছন্দ হয় না তাদের। তারা আমাকে চায় না।

নটবর। বাংলায় কিছু লিখলে আমার বিশ্বাস—

মধুসূদন। বাংলা লেখবার জন্যে নিজেই আমি ছটফট করছি; **I know I can make and remake that languge.** বাংলা ভাষার চেহারা বদলে দিতে পারি আমি। কিন্তু কেউ আমার লেখা পড়বে না, বাংলা দেশ চায় না আমাকে, **and I know it for certain.**

নটবর। আমার মনে হয় আপনি ক্রিশ্চান হয়েছিলেন ব'লেই হয়তো—

মধুসূদন। বাঙালী ক্রিশ্চানরাই সবচেয়ে বেশী অভদ্রতা করেছে আমার সঙ্গে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন **treated me like dirt.**

নটবর। (সবিস্ময়ে) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

মধুসূদন। আলাপ আছে মানে! তার মেয়ে দেবকীর সঙ্গে আমার— (সহসা ক্ষেপিয়া) **I can never forgive that man. It is for him that I am rotting in this wretched Black Town of Madras.**

নটবর। কাল আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এখানে এসেছেন।

মধুসূদন। কোথায়?

নটবর। কোথায় উঠেছেন তা জানি না, তবে মাদ্রাজে এসেছেন তা ঠিক।

বয় প্রবেশ করিয়া একটি কার্ড দিল

মধুসূদন। (কার্ড দেখিয়া) **Good gracious!**

নটবরকে কার্ড দেখাইয়া

**Your Reverend K. M. Banerjee! The swine, the damned swine, what does he want with me?**

নটবর। ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, অভদ্রতা করাটা ঠিক হবে না।

মধুসূদন। **My dear Natabar, you need not worry, I am quite efficient in lip-deep Christian manners.** ( বয়কে ) **Yes, bring him in.**

নটবর। আপনারা আলাপ করুন তা হ'লে, আমি চলি। বইটা থাক্।

নটবর চলিয়া গেলেন। স্বেভাঃ কৃষ্ণমোহন প্রবেশ করিলেন। প্রবীণ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। দেখিলে শ্রদ্ধা হয়।

মধুসূদন। ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া ) **Good morning. Do glad to meet you after such a long time.**

উঠিয়া করমর্দন করিলেন এবং একটি চেয়ার আগাইয়া দিলেন

কৃষ্ণমোহন। ( উপবেশন করিতে করিতে ) গৌরদাস তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, এই নাও।

একটি পত্র দিলেন

আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মধুসূদন। আমাকে ? কোথায় ?

কৃষ্ণমোহন। কোথায় আবার ? দেশে। দেশের ছেলে দেশে ফিরবে না ?

মধুসূদন। দেশ তো আমাকে চায় নি কোনদিন।

কৃষ্ণমোহনের অনাড়ম্বর আন্তরিকতার সুরে মধুসূদনের মেকি সাহেবিয়ানা টিকিল না, বাঙালী-সুলভ অভিমান আত্মপ্রকাশ করিল।

কৃষ্ণমোহন। চেয়েছে বই কি! **Your 'Captive Lady' has captured the hearts of all. Mr. Bethune—by the way, do you know, Mr. Bethune is dead ?**

মধুসূদন। হ্যাঁ, শুনেছি।

কৃষ্ণমোহন। **These Anglo-Indians killed him,** কালা আইনের উত্তেজনা তাঁর সহ্য হ'ল না। **He had a very high opinion of you.**

মধুসূদন। তিনি আমায় বাংলা লিখতে বলেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন। বাঙালীর ছেলের বাংলা লেখাই তো উচিত। দেশে ফিরে চল তুমি, দেখবে দেশ জেগে উঠেছে। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওর স্বপ্ন সফল হয়েছে বাংলা দেশে। রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্যে, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দেবেন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন মিত্তির, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ, রসিককৃষ্ণ দেশ জুড়ে প্রতিভার একটা মিছিল চলেছে যেন। এ সময় তোমার এখানে প'ড়ে থাকা চলে না।

মধুসূদন। ভয় হয় বাংলা দেশে গেলে খেতে পাব কি-না! এখানে তবু যা হোক—

কৃষ্ণমোহন। বল কি! তোমার মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক খেতে পাবে না! **All your friends are well placed in life there.** তোমারও একটা না একটা কিছু জুটে যাবেই।

ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

মধুসূদন। আপনি উঠেছেন কোথা?

কৃষ্ণমোহন। আমি মিশনের কাজে এসেছি, মিশনেই উঠেছি।

মধুসূদন। (অনুযোগের স্বরে) আমার এখানে এসে ওঠা উচিত ছিল আপনার।

কৃষ্ণমোহন। আছি দু-চার দিন। আসব আবার। তুমি বিয়ে করেছ তো?

মধুসূদন। (হাসিয়া) একবার নয়, দুবার।

কৃষ্ণমোহন। ও! প্রথম স্ত্রী মারা—

মধুসূদন। না, মারা যায় নি। **She has divorced me.**

কৃষ্ণমোহন। **I hope you are happy.**

মধুসূদন। **I would I had the means.**

কৃষ্ণমোহন পুনরায় ঘড়ি দেখিলেন

কৃষ্ণমোহন। এবার উঠি আমি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলা-খাঁকারি দিলেন

গৌরদাসের চিঠিতে তুমি পাবে সব খবর। **I am afraid it contains a very sad piece of news.**

মধুসূদন। (সভয়ে) কি! **I hope father is well.**

কৃষ্ণমোহন। **May his soul rest in eternal peace!**

মধুসূদন উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মধুসূদন। বাবা মারা গেছেন! **You don't mean it—do you?**

কৃষ্ণমোহন কেবল মাথা নাড়িলেন

কৃষ্ণমোহন। এর ওপর তো মানুষের হাত নেই—**such is the law of Nature—inexorable, inevitable.**

মধুসূদন বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

গৌরের চিঠিতে সব খবর পাবে। শুনেছি তোমার আত্মীয়স্বজনেরা নাকি তোমার বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কি সব গোলমাল করছে। তোমার অবিলম্বে দেশে ফেরা উচিত।

আর একবার ঘড়ি দেখিলেন

আচ্ছা, আমি চলি তবে। **Good bye.**

মধুসূদন প্রত্যভিবাদন করিলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বারপ্রান্তে হেনরিয়েটাকে দেখা গেল।

হেনরিয়েটা। **Darling!**

মধুসূদন। **Henrietta, do you know—**

হেনরিয়েটা। **Yes, I hove heard— was listening. How terrible!**

মধুসূদন। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি বলছেন ফিরে যেতে।

হেনরিয়েটা। তাই যাও।

ঠিক এই সময়ে একটি ছয় বৎসরের বালিকা খোলা দ্বারপথ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল ও মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিল। রেবেকার কন্যা

বালিকা। **Daddy!**

মধুসূদন। এ কি, তুমি কি ক'রে এলে?

বালিকা। আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে তোমাকে দেখতে পেলাম। তুমি আমাদের কাছে যাও না কেন বাবা?

মধুসূদন। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি এখনি।

বালিকা। না, তুমি চল আমার সঙ্গে।

মধুসূদন। যাচ্ছি—তুমি যাও আগে—এখনি যাচ্ছি আমি।

বালিকা। না, তুমি যাবে না।

মধুসূদন। নিশ্চয় যাব—**there's a good girl**—কথা শোন—তুমি যাও, আমিও যাচ্ছি একটু পরে।

বালিকা অনিচ্ছাভরে চলিয়া গেল। হেনরিয়েটা নির্বাক

মধুসূদন। **No, I must leave Madras for good**—এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—**I must weigh anchor**—হেনরিয়েটা, বাংলা দেশে গিয়ে থাকতে পারবে তুমি?

হেনরিয়েটা। আমি? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব—যেখানে আমাকে রাখবে সেখানেই আমি থাকব। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?

মধুসূদন। পারব মানে? পারতে হবে। **I must.**

হেনরিয়েটা। এক কাজ কর না?

মধুসূদন। কি?

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল তুমি। আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে। **I want to see you happy.**

মধু। সে হয় না—**I cannot deprive Rebecca of her children**—সে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে—সে হয় না—সে হয় না—**Henrietta—O dear dear—isn't this terrible?**

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন

## চতুর্থ বিরতি

## ত্রয়োদশ দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বৈঠকখানা। গৌরদাস ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বসিয়া গল্প করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সাজসজ্জা আসবাবপত্র প্রভৃতি সমস্তই তৎকালোপযোগী। যতীন্দ্রমোহনের সুসজ্জিত হরকরাও এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

যতীন্দ্রমোহন। তুমি সুদ্ধ যখন রিহার্সালে কামাই করতে আরম্ভ করেছ তখন আর আশা নেই। 'রত্নাবলী' নাটকটাই অপয়া দেখছি, একটা না একটা বাধা লেগেই আছে। কালীপ্রসন্ন শুনছি 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করছে। ও যাতে হাত দেয় তাই বেশ উতরে যায়।

গৌরদাস। নাবাতে পারলে আমাদের বইখানাও ওতরাবে। তর্করত্নের অনুবাদ চমৎকার হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। কিন্তু নাবানো যাবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। অনেক বাধা। সাগরিকার পেটের অসুখ সারতেই চাইছে না।

গৌরদাস। ছোকরা সাগরিকার পার্টটা কিন্তু করছে চমৎকার।

যতীন্দ্রমোহন। কেশব গাঙ্গুলি, মহেন্দ্র গোঁসাই এরা দুজনও বেশ করছে। কিন্তু orchestra নিয়ে মুশকিলে পড়া গেছে যে! সংস্কৃত নাটকে বিলিতি বাজনা চলবে না—দিশি orchestra করতে হবে। I am keen on this point.

গৌরদাস। ক্ষেত্র গোঁসাই আর যদু পাল যদি ভার নেয় তা হ'লে হয়ে যাবে।

ভোলানাথ। (নেপথ্যে) My I come in?

গৌরদাস। চন্দর না কি! এস এস।

ভোলানাথ প্রবেশ করিলেন। বয়স বাড়িয়াছে

এস, ব'স।

ভোলানাথ। আমাদের মধু নাকি মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসেছে হে?

গৌরদাস। এসেছে।

ভোলানাথ। কোথা আছে সে?

গৌরদাস। এই খানিকক্ষণ হ'ল খিদিরপুরে গেছে।

ভোলানাথ। এতক্ষণ এখানে ছিল?

গৌরদাস। এইখানেই তো এসে উঠেছে। আমি একরকম জোর ক'রে তাকে খিদিরপুরে পাঠালাম এক্ষুনি।

ভোলানাথ। কবে এসেছে?

গৌরদাস। পরশু।

যতীন্দ্রমোহন। (হাসিয়া) ওর আত্মীয়স্বজনরা ওকে দেখে আঁতকে উঠবে, লোকে ভূত দেখে যেমন আঁতকে ওঠে।

ভোলানাথ। যা বলেছ! এতদিন ওরা রটাচ্ছিল যে, মধু মাদ্রাজে মারা গেছে। একটা জাল উইল বার ক'রে ওর বিষয়সম্পত্তিও গ্রাস ক'রে ব'সে আছে শুনেছি।

যতীন্দ্রমোহন। কেস হ'লে অবশ্য জাল উইল টিকবে না।

গৌরদাস। কিন্তু কেস করতে হ'লে টাকা চাই। মধু একেবারে কপর্দকহীন, বউটাকে পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে আনতে পারে নি।

ভোলানাথ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন

ভোলানাথ। ওহে ভূদেব যাচ্ছে, ডাকব? ওকেও মধুর খবরটা দেওয়া যাক, শোনে নি বোধ হয়।

গৌরদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক না।

যতীন্দ্রমোহন। (অর্ধস্বগত) আবার বাগড়া পড়ল। 'রত্নাবলী' বইটাই অপয়া।

ভোলানাথ উঠিয়া গিয়া জানালা হইতে ভূদেবকে ডাকিলেন। ক্ষণপরেই ভূদেব প্রবেশ করিলেন।

ভোলানাথ। অমন হন হন ক'রে চলেছ কোথায়?

ভূদেব। রামগোপাল ঘোষের একটা বক্তৃতা আছে, শুনতে যাচ্ছি। যাবে নাকি?

ভোলানাথ। যেতে পারি। মধু ফিরেছে, শুনেছ?

ভূদেব। মধু? আমাদের মধু?

ভোলানাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের **poet. And he has come back like a poet too, without a six-pence in his pocket.**

ভূদেব। সেখানে তো মোটা মাইনের চাকরি করত শুনেছি।

গৌরদাস। খরচও মোটা ছিল—মেম বিয়ে করেছে।

ভূদেব। সে কোথায়?

গৌরদাস। খিদিরপুরে গেছে।

ভূদেব। ওর বাবা তো মারা গেছেন?

ভোলানাথ। হ্যাঁ, এবং পৈতৃক সম্পত্তিও পরহস্তগত।

ভূদেব। বড় দুঃখের কথা।

যতীন্দ্রমোহন। ওর নিজের কিন্তু সেজন্য বিশেষ দুঃখ নেই। ওর বেশী দুঃখ আমরা ওর 'ক্যাপটিভ লেডি'কে অবহেলা করেছি ব'লে।

গৌরদাস। আমাকে তো মারতে বাকি রেখেছে কেবল।

ভূদেব। আমিও ও-ব্যাপারে একটু অপরাধী হয়ে আছি ভাই।

গৌরদাস। কেন, তুমি তো এক কপি কিনেছিলে?

ভূদেব। কিনেছি, পড়েওছি। কিন্তু ও আমাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল 'ক্যাপটিভ লেডি'র ওপর যজ্ঞ-টজ্ঞ বিষয়ে নোট লিখে দিতে। তা আর আমার হয়ে ওঠে নি। বইটা হয়েছিল চমৎকার।

ভোলানাথ। **It rose as an Aurora Borealis from amidst the stern cold of want and poverty.**

ভূদেব। (ভোলানাথকে) যাবে নাকি রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা শুনতে? যাবে তো চল, বেশী দেরি নেই আর।

ভোলানাথ। হ্যাঁ, চল। **We shouldn't miss the oration of our Demosthenes.** (গৌরদাসকে) এখনই ঘুরে আসছি আমরা।

গৌরদাস। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। যতীন, যাবে?

যতীন্দ্রমোহন। দেখ, এই তোমাদের মহৎ দোষ—একটা **fixity of**

**purpose** নেই। ছোট রাজা বেচারা আমাদের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছে, অথচ—

গৌরদাস। আচ্ছা, যাব না। তোমরা যাও।

ভূদেব ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন

যতীন্দ্রমোহন। নাট্যশিল্প একটা বড় আর্ট। ও নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়।

গৌরদাস। বাজে কথা ছাড় না, কি বলবে বল ?

যতীন্দ্রমোহন। তুমি যে ভূমিকায় নাবছ তার সম্বন্ধে ভেবেছ কিছু? সৌগন্ধরায়ণ হচ্ছেন রাজমন্ত্রী, তাঁর চালচলন, কথাবার্তা এমন হবে যে—

( নেপথ্যে )। **May I come in ?**

যতীন্দ্রমোহন। আঃ, আবার কে এল !

কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

গৌরদাস। **Good afternoon** ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তারপর, খবর কি ?

যতীন্দ্রমোহন। এমন আকস্মিক অভ্যুদয়ের হেতু ?

কিশোরীচাঁদ। হেতু দুটি—প্রথম, ছোট রাজার সঙ্গে এখনি দেখা হ'ল, তিনি দেখলাম ক্ষেপে আছেন গৌরদাস রিহার্সালে যাচ্ছে না ব'লে।

যতীন্দ্রমোহন। সে কথা আমিও বলেছি ওকে।

কিশোরীচাঁদ। দ্বিতীয়—রত্নাবলীর ওঁরা ভাল একটা ইংরেজী অনুবাদ করাতে চান। থিয়েটার দেখতে সায়েবসুবোরাও আসবে তো। ওঁরা পাঁচ শো টাকা পারিশ্রমিক দিতেও প্রস্তুত আছেন। আমাকে বললেন একটা ভাল লোককে দিয়ে করিয়ে দিতে।

গৌরদাস। আমাদের মধুকে বললে কেমন হয় ?

যতীন্দ্রমোহন। **He is the fittest man.**

কিশোরীচাঁদ। মধু ফিরেছে নাকি ?

গৌরদাস। ফিরেছে।

কিশোরীচাঁদ। **Then certainly he is the fittest man.** সে কোথায়? তার আর সব খবর কি?

গৌরদাস। আর সব খবর অতিশয় শোচনীয়। বাবা মারা গেছেন, বিষয়-সম্পত্তি বেদখল, পকেটে একটি পয়সা নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। আমি ভাবছি নিজেদের মধ্যে কিছু চাঁদা তুলে—

কিশোরীচাঁদ। সে উঠেছে কোথা?

গৌরদাস। আপাতত আমার এখানেই। এখন খিদিরপুরে গেছে।

কিশোরীচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তর্জনী দ্বারা ওষ্ঠে মৃদু টোকা দিতে দিতে ক্ষণকাল কি ভাবিলেন।

কিশোরীচাঁদ। তার যদি আপত্তি না থাকে আমি আমার দমদমের বাগান-বাড়ীখানা থাকতে দিতে পারি তাকে। খালি প'ড়ে আছে। আর ১২০৲ মাইনের চাকরিতে যদি ওর আপত্তি না থাকে তা হ'লে আমার **Interpreter**-এর পোস্টটাও ওকে দিতে পারি। **Mr. Tucker** চ'লে যাচ্ছে।

গৌরদাস। তা হ'লে তো ভালই হয়।

কিশোরীচাঁদ। তার মতটা জেনে তা হ'লে জানিও আমাকে। **I shall arrange accordingly.** রত্নাবলীর ব্যাপারে কিন্তু আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না ভাই, মধুকে দিয়ে হোক, যাকে দিয়ে হোক—যা করবার করিও। আমি চললাম, এখন আর বসব না। আজ রিহার্সালে যাচ্ছ তো?

গৌরদাস। যাব।

কিশোরীচাঁদ। সেইখানেই আবার দেখা হবে তা হ'লে।

চলিয়া গেলেন

যতীন্দ্রমোহন। রিহার্সালে যাওয়াটা খুব দরকার। জিভের আড়ষ্টতাই ঘোচে না তা হ'লে। দেখ, আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি।

গৌরদাস। কি লক্ষ্য করলে আবার?

যতীন্দ্রমোহন। যাত্রার ঢংটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছ না তোমরা। সেই নাকী স্বর আর সেই টেনে টেনে কথা—

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধুসূদন। **My dear Gour—it is awful—it is hell !**

গৌরদাস, যতীন্দ্রমোহন উভয়েই বিস্মিত হইলেন

গৌরদাস। কি হ'ল! এত শিগগির ফিরলে যে ?

মধুসূদন একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

গৌরদাস। খুব দুর্ব্যবহার করলে বুঝি ?

যতীন্দ্রমোহন। জ্ঞাতিশত্রুরা দুর্ব্যবহার ক'রেই থাকে—এ আর নতুন কি!

গৌরদাস। ওতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন ?

যতীন্দ্রমোহন। ভাল উকিলের পরামর্শ নিয়ে বিষয়টি উদ্ধার করবার চেষ্টা করি এস সবাই মিলে।

মধুসূদন নীরব

গৌর। কি ভাবছ ?

মধু। **I have seen her !** স্বচক্ষে দেখে এলাম —উঃ!

গৌর। কাকে দেখে এলে ?

মধু। বাবার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে। অপরূপ সুন্দরী, অকাল-বৈধব্যের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। **O, my unprotected lone step-mother !**

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন

গৌরদাস। ( ক্ষণকাল পরে ) মায়ের গয়নাগুলোর কোন সন্ধান পেলি ? উইলের সম্বন্ধে কোন কথা হ'ল ?

মধু। ( মুখ তুলিয়া ) **How could I ?**

উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ

জোর গলায় নিজের দাবি জাহির করতেই তো গিয়েছিলাম—কিন্তু ওই

দৃশ্য দেখে **I was crest-fallen—dumbfounded. She is haunting me even now—**

গৌরদাস। কিন্তু একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার।

মধু। **My dear Gour, I am a pauper no doubt, but I am a gentleman none the less.**

গৌর। কি বিপদ! আমি কি বলছি—

যতীন্দ্রমোহন। থাক্ থাক্, ওসব আলোচনা থাক্ এখন। তার চেয়ে কিশোরী যে কথাটা ব'লে গেল তাই বল।

মধু। কিশোরী এসেছিল নাকি? সে আজকাল পুলিস-আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট না?

যতীন্দ্রমোহন। হ্যাঁ। তার অধীনে **interpreter**-এর পোস্টটা খালি হচ্ছে। তুমি যদি চাও সে তোমাকেই দেবে।

মধু। **Very kind of him.** মাইনে কত?

গৌর। একশ' কুড়ি টাকা।

মধু। মোটে? **It won't keep me in** ডাল-ভাত **even!**

গৌর। যতদিন ওর চেয়ে ভাল কিছু একটা না জুটছে ততদিন আমার মনে হয়—

যতীন্দ্রমোহন। এখন ওইটেই নাও না। ভাল একটা কিছু পেলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ!

মধু। যা বল তোমরা, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

যতীন্দ্রমোহন। আর একটি প্রস্তাব আছে। গৌর বল।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (গৌরকে) মা জিগ্যেস করলেন, আপনারা কি গাড়ি নিয়ে বেরুবেন এখন?

গৌরদাস। হ্যাঁ, বেরুব। কেন, তিনি কি কোথাও—আঃ, কি বিপদ—আচ্ছা, চল, যাচ্ছি আমি—এক মিনিট—আসছি এখুনি।

ভৃত্যসহ অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। আর একটি কি প্রস্তাব ?

যতীন্দ্রমোহন। রাজারা 'রত্নাবলী'খানার ইংরেজীতে অনুবাদ করাতে চান সায়েব দর্শকদের সুবিধের জন্যে। পাঁচশ' টাকা পারিশ্রমিক দেবেন। আমাদের ইচ্ছে, তুমিই এটার ভার নাও।

মধু। ( Shrug করিয়া ) **Well, this is more degrading.**

যতীন্দ্রমোহন। এতে আবার **degrading** কোন্‌খানটা !

মধু। **Degrading** নয় ? **Sculpter's chisel** দিয়ে উনুন খুঁড়তে চাও তোমরা ! তোমাদের **taste** কি রকম বুঝি না। এই একটা বাজে নাটকের জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করছ—

যতীন্দ্রমোহন। বাংলায় ভাল নাটক কই ?

মধু। **Shall I write a drama for you ?**

যতীন্দ্রমোহন। ( বিস্মিত ) তুমি পারবে ?

মধু। আমি পারব না ! বল কি !

সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

শুধু **drama** নয়, বাংলায় আমি **Blank verse**ও লিখব। **Blank verse**-এ না লিখলে বাংলা নাটকের উন্নতি হ'তে পারে না।

যতীন্দ্রমোহন। কৃত্তিবাস না কে কল্পনা করেছিলেন—জলে ভাসে শিলা, তোমার কল্পনার দৌ'ড় দেখছি তার চেয়েও বেশী।

হাসিলেন

মধু। তুমি কি মনে কর বাংলা ভাষায় **Blank verse** লেখা অসম্ভব ?

যতীন্দ্রমোহন। মনে করি। বাংলা ভাষায় **Blank verse**-এর উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি আনা অসম্ভব। ঈশ্বর গুপ্তের ট্রাটা মনে আছে ? কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভ'রে খাই—

মধু। বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত লিখতে পারে নি ব'লে যে আর কেউ পারবে না তার কোন মানে নেই। **It needs a more powerful genious.**

যতীন্দ্রমোহন। ফরাসী ভাষায় জিনিয়াসের অভাব নেই, কিন্তু যতদূর

জানি, নাম করবার মতো Blank verse ওতেও নেই। প্রত্যেক ভাষারই একটা ভঙ্গী থাকে, যাতে—

মধু। বাংলা ভাষায় সব রকম ভঙ্গীই ফোটানো সম্ভব। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা।

যতীন্দ্রমোহন। দুহিতাটি কিন্তু বড় জীর্ণশীর্ণ।

মধু। Come on, bet—বাংলায় যদি Blank verse লিখে দিতে পারি, কি দেবে তুমি?

যতীন্দ্রমোহন। সত্যিই যদি Blank verse-এ ভাল কবিতা লিখে দিতে পার, আমি সে কবিতা ছাপাবার সমস্ত ভার নেব।

মধু। Done.

হাত বাড়াইয়া যতীন্দ্রমোহনের কর-মর্দন করিলেন

## চতুর্দশ দৃশ্য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বৈঠকখানা। আসবাবপত্রে আভিজাত্যের ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রহিয়াছে। মধুসূদন কবিতা পড়িতেছেন। তাঁহার বাঁ হাতে কবিতার খাতা, ডান হাতে মদের গ্লাস। যতীন্দ্রমোহনের সম্মুখেও মদের গ্লাস রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি তেমন মনোযোগী নহেন, ঈষৎ বিস্ফারিত নেত্রে সবিস্ময়ে তিনি কবিতা শুনিতেছেন।

মধু।
ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে
অভ্রভেদী, দেবাত্মা ভীষণ মূর্তিধর
সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা শুভ্রবেশধারী
নিমগ্ন তপঃসাগরে ভীম ব্যোমকেশ
যোগিকুলধ্যেয় যোগী। নিকুঞ্জ কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল কুসুম,
অন্যান্য অচল ভালে শোভে যে সকল

( যেন মরকতময় কনক কিরীট )
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা
পৃথ্বী-সুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়—

কপাটে টোকা পড়িল

মধু। ( বিরক্তিভরে ) আঃ!

যতীন্দ্রমোহন। কে? ভেতরে এস।

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। যতীনকে 'তিলোত্তমা' শোনানো হচ্ছে বুঝি? ( যতীন্দ্রমোহনকে ) কেমন লাগছে?

যতীন্দ্রমোহন। সুপার্ব্! এই তৃতীয়বার শুনছিলাম। ( হাসিয়া ) বাজি হেরে গেছি, **and am glad to lose.**

গৌরদাস উপবেশন করিলেন

গৌরদাস। আমি আগেই শুনেছি। সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। শুধু চমৎকার নয়, যুগান্তকারী, অভূতপূর্ব, অচিন্তনীয়, অপরূপ, আশ্চর্যজনক। আমি থ হয়ে গেছি।

মধুসূদন এক নিশ্বাসে মদটা শেষ করিয়া ফেলিলেন

গৌরদাস। 'শর্মিষ্ঠা'খানাও একেবারে নতুন জিনিস হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে—এ রকম বাছা বাছা কথা তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?

মধু। অভিধান থেকে।

গৌরদাস। মাদ্রাজে প'ড়ে থাকলে কি এসব হ'ত! ভাগ্যে তোমাকে এখানে আনিয়েছিলাম!

মধু। ( সোচ্ছ্বাসে ) **Yes you are another** ভগীরথ। আমার কাব্য-সুরধুনীকে তুমিই বঙ্গে এনেছ। **By the bye,** আমার 'শর্মিষ্ঠা'র **manuscript**-খানা কোথায়? তোমাদের রামনারায়ণ তর্করত্নের ওসব ফুক্কুড়ি চলবে না। সব নাটকই 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নয়। আমি তাকে

grammar ঠিক ক'রে দিতে দিয়েছিলাম, ঢেলে সাজতে বলি নি। Look at his cheek! বইটা কোথায়?

গৌরদাস। রাজারা সেখানা আবার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে দেখতে দিয়েছেন।

মধু। এ তো ভারি জ্বালাতনে পড়া গেল! Can't they rely on me?

যতীন্দ্রমোহন। রাজাদের খুব পছন্দ হয়েছে তোমার বই। তবে তর্কবাগীশ মশাই ওঁদের সভাপণ্ডিত, ওঁকে একটু দেখিয়ে না নিলে উনি ক্ষুণ্ণ হবেন। প্রবীণ লোক—

মধু। প্রবীণ লোক ব'লেই আমার ভয় বেশী। সূত্রধার, নন্দী—এসব ছাড়া যে নাটক হতে পারে তা প্রবীণদের কল্পনারই অতীত। বিদেশী নাটক তো পড়ে নি বেচারারা।

যতীন্দ্রমোহন। আমার মতে কিন্তু স্বদেশী কাব্যে বিদেশী গন্ধ কম থাকাই ভাল।

মধু। থাকলে ক্ষতি কি! Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air? Carlyle's prose for its Germanism? কাব্যে কাব্যগুণ থাকলেই হ'ল।

গৌরদাস। রঙ্গলালের লেখা তোমার কেমন লাগছে?

মধু। সেদিন ওর কতকগুলো কবিতা দেখলাম। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়'—এ চমৎকার! কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনাতেও যখন—মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে, দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে—লিখে ভুজঙ্গ-প্রয়াতের নকল করেছে তখন আমার ভাল লাগে নি।

যতীন্দ্রমোহন। সংস্কৃত ছন্দে লিখলেও ওর আদর্শ কি সম্পূর্ণ দেশী?

মধু। ওর আদর্শ কারা জান?—Byron, Moore আর Scott.

গৌরদাস। এককালে তোমার আদর্শও তাই ছিল—আমরা কলেজে তোমাকে পোপ বলতাম।

মধু। আর সেই গর্বে আমার মাটিতে পা পড়ত না! **I was a fool then**—কিছু দূর এগুলেই বুঝতে পারা যায় **what hills peep over hills—what Alps on Alps arise!** বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো, মিলটন—এঁরাই হচ্ছেন কবিকুলগুরু। আদর্শ করতে হ'লে এঁদেরই আদর্শ করব।

প্রেমচাঁদ। (নেপথ্যে) যতীন, বাড়ী আছ নাকি?

যতীন্দ্রমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যতীন্দ্রমোহন। আসুন পণ্ডিতমশায়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রবেশ করিলেন

প্রেমচাঁদ। (মধুসূদনকে দেখিয়া) স্বয়ং লেখকই যে এখানে হাজির দেখছি! আমি আজ বাইরে যাচ্ছি, তাই যতীনকে তোমার 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপিখানা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমার দেখা হয়ে গেছে।

মধু। কেমন দেখলেন?

প্রেমচাঁদ। ছোট রাজা বলেছিলেন কোথাও দোষ দেখলে দাগ দিয়ে দিতে।

মধু। দেখি কোথায় কোথায় দাগ দিলেন!

উলটাইয়া দেখিতে লাগিলেন

প্রেমচাঁদ। দাগ দিই নি। দাগ দিতে গেলে আর কিছু থাকবে না। তবে কিনা আমি যে চোখে দেখেছি সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে। আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে—বাহবা পড়বে!

মধু। আপনার অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ।

প্রেমচাঁদ। আমি এখন আর বসব না, চলি।

চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

মধু। (সামলাইয়া) **Lord! these barren pundits understand nothing but grammar!**

## পঞ্চদশ দৃশ্য

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় মধুসূদনের বাসায় ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি সুবিস্তৃত ঘর। ঘরের তিন কোণে তিনটি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সম্মুখে একটি করিয়া চেয়ার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের আর একদিকে দুইটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সোফা প্রভৃতিও আছে। একটি বড় বুক-শেল্‌ফে অনেকগুলি পুস্তক দেখা যাইতেছে। একটি টেবিলের নিকট মধুসূদন আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা এবং গায়েও আদ্দির ঢিলাহাতা ঘুন্টি-দেওয়া পাঞ্জাবি। হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রহিয়াছে। কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করিয়া তাহার পর তিনি জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

মধু। **The infernal serpent, he it was whose guile**
**Stirred up with envy and revenge, deceived**
**The mother of mankind, what time his pride**
**Had cast him out from Heaven, with all his host**
**Of rebel Angles, by whose aid, aspiring**
**To set himself in Glory above his peers,**
**He trusted to have equalled the most High**
**If he opposed and with ambitions aim**
**Agaist the throne and monarch of God**
**Raised impious war in Heaven and battle proud**
**With vain attempt—**

( নেপথ্যে ) মধু বাড়ি আছ ?

মধু। ( বই বন্ধ করিয়া ) আছি—এস, গৌর নাকি ?

গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস—এলে কবে ? তোমার যে পাত্তাই নেই আজকাল, হে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটকুলতিলক ! তারপর, খবর কি ? 'তিলোত্তমসম্ভব' পেয়েছ ?

গৌর। ( উপবেশনান্তে ) পেয়েছি—তার সমালোচনাও পড়েছি, **I congratulate you.** রাজনারায়ণ, রাজেন, **even old fashioned** দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। **You have worked wonders my friend.**—তারপর খবর কি তোমার ?

মধু। খবর? খবর ভালই। (হাসিয়া) অর্থাভাব ছাড়া আর কোন অভাব নেই।

গৌরদাস। অর্থাভাব? কেন? আদালতে চাকরি করছ—বই লিখেও কিছু পাচ্ছ—**you should not be in want.**

মধু। বই লিখে আর কত পেয়েছি?

গৌরদাস। পাও নি কি রকম? রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা, তিলোত্তমা—**you have flooded our literature**—আর প্রত্যেক বইখানাতেই তুমি বেশ টাকা পেয়েছ। বড় রাজা, ছোট রাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সবাই তো যথেষ্ট দিয়েছেন তোমাকে।

মধু। **And I am greateful to them!**—কিন্তু ওই কটা টাকাতে আমার কি হবে বল দেখি? বৈশ্বানর কখনও এক-আধ চামচে ঘি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন! আমি দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে চাই। রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে চাই। **I thrive in luxury, you know—it is a necessity for me and my imagination. I hate—I simply hate to live in a close atmosphere. It suffocates me!** এই কটা টাকাতে কোনক্রমে খাওয়া-পরা চলতে পারে বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমে চলাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। **I want to soar—I mean, materially too! I am thinking of going to England and becoming a barrister. I must have more money.**

গৌর। তোমার জ্ঞাতিদের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি তো উদ্ধার হয়েছে, নয়?

মধু। প্রায়। **P and B seem to be yielding—the rascals!**

গৌর। তবু তোমার কুলুচ্ছে না?

মধু। **My dear G. D. Bysack, you illustrious deputy magistrate, you ought to know that a few hundred rupees per month are too inadequate for a poet of my calibre.**

গৌর। (হাসিয়া) ওটা পড়ছিলে কি বই? (টেবিল হইতে বইটি তুলিয়া) এটা তো দেখছি 'হোমার', এখানা 'টাসো'—ওটা কি?

মধু। **Paradise Lost.**

গৌর। নতুন কিছু শুরু করেছ নাকি?

মধু। শুরু করেছি মানে? তিনখানা একসঙ্গে শুরু করেছি। ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক—মেঘনাদবধও শুরু করেছি কাল থেকে।

গৌর। (সাশ্চর্যে) একসঙ্গে তিনখানা! এমন হৈ-হৈ ক'রে লেখবার মানে?

মধু। তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে বিলেত পালাতে চাই।

গৌর। **Still sighing for the land of Shakespeare and Milton?**

মধু। (হাসিয়া) **No, for Grey's Inn.** বিলেত যাব ব্যারিস্টার হবার জন্যে।

(নেপথ্যে) আসতে পারি আমরা?

মধু। আসুন। পণ্ডিতরা এসেছে—**Gour, now I must bid you good night.**

গৌর। এখন পড়াশোনা হবে বুঝি?

মধু। **I shall dictate now.**

গৌর। উঠি তবে। তোমার নতুন লেখাগুলো দেখাই হ'ল না, বাজে কথায় সময় কেটে গেল।

মধু। সে আর একদিন হবে।

তিনজন পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

আসুন, আপনারা বসুন। গৌর, তোমার কাছে আইনের বইও দু-একখানা নেব। আইনও পড়তে শুরু করেছি। (হাসিয়া) **Carrying on everything.**

গৌর। আচ্ছা, কাল আসব। **Good night.**

প্রস্থান

মধু। Good night. ( পণ্ডিতদের প্রতি ) বসুন আপনারা।

পণ্ডিতগণ আগেই তিন কোণে টেবিলে গিয়া বসিলেন। মধুসূদন একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রথম পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

আপনি 'কৃষ্ণকুমারী' লিখছেন, না? কতদূর হয়েছে দেখি? ( দেখিলেন ) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হয়েছে—না? That's all right.

দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

ব্রজাঙ্গনার "ময়ূরী" কবিতাটি কাল শেষ হয় নি। মাত্র গোড়াটা শুরু করে-ছিলাম। পড়ুন তো শেষের দু লাইন।

২য় পণ্ডিত। ( পড়িতে লাগিলেন )

আহা কে না ভালবাসে রাধিকা-রমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!

মধুসূদন সিগারেটটাতে দু-একটা টান দিলেন। তাহার পর তৃতীয় পণ্ডিতের নিকট গেলেন

মধু। 'মেঘনাদ' কতটা হয়েছে?

৩য় পণ্ডিত। ভগ্নদূত এসে রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

মধু। শেষের কয়েক লাইন পড়ুন তো।

৩য় পণ্ডিত। ( পড়িলেন )

এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি
আদেশিলা—কহ দূত, কেমনে, পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

মধু। দেখি—

দেখিলেন ও খাতা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রথম পণ্ডিতের কাছে গেলেন

লিখুন—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—উদয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ, সম্মুখে দেবালয়, দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা—হয়েছে লেখা?

১ম পণ্ডিত। দাঁড়ান—হয়েছে—মদনিকা—

মধু। লিখুন তা হ'লে এবার। মদনিকা বলছে—আর কেন সখি, চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেব-দর্শনের ছলে এখানে এসেছি—আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি! নেপথ্যে—রণবাদ্য—

১ম পণ্ডিত। হঁ্যা—নেপথ্যে রণবাদ্য—

মধু। লিখুন—বিলাসবতী এবার বলছেন—ঐ শোন্ লো শোন্, মহারাজ বুঝি ফিরে আসছেন। মদনিকা উত্তরে বলছেন—

পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া থামিতে বলিলেন

**Oh, you are slow, pundit!** হয়েছে? লিখুন—মদনিকা বলছেন—তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি কে আসছে!

আবার কিছুক্ষণ পদচারণ

লিখুন। বিলাসবতী—সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি! তা কই, আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। —মদনিকা। এখন ভাই কাঁদলে আর কি হবে? ওই দেখ মন্ত্রীমশায় আসছেন। মন্ত্রীর প্রবেশ।

এই পর্যন্ত বলিয়া মধুসূদন আবার বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকট গিয়া থামিলেন

আপনি আর একবার "ময়ূরী"টা পড়ুন তো!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (পাঠ)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুমিও কি দুঃখিনী?
আহা কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!

মধু কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

মধু। আয় পাখি আমরা দু'জনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস দান
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকা-রঞ্জনে
তুই ভাব ঘনে ধনি আমি শ্রীমাধবে।

দ্বিতীয় পণ্ডিত লিখিতে লাগিলেন ও মধুসূদন আবার পদচারণা শুরু করিলেন। সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন

মধু। ইন্দ্রের আর একটি নাম—শক্র, না?

২য় পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। লিখুন—

কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

২য় পণ্ডিত। পরে তরুবর?

মধু। মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) এইবার আপনার পালা। পড়ুন তো খানিকটা। একটু আগে থেকে পড়ুন—**just create the atmosphere.**

৩য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি—

নীরব রবার বীণা, মুরজ মুরলী—
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে!

মধু। চুপ করুন। ঠিক পড়া হচ্ছে না আপনার—

আর একটা সিগারেট ধরাইলেন ও টেবিল হইতে মিল্টনখানা তুলিয়া লইয়া খানিকক্ষণ নীরবে পড়িলেন। তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া পদচারণ করিতে শুরু করিলেন। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল

হাতীর কি কি প্রতিশব্দ জানেন বলুন তো! 'তিলোত্তমা'তে ব্যবহার করেছি অনেক কথা—মনে থাকে না সব।

৩য় পণ্ডিত। হাতীর? হস্তী, করী, গজ, মাতঙ্গ, বারণ।

মধু। **I think there is another good word—**

৩য় পণ্ডিত। কুঞ্জর।

মধু। **That's the word**—কুঞ্জর। আচ্ছা, বজ্র শব্দের কয়েকটা বলুন তো?

৩য় পণ্ডিত। বজ্র, কুলিশ, দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—( অভিধান দেখিলেন ) ইরম্মদ—

মধু। ( উদ্দীপিত ) **Yes, I want** ইরম্মদ—সুন্দর কথাটা।

আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া

এইবার লিখুন—

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ যুড়ি
আরম্ভিলা ভগ্নদূত—হায়, লঙ্কাপতি
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী?
মদকল করী যথা পথে নলবনে—

৩য় পণ্ডিত। মদকল শব্দের অর্থই মত্তহস্তী—আবার করী কেন?

মধু। যা বলছি লিখে যান—

মদকল করী যথা পশে নলবনে
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে

ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে!
শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জনে,
সিংহনাদে, জলধি কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে;

ধনুকের ভাল বাংলা কি? বেশ গালভরা একটা শব্দ বলুন তো! **There is a word.**

৩য় পণ্ডিত। দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—( দেখিলেন ) কোদণ্ড?

মধু। কোদণ্ড, কোদণ্ড! লিখুন—

কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।

মধু। শরের কতকগুলো প্রতিশব্দ দেখুন তো।

৩য় পণ্ডিত। শর, তীর, বাণ, কলম্ব—

মধু। Good—লিখুন—

পদচারণা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘনঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে
মেঘদল আসি যেন আবরিল রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

আবার পিছন দিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া তিনি পদচারণা শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথম পণ্ডিত হাই তুলিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

১ম পণ্ডিত। দত্ত মহাশয়!

মধু। (হঠাৎ চমকাইয়া) **Shut up**—কথা বলেন কেন? কি বলছেন?

১ম পণ্ডিত। (ইতস্তত করিয়া) আমাদের বেতন প্রায় তিন মাসের বাকি পড়েছে—যদি কিছু দিতেন আজ ভাল হ'ত।

মধু। তিন মাসের বাকি পড়েছে! বেশ তো পাবেন।

২য় পণ্ডিত। পাবেন পাবেন তো রোজই শুনছি। আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—

মধু। আপনারা কি মনে করেছেন, আমার হাতে টাকা আছে—অথচ দিচ্ছি না?

৩য় পণ্ডিত। আজ্ঞে, তা নয়—তিন মাসের হয়ে গেল কি না!

মধু। হাতে টাকা এলেই মিটিয়ে দেব—এখন যা করছেন করুন।

(নেপথ্যে)। দত্ত মশায় বাড়ি আছেন?

মধু। **Damn it**—আবার কে এলো!

বাড়ীওয়ালা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওয়ালা। ভাড়াটা কবে দেবেন?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওয়ালা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওয়ালা। ঠিক তো?

মধু। ঠিক।

বাড়ীওয়ালা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন, শুরু করা যাক। লিখুন। কত দূর হয়েছে?

৩য় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে

শনশনে—

পিছনে হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণা শুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামা-জাতীয় লোক একটি প্যাকেট হস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর—

মধু। ও, যেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম ?

খানসামা। জি হুজুর।

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন! It will make Henrietta look like a princess! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন! সুন্দর নয় পণ্ডিত ?

১ম পণ্ডিত। অতি সুন্দর।

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বক্‌শিশ লে যাও।

টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দেনা।

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা! Fine! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি। আজ আর কিছু হবে না। আপনারা আজ যান।

'হেন্‌রিয়েটা' 'হেন্‌রিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগলেন।

## ষোড়শ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবনসীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন, কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening, Pundit!

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—ব'স। কোথায় বসতে দিই তোমাকে! তুমি সাহেব মানুষ—

মধু। Please don't trouble yourself, এই তো বেশ বসেছি।

চৌকিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি?

মধু। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ ক'রে ফেলেছি—ক্ষমা করবে তো?

বিদ্যাসাগর। কি বল তো?

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক কই? There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। চূড়ায় তুলে দিয়ে শেষে মইটি কেড়ে নেবে নাকি? মতলব কি তোমার?

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো? এসব হচ্ছে কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। খিদিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি ক'রে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনলে? হরিমোহন?

মধু। হ্যাঁ। আর বাকি সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে—তা ছাড়া, মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চ'লে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইল; একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তা হ'লে! তোমার 'মেঘনাদ বধ' তো দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে, নয়?

মধু। হ্যাঁ। **Bhudeb has introduced 'মেঘনাদ' in his school. Hemchandra, a real B. A, is editing the school edition.**

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক। 'ব্রজাঙ্গনা' কিন্তু খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই।

মধু। প্রথমে তো তুমি আমাকে মোটে আমলই দিতে চাও নি!

বিদ্যাসাগর। প্রথম প্রথম সত্যিই আমার মনে হয়েছিল তুমি একটি কিম্ভূতকিমাকার অকাল-কুষ্মাণ্ড। এখন ক্রমশ ভুলটি ভাঙছে।

মধু। **My dear Vid, you are great! I prize your opinion above all others, because your admiration is honest, and you are above flattering any man.**

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ। (একটু পরে) এত টাকাকড়ি খরচ ক'রে বিলাত যাচ্ছ—শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে তো?

মধু। বাঃ, সুবিধে হবে না? ব্যারিস্টার হব—**that means a bigger scope for me**—টাকা রোজগার করতে হবে—**I can't rot in poverty!**

বিদ্যাসাগর। টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই

তোমার ঝোঁকটা যে বেশি! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক ক'রে দিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়বে ব'লে, কিন্তু তুমি ফট্ ক'রে ছেড়ে দিলে!

মধু। আমি পারলাম না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ—সবাই ছাড়তে মানা করেছিল—কিন্তু আমি পারলাম না। **It was impossible for me to carry on**—রেখে ঢেকে ওজন ক'রে লেখা আমার কর্ম নয়—'**Citizen**' কাগজে লিখে কি বিপদেই পড়োছলাম!

বিদ্যাসাগর। তুমি তো বিপদে প'ড়েই আছ। আমি ভাবছি কিন্তু 'পেট্রিয়ট' চালাবার মত একটা ভাল লোক পাই কোথা! কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে—কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবছি। কেষ্টদাস পালকেই শেষ পর্যন্ত দিতে হবে দেখছি। হরিশ মারা যাওয়ার পর থেকে কাগজটাতে অভদ্রা লেগেছে। গিরীশ আর হরিশের স্মৃতিচিহ্ন ওই কাগজখানি। ওটা নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। ভাল কথা, শুনছি নাকি নীলকর সায়েব ব্যাটারা হরিশের বিধবার নামেও মোকদ্দমা ক'রে ডিগ্রী করেছে?

মধু। শুনছি। **These planters are demons**—(হাসিয়া) যদিও আমার প্রথম শ্বশুর একজন **planter** ছিলেন—**I mean Rebecca's father**—তবু ওদের সম্বন্ধে আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না। **The rogues!**

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদক—এ কথাটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।

মধু। তা খুব জানি। ওপরওলার কাছ থেকে গুঁতোও খেয়েছি এর জন্যে। **But I don't care. I am sick of this horrid service**—আমায় বিলেত যাওয়ার আর একটা কারণও এই। **I want an independent profession.**

বিদ্যাসাগর। কিন্তু লং সাহেবের মনের জোরটা দেখলে একবার! জেলে গেল, তবু কিছুতেই তোমার নাম প্রকাশ করলে না। সায়েব জাতের গুণই এই। একেবারে ইস্পাত।

মধু। আমাদের কালীপ্রসন্ন সিংহও কম ইস্পাত নয়। লং সায়েবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিলে আদালতে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) সে কথা একশ' বার! সঙ্গদোষে যদি বিগড়ে না যায়, ও-ছোকরার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে। ওর একটা মহৎ কীর্তি হ'ল মহাভারতের অনুবাদ। অনেক টাকা খরচ করেছে। ভাল ভাল পণ্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে—এ কি সোজা কথা! ওর 'হুতোম' কিন্তু সুবিধের হয় নি।

মধু। মহাভারতের পেছনে তুমি রয়েছ যে! হুতোম **is too realistic.**

বিদ্যাসাগর। মহাভারতে আমি আর কি করেছি—যোগাড়-যন্ত্র ক'রে দিয়েছি মাত্র।

মধু। আচ্ছা, তোমার চেহারাটা কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই নাকি?

বিদ্যাসাগর। মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যাবার সময় সেই যে গাড়ি থেকে প'ড়ে গেছলায়—তার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তা ছাড়া, (হাসিয়া) চালকলা-খেকো এ বামুনের চেহারা কোন কালেই কন্দর্পকান্তি ছিল না।

মধু। কে বললে? **In your youth** তুমি সত্যিই কন্দর্পকান্তি ছিলে। **Look at your portrait by Hudson.**

বিদ্যাসাগর। আবার কবিত্ব শুরু করলে তুমি! থাম। তার চেয়ে 'বীরাঙ্গনা' থেকে কিছু পড় দেখি, শোনা যাক। 'বীরাঙ্গনা' কি নিয়ে লিখেছ?

মধু। এ কাব্যখানা পত্রাকারে লেখা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে কতকগুলি নারী-চরিত্র নিয়েছি—তারা যেন তাদের স্বামী

অথবা প্রেমাস্পদকে পত্র লিখে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। Ovid-এর Heroic Epistle-এর ধরনে লিখেছি আর কি!

বিদ্যাসাগর। পড় তো—শুনি।

মধুসূদন পড়িতে লাগিলেন ও বিদ্যাসাগর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন

মধু। প্রথমটাই শোন। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা—

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলা-রাশি, হা নাথ, আকাশে
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে
অমনি চমকি ভাবি মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে পশিছে আশ্রমে
পদাতিক, বাজীরাজি সুরথ সারথি
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা অনসূয়া ডাকি সখিদ্বয়ে
কহি, হেদে দেখ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে।
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে,
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।

বিদ্যাসাগর। অতি উত্তম হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, তোমার এ শকুন্তলা পড়বার পর আমার 'শকুন্তলা' আর কি কেউ পড়বে! (হাস্য)

মধু। বল কি! Your prose is unparalleled! যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' স-গৌরবে বিরাজ করবে। You are another কণ্ব।

বিদ্যাসাগর। তোমার একটা দোষ কি জান? অতিশয়োক্তি। সব জিনিসই অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে তোলা কেমন তোমার একটা বদ্ রোগ! তোমার 'তিলোত্তমা' আর 'মেঘনাদবধে' উপমা আর অলঙ্কারের ভীড় ঠেলে এগোনোই মুশকিল।

মধু। তবু লোকে এগিয়েছে তো!

বিদ্যাসাগর। লোকের এগোনোর কথা আর ব'লো না। কবির লড়াই, বুলবুলির নাচ, দলাদলি, কেরানীগিরি সবেতেই এগোয় তারা। এক ঝাঁক মাছি যেন—মধু, গুড়, বিষ্ঠা সর্বত্রই সমান উৎসাহে ভনভন করছে। ওর থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

মধু। কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনীর অভিনন্দনটা?

বিদ্যাসাগর। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ওটা ওদের রসিকতা নয় তো! রূপোরই হোক আর সোনারই হোক কবিকে মদের গেলাস উপহার দেওয়াটা কি রকম অভিনন্দন বুঝলাম না। (হাসিলেন)

মধু। আমি কিন্তু ঢের বেশী অভিনন্দিত হয়েছি সেদিন চীনেবাজারে।

বিদ্যাসাগর। (সবিস্ময়ে) চীনেবাজারে!

মধু। হ্যাঁ, সেখানে সেদিন এক দোকানদার দেখি নিবিষ্টচিত্তে ব'সে 'মেঘনাদবধ' পড়ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ছেন মশায়? সে বললে—একখানি নূতন কাব্য। বললাম—কাব্য! বাংলা ভাষার ভাল কবিতাই নেই, কাব্য হবে কোথা থেকে! দোকানী কি উত্তর দিলে শুনবে? বললে—সে কি মশায়, মাত্র এই একখানি কাব্যই তো যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) বটে! তারপর?

মধু। তারপর তাকে বললাম—আচ্ছা, একটু প'ড়ে শোনান তো দেখি! সে আমার সাহেবী পোশাক দেখে বললে—এর ভাষা বোধ হয় বুঝতে পারবেন না। বললাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? তখন সে খানিকটা প'ড়ে শোনালে। তারপর তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে আমিও

খানিকটা প'ড়ে শোনালাম তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এই অমিত্রাক্ষর বাংলায় চলবে কি? সে মহা উৎসাহে বললে—খুব চলবে মশাই—এ বাংলায় নূতন সৃষ্টি—মনে হয় এ-ই সর্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি তাকে আত্মপরিচয় না দিয়ে স'রে পড়লাম,—**but I was puffed up like a baloon !**

বিদ্যাসাগর। 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' দেখেছ? (হাসিলেন)

মধু। দেখেছি। ঢাকার জগবন্ধু ভদ্র লিখেছে—বেশ লিখেছে। বেহার থেকেও কে একজন—নামটা ঠিক মনে আসছে না—হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর লিখেছে। কিন্তু তার তেমন নাকি সুবিধে হয় নি।

বিদ্যাসাগর। দেখ, আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে 'মেঘনাদবধ' লিখতে লিখতে কি ক'রে তুমি 'ব্রজাঙ্গনা' লিখলে! একেবারে অন্য সুর!

মধু। ওটা লিখেছি ভূদেবের ফরমাসে। ভূদেব একদিন আমাকে বললে—ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার; তারই ফল 'ব্রজাঙ্গনা'। ভাল লেগেছে তোমার?

বিদ্যাসাগর। চমৎকার! (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষরও হয়তো একদিন ভাল লেগে যাবে—বলা যায় না। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাক, বিলেতে চললে তা হ'লে?

মধু। হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে সাধ—বিলেত যাব। **And go I must.** কল্পনানেত্রে আমি যেন বিলেতটাকে দেখতে পাচ্ছি। টাসোর **Jerusalem Delivered**-এ **Crusader**-রা **Jerusalem**-এর কাছাকাছি এসে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, আমার মনের অবস্থাও অনেকটা তাই—

> **Wing'd is each heart and winged every heel**
> **They fly, yet notice not how fast they fly—**

জাহাজে উঠলে যেন আমি বাঁচি—**I am impatient.**

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধুটি বেশ বিশ্বাসী লোক তো?

মধু। দিগম্বর মিত্তির, বৈকুণ্ঠনাথ মিত্তিরের মত লোক জামিন হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।

বিদ্যাসাগর। দেখো—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে!

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি। সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? হয়েছে!

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর নেই টাকা—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। তার ওপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার ওপর—

মধু। তুমি ইচ্ছে করলে সব পার।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি সব পারি, কেবল একটি কাজ পারি না।

মধু। (হাসিয়া) সে অসম্ভব কাজটি কি?

বিদ্যাসাগর। তোমাদের উপকার করা। চেষ্টা ক'রেও তোমাদের উপকার করা যায় না। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) জান, তারাচাঁদ চক্রবর্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আর একটা ট্রেনিং স্কুল খুলে বসেছে—

মধু। এ রকম করবার মানে?

বিদ্যাসাগর। এই চিরকাল করছ তোমরা। তোমরা টেক্কা দিতে ওস্তাদ, ঘোঁট পাকাতে ওস্তাদ—একটা ছুতো পেলেই হ'ল। সেবার মনে নেই—হীরাবুলবুল ব'লে এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভরতি করা নিয়ে সে কি কাণ্ড! রাজেন দত্ত-টত্ত ঘোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে একটা কলেজই খুলে বসল! মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই উচ্ছন্ন গেল সব। আমি

আর ক'দিক সামলাই বল? সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? (একটু পরে) কিসের জন্য টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জ'মে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে তো before I sail.

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে? চুরি করব?

মধু। You can work wonders if you like! টাকা না পেলে আমি অপমানিত হব। I appeal to your greatness. মহাদেব বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলেই আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। কি মুশকিল—টাকা নেই বলছি—

মধু। দাও ভাই। হাতজোড় ক'রে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাত জোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা-হা, ও কি কর তুমি! দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ধার ক'রে বসবে, তারপর আমাকে ধ'রে টানাটানি!

মধু। My dear Vid—আর ব'কো না, যথেষ্ট হয়েছে—

বিদ্যাসাগর। কিছুদিন আগে 'তত্ত্ববোধিনী'তে তোমার "আত্মবিলাপ" প'ড়ে ভাবলাম যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে, এবার থেকে ভালভাবে চলবে। কিন্তু দেখছি—

মধু। Believe me—ভাল-খারাপ আমি কিছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। You know necessity knows no law.

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার necessity যে রাজকীয় necessity—এই হয়েছে মুশকিল কিনা। কত টাকা চাই তোমার?

মধু। I need a lot! তুমি কত দিতে পারবে তাই বল?

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই?

বিদ্যাসাগর। না।

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) **But I counted upon your greatness.** কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক ব'লে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্গত আবদার করি। রাগ ক'রো না আমার ওপর। **I am helpless creature.** কেন জানি না, কিছুতেই কুলোতে পারি না।

বিদ্যাসাগর। থাকলে দিতুম—কিন্তু আমি নিজেই এখন নিঃস্ব।

মধু। তুমি সাগর, তুমি রত্নাকর—তুমি নিঃস্ব! আমি কি এতবড় অভাগা যে চাইবামাত্র সাগরও শুকিয়ে যাবে! (বিদ্যাসাগরের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া) **My dear Vid—**

বিদ্যাসাগর। আঃ, কি যে কর তুমি! হাত ছাড়—হাতটা ছাড় না।

হাত ছাড়াইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। চ'লে গেল! (হতভম্ব হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন) **No, I can't waste**—টাকাটা যোগাড় করতেই হবে—দেখি, গৌরের কাছে যদি পাই।

চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে বিদ্যাসাগর একটা চেক-বহি হাতে বাহির হইয়া আসিলেন

বিদ্যাসাগর। এ কি, চ'লে গেল নাকি! ছিরু—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সাহেব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় তো—দৌড়ে যা—

চেক কাটিয়া দিলেন

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। **You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.**

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর! দোয়াত-টোয়াত সব উলটে দেবে নাকি!

মধু। সত্যই তুমি সাগর—করুণাসাগর।

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্ক একদম খালি। এর মধ্যে টাকাটা জমা ক'রে দেব যেখান থেকে হোক।

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

পঞ্চম বিরতি

## সপ্তদশ দৃশ্য

ভার্সাই শহরে একটি স্বল্পালোকিত কক্ষ। একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকটি শ্রীহীন চেয়ার ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। দীনবেশে মধুসূদন অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। মধুসূদন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন এবং সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। কড়ানাড়া সমানে চলিতে লাগিল।

মধু। ( শুষ্ক সভয় কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি ) হেনরিয়েটা!

পাশের ঘর হইতে হেনরিয়েটা বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আসন্নপ্রসব

হেনরিয়েটা। Yes, my darling.

মধু। Don't you hear? Somebody knocking—বোধ হয় কোন পাওনাদার এসেছে। ( অসহায়ভাবে ) কি করি?

হেনরিয়েটা। তুমি ভেতরে যাও, আমি কথা কইছি।

কড়ানাড়ার শব্দ উগ্রতর হইল। একটু ইতস্তত করিয়া মধুসূদন পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হেনরিয়েটা আগাইয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিতেই মনোমোহন ঘোষ প্রবেশ করিলেন।

মনোমোহন। Good morning—বউদি যে!

হেনরিয়েটা। ও আপনি! আসুন।

মনোমোহন। আপনারা লণ্ডন থেকে হঠাৎ এখানে চ'লে এলেন যে?

মনোমোহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পাশের ঘর হইতে মধুসূদন সোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিলেন

মধু। মনু—তুমি! এখানে কি মনে ক'রে? অ্যা—ব'স—ব'স—**it is such a relief to see you.**

হেনরিয়েটা। **Excuse me.**

হেনরিয়েটা ভিতরে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন ও মনোমোহন উপবেশন করিলেন

মনোমোহন। I.C.S.-এ ফেল ক'রে ভাবলাম, কি আর করি, আপনার কাছে একটু বেড়িয়ে যাই। (হাসিলেন)

মধু। তুমি ফেল করেছ? **I am so sorry.** সত্যেনের খবর কি?

মনোমোহন। সত্যেন পাস করেছে।

মধু। আমার ধারণা ছিল সত্যেনের চেয়ে তুমি ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

মনোমোহন চুপ করিয়া রহিলেন

মধু। (সান্ত্বনার স্বরে) **Don't collapse my boy. They say failures are but the pillars of success. Look at me.**

মনোমোহন। না, আমি—

মধু। এবার তুমি **Latin Italian** নাও।

মনোমোহন। পারব কি?

মধুসূদন। কেন পারবে না! **It is so easy to learn languages**—এখানে আমি **French**-টা তো প্রায় শিখে ফেললাম। এবার জার্মান, স্প্যানিশ আর পর্টুগীজ আরম্ভ করব ভাবছি।

মনোমোহন। আজকাল লিখছেন না কিছু?

মধু। **Oh yes,** বাংলা সনেট লিখছি। শুনবে?

ডেস্ক হইতে খাতা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন

**Wait a minute, let us moisten our throats a little—**

তাক হইতে মদের বোতল ও দুইটি গ্লাস পাড়িলেন। কিন্তু বোতল উপুড় করিয়া দেখিলেন, বোতলে কিছু নাই।

**Not a drop! How is this**—ওহো, কাল **De Souza** আর **Mandes** এসেছিল—**I forget—my dear Manu, I am—**

মনোমোহন। তাতে হয়েছে কি!

মধুসূদন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল

মধু। **I have ceased to be a gentleman, Manu. This is awful.**

মনোমোহন। ফুরিয়ে গেছে তাতে আর কি হবে! পড়ুন আপনি।

মধুসূদন কিন্তু নিশ্চুপের মত বসিয়া রহিলেন

বউদি আসবার পর আপনি লণ্ডন থেকে চ'লে এলেন যে হঠাৎ?

মধু। **I had to. I was suspended from Grey's Inn.**

মনোমোহন। সাস্‌পেণ্ডেড্‌! কেন?

মধু। ধারের জন্যে। হাতে একটি পয়সা ছিল না, ধার না ক'রেই বা কি করি! তার ওপর তোমার বউদি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে পড়লেন—বাধ্য হয়ে লণ্ডন ছেড়ে পালাতে হ'ল। ভাবলাম, এই পাড়াগাঁয়ে কম খরচে কুলুতে পারব—কিন্তু এখানেও কুলুতে পারছি না ভাই।

মনোমোহন। আপনার টাকা কি আসছে না?

মধু। **Not a farthing**—চারিদিকে কেবল ধার আর ধার—শোধ করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্য।

মনোমোহন। কি যে বলেন!

মধু। **I am not exaggerating—I have become another Micawber.** ওই **De Souza** আর **Mendes**-দের খোসামোদ ক'রে **public charity**-র আশায় জীবন ধারণ করতে হচ্ছে।

মনোমোহন। **This is awful.** আপনার টাকা আসছে না কেন? আপনার পৈতৃক সম্পত্তি তো সব উদ্ধার হয়েছে শুনেছি।

মধু। সব উদ্ধার হয়েছে **and it is worth Rs. 1500 a year. One can easily raise fifteen thousand rupees mortgaging it—**

কিন্তু যাদের উপর ভার দিয়ে এসেছি তারা একটি পয়সা পাঠাচ্ছে না। হেনরিয়েটাকে মাসে মাসে খরচ দেবার কথা ছিল, কিছু দেয় নি। বেচারা নিরুপায় হয়ে শেষে এখানে পালিয়ে এসেছে।

মনোমোহন। এ রকম ব্যবহার করছে কেন তারা?

মধু। **Firstly, because they are rogues; secondly, because they are rogues; and thirdly, because they are rogues.**

উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা ঘুরিয়া

**But I must pull through**—আমাকে বাঁচতে হবে—**I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful, premeditated murders and then be hanged**—ব্যারিস্টার হতে পারি আর না পারি—**I must do this.**

মনোমোহন। আপনার **terms** কি শেষ হয়েছে?

মধু। **Oh no—I have eaten only thirty dinners**—এখনও বেয়াল্লিশটা বাকি।

একটি কাগজে-মোড়া পুঁলিন্দা বগলে করিয়া হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন

হেনরিয়েটা। আমি একটু বেরুচ্ছি।

মধু। কোথায় যাচ্ছ এ সময়? হাতে ওটা কি?

হেনরিয়েটা। (ম্লান হাসিয়া) ও কিছু নয়।

মধু। **I know where you are going**—কি নিয়ে যাচ্ছ দেখি? মনুকে লুকোবার দরকার নেই, সব কথা বলেছি ওকে।

হেনরিয়েটা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মধুসূদন পুলিন্দাটা খুলিয়া দেখিলেন—
একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির হইল

এইটে নিয়ে যাচ্ছ! **No darling, I can't let you pawn this. This was my first present to you after marriage.**

হেনরিয়েটা। ঘরে খাবার নেই। **Most of our trades people have stopped.**

মধু। তা হোক। **I am expecting money by every mail.**

হেনরিয়েটা। ( বিস্মিত ) কে পাঠাবে।

মধু। **The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.**

মনোমোহন। You mean বিদ্যাসাগর ?

মধু। Yes, বিদ্যাসাগর the Great.

দুয়ারে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। মনোমোহন কপাট খুলিয়া দিতেই পিওন প্রবেশ করিল এবং একটি রেজিস্টার্ড খাম মধুসূদনের হাতে দিল

এসেছে—এসেছে—এসেছে—এসেছে—টাকা এসেছে।

উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্তে খামটা তুলিয়া ধরিয়া শিশুর মতো নৃত্য করিতে লাগিলেন

**Henrieta, my darling—will you send for a bottle of Champagne at once.**

## ষষ্ঠ বিরতি

## অষ্টাদশ দৃশ্য

স্পেনসস্ হোটেলে ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্তের সুসজ্জিত ড্রইংরুম। ভোলানাথ ও গৌরদাস বসিয়া গল্প করিতেছেন। উভয়েরই বয়স বাড়িয়াছে।

ভোলানাথ। তোমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলে, আমি কিন্তু জানতাম মধু ঠিক ব্যারিস্টার হয়ে আসবে।

গৌরদাস। বাহাদুরি আছে। এই তো সেদিন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এল, এর মধ্যে কেমন জমিয়ে ফেলেছে দেখেছ!

চাপরাসী কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল

ভোলানাথ। (কার্ড দেখিয়া) ভূদেব এসেছে (চাপরাসীকে) সেলাম দেও।

চাপরাসী চলিয়া গেল। ভূদেব প্রবেশ করিলেন

ভোলানাথ।<br>গৌরদাস। } **Good morning.**

ভূদেব। গুড মর্নিং—ভালই হ'ল তোমরাও এখানে আছ। তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

গৌরদাস। হঠাৎ নিমন্ত্রণ?

ভূদেব। মধু কোথা?

গৌরদাস। চান করছে।

ভূদেব। মধুকে খাওয়াব একদিন। তোমাদেরও সেদিন যেতে হবে।

ভোলানাথ। কবে সেটা?

ভূদেব। দিনটা মধুর সুবিধা অনুসারে ঠিক করতে হবে। মধু এই হোটেলেই থাকবে নাকি চিরকাল?

গৌরদাস। নড়বার তো কোন লক্ষণই দেখছি না।

ভূদেব। এখানে কেন, বাঙালীপাড়ায় গিয়ে থাকলেই পারত।

ভোলানাথ। বিদ্যাসাগরও ওই কথা বলেছিল।

উপবেশন করিলেন

ভূদেব। মধু কি বললে তাতে?

ভোলানাথ। মধু-বিদ্যাসাগর-সংবাদ শোন নি তুমি?

ভূদেব। না।

ভোলানাথ। গৌরের কাছে শোন।

ভূদেব গৌরের দিকে চাহিলেন

গৌরদাস। মধু যেদিন বিলেত থেকে ফিরল সেদিন বিদ্যাসাগর নিজে জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত। মধু জাহাজ থেকে নেবেই did something dramatic—বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে ধ'রে এমন চুম খেতে লাগল যে ব্রাহ্মণের দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

ভূদেব। (সহাস্যে) যাকে-তাকে যখন-তখন জড়িয়ে ধ'রে চুম খাওয়া ওর চিরকালের স্বভাব। তারপর?

গৌরদাস। চুম্বন-পর্ব শেষ হ'লে বিদ্যাসাগর বললে—এইবার যাওয়া যাক চল, তোমার জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকেষ্টর বাইরের ঘরটা সাফসুতরো করিয়ে রেখেছি, সেইখানেই উঠবে চল। মধু বললে—সুকিয়া স্ট্রীটে?

ননসেন্স! সেখানে থেকে ব্যারিস্টারি করা যায় নাকি কখনও! বিদ্যাসাগর বললে—আপাতত চল না, খরচ কম হবে। মধু বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে আর একটি চুম খেয়ে বললে—মাই ডিয়ার ভিড্, ইউ আর এ ডারলিং, কিন্তু তা আমি পারব না। আমাকে বামুনপাড়ায়—মানে, সায়েবপাড়ায় থাকতে হবে। তারপর সোজা এইখানে এসে উঠল।

ভূদেব। এখানকার এত খরচ চালিয়ে যাচ্ছে তো! পরিবার বিলেতে, সেখানেও টাকা পাঠাতে হয় নিশ্চয়! পরিবারকে বিলেতে রেখে এল কেন বল তো?

গৌরদাস। ছেলেমেয়েদের এডুকেশনের জন্যে।

ভূদেব। রোজগার তা হ'লে ভালই হচ্ছে বলতে হবে?

ভোলানাথ। হাজারখানেক টাকা নিশ্চয়!

গৌরদাস। বেশি। কিন্তু মধু আমাদের যে তিমিরে সেই তিমিরে।

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধু। হ্যালো, ভূদেব যে! আর্যপুত্র, কি মনে ক'রে হঠাৎ? আজ ছুটির দিনটা জমবে ভাল দেখছি!

উপবেশন করিলেন

ভূদেব। তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম।

মধু। খৃস্টান ফিরিঙ্গিকে বামুন-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ!

ভূদেব। (হাসিয়া) নিমন্ত্রণ করতে এসেছি 'মেঘনাদবধ'-'বীরাঙ্গনা'র কবিকে—ফিরিঙ্গিকে নয়।

মধুসূদন পুলকিত হইলেন এবং তাহা তাঁহার মুখভাবে ফুটিয়া উঠিল

বাইরে তুমি যতই ম্লেচ্ছ হও না কেন, কাব্যলোকে তুমি দেবতার মত শুচি।

মধু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা বলবে—কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাঁশীর বদলে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন?

চাপরাসী একটি বিল লইয়া প্রবেশ করিল এবং মধুসূদনকে দিল

মধু। Damn it! (চাপরাসীকে বিল ফেরত দিয়া) সাত দিন পরে আসতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল

ভূদেব। তুমি যাচ্ছ কবে তা হ'লে? কাল সুবিধে হবে? কালও ছুটি আছে।

মধু। কাল ভাই পারব না। দ্বারকা হাইকোর্টের জাস্টিস হয়েছে। I am arranging a dinner in his honour.

ভূদেব। ও! তা হ'লে আসছে রবিবার?

মধু। হ্যাঁ, তা হতে পারে।

ভূদেব। আসছে রবিবার বিকেলে তা হ'লে এসো তোমরা। আমি উঠি এখন।

মধু। আমার একটা শর্ত আছে কিন্তু!

ভূদেব। কি বল?

মধু। তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের হাতের দিশী রান্না খেতে চাই। কোন রকম সায়েবিয়ানা করতে পাবে না। আসনে চাপটালি হয়ে ব'সে খেয়ে আসব।

ভূদেব। বেশ, তাই হবে। (হাসিয়া) আমি কিন্তু নিজে কাঁটা-চামচেতে খাই পরিচ্ছন্নতার জন্যে।

মধু। বল কি!

ভোলানাথ। Good, this is news!

গৌরদাস। বিলিতি কাঁটা চামচ?

ভূদেব। বিলিতি নয়, সম্পূর্ণ স্বদেশী। স্যাকরা ডেকে রূপোর কাঁটা-চামচ করিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, উঠি এবার। বাইরের ঘরে তোমার মক্কেলও ব'সে আছে।

চলিয়া গেলেন

মধু। I am sorry I have disappoint you to-night Bholanath.

ভোলানাথ। কেন?

মধু। Salmon পাওয়া গেল না। I ordered twenty tins but they could not supply one.

গৌরদাস। যদি অভয় দাও একটি কথা বলি।

মধু। বল।

গৌরদাস। ঐ বিলটা এসেছিল কোথা থেকে?

মধু। এই হোটেলেরই বিল। That fellow is getting impertinent gradually. I would give him a bit of my mind one day.

ভোলানাথ হাসিলেন

গৌরদাস। তুমি তো চতুর্দিকেই তোমার bits of mind ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ শুনছি। শুনলাম, কাল জ্যাকসন সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

মধু। করব না! লোকটা কালা আদমিকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। আমরা যেন কুকুর-বেরালের সামিল।

ভোলানাথ। হয়েছিল কি?

মধু। কাল argue করছি, ব্যাটা মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে কি-না —the court orders you to plead slowly, the court has ears! আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—but pretty too long, my lord.

ভোলানাথ। Served him rightly.

গৌরদাস। তোমার সাহস তো কম নয় হে! শুনেছি জ্যাকসন যখন চোখে monocle লাগিয়ে তাকায়, তখন বড় বড় জজ ব্যারিস্টারেরও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

মধু। তার monocle আছে. আমারও spring-এর চশমা আছে।

টেবিল হইতে চশমাটা তুলিয়া নাকে লাগাইলেন। ভোলানাথ ও গৌরদাস হাসিতে লাগিলেন।
'বয়' মদের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল—সকলে এক এক গ্লাস তুলিয়া লইলেন

গৌরদাস। মদটা একটু কমানো দরকার এবার, লিভারে ব্যথা হয়েছে।

মধু। (স্মিতমুখে এক চুমুক পান করিয়া) হরিশ ম'রেই গেল!

ভোলানাথ। হরিশের যে মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

মধু। ( বেশ বড়-গোছের একটা চুমুক দিয়া ) হ্যাঁ, মাত্রাজ্ঞান থাকাটা দরকার।—বিশেষত গৌরের—দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কচি বউ।

আর এক চুমুক দিলেন

গৌরদাস। তোমার মেমসায়েবের খবর কি ?

মধু। খবর পাই নি। টাকাও পাঠাতে পারি নি। I shall have to ask Vid again for some loan.

গৌরদাস মুচকি হাসিলেন

ভোলানাথ। তুমি এত রোজগার করছ, অথচ you are always in want—তোমার ব্যাপার কি বুঝি না।

মধু। My dear Bholanath, please do be convinced once for all. ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন, পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। ( উদ্দীপ্ত হইয়া ) Can you tell me why should one cringe and live shabbily ? এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সামান্য কেঁচোর মতো কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে ? What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life ?

গৌরদাস। কিন্তু এমনভাবে ধার ক'রে—

মধু। ধার করি, কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি ব'লেই হাতে টাকা থাকে না। In any civilised country a man of my abilities would roll in wealth.

চাপরাসী প্রবেশ করিয়া মধুসূদনকে একটি কার্ড দিল

মধু। আঃ, ছুটির দিনেও নিস্তার নেই !

গৌরদাস। কে এল আবার !

মধু। আবার কে, মক্কেল ! These beggars seem to think that I am always at their beck and call—ফি দিয়ে মাথা কিনেছে যেন ! ( চাপরাসীকে ) একটু অপেক্ষা করতে বল।

চাপরাসী। আর একটি গরীব ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ থেকে এসে ব'সে আছে হুজুর। কালও সে এসেছিল।

মধু। ও, আচ্ছা, ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে এস, আর এঁকে (কার্ড দেখাইয়া) বসতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল। দীন-দরিদ্র-মূর্তি এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। কি চান আপনি ?

ব্রাহ্মণ। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমার নাম শুনে এসেছি বাবা, আমার জ্ঞাতিরা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা ক'রে আমার ভিটেটি গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে, তুমি দয়া না করলে আমার আর উদ্ধার নেই বাবা। হাতে একটি পয়সা নেই, ধারে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে।

মধু। **Seems to be an artist!** কি করেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ। যাত্রার দলে সখী-সংবাদ গান গেয়ে বেড়াই।

মধু। ( গৌরদাসের দিকে চাহিয়া ) There you are.

গৌরদাস। বেশ ভাল গান ?

ব্রাহ্মণ। বল তো, শুনিয়ে দি বাবা।

আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া ব্রাহ্মণ গলা-খাঁকারি দিয়া সখী-সংবাদ শুরু করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের গলা সত্যই ভাল, তিন জনেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। গান শেষ হইয়া গেলে মধুসূদন আনন্দে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

মধু। Wonderful! কই, দিন আপনার কাগজপত্তর! আমি দেখে রাখব। আপনার কেস করব আমি—

ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার কাগজপত্র বাহির করিয়া দিলেন।

মধু। এগুলো বরং আমার মুন্সীকে দিয়ে যান।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

মধু। চমৎকার গাইলে!

গৌরদাস। বিনা পয়সায় কাজও গুছিয়ে নিলে।

মধু। **Don't say that—he has paid me handsomely.**

ভোলানাথ। যাকগে। আজ সন্ধ্যেয় কি প্রোগ্রাম বল—যতীনের ওখানে ভাল বাঈজীর নাচ আছে, সেখানে যাবে, না, এখানেই এসে জোটা যাবে সবাই ? **Salmon** তো পাওয়া যায় নি !

মধু। তাতে কি হয়েছে—**I shall compensate it by Meckerel.**

চাপরাসী প্রবেশ করিল

চাপরাসী। একজন পণ্ডিতমশাই দেখা করতে এসেছেন।

মধু। কে পণ্ডিত এল আবার !

চাপরাসী। বললেন, তিনি আপনাকে পাঠশালায় পড়িয়েছেন।

মধু। ও, ডেকে নিয়ে এস।

চাপরাসী চলিয়া গেল। এক বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও হেঁট হইয়া পদধূলি লইলেন

পণ্ডিত। দীর্ঘজীবী হও। আমি সাগরদাঁড়ি থেকে আজ সকালে এসেছি, এখানে কাউকে তেমন তো চিনি না, তুমি দেশবিখ্যাত কৃতী পুরুষ হয়েছ ব'লেই তোমার ঠিকানাটা সহজেই পাওয়া গেল, তাই এলাম এখানেই।

মধু। বেশ করেছেন। আপনি ভেতরেই চলুন। হাত পা ধুয়ে আরাম ক'রে বসবেন। আসুন—এই দিকে।

পণ্ডিতকে ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন

গৌরদাস। লোকটা বাইরে খাঁটি সায়েব অথচ অন্তরে খাঁটি বাঙালী। আশ্চর্য !

ভোলানাথ। **He is a poet—always warbling on the branch of Poesy, like the**

**Sweet bird, whose bower is ever green**
**Whose sky is ever clear**
**Who has no sorrow in his song**
**No winter in his year.**

সুখে দুঃখে সর্বদাই ও মশগুল হয়ে রয়েছে !

কার্ড লইয়া চাপরাসীর প্রবেশ

ভোলানাথ। মনু এসেছে। ডাক।

যুবক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। **Good morning.**

ভোলানাথ। **Good morning.**

মনোমোহন ঘোষ প্রত্যভিবাদন করিয়া বসিলেন

মনোমোহন। **Mr. Dutta is in I hope.**

গৌরদাস। হঁ্যা। এটি কে?

ভোলানাথ। একে চেন না—এটি ডাক্তার দুর্গাচরণের ছেলে—এবার **B. A.**-তে **Latin**-এ **first** হয়েছে। ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেন্দ্রনাথ উপবেশন করিলেন

মনোমোহন। ও **I. C. S.** পড়তে বিলেত যাচ্ছে। মিস্টার দত্তের কাছে নিয়ে এলাম **to get some books on Latin.** উনি দেবেন বলেছিলেন।

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধু। হ্যালো! মনু না কি? কি খবর? (সুরেন্দ্রকে দেখিয়া) ও! ল্যাটিনের কিছু বই দেব বলেছিলাম, খুঁজে দেখছি একটিও নেই—**most probably I pawned everything in London.**

হাসিলেন

মনোমোহন। কতকগুলো ভাল ভাল বইয়ের নাম ব'লে দিন তা হ'লে।

মধু। তার আগে জানা দরকার ওর বিদ্যে কতদূর। আচ্ছা, এক কাজ কর দিকি—এই **Horace** থেকে এই **passage**-টার ব্যাখ্যা লেখ দিকি **in your own Latin.**

শেল্‌ফ্‌ হইতে বই পাড়িয়া দিলেন

এই নাও, কাগজ আর পেন্সিল।

কাগজ পেন্সিল ও বই লইয়া সুরেন্দ্রনাথ টেবিলের এক ধারে গিয়া বসিলেন

মধু। গৌর, তোর কাছে টাকা আছে কিছু?

গৌর। এখনই চাই?

মধু। এখনই।

গৌরদাস। কত আছে দেখি—বেশী নেই বোধ হয়।

ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিলেন

কুড়ি টাকা আছে।

মধু। মাত্র? আচ্ছা, ওতেই হবে—দে।

গৌর টাকা দিলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) কি হবে এখন টাকা?

মধু। পণ্ডিত মশাইকে কিছু প্রণামী দেওয়া উচিত নয়? আমার হাতে একেবারে কিচ্ছু নেই আজ। মাত্র কুড়ি টাকা দিলে অশোভন হবে না তো?

ভোলানাথ। কিছু অশোভন হবে না। এক টাকার বেশী সাধারণতঃ কেউ দেয় না।

মধু। আমি সাধারণ লোক নই বন্ধু, সাধারণ নিয়ম আমার সম্বন্ধে খাটে না। How dare you!

টাকা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। যে রকম রেটে খরচ ক'রে চলেছে, দুদিন পরে কি যে হবে তাই ভাবি।

ভোলানাথ। ভেবে লাভ কি বল? Can you stop him? একটু কিছু বলতে গেলেই his temper flares up.

মনোমোহন। God save me from his temper! কাল বার-লাইব্রেরিতে যা কাণ্ড—

মধুসূদন ফিরিয়া আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া খাতাখানি তাঁহার হাতে দিলেন

মধু। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যা বলবার মনুকে বলব।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। মধুসূদন খাতাখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পড়া শেষ হইলে বিরক্তির সহিত সেটা টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিলেন

যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে! এর নাম কি ল্যাটিন—ছি ছি ছি! আমি কতকগুলো বইয়ের নাম লিখে দেব সেইগুলো ভাল ক'রে পড়তে ব'লো।

মনোমোহন। এখনই দেবেন কি ?

মধু। আজ আর সময় হবে না, আর একদিন এসো।

মনোমোহন। আচ্ছা, কাল একটা মক্কেল আনব আপনার কাছে। জেজুরগাঁয়ের রাধাকিশোর ঘোষ। আমিই তার কেসটা করছি—দু-একটা পয়েন্টে শুধু আপনার ওপিনিয়ন চাই।

মধু। বেশ, এস।

মনোমোহন। আপনার ফি কত আনতে বলব ?

মধু। তোমার মক্কেলের কাছ থেকে আমি ফি নেব কেন, তুমি নাওগে যাও।

মনোমোহন। সে আপনাকেও কিছু দিতে চায়।

মধু। নিতান্তই যদি কিছু দিতে চায়—একটা **Bargundy, half a dozen beer** আর শ'খানেক মালদ'র আম পাঠিয়ে দিতে ব'লো।

মনোমোহন। ( হাসিয়া ) আচ্ছা, তাই বলব। আমি চলি তা হ'লে।

মধু। এসো। কালকে ডিনারের কথাটা মনে আছে তো ? কার্ড পেয়েছ ?

মনোমোহন। পেয়েছি। আচ্ছা—Good-bye.

মধু। Good-bye.

গৌরদাস, ভোলানাথ 'নড্' করিয়া সারিলেন। মনোমোহন চলিয়া গেলেন

মধু। আজ ছুটির দিনের সকালটা ভাবলাম কাব্য আলোচনা ক'রে কাটাব, তাই তোমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম ; কিন্তু আজই ঝামেলার পর ঝামেলা—**one after another !** "সিংহলবিজয়" শুনবে নাকি ?

ভোলানাথ। নিশ্চয় শুনব।

গৌরদাস। সেই আশাতেই তো ব'সে আছি।

মধু। তা হ'লে শুরু করি।

উঠিয়া গেলেন এবং ড্রয়ার খুলিয়া একটি খাতা বাহির করিয়া আনিলেন

ভোলানাথ। কতদূর হয়েছে ?

মধু। রাজনারায়ণের হুজুকে প'ড়ে শুরু করেছি মাত্র—বেশী লিখি নি এখনও।

ভাল করিয়া বসিলেন

'মেঘনাদবধে' হোমার আমার আদর্শ ছিল—এতে আমার আদর্শ হচ্ছে ভার্জিল অর্থাৎ ইনিড্। শোন—

স্বর্ণ-সৌধে সুধাধারা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা-নগরে
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।

চাপরাসী প্রবেশ করিল

চাপরাসী। হুজুর, সেই মক্কেলটি—

মধু। আঃ, জ্বালাতন করলে তো—আর একটু বসতে পারছেন না তিনি! এসেছেন তো ছুটির দিনে—

চাপরাসী। একটু ব্যস্ত হচ্ছেন।

মধু। ব্যস্ত হচ্ছেন তো যেতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল। মুন্সী দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিলেন

মুন্সী। আমার কাজ হয়ে গেছে। যাব কি?

মধু। সব কাজ হয়ে গেছে? ওই যে কে একজন এসে ব'সে আছে?

মুন্সী। তাঁর কাগজপত্র সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দিলেই হবে। আমি থাকতাম, কিন্তু আমার ছেলেটির অসুখ।

মধু। ও, তা হ'লে যাও। হ্যাঁ, শোন—( হাসিয়া ) **Won't you have a peg before you go?** বয়টাকে বল আমাদেরও দিয়ে যাক।

মুন্সী সহাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন পুনরায় কাব্যপাঠ শুরু করিলেন

হ্যাঁ, কোথায় পড়ছিলাম—

ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।

কষি' সতী শশীমুখী সখীরে কহিলা
'হেদে দেখ শশীমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে
বিজয়—'

চাপরাসী প্রবেশ করিয়া একটি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল

মধু। আবার কি! ও, ডাকের চিঠি—এ কি! হেনরিয়েটার লেখা দেখছি!

খুলিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিলেন

বাই জোভ!

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গৌরদাস। কি হ'ল? কোন দুঃসংবাদ নাকি?

মধু। হেনরিয়েটা চিঠি লিখেছে—ওরা আসছে।

ভোলানাথ। কবে?

মধু। সম্ভবত আজই। মহা মুশকিল হ'ল দেখছি—সপরিবারে তো হোটেলে থাকা যাবে না—তা ছাড়া it will tell on my prestige—একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে—(সহসা) হয়েছে, আচ্ছা লাউডন স্ট্রীটের সে বাড়ীটা কি খালি আছে?

গৌরদাস। সে তো প্রকাণ্ড বাড়ী—একটা palace বললেই হয়!

মধু। (সাগ্রহে) Yes, I shall have that palace.

গৌরদাস। ভাড়া মাসে ৪০০৲।

মধু। My dear G. D. Bysak, please don't shatter my dreams—ওই বাড়ীই চাই আমায়—ভাড়া যতই হোক। Come, let us fix it up immediately— এসব থাক্ এখন। ভোলানাথ, ওঠ—

একতাড়া খাম লইয়া চাপরাসী পুনরায় প্রবেশ করিলেন

মধু। Ghoh! আবার কি?

খামগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন

ভোলানাথ। কি ওগুলো?

মধু। (বিরক্তিভরে) বিল—বিল—বিল—বিল—বিল।

একে একে টেবিলের উপর খামগুলি আছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন

চাপরাসী। সবাই বাইরের ঘরে ব'সে আছে।

মধু। বল, এখন দেখা হবে না।

চাপরাসী চলিয়া গেল

আমরা এই দিক দিয়ে পালাই চল। এস, এস, আর দেরি ক'রো না, ওঠ—ওঠ।

গৌরদাস ও ভোলানাথকে একরূপ জোর করিয়া টানিয়া লইয়া আর একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন

## ঊনবিংশ দৃশ্য

বেনিয়াপুকুর রোড ধরিয়া চিন্তিতমুখে গৌরদাস চলিয়াছেন। বিপরীত দিক হইতে ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন

ভূদেব। গৌরদাস যে, কোথায় চলেছ? আমাদের মধুর খবর কি?

গৌরদাস। মধুকে দেখতে যাচ্ছি।

ভূদেব। কি খবর তার? আমি অনেক দিন এখানে ছিলাম না। সে তার 'হেক্‌টারবধ'খানা আমার নামে উৎসর্গ করেছে—তার পর আর তার সঙ্গে দেখাই করতে পারি নি। তার খবর ভাল তো?

গৌরদাস। খুব শোচনীয়।

ভূদেব। কি রকম?

গৌরদাস। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক—সব দিক দিয়ে শোচনীয়।

ভূদেব। ব্যারিস্টারিতে তো মাঝে তার নামডাক শুনেছিলাম, আজকাল অবশ্য তেমন শুনতে পাই না। শোচনীয় অবস্থা বলছ? ব্যারিস্টারিতে কিছু হচ্ছে না নাকি?

গৌরদাস। মাঝে সে ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজারি করতে গিয়েছিল।

ভূদেব। স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে চাকরি নিতে গেল কেন?

গৌরদাস। বাধ্য হয়ে—ঋণের দায়ে। লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে এমন খরচ করতে লাগল যে, সে আর কি বলব ভাই!

ভূদেব। এখন তা হ'লে চাকরিই করছে?

গৌরদাস। না, চাকরিও গেছে। ও কখনও চাকরি করতে পারে? বহুকাল আগেই ছেড়ে দিয়েছে।

ভূদেব। কি করছে তা হ'লে এখন?

গৌরদাস। ঋণে জর্জরিত হয়ে অসুখে ভুগছে।

ভূদেব। লাউডন স্ট্রীটেই আছে এখনও?

গৌরদাস। না, এখন এই বেনেপুকুর রোডেই আছে। এখানকার বাড়ীভাড়াও অনেক বাকি। আমরা চেষ্টা করছি উত্তরপাড়ায় জয়কেষ্ট মুকুজ্জের লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতে—আর কিছু না হোক, বাড়ীভাড়াটা লাগবে না।

ভূদেব। আহা, বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে তো! চল যাই তোমার সঙ্গে। অনেক দিন দেখি নি তাকে।

গৌরদাস। এস।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

## বিংশ দৃশ্য

**বেনিয়াপুকুর রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭৩ খৃঃ, মার্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন তাহা সাহেবী ফ্যাশানে মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেল্‌ফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দিকে হোমার, দান্তে, ভার্জিল, তাসো, শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তরনির্মিত, কোনটা ধাতুনির্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন-দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখশ্রী অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে**

ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন

হেনরিয়েটা। ভূদেববাবু গৌরবাবু চ'লে গেলেন?

মধুসূদন নীরব

এমনভাবে চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সাহেবী পোশাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় ক'রে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এরা দুঃখিত হলেন আমার পোশাক দেখে, আর বিলেতে গোল্‌ডস্টুকারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে। Strange!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন

এলোমেলো কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পঞ্চকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে। (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িতে সেই বিশাল বাদামগাছটা—আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। সেই বটগাছটাও—যার তলায় ব'সে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে—শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম। সব ঠিক আছে—আমি ফুরিয়ে গেলাম। The end so quickly!

হেনরিয়েটা। Oh don't, dear.

মধু। Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

But I cannot kill my thoughts। যতক্ষণ বেঁচে আছি, ভাবতে হবে—this brain is a terrible machine!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন

**Did I not fight my utmost, Henrietta?** **কত কি করলাম!** বিলেত গেলাম—ব্যারিস্টার হলাম—হাইকোর্টে চাকরি নিলাম—আবার ব্যারিস্টারি করলাম—পুলিশকোর্টে চাকরি নিয়ে গেলাম—ফের ব্যারিস্টারি করছি।

হেনরিয়েটা। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

মধু। ঠিক হয়ে যাবে? (হাসিয়া) **I envy your optimism.**

হেনরিয়েটা। কেন এমন করছ তুমি আজ? শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে?

মধু। **I am not sorry for myself**—তোমাদের কোন ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলাম না—এইটেই আমার দুঃখ। শর্মিষ্ঠার বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি—**I have done a great duty—I hope Floyd will make her happy.** (সহসা) মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকে মনে আছে তোমার? **It was lovely.**

আবার চুপ করিয়া গেলেন

হেনরিয়েটা। (স-স্নেহে তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন) শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে আজ?

মধু। যা হয়েছে তার চেয়ে আর কি হতে পারে! গলায় ঘা হয়েছে, পেটে জল হয়েছে, পিলে হয়েছে—রক্ত বমি করছি। এখনও অন্ধ হয়ে যাই নি—**this much is wanting! Milton became blind**—হোমারকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়েছিল—**Virgil, Ovid, Dante were exiled—Tasse, Bunyan were imprisoned! I don't expect a better lot. I shall die the gloriously miserable death of a poet.** এইটুকু শুধু দুঃখ যে, তুমিও আমার সঙ্গে কষ্ট পেলে। **You have shared my miseries but cannot share my glories. The future will remember poet Madhusudan, but not Henrietta who inspired him. This idea is**—(সহসা উদ্দীপ্ত

হইয়া) Why did you stick on to me—you foolish woman! রেবেকা আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে গেল—দেবকী slipped away from my fatal grasp—why did you stick on?

হেনরিয়েটা। (অসহায়ভাবে) এমন করছ কেন তুমি? একটু স্থির হও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুসূদন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন

মধু। সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠিক। (সহসা) সত্যি ক'রে বল তো Henrietta—were you happy with me? পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এদিকে এস না—

হেনরিয়েটা সামনের দিকে আসিলেন

হেনরিয়েটা। Need I say that in so many words! লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে যে সুখে ছিলাম আমরা, তেমন সুখ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ি—

মধু। Wait, wait, you will get time enough to live on memories. Don't exhaust them now. (সহসা হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া), এ কি, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে! কখন থেকে জ্বর হয়েছে আবার?

হেনরিয়েটা। না, জ্বর হয় নি আমার—ও কিছু নয়।

মধু। কিছু নয় কি! ডাক্তার পামারকে খবর পাঠাই কাকে দিয়ে?

হেনরিয়েটা। Don't you worry. আমার বিশেষ কিছু হয় নি। আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা বলছেন, কবিরাজি করাতে। Why not try a Kaviraj, dear.

মধু। I cannot degrade myself.

বাহিরে একটা কোলাহল ও বচসা শোনা যাইতে লাগিল

হেনরিয়েটা। Oh, dear—

বয়-ভৃত্যের প্রবেশ

বয়। বিল নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক—ভিতরে আসতে চাইছে —গালাগালি দিচ্ছে।

হেনরিয়েটা। এখন যেতে বল—বল, সায়েবের শরীর খারাপ—

বয় চলিয়া গেল

মধু। Henrietta, this is hell. (সহসা উঠিয়া) Please let me go—I shall plead guilty—I shall tell them that I am a pauper now—এক কপর্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর ক'রো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।

হেনরিয়েটা। Please don't—please—

তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন।
অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিলেন—মুখে বিচিত্র হাসি

মধু। Am I not playing my part well! Marvellous —isn't? (সহসা) যাও, তুমি শোও গে যাও—জ্বর গায়ে ব'সে থাকবার দরকার নেই। Give me that bottle of Brandy and Dante's Inferno.

হেনরিয়েটা। Now, don't excite yourself.

হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে মধুর আদেশ পালন করিলেন—ব্রাণ্ডি ও
'ইন্‌ফার্নো' আগাইয়া দিলেন

হেনরিয়েটা। আমার যা দু-একখানা শৌখীন কাপড় গয়না এখনও বাকি আছে—সব বিক্রি ক'রে দাও। আমাদের এই আসবাবপত্র যা-কিছু আছে সব বিক্রি ক'রে দাও—ঋণ শোধ ক'রে ফেল—তুমি সুস্থ হও—আবার সব হবে।

মধু। (মিনতি করিয়া) Do leave me alone, Henrietta. যাও ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়—You are ill, my dear. Go—

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—মধুসূদন নির্জলা ব্রাণ্ডি খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া 'ইন্‌ফার্নো'-খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল ও একখানি কার্ড দিল।

( কার্ডখানি দেখিয়া ) সাহেবকে আসতে বল।

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও
যথারীতি অভিবাদন করিলেন

Good afternoon মনু—এস। I hope you have not come to remind me of my debts !

মনোমোহন। ( সহাস্যে ) What rot !

মধু। ( সহসা ) উঃ, বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণটাও যদি শোধ ক'রে যেতে পারতাম ! ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার, অথচ they are the people I respect most.

আবার মদ্যপান করিলেন

Will you have a drop, মনু ?

মনোমোহন। No thanks. কিন্তু আপনি এ করছেন কি ? চারিদিকে কপাট জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে নির্জলা মদ খাচ্ছেন !

মধু। ( সহাস্যে ) There is no doubt about it.

মনোমোহন। এর পরিণাম কি জানেন ?

মধু। জানি না ? গলায় ছুরি বসালেও পারতাম—but this is a process equally sure but less painful.

মনোমোহন। ( হাসিয়া ) আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! দিনকতক একটু নিয়মে থাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু। ( আর একপাত্র পান করিয়া ) হেনরিয়েটাও এতক্ষণ ঠিক ওই কথাই বলছিল আমাকে। সে মেয়েমানুষ, তার মুখে ওসব কথা মানায়। But you are not only a man but a clever barrister—you should not talk nonsense.

মনোমোহন। কি আশ্চর্য ! এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন বলুন তো ?

মধু। Do you think I want to die? Do you think I want to leave this beautiful world? No. But the fact is there is no way out of it. তা ছাড়া, আমার এখন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। Why should I drag on this miserable existence any more? Why should I?

মনোমোহন। বাঁচতে হবে বই কি আপনাকে—we cannot afford to loss a genius like you.

মধু। But the genius is dead long ago. আমি এখন তার প্রেতাত্মা—genious in another sense of the word! A dead volcano.

মনোমোহন। কি যে বলেন আপনি!

মধু। ঠিকই বলছি। (একটু পরে) অনেক আগেই আমার ম'রে যাওয়া উচিত ছিল।

মনোমোহন। এ কথা বলছেন কেন?

মধু। 'সধবার একাদশী' পড়েছ? দীনবন্ধু has become popular at my cost! By the bye, where is বঙ্কিম? He is the coming light, I would like to see him.

মনোমোহন। দীনবন্ধুর কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ যে আপনি তা কে বললে?

মধু। কে আবার বলবে! Am I a fool?

মনোমোহন। না না, ওটা আপনার ভুল। দীনবন্ধু নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, মধু কি কখনও নিম হয়?

মধু। এ রসিকতা থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

মনোমোহন। এ আপনার অন্যায় রাগ কিন্তু!

মধু। আমি রাগ করি নি—I have appreciated the satire—I admit he has got a powerful pen—but still it hurts. কেমন আছে সে আজকাল? শুনেছিলাম সেও অসুস্থ—

মনোমোহন। তাঁর ডায়াবিটিস্ হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন

মধু। ( সহসা ) আমি কি সত্যই নিমে দত্তের মত ?

মনোমোহন। **Far from it!** আপনার মত চরিত্র—

মধু। ( বাধা দিয়া ) আমার চরিত্রে প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—**I am reckless, tactless, thoughtless, and everything-less.**

মনোমোহন। বলেন কি! এক বিদ্যাসাগর ছাড়া আপনার মত মহানুভব লোক তো আমি আর দেখি নি।

মধু। **You are a darling** মনু। **But don't try to delude me. I understand you and thank you.**

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন

মধু। মনে হচ্ছে—( থামিয়া গেলেন )

মনোমোহন। কি মনে হচ্ছে ?

মধু। মনে হচ্ছে সারাজীবন ধ'রে কোন্ মরীচিকার পেছনে ছুটলাম এতদিন—কাব্য ? যশ ? টাকা ?

মনোমোহন। আপনার মত লোকের কখনও টাকা হতে পারে ?

মধু। আমি তো টাকা চাই নি—আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ জীবনে তা আর হ'ল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল!

মনোমোহন। সব হবে আবার—আপনি একটু সামলে উঠুন।

বয় প্রবেশ করিল ও একটি ডাকের চিঠি দিয়া গেল

মধু। ( পত্র পাঠান্তে ) সকলেই ভদ্রলোক! সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করতে চায়!

মনোমোহন। কার চিঠি ?

মধু। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্জের—লিখেছে তাদের লাইব্রেরি-ঘরটায় গিয়ে থাকতে। সাদরে আহ্বান করেছে।

মনোমোহন। বেশ তো, যান না।

মধু। হ্যাঁ, যাব বই কি। (সহসা) Do you realise what it really means? কিন্তু না—I am talking nonsense—যাব—তুমি একটা বজরা যোগাড় ক'রে দাও—Yes, I want a little respite—পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি।

মনোমোহন। বউদি কোথা?

মধু। তার খুব জ্বর—যাও না, দেখে এস, পাশের ঘরেই আছে—তোমার সঙ্গে তো কোন formality নেই—বয়টাকে ডেকে একটা খবর দিয়ে যাও।

মনোমোহন ভিতরের দিকে গেলেন। নেপথ্যে 'বয়' 'বয়' ডাক শোনা গেল। মধুসূদন আবার খানিকটা মদ্যপান করিলেন ও 'ইন্‌কার্নো'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা গোবর্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন পাওনাদার

গোবর্ধন। নমস্কার দত্ত সাহেব!

মধু। এ কি, গোবর্ধন যে! এস।

গোবর্ধন। আপনার চাকরটা ঢুকতেই দেয় না—এ তো এক মুশকিল! সে ভেতরে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি। আপনার অসুখ নাকি?

মধু। হ্যাঁ, ভাল নেই শরীরটা। তারপর খবর কি?

গোবর্ধন। খবর ভালই।

মধু। দিগম্বর ভাল আছে?

গোবর্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (একটু ইতস্তত করিয়া) টাকাটার কোন ব্যবস্থা হ'ল?

মধু। কিচ্ছু হয় নি।

গোবর্ধন। অনেক দিন ধ'রে প'ড়ে রয়েছে টাকাটা—

মধু। (সহাস্যে) এই সমস্ত ফার্নিচারই তো তুমি দিয়েছিলে—না?

গোবর্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। এইগুলোই তুলে নিয়ে যাও and release me. ওই bust-

গুলোও নিয়ে যাও—অনেক দাম দিয়ে বিলেত থেকে কিনে এনেছিলাম ওগুলো—ওই বইগুলোও—সব নিয়ে যাও—সব নিয়ে যাও—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? Take them all!

গোবর্ধন। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে, সে কি হয়! টাকা হ'লে দেবেন এখন পরে। আমি শুধু এমনি খবর নিতে এসেছিলাম। যাই তা হ'লে—নমস্কার!

গমনোদ্যত

মধু। ওহে, শোন শোন—আমার কতকগুলো অপ্রকাশিত কবিতা আছে। নেবে? নাও তো দিতে পারি। বিক্রি করলে কিছু পেতে পার।

গোবর্ধন। আজ্ঞে না। টাকা যখন হয় দেবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না ওর জন্যে—

চলিয়া গেলেন

মধু। অনুগ্রহ! গোবর্ধনের মত লোকও অনুগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে আমাকে! আর কেন? Out, out brief candle.

মনোমোহন ঘোষ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ

মনোমোহন। আচ্ছা, আপনি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন বলুন দেখি!

মধু। কি?

মনোমোহন। আপনি এ কবিতা লিখেছেন কেন? বউদিদি এই কবিতাটি পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন! ছি-ছি, ভারি অন্যায় আপনার! এটা নাকি আপনার ওয়েস্‌ট্ পেপার বাস্কেটে পড়ে ছিল—শর্মিষ্ঠা কুড়িয়ে পেয়েছে।

মধু। ও সেই কবিতাটা! আজকাল কোথায় যে কি ফেলি মনে থাকে না আমার। রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা এনে কোথায় যে হারালাম! কবিতাটা দেখি—

মনোমোহন। এ কবিতা লেখা কি আপনার উচিত হয়েছে?

মধু। Why not? I am digging my own grave, why shall not write my own epitaph too? ওটা দাও আমাকে।

মনোমোহনের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন ও চেয়া বিকৃত স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষী তীরে
জন্মভূমি—জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

পড়িয়া একটু হাসিলেন। মনোমোহন মাথা নীচু করিলেন। মধুসূদন আবার আবৃত্তি করিলেন

জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম—

শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন

## শেষ দৃশ্য

১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৯শে জুন, রবিবার। বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে 'বঙ্গদর্শনে'র ফাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের এক হস্তে ফরসির নল, অন্য হস্তে লেখনী। রাত্রিকাল। সহসা দুয়ার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—বগলে একগাদা বই। মধুসূদনকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

বঙ্কিম। এ কি, আপনি! আপনি এ সময়ে হঠাৎ! বসুন।

মধু। ( উপবেশনান্তে ) তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল! লিখছিলে নাকি? কি লিখছ?

বঙ্কিম। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যে লিখছি—

মধু। Good! তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' পড়েছি—চমৎকার হয়েছে—চমৎকার! তোমার 'বঙ্গদর্শন'ও সুন্দর হচ্ছে! **You have created real romances in our literature, I congratulate you.** আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম—**I hope you will take care of them**—দেখ, জীবনে অনেক কিছু করব মনে করেছিলাম। আরও ঢের ভাল কাব্য লেখবার ইচ্ছে ছিল আমার—ইচ্ছে ছিল ভাল গদ্যও রচনা করব—শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিছুই আর হয়ে উঠল না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। **I hope you will do what I could not.**

বঙ্কিম। আপনার অসুখ শুনেছিলাম—

মধু। ( সহাস্যে ) **I have been cured now. I am going out for a long change.**

বঙ্কিম। কোথায়?

মধু। ঠিক জানি না।

বঙ্কিম। ফিরবেন কবে?

মধু। তাও ঠিক জানি না। এবার উঠি—সময় নেই বেশী আমার—**God bless you, my boy—keep the flag flying—Good-bye.**

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

( নেপথ্যে ) বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন নাকি?

বঙ্কিম। আছি—আসুন।

জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন

ভদ্রলোক। খবর শুনেছেন? আপনাদের কবি মাইকেল মধুসূদন মারা গেছেন।

বঙ্কিম। ( সবিস্ময়ে ) মারা গেছেন? মাথা খারাপ হ'ল না আপনার!

ভদ্রলোক। এইমাত্র কোলকাতা থেকে একজন লোক এল, তারই মুখে শুনলাম। আজই মারা গেছেন—আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে। উত্তরপাড়ায় জয়কেষ্ট মুখুজ্জের লাইব্রেরিতে ছিলেন—সেখানে বাড়াবাড়ি হওয়াতে আলিপুর হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে। সেখানেই মারা গেছেন।

বঙ্কিম। ( হাসিয়া ) একেবারে বাজে গুজব।

ভদ্রলোক। কি যে আপনি বলেন মশায়! শুধু তিনি নন, তাঁর মেমসাহেবও মারা গেছেন—তিনিও ভুগছিলেন। তবে তিনি হাসপাতালে মরেন নি—বেনেটোলার বাড়ীতে মরেছেন—স্বামীর আগেই মারা গেছেন শুনলাম।

বঙ্কিম। মশাই, আপনি আসবার ঠিক আগে এই বইগুলো—(সবিস্ময়ে) কই, বইগুলো কোথা গেল—তাই তো, বইগুলো এইখানে ছিল যে—এ কি!

ভদ্রলোক। কি বই?

বঙ্কিম। এইখানে ছিল যে বইগুলো – কি আশ্চর্য!

ভদ্রলোক। অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন, শুনলে চোখের জল রাখা যায় না।

বঙ্কিম। মধুসূদন মরে নি—মরতে পারে না—অসম্ভব।

॥ যবনিকা ॥

# বনফুলের আরও গল্প

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

আই. এ. পি. কোং লিঃ
৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৪৬

মুদ্রাকর :
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

সহধর্ম্মিণী

# শ্রীমতী লীলাবতী দেবী

করকমলেষু—

১৩-৮-৩৮
ভাগলপুর।

প্রথম সংস্করণের

# নিবেদন

শুনিতে পাই গ্রন্থের বাজারে ছোট-গল্পের চাহিদা নাই। এই প্রবল জনশ্রুতি সত্ত্বেও আমার ছোট গল্পগুলি পুনরায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছি ; তাহার কারণ গ্রন্থকার হইবার বাসনা প্রবলতর। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই সুতরাং আমি এমন একদল পাঠকপাঠিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আশান্বিত হইতেছি যাঁহারা গল্পের রসাস্বাদনের জন্য ফুট, ইঞ্চি, সের, ছটাক জাতীয় মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল নহেন।

সব কল্পনা অলীক নহে ইহাই ভরসা।

১১-৮-৩৮
ভাগলপুর

"বনফুল"

দ্বিতীয় সংস্করণের

# নিবেদন

ছয় বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। ইহার জন্য লেখক, পাঠক, প্রকাশক কে দায়ী জানি না। তথাপি দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে তো! কল্পনা সুতরাং অলীক নহে।

৯-৫-৪৪
ভাগলপুর

"বনফুল"

# সূচীপত্র

# বনফুলের আরও গল্প

সুন্দর জ্যোৎস্না!

চারিদিকে জনমানবের সাড়া নাই। গভীর রাত্রি। দূর হইতে নদীর কলকল-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নির্জ্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। স্বপ্ন-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছি, জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। কুৎসিত জিনিসও সুন্দর হইয়া উঠিল। ওই পচা-ডোবাটাও যেন জরিদার কাপড় পরিয়া মোহিনী সাজিয়াছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও রূপালি আবেশ।

নির্জ্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। তাহারই প্রতীক্ষায়। তাহারই প্রতীক্ষায় এই গভীর রাত্রির সমস্ত জ্যোৎস্নাও যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসিতেছে।—হ্যাঁ ওই যে। সর্ব্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা তাহার নূপুর শিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।…ওই সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

সহসা একটা দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায় শাণিত ছোরাটা চক্-চক্ করিয়া উঠিল। রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি—একি, এ যে আমারই বিবেক।

# ঐরাবত

## এক

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয় বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্ম্মিক—প্রচণ্ড সংযমী—অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন—তিনবার দন্তধাবন করিতেন—দুইবেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মত স্বাস্থ্য। লেখা-পড়াও জানিতেন—শোনা যায় তিনি বি-এ পাশ। দরিদ্র নন—খাইবার পরিবার সঙ্গতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈত্রিক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার মৌলিকতা। এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপত এই। তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই কার্ব্বলিক লোশনে ভিজান নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম। মুদ্গর, ডাম্বেল, ডেভালাপার। অর্দ্ধঘণ্টা কাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিকটবর্ত্তী নদীটিতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাইতে গাইতে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে অবগাহন তাঁহার করা চাইই। বাড়ী ফিরিয়া তিনি ষ্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। ষ্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। ষ্টোভের

নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়ামও করিতেন। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক, স্নান, আহার সমস্তই সমাধা হইয়া যাইত। কম্‌প্লিট।

তিনি বলিতেন যখন খাইতেই হইবে—অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত—তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত!

সমস্তদিন সময় পাওয়া যায় কত!

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একজোড়া মিলিটারি বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারি বুট পরিলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে—ব্যাস নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পর—খোল আর পর। সময় নষ্ট হয় কত!

তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসর কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল—ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন তেমন লাঠি নয়। বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড় ব্যাগ—পোষ্টাফিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়—সেই জাতীয়

একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কপিং পেন্সিল একটি বাঁধান নোটবুক—শুকনো খেজুর—টিঞ্চার আয়ডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত। যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ব্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাড়িগোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়া ছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া—তাঁহার মুখ ত বটেই—বুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জ্রর অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন—"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?"

সকলেই স্বীকার করিত—বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটি ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারী বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী নগ্নগাত্র বলিষ্ঠ বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে

চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মত দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণামও করিত।

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতিনিন্দা তাহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী?—তিনি বহুপূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহার মামার বাড়ীতে মানুষ হইতেছে। তাহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর—আর একজনের রায় সাহেব।

বলিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর—আর রায় সাহেব হবার জন্যে পরে হয় ত ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাকৃতে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভালো।"

## দুই

অতি প্রত্যূষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় তাহা হইলে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের—বিশেষ করিয়া বালকদের লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহার জন্য তাঁহাকে চারক্রোশ দূরে যাইতে হয় কেন? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায়না—একথা সুবিদিত।

চারক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলি লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটি সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণবাবু বখেড়া বিরোধী।

সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকাঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

## তিন

কিন্তু অকস্মাৎ নূতন একটা বখেড়া বাধিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন ব্রহ্মচর্য্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবু আসিতেই ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিল। মাসিক-পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু-স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর ঢেউখেলান রঙীন অক্ষরে লেখা—"মরমী" তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্ত্তি!

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরেই একটি গল্প—

একটি রোগা গাছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মোহড়া লইতেছে।

এ ত ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন—সব সরিয়া পড়িয়াছে।

একটি ছাত্রও নাই।

## চার

সেইদিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দুই দিন পরে যে সংবাদটি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই।

"মরমী" কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতাল অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাজ্মাতিক।

গল্পলেখক সুজিৎ সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহার জীবন-সংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ "মরমী" অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি

বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

## পাঁচ

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছে না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্ম চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিষ্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই—খালাসির বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল—ওসব বাজে কথা—তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদলভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশীদিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশঃ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল!

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশঃ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিশও।

## ছয়

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুণাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছেন—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবত বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই—এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম খবরের কাগজের মারফত আশা করি তাহা অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম সে ভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা সুদ্ধ সবাইকে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে, যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত হোটেলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল—রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে

হয়—কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি এবং চিন্তা করি কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয়, তাহা হইলে সে প্রগতির শেষফল দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি? থাকিবে না ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত তাহাই একদা রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মনে হইল মানস-পটে সিনেমা দৃষ্ট এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। মুখখানি যেন আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলা বাহুল্য—একটু বিব্রত হইলাম।

কিন্তু যাক্ ঈশ্বরেচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে মুখ মন হইতে সরিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুমাইবার পরই বোঝা গেল বখেড়া মেটে নাই—কারণ সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল লিখিতে পারিব না। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখ, তাহা অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম জাগিয়াও নিস্তার নাই—মুখ ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিল।

এইরূপ প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী—একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলব কি ভায়া, শেষটা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম—এ অবস্থার প্রতিকার কি! মাঝে মাঝে রাগও হইত—কিন্তু স্বপ্নের মাথায় ত লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কথাটা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

এই ভাবে দিন যায়। ক্রমশ এই সত্যটি আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই—ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এক দিন সহসা পৌরাণিক গল্প মনে পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।

আশা করি তুমি গল্পটা জানো।

……সুতরাং, কাল বিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছু অর্থব্যয় করাতে পুলিশের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশ্ব গ্রামে পৌছিব তুমি আমার বাড়ীটা পরিষ্কার করিয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগুলিতে চূণকাম করাইয়া দিও। মোট কথা চতুর্দ্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইতি—ত্রিগুণানন্দ।

## সাত

ঐরাবত আসিতেছেন।

ষ্টেশনে গেলাম।

যথা সময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন শেভড'—গোঁফদাড়ি একেবারেই নাই।

মাথায় দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি।

পায়ে পেটেণ্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্প্‌সু! হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ।

সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে। আমি নির্ব্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙ্গিল যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন—"হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি! বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।"

হেঁট হইয়া বৌদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

# উৎসবের ইতিহাস

## এক

সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

—সাণ্ডেল মশাইকে আরো চারিটি পোলাও দাও।

—আন্—আন্—ওরে এদিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি।

মাংস আপনাকে দেব আর একটু?

—না—না—সে কি কথা! দাও খানিকটা মাংস—

—ডাল—ডাল—চাই—ডাল।

—ছ্যাঁচড়া—ছ্যাঁচড়া।

ওহে—ছ্যাচড়া রেখে তুমি পায়েসটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও দিকি—

—এ হে হে জলের গেলাসটা পা লেগে পড়ে গেল যে! তোমরা দেখেও চলতে পার না? উটের মত চলছ সব!

—এই রসগোল্লা এদিকে এস—মুখুজ্জে মশাইকে গোটাআষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

—তুমি যাও ত হে—কয়েক 'পিস্' ভাল দেখে মাছ বেছে বেছে নিয়ে এস ত—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আখতার মিঞা আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে! নরেন তুমি ওঁর কাছেই থাক—

—সিঙ্গি মশাইকে খানিকটা ছ্যাঁচড়া দিয়ে যাও—চাটনিও—

নানা আকৃতির জন তিরিশেক লোক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে।

স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে।

না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

## দুই

ঠিক ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়টি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু সত্য।

প্রবীন মল্লিক মহাশয় 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিতেছেন। অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে ত!

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবামাত্র টাকাটা ঝড়াৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"ফিষ্টি একটা করতে হবে বইকি! ফিষ্টি না করলে চলে! এ কটা টাকা—যদি সিক্স্ পারসেণ্টই দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরি ছেলে তোমার! বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—"

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রস-ভঙ্গ হয় নাই।

সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

## তিন

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ।

( ১ ) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

( ২ ) তৈলনিষিক্ত বিশু সান্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

( ৩ ) খবরটি গোপন রহিল না।

( ৪ ) ফলে, বিশু সান্যালের প্রতিদ্বন্দী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।

( ৫ ) উভয় পত্রই আখ্‌তার আলীর হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুল চিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

( ৬ ) বিশু সান্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার করিল যে তাহার তৈল-নিষেক-শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই! এখন সে বহুলোককে তৈল-সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।

সে গিয়া 'থাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়কে প্রশ্ন করিল এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন ত! আখতার আলিকে গিয়া ধরিব কি?

ঈষদ্ধাস্যসহকারে মুখুজ্জে বলিলেন সুবিধা হইবে না। আখতার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করেন না। তুমি বরং সিঙ্গীর কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গী ঘাগি লোক! যদি রাজী করতে পার—নির্ঘাৎ লেগে যাবে।

( ৭ ) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।

( ৮ ) তৈলার্দ্র সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া পান্থ মিত্রের নিকট গেলেন।

( ৯ ) ঘাগি-ঘুঘু সম্মিলন হইল। পান্থ মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল-নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগি-ঘুঘু-সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।

( ১০ ) প্রকাশ্যে পান্থ মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন, "শুধু হাতে হবে না হে। একটা ভালোগোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"

( ১১ ) ঘাগি সিঙ্গি মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।

প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইতে হইল।

( ১২ ) পরদিন ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।

( ১৩ ) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজন-সুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।

( ১৪ ) সমস্তাচ্ছন্ন আখতার আলি বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন—এমন সময়—ট্রিং—ট্রিং—ট্রিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখতার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।

(১৬) নরেন নির্ব্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

## চার

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই—নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিস্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণি-পীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিস্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগকর্ত্তা আখতার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ নরেনের এত দিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকুরি পাইয়াছে।

হউক কেরাণীগিরি—হউক বেতন তিরিশ টাকা—

চাকুরি ত!

প্রস্পেক্টও আছে।

উপরোক্ত ভোজন উৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

## পাঁচ

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্ব্বশেষে উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম, এ।

# অলকনন্দা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### এক

"শশকগণের সহিত মেষগণের ঘোরতর সংঘর্ষ। উভয় পক্ষেরই আর্য্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে। ভীষণ আরবে সকলের কর্ণপটহ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম। সত্যই এরূপ শব্দ-ঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব্ব। ওই শোন—শশকগণের দামামা-ধ্বনি মেষদের নাকাড়া-নিনাদকে ছাপাইয়া উঠিতেছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে মেষগণের তূর্য্যাস্ফালন শশকদিগের ভেরী-হুঙ্কারকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

চরাচর কম্পমান।

শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীকুল চক্রাকারে গগনে উড্ডীয়মান। সিংহগণ এই লোমহর্ষণ সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

আকাশে বাতাসে আশঙ্কা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—"

বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গকার দিগিন্দ্র সোম ক্ষিপ্ত হইয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কহিল—

"ধনেশ একপয়সা দেবে না—পাকা খবর শুনে এলাম—"

দিগিন্দ্রের লেখনী হস্তচ্যুত হইল।

তিনি ব্যাদত আননে হেবোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

## দুই

অতি আধুনিক জনৈক প্রতিভা—অর্থাৎ সুকবি পঙ্কু মিত্র—হর্ষোৎফুল্ললোচনে গদ্য ছন্দে কাঁদিয়াছিলেন—

শাওন রাতের প্রিয়া
ওগো শুনছ ?
এসো তুমি তোমার নরম পা ফেলে ফেলে
আমার মনের ওপর।
এসো।
হয়ত তোমার কষ্ট হবে একটু,
কারণ মন যে আমার গোটা নয়—
তোমার নরম পা রাখবে কোথায় তুমি !
লক্ষ টুক্‌রোয় ভাঙা যে আমার মন
তোমার গোটা নরম পা দুখানি রাখবার মত
গোটা মন নেই ত !
তবু এসো ভাই তুমি
বুঝলে ?
ওগো
শাওন রাতের প্রিয়া আমার !…

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন আর মিছিমিছি—"

বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া কবি বলিলেন—"সত্যি বলছেন আপনি!"

হেবো চটিয়া বলিল—"বিশ্বাস না করেন—লিখে যান—"

লেখনী ত্যাগ করিয়া কবি কহিলেন—"এ কি খবর শোনালেন আপনি এই দারুণ দুপুরে"—অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং প্রাচীর-সংলগ্ন টিকটিকি-দম্পতির পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। উহারাই তাঁহার উপরোক্ত কবিতাটি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

## তিন

বিখ্যাত জীব-বিদ্যা-বিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যা-সমুদ্র মন্থন করিয়া অপূর্ব্ব প্রবন্ধ-রত্ন—"উটপাখীর ডিম্ব"—উদ্ধার করিতেছিলেন। প্রখরেশ ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানারূপ ভয়াবহ আকৃতির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা উত্তুঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রায় সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। উট পাখীর ডিম্ব সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিতের মতামত তিনি তন্ময়চিত্তে প্রণিধান করিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কহিল—"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন মিছে খেটে মরছেন!"

"অ্যাঁ—বলেন কি!"

পাল মহাশয়ের চশমা নাসিকা-চ্যুত হইল।

ডিম ভাঙিয়া উষ্ট্রপক্ষী নিমেষে মরীচিকায় বিলীন হইয়া গেল।

হেবো হাসিয়া বলিল—"ঠিকই বলছি—নিট খবর!"

পাল মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তূপীকৃত গ্রন্থরাজির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

## চার

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক মুরারিমোহন "সর্পিনী" নামে একটি চমকপ্রদ গল্প সুরু করিয়াছিলেন। মুরারিমোহনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি গল্প অল্প করেন না। "সর্পিনী" গল্পের ষোড়শী তন্বী নায়িকা তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষকে হত্যা এবং পাঁচজনকে মৃতপ্রায় করিয়া গলায় দড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—

এমন সময় হেবো আসিয়া উপস্থিত।

তাহার বার্ত্তা পূর্ব্ববৎ।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

মুরারিমোহন মুখে বলিলেন বটে—"যাক্ বাঁচা গেল!"

তাঁহার অন্তরাত্মা কিন্তু অন্য কথা বলিতে লাগিল।

## পাঁচ

পণ্ডিত প্রভাকর শর্ম্মা "গীতার রাজ-নৈতিক আদর্শ" লিখিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া তাঁহাকে আদর্শ ভ্রষ্ট করিল।

শর্ম্মা মহাশয় প্রথমটা হেবোর কথা বিশ্বাসই করিতে চান না।

হেবো কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

অবশেষে শর্ম্মা মহাশয়কে বিশ্বাস করিতেই হইল যে, ধনেশ সত্যই পয়সা খরচ করিতে রাজী নয়।

বিশ্বাস হইবামাত্র তিনি গামছা পরিয়া তেল মাখিতে বসিয়া গেলেন।

উদ্দেশ্য গঙ্গা-স্নান করা।

এই গ্রীষ্মে 'গীতার রাজ-নৈতিক আদর্শ' লইয়া মাথা ঘামানো অপেক্ষা গঙ্গা-স্নান করা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল।

## ছয়

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠকও মুদ্গর পরিত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"প্রাণায়াম ও ব্যায়াম"। রচনাটি গবেষণামূলক।

তিনি প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন যে, প্রাণায়ামহীন ব্যায়াম করার কোন সার্থকতা নাই। চিনি-হীন সন্দেশের ন্যায় তাহা নিতান্তই অর্থ-হীন। ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমান প্রমুখ পৌরাণিক বীরগণ প্রাণায়াম করিতেন কিনা তাহাই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি উল্টাইয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় ছিলেন—

এমন সময় হেবো আসিয়া হাজির।

বলে কি!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পাঠকজির ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল।

রক্তাভ চক্ষু দুইটি হইতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

গর্দ্দানের ও বাহুযুগের পেশীসমূহ ফুলিয়া উঠিল।

তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

"ইয়ার্কি না কি? পয়সা দেবো না! একটি ঘুষিতে ব্যাটার—"

হেবো সরিয়া পড়িল।

## সাত

ঐতিহাসিক বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় একটি অতিশয় মৌলিক প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করিতেছিলেন।

প্রবন্ধের নাম—"আলিবর্দ্দী খাঁ নামে সত্যই কি কেহ ছিলেন ?"

হেবো আসিয়া তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় বাধা দিল।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

আলিবর্দ্দী খাঁর অস্তিত্ব ছিল কি না সে চিন্তা সুতরাং নিরর্থক।

দাঁ মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। ঐতিহাসিক হইলেও কবিরাজী তাঁহার পেশা।

## আট

এই প্রকারে হেবো প্রায় পঞ্চাশজন লেখককে নিবৃত্ত করিল।

সে পাকা খবর পাইয়াছে, ধনেশ এক পয়সাও খরচ করিবে না।

সুতরাং 'অলকনন্দা' নামে যে মাসিক পত্র বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহা আর বাহির হইবে না।

দিগিন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া ধনেশ পোদ্দার ইহার জন্য দশ হাজার মুদ্রা খরচ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

কিন্তু কে নাকি তাহাকে ভুজুং দিয়াছে, টাকাটা জলে পড়িবে।

ফলে ধনেশ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### এক

দিগিন্দ্র সোম কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন।

তিনি সহজে কোন ব্যাপারে হাল ছাড়েন না। অনেক নৌকাই তিনি বহু দুর্য্যোগে তীরে ভিড়াইয়াছেন। তা'ছাড়া শক্তিশালী লোক। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত ব্যঙ্গকার, তৃতীয়ত শুধু তাঁহার লেখনীরই জোর নাই—গলারও জোর আছে।

অথচ হঠকারি নহেন।

মাথা ঠাণ্ডা।

'অলকনন্দা' বাহির হইলে তাঁহারই সম্পাদক হইবার কথা। বেশ মোটা মাহিনা মিলিবার আশা ছিল সুতরাং সোম মহাশয় হাল ছাড়িলেন না। কি ভাবে চলিলে 'পানি' পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিন্তু এই সব কার্য্য ( বস্তুত যে কোন বৃহৎ কার্য্যই ) সুচারুরূপে হাঁসিল করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি দল পাকাইলেন।

আশাহত যাবতীয় লেখকবৃন্দ তাঁহার দলে জুটিল।

উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া হোক ধনেশকে পুনরায় তাতাইতে হইবে।

বিবাহের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন প্রজাবৃদ্ধিতে—সঙ্ঘের স্বাভাবিক পরিণতি তেমনি সভায়। নিষ্ফলা বিবাহ বরং সম্ভবে—কিন্তু নি-সভা সঙ্ঘ অসম্ভব।

সুতরাং অচিরেই দিগিন্দ্র সোমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

কথা হইল সভা মাঠে বসিবে।

বাড়ীতে সভা আহ্বান করিলে এতগুলি লোককে চা-চুরুট জোগানো সোম মহাশয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত—দ্বিতীয়ত তাঁহার বাড়ীতে স্থানাভাব। এতগুলি লোককে বসাইবার মত প্রশস্ত স্থান তাঁহার ভাড়াটে বাসায় ছিল না। সুতরাং সভা মাঠে বসিবে ঠিক হইল। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ ঘটিল। মাঠে এতবড় সভা করিতে হইলে পুলিশের অনুমতি চাই। দিগিন্দ্র বাবু সভাপতি জানিলে পুলিশের অনুমতি পাওয়াও মুস্কিল। সুতরাং নির্ব্বাচিত কয়েকজন সভ্য লইয়া একটি ছোট পরামর্শ সভা বসিবে স্থির হইল। মাঠেই বসিবে।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম—

(১) দিগিন্দ্র সোম
(২) সুকবি পঞ্চু মিত্র
(৩) বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল
(৪) গল্প-লেখক মুরারিমোহন সাঁতরা
(৫) ব্যায়াম-বীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠক
(৬) ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ
(৭) হেবো—

অর্থাৎ সপ্তরথী সম্মিলন।

দুর্দ্দমনীয় দিগিন্দ্র সোম অধিনায়ক। সভা বসিল।

দিগিন্দ্র বাবু তাঁহার অনিন্দনীয় ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা কি এখনও বাঁচিয়া আছি? আমরা জীবিত—না, মৃত? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আপনারা অবগত আছেন কেন আজ আমি আপনাদের

আহ্বান করিয়াছি। পরম স্নেহাস্পদ হেবো আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যে বার্ত্তা বিতরণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহার সম্যক অর্থ কি আপনারা সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন ? আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সরল অর্থ এই—ধনগর্ব্বিত ধনেশ পোদ্দার সমস্ত লেখক জাতির মুখে জুতা মারিয়াছে। এই পাদুকা-কর্দ্দম-লাঞ্ছিত মুখ আর কি আমরা সভ্যসমাজে দেখাইতে পারিব ? আমরা দরিদ্র তাহা ঠিক, আমরা অসহায় তাহাও ঠিক, ভাগ্যনিয়ন্তা ভাগ্যহীন করিয়াই আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি না কি ? নিরন্ন আমরা অশক্ত দেহে বাণীসাধনার একাগ্রতায় কত বিনিদ্র রজনী যে যাপন করিয়াছি ধনেশ কি তাহার খবর রাখেন ? তিনি আমাদের বাণীপূজার সহায়ক হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ কোন্ অধিকারে তিনি আমাদের অপমান করিলেন ? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছি—ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই ?"

পুষ্কর পাঠক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

দন্ত কড়মড় করিয়া পেশীবহুল মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত করত বলিয়া উঠিলেন—"বলেন ত এক্ষুণি ব্যাটার দফা নিকেশ করে দিয়ে আসি। ও ব্যাটাকে সাবড়াতে কতক্ষণ! ফুটপাতে একটি আছাড় মারলেই মুণ্ডুটি ছাতু হয়ে যাবে—"

প্রাণায়াম-সাধক পাঠকজি চটিলে আর রক্ষা নাই।

এ কথা সকলেই জানিতেন।

সুতরাং সকলেই নিঃশব্দে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন—কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না।

সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।

তিনি একটু পরে একটু কাসিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন—

"পাঠকজির উত্তেজনার স্বাভাবিকতা আশা করি আপনারা কেহই অস্বীকার করেন না। তাঁহার এই উক্তি তাঁহার মত বীরের উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু পাঠকজির প্রস্তাবিত কার্য্যটা শুধু যে দুরূহ ও বিপজ্জনক তাহাই নয়—তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধনেশবাবুকে ক্ষমা করিতে চাই এবং সম্ভব হইলে দলে টানিতে চাই। আর যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন—"

ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণকান্তি লোক। গলা খাঁকরি দিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধনেশবাবুর বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যদি কিছু করিতেই হয় তবে তাঁহার কবিরাজী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি এখন রোগী। ধনাধিক্য হেতু বায়ু-বিকৃতির নজির—বলেন ত—ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। রোমে নীরো, ইজিপ্টে ইখন্অ্যাটান্, পারস্যে নাদির শাহ—"

সভাপতি মহাশয় দাঁ মহাশয়কে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

"দাঁ মহাশয়ের প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে ইহা তাদৃশ কার্য্যকরী হইবে না—ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইবেন না। সহজ অথচ কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি—

উস্‌কো-খুস্‌কো চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া হরিকুমার-শিষ্য সুকবি পঞ্চু মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিহি গলায় বলিলেন—

"অনুমতি করেন ত ধনেশবাবুকে গদ্য কবিতায় চিঠি লিখতে পারি আমি একটা। সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পাষাণ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দ-লক্ষ্মীর—"

বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অধীর ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। "থামুন ত মশায় আপনি। বাজে ফক্কুড়ি করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে পরে। কাজের কথা হোক আগে। আমার ধারণা ধনেশ পোদ্দারকে ছলে অথবা কৌশলে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই। বলে তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। যাঁরাই জীবন-যুদ্ধের অর্থাৎ স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্সের রীতিনীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবন-যুদ্ধে জয় লাভ করতে হলে ছল ও কৌশলও কম উপযোগী অস্ত্র নয়। ধনেশকে ছলে অথবা কৌশলে আয়ত্তে আনতে হবে।"

গল্প-লেখক মুরারিমোহন বলিলেন—

"গণেশবাবুকে ধরলে হয় না? বেশ ভাল লোক তিনি—"

প্রায় সমস্বরে সকলে প্রশ্ন করিলেন—"গণেশ কে?"

"ধনেশের বাবা।"

মুরারিবাবু বলিতে লাগিলেন—"গণেশবাবু চমৎকার লোক। আমার সঙ্গে আলাপও আছে। গণেশবাবু যদি অনুরোধ করেন, ধনেশ-তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। ধনেশবাবু আর যাই হোন খুব পিতৃভক্ত শুনেছি—"

"তাই চলুন—গণেশবাবুকে ধরি গিয়ে সকলে মিলে—"

রুদ্ধ আবেগে দিগিন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বাকী সকলেও সোৎসাহে সম্মত হইয়া গেলেন!

হেবো কিছু বলিল না।

সে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## এক

মুরারিবাবু ভুল জানিতেন।

সকল কথা জানিত হেবো।

কথাটি এই—ধনেশ পিতৃভক্ত ছিল না—গণেশই পুত্রভক্ত ছিলেন। কারণও ছিল।

বৃদ্ধ গণেশ তরুণী তৃতীয় পক্ষ ও বিগত দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি অপোগণ্ড কাচ্চাবাচ্চা লইয়া প্রথম পক্ষের পুত্র ধনেশের দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। ধনেশ ঘাড় ধরিয়া বৃদ্ধ পিতাকে কাচ্চাবাচ্চা সমেত রাস্তায় বাহির করিয়া দেন নাই, ইহাই যদি পিতৃভক্তির নিদর্শন হয়—তাহা হইলে ধনেশ পিতৃভক্ত।

পিতার প্রতি ভক্তি থাকিবার ধনেশের কোন হেতুও ছিলনা।

এক জন্মদান করা ছাড়া গণেশ ধনেশের আর কোন উপকার করেন নাই। এই বিপুল ধন-সম্ভার ধনেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই—নিজে উপার্জন করিয়াছেন। গণেশ সামান্য চাকুরি করিতেন এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে আজীবন তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি ধনেশকে লেখাপড়া পর্য্যন্ত শিখাইবার অবসর পান নাই। ধনেশ স্বকীয় প্রতিভাবলে পাট ও লোহার কারবার করিয়া বিগত যুদ্ধের বাজারে বহু টাকার মালিক হইয়া বসিয়াছেন।

তবে ইহা সত্য কথা, ধনেশ পিতার প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করে না। কিন্তু পিতৃভক্ত বলিতে যাহা বুঝায়, ধনেশ তাহা নয়।

পিতা গণেশ পুত্র ধনেশের আধিপত্যে দুই পক্ষ লইয়া গরুড় পক্ষীটির মত সসঙ্কোচে বাস করিয়া থাকেন।

এই গণেশকে গিয়া দিগিন্দ্রবাবুর দল গোপনে ধরিয়া পড়িলেন। গণেশ লোক খারাপ নন। এতগুলি ভদ্রসন্তানের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। আশ্বাস দিলেন ধনেশকে তিনি অনুরোধ করিবেন।

করিলেনও।

শুনিবামাত্র ধনেশ বলিয়া বসিলেন—"ক্ষেপেছ ? এ সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তোমাকে এসে ধরেছিল বুঝি ! যত সব বোগাসের দল !"

গণেশ চুপ্ সাইয়া গেলেন।

সুতরাং পরদিন দিগিন্দ্রবাবুকেও চুপ্ সাইতে হইল।

এ রকমটা যে ঘটিবে হেবো তাহা জানিত।

## দুই

আবার পরামর্শ-সভা বসিল।

গল্প-লেখক মুরারি মোহন আবার একটি পরামর্শ দিলেন এবং রাজনৈতিক দিগিন্দ্রবাবু আবার তাহাতে নাচিলেন। সুতরাং বাকী সকলকেও নাচিতে হইল।

"কঙ্করানন্দের কাছে যাওয়া যাক্।"

কঙ্করানন্দ ধনেশের গুরু।

কঙ্করানন্দকে ভিজাইতে পারিলে ধনেশ তাতিবেই।

গুরুবাক্য ধনেশ কিছুতেই ঠেলিতে পারিবে না।

সদলবলে গিয়া সকলে কঙ্করানন্দের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত শুনিয়া কঙ্করানন্দ বলিলেন—"তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু—ধনেশকে আমি অনুরোধ কোরব—"

সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

এইবার নিশ্চয়!

হেবো কিন্তু হাসিল।

* * * *

হেবোর হাসি বিফল হইল না।

ধনেশ অটল।

গুরুবাক্য সে অবহেলা করিয়াছে, অথচ গুরু চটেন নাই!

ধনেশ-কঙ্করানন্দ-সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকার।

সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া ধনেশ গুরুদেবকে বলিলেন—

"গুরুদেব, আপনার আদেশ আমি নতশিরে মানতে বাধ্য। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করবার অনুমতি দিন আমাকে। এতগুলো টাকা কি আপনি জলে ফেলে দিতে আদেশ করেন? যদি করেন—দেব—জলেই ফেলে দেব আমি! আমার বিজ্‌নেস্‌ পার্টনার নাথমল স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাকে যে, মাসিক পত্র বার করলে টাকাটা তাহা জলে পড়্‌বে! তা ছাড়া অতগুলো টাকা বাজে ব্যাপারে আটকে ফেল্‌তে ইচ্ছে নেই আমার। আমার আন্তরিক ইচ্ছে আপনাকে—"

স্মিতহাস্যভরে কঙ্করানন্দ বলিলেন—"আমার কিসের দরকার বল! আমি কাঁকর খাই, কাঁকরে শুই—"

"না—না, না—আপনার জন্যে নয়—সে স্পর্দ্ধা আমার নেই! আপনাকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রম স্থাপন করব বলে অনেক দিন থেকে আমার বাসনা।"

"তবে যা ভাল বোঝ—কর!"

সুতরাং কঙ্করানন্দকে ভিজাইয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## এক

রাত্রিকাল।

বাহিরের ঘরটাতে বসিয়া দিগিন্দ্রবাবু কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকাইয়া বিকৃতমুখে কান চুলকাইতেছিলেন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

আসিয়া বলিল—"দিগিন দা—জোগাড় করেছি—"

"কি ?"

"কান থেকে কলমটা বার করুন আগে।"

বেশ করিয়া একবার শেষ চুলকানী চুলকাইয়া লইয়া দিগিন্দ্র কলমটা কান হইতে বাহির করিলেন।

করিবামাত্র হেবো তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"ঠিকানা পেয়েছি। ধনেশও আজ কোলকাতার বাইরে গেছে। আজই সুযোগ, যাবেন এখন ?"

"এক্ষুনি।"

## দুই

চিৎপুর অঞ্চলে একটি সুসজ্জিত কক্ষ।

মদিরাক্ষী একটি যুবতীর সম্মুখে দিগিন্দ্র কাঁচুমাচু হইয়া বসিয়া আছেন।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন—"নিন্ পান খান একটা।"

"হ্যাঁ—এই যে—"

ত্রস্ত দিগিন্দ্র একটি পান তুলিয়া লইলেন।

"মাসিক পত্র আপনাদের বার করিয়ে দেবই—কথা দিলাম। নিশ্চয় দেব! কিন্তু তার বদলে আমাকে কি দেবেন বলুন!"

যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা-হাসি ফুটি ফুটি করিতে লাগিল।

দিগিন্দ্র উত্তর দিবে কি! তাহার অবস্থা তখন শোচনীয়।

গরম দুধে পাঁউরুটি পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয়—দিগিন্দ্রের অবস্থা তখন অনেকটা তাই—অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

আবদার-তরল কণ্ঠে যুবতী আবার বলিলেন—"আপনাদের কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে কিন্তু—"

দিগিন্দ্র নিরুত্তর।

দিগিন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া হেবোই শেষে উত্তর দিল।

"নিশ্চয়—প্রত্যেক মাসেই আপনার ছবি থাকবে—"

## তিন

বলা-বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ।

সুতরাং সে কাবু হইল।

শুধু কাবু নয়—ঢালা হুকুম দিল—যত টাকা লাগে—কুছ পরোয়া নেই। সুতরাং অলকনন্দা এইবার নির্ঘাৎ বাহির হইবে।

মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে।

কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী চিৎপুরে গিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন। হেবোর নির্দ্দেশ অনুযায়ী অলকনন্দার প্রথম সংখ্যার প্রথম রঙীন ছবিটির নাম হইবে 'পূজারিণী'—দ্বিতীয় ছবিটির 'স্নানার্থিনী'। তৃতীয় ছবিটির নামকরণ হেবো এখনও করে নাই।

## এক

এককড়ির প্রপৌত্র, দু'কড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছ'কড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্মিত বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা জীবনটা ভরিয়া নানা-প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি

লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অঙ্গচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার-পুত্র ছ'কড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছ'কড়ির মাথাটি এমনভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কালকাতায় পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাতেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে!

## দুই

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ-কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ:

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ছ'কড়ির বয়স

াইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, হা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছ'কড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সে-কথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছ'কড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছ'কড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফালাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্ব্বোপরি বছর-চারেক পূর্ব্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে এক মত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া—পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

"দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরন্ত করিও না। ইস্কুলে-পড়া হাল-ফেশিয়ান মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহকর্ম্মনিপুণা কর। আমার সহধর্ম্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত্ব গ্রামসুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে—"

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্ম্মে সুনিপুণ করিতে আমার চেষ্টার কোন ক্রটি নাই। তোমার বউমা মশলা বাটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম নিয়মিতভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কার্য্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন—

"উল-বোনা জরির কার্য্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা এমন কি উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—"

এইভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছ'কড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে। বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে বিবাহ করিবে—তৎপূর্ব্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে, জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছ'কড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালের ছেলেছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দ্দেশমত ছ'কড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

## তিন

ইহার উত্তরে ছ'কড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছ'কড়ি লিখিয়াছে—

"বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পুর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ-কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "ছ'কড়ির চিঠি! পড়ে দেখ—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার-বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "লভে পড়েছে—"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে প্রেমে—"

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "এর মূলে কি আছে জান?"

কুণ্ডু বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষা—"

"না, আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই—দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম চট্‌চট্‌ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন, "চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক ঢিলে দুই পাখীই মরবে"—পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সঙ্গী।

## চার

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সঙ্গে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

"ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি নাকি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্মে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও না-কি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা জোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পায় নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

"তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম! ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিসটা ধীরেসুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

"শ্রীমান ছ'কড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতা-য়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তার মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে মেলা-মেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছ'কড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টই

বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি যদি জানিতে পার যে মেয়ে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে ত আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়ত বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছ'কড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছ'কড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এবং ছ'কড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম এবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আমি হরিণহাটিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।

"সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না হয় দু ঘা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্ম্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার…" ইত্যাদি।

## পাঁচ

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটারফ্লাই ফ্যাশানে গোঁপ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক বাড়ীর বৈঠকখানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমী ফুলের কয়েকটি

টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, "সব লক্ষ্য করছি—"

* * * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে। যাক্—এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে ত বেশ?"

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন, "ওটা কি?"

"ওমা, ছ'কড়ির খোকা হয়েছে যে! অমলকুমার—"

"কি?"

"অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।"

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন, "অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা। আমি কাশী ফিরে চললাম—"

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা গো—"

"অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—"

"বেশ ত তুমিই একটা নাম দাও না।"

"ন'কড়ি—"

"বেশ তাই হবে—"

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

# বাস্তব ও স্বপ্ন

আদেশ শুনিয়া পলাশ অবাক হইয়া গেল।

তাহার পর যথোচিত সংযত কণ্ঠে কহিল—"তা কি করে সম্ভব ?"

বড়বাবু রুক্ষ স্বরে উত্তর দিলেন—"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না মশাই, কাল ন'টার মধ্যে আপনাকে লেজার কমপ্লিট করে দিতে হবে। দশটার সময় ইনেস্‌পেকশন হবে—"

পলাশ আবার বলিল—"সমস্ত লেজারটা কমপ্লিট করতে হলে ত সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমি কি সমস্ত রাত এইখানে বসে কাজ করব ?"

"সমস্ত রাত! দশটা পর্য্যন্ত কাজ করলে অমন দুটো লেজার কমপ্লিট হয়ে যায়। এখন ত মাত্র আড়াইটে বেজেছে। সাত আট ঘণ্টা ভাল করে কাজ করলে লেজার কমপ্লিট হবে না ? কাকে শেখাচ্ছেন আপনি! আমিও একদিন আপনার পোষ্টেই চাকরি করেছি।

"বাড়ীতে আমার ছোট মেয়েটির জ্বর দেখে এসেছিলাম—অত রাত্রি পর্য্যন্ত আফিসে থাকলে—"

পলাশ তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। বড়বাবু তাঁহার 'রিভলভিং' চেয়ারখানাতে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পলাশের মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া কঠিন স্বরে বলিলেন—"দেখুন এই জন্যেই আমি সাহেবকে বলেছিলাম যে, এম্‌-এস্‌-সি ফেমেস্‌সি ক্লার্ক আমার দরকার নেই! ওরা 'ষ্টিক' করে থাকবেনও না, আর যতদিন থাকবেন ততদিন কাজকর্ম্ম না করে খালি তর্ক করবেন। আপনার ছোট মেয়েটীর জ্বর হয়েছে বলে কি আমরা আপিস বন্ধ করে দেব নাকি? আমার

বাড়ীতেও ছুটো ছেলের হুপিং কাসি, একটির চোখ উঠেছে, পিসিমার হাঁপানি, গিন্নির কোমরে ফিক্ ব্যথা—তাই বলে কি আমি ঘরে বসে বুক চাপড়াব? না, বুক চাপড়াইলেই কিছু উপশম হবে?"

পলাশ বলিল—"কিন্তু এত কাজ যে 'এরিয়র' পড়েছে তা ত ঠিক আমার দোষে নয়। আমি যতদিন থেকে—"

উত্তপ্ত তৈলে এইবার বার্ত্তাকু নিক্ষিপ্ত হইল।

বড়বাবু টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—
"I order you to do it. You shall suffer if you do not obey. Go—"

পলাশ চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, বড়বাবু প্রাকৃত ভাষায় স্বগতোক্তি করিতেছেন—"আরে মোলো—কচু খেলে যা—"

বড়বাবুর মুখটি লম্বা ধরণের—অনেকটা মোচার ন্যায়। থুৎনীর কাছে এবং মাথার দিকে একটু সূচালো। মস্তক কেশবিহীন। সামনের দিকটাতে এত টাক পড়িয়াছে যে আলো পড়িলে চক্ চক্ করে চক্ষু ছুইটি বড় বড় এবং অস্বাভাবিক রকম শাদা। গায়ের বর্ণ ঘোর কালো হওয়ায় আরও শাদা দেখায়। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, পরিষ্কার কামানো। বলা বাহুল্য বড়বাবুর দেহ-সৌষ্ঠবে নয়নমুগ্ধকর কিছু নাই; তাহাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয় নাই। কারণ তিনি কোন প্রণয়-ব্যাপারে নায়ক-পদপ্রার্থী নহেন। জীবনে তিনি যাহা কামনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি এই বদ চেহারা এবং স্বল্প বিদ্যা সত্ত্বেও পাইয়াছেন। মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এত বড় আপিসের বড়বাবুর পদে উন্নীত হওয়া কি সোজা কথা?

# দুই

বড়বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাশ দেখিল যে, বড়বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন কৌতূহলী কেরাণী বড়বাবুর দ্বারের কাছে উৎকর্ণ হইয়া আড়ি পাতিয়াছে। পলাশকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে, শ্রবণযোগ্য আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। পলাশও আসিয়া নিজের স্থানটিতে বসিল। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমানিত সে জীবনে কখনও হয় নাই। ছি, ছি— মাসে চল্লিশটা টাকার জন্য এই লাঞ্ছনা! একটু পরেই একটি সুদর্শন ছোকরা আসিয়া পাশের টুলটা টানিয়া বসিল এবং এক টিপ নস্য টানিয়া হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে হুঁকো-মুখো ?"

অফিসে সকলেই বড়বাবুকে আড়ালে হুঁকো-মুখো বলিয়া ডাকিত। পলাশ কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিল না।

অমিয় বলিল—"কি বললে—বল না ?"

অমিয় পলাশের বন্ধু। এককালে সহপাঠী ছিল।

পলাশ বলিল—"বললে এই লেজার বুক কমপ্লিট করে দিতে"— পলাশ এক বিরাটকায় খাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

অমিয় বলিল—"এখন বলবে বৈকি। কাল 'অডিট' আসছে কি না ! তোমার পোষ্টে ওর শালা এতকাল ছিল। কুটোটি নাড়ত না—তাই এতসব বাকী—"

পলাশ নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

অমিয় সহানুভূতির স্বরে বলিল—"এখন আর ভেবে কি হবে ভাই। উঠে পড়ে লেগে যাওয়াই ভাল। বল ত তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার ফাইল আমি ক্লিয়ার করে ফেলেছি—"

এমন সময় চশমা সামলাইতে সামলাইতে বিশ্বাস মশায় প্রবেশ করিলেন। স্ফীতোদর বর্ত্তুলাকার ভদ্রলোক; মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল; হাসিলে কালো পানের ছোপধরা কয়েকটি দন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অফিসের অনেককালের কর্ম্মচারী। অফিসের সকলের সহিত তাঁহার দাদামহাশয় সম্পর্ক; তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা সকলেই করে। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করাতে রসিকতার মাত্রাটা সম্প্রতি একটু বাড়িয়াছে।

বিশ্বাস মশায় আসিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া অভিভাবক-ভঙ্গীতে বলিলেন—"ছি, ছি, কাজটা তোমার অন্যায় হয়েছে ভাই, বড়বাবুর মুখের উপর অমন জবাব দেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি; হাজার হোক প্রবীণ লোক—তা ছাড়া শিবতুল্য মানুষ—" বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিম্নস্বরে গল্প জুড়িয়া দিলেন—"আমাদের আফিসে আমরা ত সুখে আছি হে, রাম রাজত্বে আছি বললেই চলে। ওই আমাদের সামনের আপিসের বড়বাবুর তুলনায় আমাদের বড়বাবু ত' সাক্ষাৎ শিব। ওদের বড়বাবু রেগে গেলে জুতো পর্য্যন্ত ছোঁড়েন।"

একবার গল্প সুরু করিলে বিশ্বাস মহাশয়ের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। সত্যের বড় বড় নদী পর্ব্বত তিনি অনায়াসে মিথ্যা কল্পনার এরোপ্লেনে উড়িয়া পার হইয়া যান। এ ক্ষমতা তাঁহার আছে সুতরাং তিনি তাঁহার শ্লথ চশমাটা নাকের উপর ঠিকমত বসাইয়া লইয়া সুরু করিলেন—

"সেকালে শুনেছি পালা করে বড়বাবুদের পা টিপে দিতে হত—তামাক সেজে দিতে হত। তবে চাকুরি বজায় থাকত। শঙ্কর খুড়োর

মুখে গল্প শুনেছি—একবার তাঁর আপিসের বড়বাবুর হ'ল 'ডিস্‌পেপ্‌-সিয়া'। ডাক্তার উপদেশ দিলেন, গন্ধভাদালের সঙ্গে চুনো মাছের ঝোল করে খেতে। তাই শুনে শঙ্কর খুড়ো সকালে উঠে নিজেদের খিড়কির পুকুর থেকে স্বহস্তে জাল ফেলে চুনো মাছ ধরে আর এক বোঝা গন্ধ-ভাদালের লতা সংগ্রহ করে নিয়ে আপিসে হাজির হলেন। আপিসে গিয়েই কিন্তু শঙ্কর খুড়োর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। গিয়ে দেখেন, সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় মণ খানেক চুনো মাছ আর গাড়ী খানেক গন্ধ-ভাদালের লতা এসে পৌঁছে গেছে, দুর্গন্ধে আফিসে টেকা মুস্কিল, সায়েব চটে লাল—"

অমিয় হাসিয়া করজোড়ে বলিল—"বিশ্বাস দা—ঢের হয়েছে। এইবার একটু দয়া করুন। এই বিরাট লেজার কমপ্লিট করতে হবে।"

বিশ্বাস মহাশয় একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"এতে আর দয়া করা-করি কি ভাই। তোমরা হিতকথা বললে ত আর শুনবে না। তোমাদের মেজাজ 'তেরিয়া' হয়েই আছে। মাথা ঠিক রেখে কথাটা পর্য্যন্ত কইতে পার না। বাঙালীর ছেলে চাকরিটি গেলে তখন খাবে কি?" বলিয়া তিনি মাথা ঝাঁকিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ চশমাটা আবার নাকের উপর বসাইয়া দিলেন তাহার পর চোখের ইসারায় পলাশকে ডাকিয়া বলিলেন—"একটা কথা বলছি শোন—প্রাইভেটলি—"

পলাশ উঠিয়া গেল। বারান্দায় গিয়া বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—"বড়বাবু চলে যাওয়ার আগে একবার গিয়ে 'অ্যাপলজি' চেয়ে এসো।"

"অ্যাপলজি? কেন?"

ইহার বেশী আর পলাশ বলিতে পারিল না। সে এই অল্পদিন হইল চাকুরিতে ঢুকিয়াছে, এখনও তাহার গায়ে ইউনিভার্সিটির গন্ধ লাগিয়া

আছে ; এই সদাগরি আপিসের রীতি-নীতি এখনও সে ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বাস মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এখনও 'টেমপোরারি' লিষ্টে রয়েছে বুঝছ না? বড়বাবুর কলমের এক খোঁচায় তোমার চাকরিটি খতম হয়ে যেতে পারে, ওঁর ছোট শালা ঢুকিয়ে রয়েছে, তোমাকে ত উনি নিতেই চাননি প্রথমে। এম্-এস্-সি পাশ ব'লে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তোমার শ্বশুর হেরম্ববাবুর সঙ্গে 'টমলিন্সন্' সাহেবের অত্যন্ত দহরম মহরম, তারই জোরে তুমি চাকরিটি পেয়েছ; তুচ্ছ একটা কথার জন্যে খুইয়ো না। বড়বাবুকে বল যে, 'আমায় মাপ করুন—এমন আর কখনো হবে না।' সব ঠিক হয়ে যাবে—এধারে শিবতুল্য লোক উনি!" দ্বারপ্রান্তে অমিয় দেখা দিল, অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয় শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাও—কাজ করোগে তোমরা, আমার কাজ হয়নি এখনও। ওরে এক পয়সার মিঠে পান বেঁা করে নিয়ে আয় ত বাবা", বলিয়া তিনি একটি পয়সা একটি পাংখা কুলিকে দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন—"একটু দোক্তাও আনিস্—ওই মোড়ের দোকানটা থেকে নিস্—বেড়ে দোক্তা মাগীর—"

বিশ্বাস মহাশয় চলিয়া গেলেন।

অমিয় এবং পলাশ আসিয়া লেজার লইয়া পড়িলেন।

## তিন

রাত্রে পলাশ বাড়ী ফিরিতেছে।

দশটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলিটার মুখে দাঁড়াইয়া পলাশ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। এই দুর্গন্ধ গলিটার এক প্রান্তে

সে তাহার সাধের সংসার পাতিয়াছে! মেয়েটা কেমন আছে কে জানে! নানা আবর্জ্জনা পার হইয়া সে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল; স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আসিয়া দ্বার খুলিল এবং প্রশ্ন করিল—"আজ ফিরতে এত রাত হল?"

"আপিসে আজ কাজ বেশী ছিল—"

বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া হেমাঙ্গিনী আবার প্রশ্ন করিল—"আপিসে তোমাদের ফুলবাগান আছে নাকি?"

"তার মানে?"

"ফুল কোথায় পেলে?"

"কই? ও—ভুলেই গেছলাম! খুকী কেমন আছে?" বলিয়া কোটের 'বাটন হোল' হইতে একটি ক্ষুদ্র যুথিকাগুচ্ছ খুলিতে খুলিতে বলিল—"নাও তুমি খোঁপায় পর, ময়লা কোটে এসব মানায় না। অমিয়র বউ দিলে।"

"অমিয়র বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ অনুভব করিয়া জবাবদিহির সুরে পলাশ বলিতে লাগিল—"মানে, অমিয়ও এতক্ষণ আপিসে আমার সঙ্গে সমানে ছিল কি না। আমার কাজের সাহায্য করছিল। আজ তার ভায়রা ভাই এসেছে—বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার একটু আয়োজন ছিল—আমাকে নেমন্তন্ন করলে—'না' বলতে পারলাম না; অমিয় না থাকিলে আজ লেজার কম্প্লিট করা অসম্ভব হত। খুকী কেমন আছে?"

"খাওয়া-দাওয়া ওদের বাড়ীতে সেরেই এসেছ তাহলে?"

"হ্যাঁ—খুকীটা কেমন আছে—?"

"রাত্রে ওখানে শুলেও পারতে! আসবার দরকার কি ছিল! খুকীর জন্যে ত তোমার ঘুম হচ্ছে না। ভারি এক ব্যাগারি হরেন ডাক্তার জুটেছে—সন্ধ্যেবেলা এসে পনর ষোল টাকার ইন্‌জেক্‌শনের ফরমাস করে গেছেন। এদিকে মেয়ের দুধ পর্য্যন্ত পেটে যাচ্ছে না—নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে—"

ঝনাৎ করিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইল। পলাশ বুঝিল এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলে পাশের বাড়ীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে মাত্র। নীরবে ঘরে ঢুকিল। চোখে পড়িল তাহার 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস্'খানা দিয়া একটা বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে। বোধ হয় সাবু কিংবা বার্লি। নিকটে একখানা চিঠিও রহিয়াছে, দেখিল হরেন ডাক্তার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া পলাশের গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল! মেয়ের ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, আজ রাত্রেই ইন্‌জেক্‌শন্ না দিলে জীবন সংশয়। সর্ব্বনাশ, ইন্‌জেক্‌শন্ কিনিবার মত টাকাও যে তাহার হাতে এখন নাই! অথচ—

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল হেমাঙ্গিনী খাইতে বসিয়াছেন। বাঙালী ঘরের অধিকাংশ সাধ্বী স্ত্রীগণের আদর্শ-অনুযায়ী হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ স্বামীর প্রত্যাশায় অভুক্তা ছিলেন এবং স্বামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।

স্বামী বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি সমাপনান্তে যুবতী বন্ধু-পত্নীর নিকট হইতে পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাইয়াছেন দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উক্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের অনুকরণে ক্লান্ত স্বামীকে কটূক্তি বর্ষণান্তে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর দোদুল্যমান দুল দুইটির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া পলাশ ভাবিতে লাগিল—"শেষ পর্য্যন্ত কি—"

## চার

কল্পনাপ্রবণ পলাশকান্তির যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা পাঁচটা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও স্বপ্ন ভঙ্গ হইতে চায় না। অত্যন্ত দীর্ঘ স্বপ্ন দেখিয়াছে সে! তাহার মনে হইতে লাগিল কুপিতা হেমাঙ্গিনী আশে পাশে কোথাও ঘুরিতেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিল যে সে তাহার সেই পুরাতন মেসের সনাতন জাকল কাঠের চৌকিতেই শুইয়া আছে। সমস্তটাই স্বপ্ন! আঃ বাঁচা গেল।

সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল; 'শেল্‌ফ' হইতে হেমাঙ্গিনীর 'ফোটো'খানা লইয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিতে মন্দ নয় মেয়েটি। তবু ও খপ্পরে আর সে পা দিবে না।

এমন সময় হেরম্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র পলাশ 'ফোটো'খানি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"আমি ভেবে দেখলাম ভাল একটা রোজগারের জোগাড় না করে এখন বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না!"

হেরম্ববাবু হাসিয়া বলিলেন—"চাকরি ত আমি জোগাড় করে রেখেছি তোমার জন্যে। টমলিন্‌সন্ সায়েব আমাকে প্রমিস্ করে রেখেছেন। তোমার বন্ধু অমিয় বাবু, তোমাদের এই মেসেই থাকেন বিশ্বেস মশাই, এঁদের আপিসেই তোমার ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। প্রথমেই চল্লিশ টাকা থেকে—"

পলাশ সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে না—অত কম মাইনেতে আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না। দেখি যদি একটা প্রোফেসারি জোটাতে পারি। বি, সি, এস্‌টা দেবারও চেষ্টা করব—"

ক্ষুণ্ণ হেরম্ববাবু বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা হইল ফটোগ্রাফারটা ঠিক ফটো লইতে পারে নাই। 'পোজ'টা ঠিক হয় নাই।

## পাঁচ

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পলাশ এবং অমিয় একটি 'সিনেমা শো'তে যাইতে যাইতে গল্প করিতেছিল। বিশ্বাস মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা নয়, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে একটি মনোহারিণী শাড়ি কিনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পলাশ এবং অমিয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের পছন্দের উপর বিশ্বাস মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস।

অমিয় বলিতেছিল—"স্বপ্নে নিজের সংসারটা কেমন দেখলি ?"

"ঠিক দাদা-বৌদির সংসার যেমন !"

"আর আপিস কেমন লাগল ?"

"আপিসে, তুমি, বিশ্বাস মশায় আর তোমাদের হুঁকো-মুখো ! বিরাট এক লেজার বুক !"

অমিয় হাসিয়া উঠিল।

"একটু দাঁড়াও ভায়ারা" বলিয়া বিশ্বাস মহাশয় মোড়ের একটি পানওয়ালির নিকট পান খরিদ করিতে গেলেন।

অমিয় বলিতে লাগিল—"আচ্ছা গাধা ত তুই। একটা স্বপ্ন দেখে অমন একটা দাঁও ছেড়ে দিলি? অমন সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরিও। কার ভাগ্যে জোটে অমন!"

বিশ্বাস মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া কথাবার্ত্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ঠিক করলে না দাদা! বাজার বড় খারাপ। তাছাড়া স্বপ্নে তুমি যাই দেখ আমাদের আপিসে কাজ করে সুখ পেতে! বড়বাবু আমাদের শিবতুল্য লোক!—ও কি তোমরা ওদিকে বেঁকলে যে! আমার শাড়িটা—"

হাত ঘড়িটা দেখাইয়া অমিয় বলিল—"মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আর। কাল নিশ্চয় কিনে দেব। আপনি আজ আটটার পর যাবেন কিন্তু—"

## ছয়

আলোকোজ্জল চৌরঙ্গী। নানাবর্ণের সুদৃশ্য মোটরকার হইতে নানাবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত নানা জাতীয় মানব-মানবী অবতরণ করিতেছে। আনন্দের স্বপ্নলোক এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া পলাশ ত্বরিতপদে টিকিট কিনিতে গেল এবং সেইদিন সকালেই দাদার নিকট হইতে মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত দশ টাকার নোটখানা ভাঙাইয়া দুইখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ফিরিবার মুখে টিকিট ঘরের প্রতি ধাবমান একটি লোকের সহিত অন্যমনস্ক পলাশের ধাক্কা লাগিয়া গেল, পলাশ মুখ তুলিয়া দেখিল। লোকটি আর কেহ নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত হেরম্ববাবু। তিনিও স্বপ্নাতুর!

# খড়্গের দৌরাত্ম্য

## এক

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দশ-আনা ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুঙ্গি, মুখে সর্ব্বদা পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ—এ হেন লোকের নাম রাধাবল্লব। পিতামহপ্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাবার সুযোগ আছে। এদেশেও অনেক ছাত্রছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজেদের পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত। সে দুরূহ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে রাধাবল্লভের নামটা আরও একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যই একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়, পোষাকে, কথায়-বার্ত্তায়, বিশেষ করিয়া উপার্জ্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ একেবারে অতি-আধুনিক। 'ব্রিজ' এবং 'ফ্লাশ' খেলায় সুদক্ষ। এই পথে তাহার অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের মাতুল রাধাবল্লভের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ সিগারেট সিনেমার খরচটা আর তাঁহাকে জোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম লাভজনক নয়।

## দুই

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্য-চর্চ্চা করিতেছে। তারুণ্য-চর্চ্চা বলিতে কি বুঝায় তাহা এ যুগের পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বুঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। নিরঙ্কুশভাবে তাহার তারুণ্য-চর্চ্চা চলিতেছিল। হটাৎ একদিন বেচারা ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েল-কারী দুষ্ট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ

পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনাহত মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। মদনাহত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। আমি জানি। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারা ধারে খানিকটা 'স্নো' কিনিয়া ফেলিয়াছিল। আয়না, স্নো এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর পরস্পরে নিমজ্জিত তখন কিন্তু পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন আবেগ-জর্জ্জরিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

## তিন

পুঁটি নাম্নী যুবতীটিই একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটিসে ঝড়াং করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল ট্রামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে তাহা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বলের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—ষোল কি ছাব্বিশ—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্ব্বেই বেচারা রাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মানুষ তখন যুক্তিরূপ বল্গা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাই। মুগ্ধ রাধাবল্লভ লুব্ধভাবে হ্যারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন ত কতবারই ঘটিয়াছে। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কত বার কত মেয়েইত রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্ত্তিনী পুঁটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনা লিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকাগণ

আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গণে শঙ্খ-হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্য। এমন ত আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্য্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হ্যারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জ্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই দ্বিতল বাড়ীটা ছাড়া যেন হ্যারিসন রোডে আর কিছু নাই, বাকী সব হাওয়া—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া শিস্-যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজাপতির খড়মখানা সজোরে আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি' রূপে।

## চার

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন; দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরাও হইলেন। নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিণ্টা-পণ্টু-বিশু-খোকনের পিতা ছাপোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সদ্য-পাস-করা নবীন ডাক্তারটি ছিলেন তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এঁকে নড়ান উচিত নয়। নাড়া-চাড়া করলে মারা যেতে পারেন।" সুতরাং রাধাবল্লভকে হাসপাতালে পাঠাবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্কর-

বাবু বাড়ীতেই তাহার শুশ্রূষার 'বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য্য। রামকিঙ্করবাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ডাক্তার ছোকরাটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটি 'আইস ব্যাগ' খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, "গেরো আর কি!"

## পাঁচ

দুই দিন পরে অচেতন রাধাবল্লভ চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি।

সে চক্ষু মুদিল।

একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে, পুঁটি নয়, হাবলি।

ফলের রস করিয়া দিল হাবলি।

ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই?

রামকিঙ্করবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছে?"

"আজ একটু ভাল।" কি সুন্দর স্বর হাবলির!

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি।

বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি।

মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি।

সব হাবলি।

আরও তিনদিন কাটিল।

পুঁটি নাই।

খালি হাবলি।

আবার খড়ম দেখা দিল।

এবার ছদ্ম বেশে নয়, স্বরূপে।

রামকিঙ্কর হাজরার হস্তে।

# পাশাপাশি

## এক

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকী আছে। ষ্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততঃ পক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও ত মুস্কিল! শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন 'আচ্ছা চিন্তাশীল লোক ত!'

পেটের চিন্তার মত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন-রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। চিন্তাশীল নই, আমি চিন্তাগ্রস্ত।

······ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলিকাতাই বেস্ট্ ফিল্ড! চাকুরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এত কাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা সৌখীন লোক ছিলেন এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

## দুই

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়-শাশুড়ীর ভাইপোর পিস্তুতো শালার আপন ভায়রা ভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমত অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, "কি ভায়া, চিন্‌তে পারছ!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, "নাঃ চিন্‌তে পারনি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে। মানে বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের," বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে

ফরম্যুলাটা মুট মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, "তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তের ভায়রা ভাই। আপন লোক সব ক'লকাতার গলি-ঘুঁজিতে পড়ে আছ—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠেনা। এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশ-ভায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

কুলীর মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "থাক্‌বেন নাকি এখানে ?"

"বেশী দিন নয়— দু-চার দিন !"

"ও।"

কুলী বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ধৈর্য্য অবশ্য বেশীক্ষণ টিকিলনা। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, "লজেঞ্চুস্ !" কেহ বলে, "ঘুড়ি চাই !" কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশী হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে !

...বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

## তিন

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠিগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্ব্বে থাকিতাম তাহা এখন-

"ড্রাইং ক্লিনিং" হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্য্যুপরি তিন দিন এইরূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—ফিরিয়া বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসেন। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, "ভাত বাড়। ওগো শুন্‌ছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে নটা হ'ল—যেতেও ত আবার খানিকক্ষণ লাগবে—" তাহার পরই ঊর্দ্ধশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোনও দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশীক্ষণ জমাইবার অবসর পাইনা। ভাবি—"কাজের মানুষ!" বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে—রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি ও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

## চার

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক তখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম, "ভায়া, আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।"

"আমার সঙ্গে? কেন?"

"একটা কথা ছিল। মানে—"

"তাহ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকারটা কি?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না,—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না—না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা চল ট্রামেই বলব এখন!"

"ট্রামে ত আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ ত। চল আমিও হেঁটে যাই। কতদূর?"

"ইডেন গার্ডেন।"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস্? কিসের আপিস্?"

"আপিস্ কে বল্লে আপনাকে!" বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তবে?"

"আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই?

"কোথা যাও, তা'হলে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই!"

নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন—তারই ৪০৲ সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারিনি। অথচ এম্ এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস

পেয়েছিলাম ! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাবনা !

উভয়ে আবার খানিক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশ বাবু আবার বলিলেন, "বাড়ীতে কথাটা আবার ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন ! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে 'অ্যাপ্রেন্টিসি' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয় !"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না? বাড়ীতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে বসে থাকা অসহ্য ! সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে ! বাঁশী কিনে দাও, লজেন্‌স্ দাও পুতুল দাও ! পাশের বাড়ীর ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও ! গিন্নীরও নানা রকম আবদার আছে।—সরে পড়ি ! বুঝলেন না !"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না। সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়ীতে থাকলে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও ! ছিলাম না—নিশ্চিন্ত— !—চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—লেট, হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন !"

পাশাপাশি দুই জনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায় !

# বিদ্যাসাগর

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল—"ওই মোড়টায় ডিসপেন্‌সারী খুলেছি, মাষ্টার মশায়—দয়া করে যাবেন মাঝে মাঝে—"

"আচ্ছা।"

...স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

* * * *

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার বি, এ, ফেল করার দরুণই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভের ফলেই হউক—ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম কর্ম্মজগতে যাহাই হউক ধর্ম্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়। দিনের পর দিন স্বামিজী যে সকল তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন সেগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর-রহস্য প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন—এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম—জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

ছাড়িলাম না—

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদ্রিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া সুরু করিয়া দিলাম।

জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে।

* * * *

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

—সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হবে?

বলিতে পারিল না।

—মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কি হবে?

পারিল না।

—নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হবে?

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল—ভুল উত্তর। ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া উপক্রমণিকাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

···এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্ব্বজন্মে কি ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস, হয় গাধা না হয় গরু ছিল। স্বামিজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা ত খুবই সহজ!

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনেত্রের

সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্ব্বজন্মের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কি—এ যে বিদ্যাসাগর—

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং উপক্রমণিকার জন্মান্তর-রহস্যের ফেরে পড়িয়া নর শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না! আশ্চর্য্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি—

অশ্রুজলে তাহার চরণ দুখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম শাসন করিতে পারি নাই—সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরাণীগিরি জুটিয়া গেল—চলিয়া গেলাম।

* * * *

বছর পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্ম্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সব কথা শুনিলাম। পড়া-শোনা ছাড়িয়া দিয়া

দিনকতক সে সখের থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্র নাকি উত্তম অভিনয় করিত। মেডেল পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট—আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানীতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইন্‌সিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিক্কি গোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্‌সিওরেন্সের দালালি করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই সহরে প্র্যাক্‌টিস্ করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্য্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।

(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

# পাঠকের মৃত্যু

## এক

প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা।

আসানসোল ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর একজন বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে ভদ্রলোককে ট্রেণের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেণেরও ঘণ্টা তিনেক দেরী ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালী।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—"আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন না—"

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিয়াছিলাম।

অবিলম্বে বইখানি দখল করিয়া বসিলাম।

দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল ষ্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিন্তু তলাইয়া গেল।

উপন্যাস অদ্ভুত।

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়-নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম্ টেব্‌ল্ বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

চমৎকার বই।

বস্তুতঃ এমন ভালো উপন্যাস আমি ইতিপূর্ব্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জুতাইয়া দিতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

দুই ঘণ্টা কাটিল।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম্ টেব্‌ল্‌টি বারংবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার ট্রেণের ত আর বেশী দেরী নেই। এইবার—"

বলিয়া একটু গলা খাকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্দ্ধেকের উপর বাকী। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই।

বাকী ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমার ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল।

বইএর তখনও অনেক বাকী।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম—"নেক্‌স্‌ট ট্রেণে যাব—এ বই শেষ না করে উঠছি না!"

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু কাসিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেণ চলিয়া গেল—বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলাম—"এঃ, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই! আগে বলেন নি কেন? ছি ছি—"

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

## দুই

দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকখানি আর একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল।

আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমত বইখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে সুরু করা গেল। খাপছাড়াভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খটকা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ সেই বইই ত।

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাঃ কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু পড়িতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—নাঃ—আর ত চলে না।

এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল ষ্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্দ্ধশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?

এমন রাবিশ্ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা ত অসম্ভব!

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

# দত্ত মহাশয়

## এক

"ছোকরার গোঁফ ওঠেনি এখনও ভাল করে—এরই মধ্যে এই কাণ্ড—গোঁফ উঠলে না জানি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ গুম্ফমুখী করিলেন এবং একটি পাকা গোঁফ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বাসকে বলিলেন—

"আর কটা আছে দেখ ত হে। এঃ এরকমভাবে পাকলে ত দু'দিনেই সব সাফ হয়ে যাবে দেখছি—"

"কই আর নেই ত। যেটা ছিঁড়লে দেখি ওটা—"

ছিন্ন রোমটি দত্ত মহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যেই ছিল।

বিশ্বাসকে সেটি তিনি দিলেন।

বিশ্বাস সেটি নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন—"তুমি কাঁচা গোঁফগুলো অমন পট্ পট্ ছিঁড়ে ফেলছ কেন বল দেকি? এ গোঁফ কি পাকা? এ ত তামাকের ধোঁয়া লেগে অমন হয়েছে—"

দত্ত মহাশয় ইতিমধ্যে আর একটি গোঁফ ছিঁড়িয়াছিলেন।

বলিলেন—"আচ্ছা, এটা দেখ ত—"

"এটা ত একেবারে ডাহা কাঁচা—তামাকের রঙ্ পর্য্যন্ত ধরেনি। আর ছিঁড়ো না।"

দত্ত দক্ষিণ চক্ষুটি বুজিয়া বক্রায়িত বাম চক্ষুর দৃষ্টিটিকে বাম গুম্ফপ্রান্তে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ওষ্ঠটিকে নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত করিয়া আবার নূতন শিকারের চেষ্টায় ছিলেন। বিশ্বাসের কথার তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না—কিন্তু অচিরাৎ তৃতীয় একটি রোম তিনি মুখভঙ্গী সহকারে উৎপাটন করিলেন এবং সেটিও বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রথম প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন।

"ছোকরা তাহলে মোকদ্দমায় পড়েছে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! তুমি শুনলে কোথা থেকে খবরটা? সেদিন সন্ধ্যে বেলা আমি ষ্টেশনের দিকে গিয়েছিলাম একবার বেড়াতে বেড়াতে, তখনি ছোকরার রকম সকম দেখে কেমন যেন আমার সন্দেহ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় থামিলেন।

বিশ্বাস তৃতীয় গোঁফটির সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করিলেন না। গা চুলকাইতে লাগিলেন।

দত্ত মহাশয়ের মুদ্রাদোষ যেমন গোঁফ ছেঁড়া—বিশ্বাস মহাশয়েরও মুদ্রাদোষ তেমনি গা চুলকানো। শুধু চুলকাইয়াই তিনি নিরস্ত হন না। সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন আহরণ করিয়া আনেন, সেই আহরিত বস্তুটি আঘ্রাণ করেন এবং পর মুহূর্ত্তেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সেটি ফেলিয়া দেন। তাহাই করিতেছিলেন।

দত্ত নাসিকার ঠিক নিম্নবর্ত্তী গুম্ফগুচ্ছটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি কি শুনে এলে?"

কণ্ডূয়ন-নিরত বিশ্বাস উত্তর দিলেন—"ওই বাঁড়ুয্যে উকীল কাকে যেন রাস্তায় বলছে কানে এল—একটা মেয়েকে নিয়ে ছোটবাবু আমাদের

কেসে পড়েছেন। ভাল করে জিগ্যেস করিনি আমি—পথে আসতে আসতে কানে এল। ষ্টেশনে তুমি কি দেখেছিলে সেদিন ?”

দত্ত উচ্চস্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"দেখব আর কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু। প্ল্যাটফরমের ওপর বসে আছে দেখলাম জরিদার ওড়না পরা এক বাঈজি গোছের—সুন্দরী—যুবতী। আর তার কাছে এক রোগা গোছের বুড়ো। পাকা দাড়ীতে মেহেদির রঙ লাগানো—গায়ে আধময়লা গোছের পাঞ্জাবী আর পায়জামা। ওমর খৈয়াম কেতাবে যেমন সব ছবি থাকে আজকাল হে—ঠিক তেমনি। ষ্টেশনের ছোটবাবু দেখলাম ঘন ঘন চাইছেন সেদিকে—ষ্টেশনে আর জনপ্রাণী নেই—” বলিয়া দত্ত মহাশয় আবার হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এত কথা বিশ্বাসটাকে না বলিলেই তিনি পারিতেন। কি দরকার ছিল।

বিশ্বাস অঙ্গ হইতে আহরিত বস্তুটি শুঁকিয়া কুঞ্চিত-নাসা হইয়া ছিলেন। দত্তের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিলেন "—ওই— ওই। ওড়না-পরা মেয়ে আর—লাল-দাড়ী বুড়োকেই আমাদের বাঁড়ুয্যে উকীল স্বচক্ষে আজ আদালতে দেখে এসেছে। আমাদের ছোটবাবুও ছিল। তুমি যা বল কথাটা ঠিকই দেখছি। গোল্লায় গেছে আজকালকার ছেলেগুলো। আচ্ছা, তুমি অনর্থক বসে কাঁচা গোঁফগুলো ছিঁড়ছ কেন বল দেখি—”

বিশ্বাস মহাশয় গত এক বৎসর হইতে দত্তের পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দত্ত ইহার প্রতিবাদ করেন না। বিশ্বাসের এই অত্যুক্তিটুকু উপভোগ করিতে করিতে তিনি পাকা গোঁফগুলি তুলিতে থাকেন। বিশ্বাসের কথায় ভুলিয়া পাকা গোঁফ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন তেমন কাঁচা ছেলে দত্ত মহাশয় নহেন।

পাত্রী পক্ষ পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া ভুল করিবে না।

বিশ্বাসও করিতেন না যদি না তাঁহার যখন তখন টাকা ধার লওয়ার প্রয়োজন থাকিত।

দত্ত বোঝেন সবই—বলেন না কিছু।

দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষটি গত হইয়াছেন।

তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে আছেন তিনি।

দুইটি প্রধান অন্তরায়।

পাকা গোঁফ এবং অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা কন্যাটি।

কন্যার বিবাহ না দিয়া তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব।

কন্যাটির বিবাহ হইয়া গেলে দত্ত মহাশয় স্বচ্ছন্দে শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই মনোমত পাত্র জুটিতেছে না।

গা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশ্বাস বলিলেন—"ছোকরা তাহলে বেশ ঘুঘু—"

দত্ত উঠিয়া গিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে ছোট হাত আয়নাটি বাহির করিয়া আনিয়া গুম্ফরাজি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস আবার তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"জেল হওয়া উচিত—চাকরি যাওয়া উচিত—এসব লোকের। পাজি, চরিত্রহীন, বখাটে সব ছোকরা—"

বিশ্বাসের এত উষ্মার কারণ ছিল। তাঁহার ধারণা তিনি নবাগত ষ্টেশনের ছোটবাবুটির নিন্দা করিয়া দত্ত মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। দত্তের কাছে আজকালকার ছেলেদের গালাগালি দিয়া বিশ্বাস মহাশয় বরাবর সুফল পাইয়া থাকেন। আজ তাঁহার কিছু টাকার দরকার। সুতরাং পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া এবং আজকালকার ছেলেছোকরাদের গালাগালি দিয়া—অর্থাৎ দুই-নলা বন্দুক দিয়া বিশ্বাস মহাশয় লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্বে বহুবার তিনি এই পন্থায় সফলকাম হইয়াছেন।

……দত্তর কিন্তু আজ কোন সাড়া শব্দ নাই।

গা চুলকানো বন্ধ করিয়া বিশ্বাস আড়চোখে একবার দত্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দত্ত উপরের ঠোঁটকে নীচের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া নিবিষ্ট মনে দর্পণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বাস ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে দত্ত মহাশয়ের মনের প্রসন্নতা ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা যতদূর হইলে নির্ভয়ে টাকার কথাটা পাড়া যায়।

সুতরাং গা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি আর একটি গুলি ছাড়িলেন! "আজকালকার ছেলেরা, বিশেষতঃ ওই খদ্দরধারীগুলো—"

হঠাৎ দত্ত আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া চক্ষুর দৃষ্টি বিশ্বাসের দিকে ফিরাইলেন।

বিশ্বাসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

চক্ষু দুইটি যেন—দুইটি জলন্ত অঙ্গারখণ্ড।

একি হইল!

চক্ষু যাহাই হউক মুখে কিন্তু দত্তের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—"টাকার দরকার আছে নাকি? আজ আমার হাতে টাকা নেই বিশ্বাস!"

বিশ্বাস মনে মনে মরিয়া গেলেন।

মুখে কিন্তু বলিলেন—"না টাকার দরকার নেই—"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর বসা বৃথা। বিশ্বাস পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ চটিল কেন, এমন ত কখনও হয় নাই।

## দুই

একটু পরেই দত্তের বৈঠকখানায় বাড়ুয্যের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহারও আগমনের কারণ টাকা। দত্তের নিকট তিনিও আসিয়াছিলেন টাকা ধার করিতে। হঠাৎ দরকার পড়িয়া গিয়াছে।

উকীল হইলেও বাড়ুয্যে স্পষ্টবক্তা, সাধা-সিধা মানুষ।

দর্পণ হস্তে গুম্ফচয়ন-নিরত দত্তকে তিনি বলিলেন—"আর উপড়ে কি আর ওর কিনারা করতে পারবে—তার চেয়ে ও আপদ কামিয়ে ফেল—"

দত্ত কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

প্রতিবাদ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যে যাহা বলে শুনিয়া যান—যেটুকু স্মরণযোগ্য মনে করিয়া রাখেন—বাকীটা অপর কর্ণ দিয়া বাহির

করিয়া দেন। সোজা হিসাব। তর্ক করিয়া লাভ কি? বাঁড়ুয্যে কাজের কথা পাড়িলেন।

"শ পাঁচেক টাকা দিতে পারবে হে? হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব—সুদও দেব—"

দত্ত মহাশয় কুশীদজীবী এবং সেই কারণেই ধনী।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত সুদ দেবে?"

"যত চাও—মাস খানেকের মধ্যেই শোধ করে দেব—"

দত্ত মহাশয় আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা, ষ্টেশনের নতুন ছোটবাবুটির নামে কি মোকদ্দমা হয়েছে নাকি একটা মেয়েকে নিয়ে। জানো তুমি?—"

"হ্যাঁ জানি বই কি—আমিই ত উকীল ছিলাম রেলের পক্ষের। কিছুই নয়—একটা বাঈজি আর তার সঙ্গে এক সারেঙ্গিওলা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—ছোটবাবুটি তাদের ধরে চালান দিয়েছিল। ছোকরা ভারি অনেষ্ট্। অপর কেউ হলে দুচার পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিত—"

দত্ত আবার আয়নাটি তুলিয়া গোঁফ দেখিতে লাগিলেন।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—"দেবে নাকি টাকাটা?"

"এখুনি চাই?"

"পেলে ত ভালই—"

দত্ত তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া দেওয়ালে প্রোথিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাণ্ডনোট ফ্যাণ্ডনোট দিতে চাও দিও—সুদ আর দিতে হবে না তোমাকে। বামুনের কাছ থেকে এ কটা টাকার কি আর সুদ নেব একমাসের জন্য—"

"অনেক ধন্যবাদ—"

বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেলেন।

তিনিও পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ হঠাৎ এমন দিলদরিয়া হইয়া উঠিল কেন!

## তিন

আধুনিক ছেলেদের নিন্দা করিলে দত্ত খুশি হইত—কিন্তু বিশ্বাস আজ দত্তকে খুশি করিতে পারে নাই। বাঁড়ুয্যের স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি বাঁড়ুয্যের উপর চটা—অথচ তাহারই উপর আজ তিনি প্রসন্ন হইয়া বিনা সুদে বিনা হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়া দিলেন।

কারণ ছিল।

মূল কারণ—সেই তৃতীয় পক্ষ।

ষ্টেশনের ছোটবাবুটিকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের ভাল লাগে। স্বজাতি এবং পালটি ঘর শুনিয়া তিনি ছোটবাবুর পিতার ঠিকানা সংগ্রহ করেন। পত্রযোগেই তিনি নিজ অনূঢ়া কন্যাটির সহিত ছোটবাবুর বিবাহ প্রায় পাকাপাকি করিয়াআনিয়াছেন। কুষ্ঠি মিল হইয়াছে—দেনা-পাওনাও প্রায়

স্থির হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয়ের চাপা স্বভাব। গোপনেই তিনি সব করিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া—ওই বাঈজি মাগীকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের মনে দারুণ খট্‌কা লাগিয়া যায়। ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভাল ত? আজকালকার ছেলে বলা ত যায় না। ছেলেটিকে দেখিলে ভাল বলিয়াই ত মনে হয়।

যাক্—এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পাত্রের অর্থাৎ ছোটবাবুর পিতাকে তিনি পত্র লিখিলেন যে অবিলম্বে তিনি যেন আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। উঃ—বিশ্বাসটা মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

পত্রখানি লিখিয়া দত্ত মহাশয় আবার দর্পণটি তুলিয়া লইলেন এবং ভ্রূকুটিকুটিল মুখে গোঁফ জোড়াটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া দর্পণটি রাখিয়া পাঁজি খুলিয়া হঠাৎ পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এবং সেই পাতা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আর একটি পত্র তিনি লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"পয়সার মায়া করলে চলবে না—ভেস্তে যাবে সব—"

দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিলেন কলপের জন্য।

# মিষ্টার মুখার্জ্জি

মিষ্টার মুখার্জ্জি কবে যে আমাদের আড্ডায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাহা মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে স্বর্গীয় মধুমামা একদিন তাঁহাকে আমাদের আড্ডায় লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে তিনি ধূমকেতুর মত আমাদের আড্ডায় আসেন যান। তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমরা কেহ জানি না।

লোকটির বিশেষত্ব আছে।

তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হয় যেন সমস্ত দুনিয়াখানা তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি সেটা গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারেন—ফেলিয়া দিতে পারেন—পকেটেও পুরিতে পারেন। সম্প্রতি লুফিতেছেন—তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রায়ই তিনি তুড়ি মারিয়া বলিয়া থাকেন—"ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি—বুঝলেন।"

বুঝি ত সবই।

মুখার্জ্জি যে একজন উঁচুদরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আমরা কেহ কোন দিন মুখার্জ্জির কথার প্রতিবাদ করি নাই। করি নাই—কারণ তাঁহার মিথ্যাকথাগুলি শুনিতে বেশ লাগিত। এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিষ্ট ছিলেন। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট চেহারা। ক্ষৌরির অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট। আধময়লা সাহেবী পোষাক গায়ে। শুনিয়াছি লোকটি বিলাত-ফেরৎ—পৃথিবীর অনেক দেশ নাকি দেখা আছে—নিজেই এসব বলিতেন। লোকটি নিতান্ত মূর্খ যে নয় তাহা অবশ্য তাঁহার কথাবার্ত্তাতেই বোঝা যাইত। তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি নাকি ডবল এম্, এ। তিনবার প্রফেসারি পাইয়া নাকি ত্যাগ করিয়াছেন—ইত্যাদি।

একদিন তিনি বলিতেছিলেন—

"মহাত্মাজীর সঙ্গে সেদিন দেখা--গাড়ীতে। থার্ড ক্লাসের একটি কোণে বসে বসে তক্‌লি ঘোরাচ্ছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে একটু মৃদু হাস্‌লেন। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল বোধ হয়। উনি যখন আফ্রিকায় যান তখন আমিও সেখানে কিনা—খুব জমাতুম দু'জনে। দেখলাম ভদ্রলোক চিনেছেন আমাকে! এগিয়ে গেলাম। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একটু ইয়ার্কি করা যাক। বললাম—মহাত্মাজী, আপনি যে দেশসুদ্ধ লোককে নিরামিষাশী হতে বলেছেন, তার আর একটা দিক ভেবে দেখেছেন? সবাই যদি আপনার কথা শোনে তাহলে আর একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে তা ভেবে দেখেছেন ?

মহাত্মাজী বললেন—কি সমস্যা ?

আমি বললাম—ছাগল সমস্যা। ওদের না খেয়ে ফেললে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে এই কৃষিপ্রধান দেশের। ছাগলে একবার যে গাছে মুখ দেয় সে গাছের দফা রফা। এক একটা ছাগলের কটা বাচ্চা হয় জানেন বছরে? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুখার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন—"এক্সকিউজ মি, আমাকে উঠতে হবে এখুনি। বাইরের ঘরে টেবিলে আমার পার্স টা ফেলে এসেছি—তাতে একটা হাজার টাকার চেক আছে—যদিও ক্রস্‌ড্‌—তবু"—মিষ্টার মুখার্জ্জি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলিকাতার কোন্ অঞ্চলে যে তিনি থাকেন তাহা কেহ জানিত না। কেহ বলিত বালিগঞ্জ—কেহ বলিত বেলেঘাটা। ভবেশ, পান্নু প্রভৃতির দৃঢ় বিশ্বাস বৌবাজার অঞ্চলেই কোথাও থাকেন তিনি। পরদিন তাঁহাকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনার বাসাটা কোন্‌খানে মিষ্টার মুখার্জ্জি? হাসিয়া তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া

বলিয়াছিলেন "মঙ্গলগ্রহে এখনও জমি কিনে উঠতে পারিনি। এই পুরানো পৃথিবীতেই এখনও বাস করতে হচ্ছে এই যা দুঃখ। কাশ্মীরই বলুন আর সুইজারল্যাণ্ডই বলুন—সব এক। নিউইয়র্কে, রোমে, প্রাগে, বার্লিনে, টোকিওতে, এমন কি ভল্‌গা নদীর তীরেও কাটিয়ে এসে'ছ বহুদিন—সর্ব্বত্রই সেই বুড়ী পৃথিবী—একঘেয়ে! এরোপ্লেনটার আর একটু উন্নতি হলেই দেখবেন দলে দলে লোক অন্য প্ল্যানেটে পালাবে। ওহো, বাই জোভ্—উঠতে হল এবার—মিসেস নাইডুর সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—"

সকলকে বিস্মিত করিয়া মুখার্জ্জি প্রস্থান করিলেন।

সেদিনও আসিয়াছিলেন এবং সেদিনও বার্টাণ্ড রাসেল, বার্ণাড শ, বল্‌ডুইন্, ব্লুম, শেক্সপীয়র, গ্যেটে সকলকে ছাতু করিতে করিতে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল যে আমেরিকার জনৈক কোটিপতির একমাত্র কন্যার জন্য উড়িষ্যার কারিগরের কাজ-করা এক জোড়া মিনা-করা দুল পাঠাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত আছেন। পরশু দিন দুল জোড়া উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছে—আজ এয়ার মেল ডে—সুতরাং আমরা যেন তাঁহাকে এক্সকিউজ করি।

লোকটা বেশীক্ষণ কিছুতেই বসিত না।

ধূমকেতুর মত আসিত এবং চলিয়া যাইত।

লোকটা চালিয়াৎ—মিথ্যাবাদী—সবই বুঝিতাম!

তবু বেশ লাগিত।

আমাদের আড্ডায় সেদিন একটু আহারাদির আয়োজন ছিল। উপলক্ষ—পান্নুর প্রেমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। পান্নু তাহার প্রেমাস্পদাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। পাশের একটি রেস্তোঁরা হইতে দেশী বিদেশী

নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে। ভবেশ আবেগভরে "স্বর্গ হইতে বিদায়" আবৃত্তি করিতেছে—বিমলদা দক্ষিণ চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশিতে 'নি' পরদায় সুর খেলাইয়া করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—বিকাশ টেবিলে তবলা বাজাইতেছে—অভ গ্লাসে গ্লাসে সরবৎ ভরিতেছে—পাঙ্গু প্লেটগুলি সাজাইতেছে—আমি এক কোণে বসিয়া কড়ে আঙুলের কড়াটা কাটিতেছি—অর্থাৎ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় মিষ্টার মুখাজ্জি আসিয়া হাজির।

পাঙ্গু সোল্লাসে বলিল—" বাঃ, ভালই হয়েছে মিষ্টার মুখাজ্জিও এসে পড়েছেন। আপনার ঠিকানাটা ঠিক জানি না ত যে আপনাকে খবর দেব। আজ আমাদের একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন আছে—মিষ্টার মুখাজ্জি—"। করজোড়ে মুখাজ্জি বলিলেন—"মাপ করবেন—খেতে পারব না কিছু। সন্ধ্যের সময় এসপ্ল্যানেডের মোড়ে মিস্ মিউলের সঙ্গে দেখা। অষ্ট্রেলিয়ায় আমার টেনিস পার্টনার ছিল। ছাড়লে না কিছুতে—ফির্পোতে ঢুকে গিলতে হল ওর সঙ্গে বসে। ফির্পোতে অনেক দিন ঢুকিনি—ভয়ঙ্কর ডিটিরিওরেট্ করেছে আজকাল। মিস্ মিউলের পাল্লায় পড়ে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। কি আর করি! অনেকদিন পরে দেখা—তাছাড়া মেয়েটার সম্বন্ধে আমার একটু সফ্ট্ কর্ণারও ছিল সেকালে—হা—হা—হা"।

ভবেশ বলিল—"তবু খান কিছু। অন্ততঃ এক গ্লাস সরবৎ—"

"খেতাম। সরবৎ কেন—আরও অনেক কিছু খেতাম—কিন্তু মিষ্টার আচারিয়ার ওখানে আমার আবার আজ নেমন্তন্ন যে। জেপ্যানো এশিয়াটিক্ সেফ্‌টিপিন্ কম্পানি একটা ফ্লোট করবে নাকি—তারই

একজন পাণ্ডা হবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছে আচারি—যত সব ফ্যাসাদ জোটে আমারই ঘাড়ে। আমি আইডিয়ালিষ্ট মানুষ,'না' বলতে পারি না চট্ করে। আচ্ছা উঠি এবার—এক্সকিউজ মি—" মুখার্জি চলিয়া গেলেন।

সেদিন আড্ডা ভাঙিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

ট্রাম নাই—পদব্রজেই বাড়ী ফিরিতেছি।

একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে মনে হইল একটা লোক হাতে ঝোলান একটি ব্যাগ লইয়া মদনানন্দ মোদক ফিরি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি মিষ্টার মুখার্জি। ডান হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়া 'চাই মদনানন্দ মোদক' বলিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিন্তু অপ্রতিভ হইলেন না। সপ্রতিভভাবেই বলিলেন—"জিনিষটা ভাল, কিন্তু আমি নিজে উপকার পেয়েছি বলে সাধারণ পাঁচজনের উপকারের জন্যে এই ব্রত গ্রহণ করেছি। হজমির এমন ওষুধ আর হয় না। দেখবেন একটু খেয়ে?"

আমি নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার চমক ভাঙিল যখন মিষ্টার মুখার্জি তাঁহার ডান হাত দিয়া সহসা আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"একটা অনুরোধ—এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়ত জিনিষটা ঠিক বুঝবে না—ভাববে হয়ত অভাবে পড়েই—"

বহুদিন কাটিয়াছে। মিষ্টার মুখার্জিকে আর দেখি নাই। আর আমাদের আড্ডায় তিনি আসেন না।

# খুড়ো

খুড়োর জন্য সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

খুড়োর সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। কিন্তু খুড়োর মত আপনার লোকও আমাদের বড় বেশী ছিল না। খুড়ো বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। চুল গোঁফ পাকিয়াছে এবং পাকিয়া নিজেরাই বেকুব বনিয়া গিয়াছে। খুড়োর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গ্রামের সকলেই খুড়ো-অন্ত প্রাণ।

একটি লোক ছাড়া।

তিনি খুড়ীমা।

আজ সকালে তিনি ঝাঁটা মারিয়া খুড়োকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। বিপন্ন খুড়ো চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধব ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করিল—"খুড়ো, ব্যাপারটা কি বল ত?"

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব।

একটু পরেই কিন্তু খুড়োর চক্ষু দুইটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন—"লেপ-তোষক ছিঁড়ে গেছে—তা আমি কি করব বল দেখি? পুরোনো জিনিষ ছিঁড়বে না?"

"বেশ তো, নতুন লেপ-তোষক করান আবার—"

"পাগল হয়েছিস্ তোরা! ওই লেপ-তোষকে বেশ চলে যাবে এ বছর। তা ছাড়া টাকাই বা কোথায়?...যা যা তোরা বাড়ী যা—

ওসব আমাদের নিত্যি লেগে আছে। একটু পরেই মিটে যাবে। বাড়ী যা তোরা—"

আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাড়ী গেলাম না।

খুড়ীমার কাছে গেলাম।

খুড়ীমা যাহা বলিলেন তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন; লেপ-তোষক সম্বন্ধে খুড়োর ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

"তোমরাই দেখ না বাছা—এই লেপ গায়ে দেওয়া যায়—না—এই তোষকে মানুষ শুতে পারে। সামনে এই দুরন্ত, শীত—পোড়ার-মুখো নিজেই যে নিমুনিয়া হয়ে মরবে সে খেয়াল নেই। বললেই একটি মুখ হাসি হেসে বলবে—'ওতেই চালিয়ে নাও এ বছরটা।' ঝাঁটা মারি অমন হাসির মুখে—! কচি খোকা!"

লেপ-তোষকের অবস্থা দেখিলাম সত্যই জরাজীর্ণ।

নবাবগঞ্জের জমিদারের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে খুড়োর অবস্থা সত্যই খারাপ হইয়াছে। নানা সদ্‌গুণের জন্য নবাবগঞ্জের জমিদার মহাশয় খুড়োকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা লাখেরাজ জমি হইতেই খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার জীবিত-কালে খুড়োর অন্যান্য অভাবও তিনি মিটাইতেন। তাঁহার পুত্র আধুনিক যুবক। এজাতীয় বাজে খরচ তিনি পছন্দ করেন না। আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদার-বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন।

খুড়ীমা কিন্তু মেয়েমানুষ—এত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধার ধারেন না।

তাঁহার যুক্তি সহজ—শীত পড়িয়াছে—লেপ-তোষক চাই।

খুড়ীমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সকলে পরামর্শ ঠিক করিয়া ফেলিলাম—খুড়োকে এবার শীতে কষ্ট পাইতে দেওয়া হইবে না। দুই টাকা করিয়া চাঁদা দিলে লেপ-তোষক হইয়া যাইবে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া গিয়া দেখি খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহা-উৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।

আমাদের দেখিলেন—"কি রে—আবার ফিরলি যে তোরা—"

"শুনুন"

খুড়ো উঠিয়া আসিলেন।

"কি ?"

তাঁহার হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই শহরে চলে যান। লেপ-তোষক তৈরি করিয়ে আসুন—"

"টাকা কোথা পেলি ?"

"সে পরে বলব এখন—এগারটায় 'বাস্' ছাড়বে—ওইতেই চলে যান আপনি—সন্ধ্যে নাগাত হোয়ে যাবে লেপ-তোষক—রাত ন'টার বাসে ফিরতে পারবেন। যান—"

"তার মানে—"

"না না, যান আপনি—ও লেপ-তোষকে এ বছর আর চলবে না। আপনি চলে যান—বুঝলেন ?"

খুড়োর হাতে নোট দুইটা গুঁজিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। একবার পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—বিস্মিত খুড়ো নোট দুইটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম খুড়ো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরিয়াছেন। দেখিয়া আসা যাক—কি রকম লেপ-তোষক হইয়াছে। খুড়োর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই শুনিলাম—খুড়ীমা তার-স্বরে চীৎকার করিতেছেন। ব্যাপার কি ?

আমি বাড়ী ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"দেখ ত ভাই—জিনিষটা ভাল হয়নি ? আঠারো টাকায় এমন জিনিষ কি পাওয়া যায় ?"

দেখি খুড়ো একটি সেতার হাতে বসিয়া আছেন।

# অজয়ের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সে দিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কি কান্না! কোন কথা নয়—খালি কান্না! অন্ধকার ঘর! সূচীভেদ্য অন্ধকার!—সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সে আর আমি একা! আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থম্‌-থম্‌ করিতেছে।

আমি নির্ব্বাক্‌।

* * * * *

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন অন্ধকার নয়—সেদিন জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের স্পন্দন আমি শুনিয়াছিলাম। উন্মত্ত সে স্পন্দন। তাহার স্পন্দিত বক্ষ আমার সর্ব্বাঙ্গে যে শিহরণ তুলিয়াছিল তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না। বলিলেই কি লোকে সব কথা বোঝে? তাহা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি?

* * * * *

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জ্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কি অপূর্ব্ব তাহার দেহখানি—যেন প্রস্ফুটিত একটি

শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদী দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়াছে। বেশ-বাসের আবরণ তাহাকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়ীটা তাহার যৌবন-স্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টক্‌টকে চওড়া লালপাড়টা মর্ম্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল। আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল তাহা সে বুঝিল কি?

বুঝিল না।

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

* * * * *

কোন দিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমিষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাবিবে কেন?

মানবী ছলনাময়ী!

* * * * *

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়ন-পল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ-দোলায় এত দিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে

আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

আমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়ত খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে—আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতে খারাপই ত! আমার সারা গায়ে ময়লা! যদিও সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয় তবু একথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি, আমার অঙ্গ মলিন। তেল-চিটচিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী—কিন্তু কি করিব, আসলে আমি যে বালিশ। ছোট তাকিয়া মাত্র! আমার কোন হাত নাই। তাহার দুঃখের অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুখের স্পন্দনে সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্ত্তাই আমি জানিতাম—তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে!

# "ক্যান্‌ভাসার"

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল সেই সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি সৌখীন শাড়ী কেনার সখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে সখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিষটা সে অপছন্দ করে এবং এই সব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন—"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?—"

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দ্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙ্গিল।

"মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—"

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট স্যুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।

ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার সহরে যাইবার কথা। যাইতেওছিল—কিন্তু ট্রেণে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেণ নাই। যদি কিছু 'বিজ্‌নেস্' হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দ্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল—"আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই?"

"মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে—"

"তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—"

"ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—"

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল—"কচু"—

হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—"

হীরালালের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?"

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

"মাজন নেবেন কি এককৌটা?"

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল—"সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত সৌখীন বাজে জিনিষ জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?"

বলিয়া সে নির্ব্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, "বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল—"তাতে আপনার কি? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে! ওসব মাজন ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।"

হীরালাল ক্যান্‌ভাসার হইলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল, "আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?"

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যা নাই তাহা সত্য—কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে

কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এই সব জুয়াচোর-গুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ্ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে!"

"গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?"

ভীম গর্জ্জনে ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান—"

"আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই—"

ইহার পরই ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্য্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই! গরীব মানুষ—এই করে কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"

হতভম্ব নির্ব্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে সে বলিল—"আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন—"

# বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী—অসম্ভব ভীড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরম শাক্ত কালীকিঙ্কর বর্ম্মা পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্ম্মার কৃষ্ণ বর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌর বর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ দাড়ী—চোখে নীল চশমা। খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেত-চন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন—"যাই বলুন আপনি, ধর্ম্ম-সাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা একটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষে ও পারে না—পারা উচিতও নয়—"

অট্টহাস্য করিয়া বর্ম্মা বলিলেন—"রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু শুনি? পৈশাচিক কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?"

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট, মশাই! ওর বেশী ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে-ছিলাম—"

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেণটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্ম্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্ম্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

ষ্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্ম্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া

কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িলে গাড়ীর ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের এক প্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন—"একটু যদি সরে দাঁড়াতে বাবা দয়া করে'—"

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-আন্দোলন হইতে নিজের নাসা-রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্য্যক্ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন—"তোমরা বসে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ বসে পড়।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার সুরু করিলেন—"এই যে মাদল—অপূর্ব্ব জিনিষ এ! বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও অপরিহার্য্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্ম্মে দেখান দিকি এমন জিনিষ। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—"

নাকের উপর ঠকাস্ করিয়া আঘাত দিয়া মাদল-বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্ম্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আবার দাঁড়ালে কেন গো—"

"আজ্ঞে পরের ইষ্টিশনেই নামব।"

"সে ত এখন দেরী আছে—"

মাদল-বাদক কিন্তু আর বসিল না। পরের ষ্টেশন পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের ষ্টেশন আসিল। গাড়ী ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্ম চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেণ থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্ম্মা আর গোস্বামী। বর্ম্মা বলিলেন—"এ হে হে হে—আপনার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! একি বিড়ম্বনা!"

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন—"আসল জিনিষ কি জানেন মশাই? অর্থ! পয়সা নেই বলেই না এই থার্ড ক্লাসে ভীড়ে চড়েছি—তাই না এ দুর্দ্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু টেকে না!—"

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন—"যা বলেছেন! অর্থ নেই বলেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শশা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শশা?"

—"দিন! সবই অদৃষ্টের রহস্য!"

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের ষ্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন তখন ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ বর্ম্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্দ্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

# অন্তর্য্যামীর কাণ্ড

ঘুম যখন ভাঙিল তখন রাত্রি গভীর।

বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলাম এবং চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করিলাম—"বাঁচা গেল!"—গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। যখন উঠিয়াছিলাম ভীষণ ভীড় ছিল। এখন আমি ত রাজা! একলম্ফে নীচে নামিয়াই—কিন্তু রাজত্ব ঘুচিয়া গেল। উপরন্তু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

বাঙ্কের ঠিক নীচেই একটি তরুণী বসিয়া।

একাকিনী।

আমার হাতে একখানা বই ছিল। বইটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া অকারণে সোজা কামরাটার অপর প্রান্তে চলিয়া গেলাম এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিলাম।

অন্তর্য্যামী মন কহিল—মেয়েটি সুবিধার নহে।

রাগ হইতে লাগিল। কোথা হইতে জুটিল এ?

গাড়ীটা খালি দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গান গাহিব। যদিও আমি সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী নহি, কিন্তু ট্রেণে চড়িলে এবং চেনাশোনা লোক কাছে না থাকিলে আমি গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া থাকি। মেয়েটি যদিও চেনাশোনা নয় কিন্তু অন্তর্য্যামী মন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—ইহার সম্মুখে গান গাওয়া চলিবে না।

চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িল।

মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইতে হইল। কয়লাক্রান্ত চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম মেয়েটি আমার পুস্তকটি অধিকার করিয়াছে, পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে এবং মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অন্তর্য্যামী মন ভুরু নাচাইয়া বলিল—বলিয়াছিলাম ত। পরিচয় হইতে দেখিলাম মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। শাশুড়ীর অসুখ হওয়াতে স্বামীর টেলিগ্রাম পাইয়া যাইতেছে। সঙ্গে কোন লোক না থাকাতে ইচ্ছা করিয়াই ভীড়ওলা পুরুষমানুষদের গাড়ীতে চড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল সকলেই মনে করিবে কেহ না কেহ একজন ইহার সঙ্গে আছে। গাড়ীটা একেবারে খালি হইয়া যাওয়াতে একটু মুস্কিল হইয়াছে। যাক্ পরের ষ্টেশনেই নামিব।

পরের ষ্টেশন আসিল।

মেয়েটি নামিয়া গেল। একা বসিয়া আছি। মেয়েটির কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া অন্তর্য্যামী মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। এমন সময় চোখে পড়িল বেঞ্চির নীচে কি যেন একটা রহিয়াছে। মেয়েটি ফেলিয়া গেল নাকি? তাড়াতাড়ি টানিয়া বাহির করিলাম। ছোট একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। ভিতরে কাপড় দিয়া কি যেন ঢাকা রহিয়াছে।

কাপড়টা খুলিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম।

ভিতরে একটা মরা শিশু!

তাড়াতাড়ি বাক্সটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম।

ক্রূর হাসি হাসিয়া অন্তর্য্যামী মন বলিল দেখিলে ত!······পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিল।

ভাবিলাম নামিয়া যাই। উঠিতে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম খাকি হাফ্‌শার্ট হাফ্‌প্যাণ্ট পরা একটি লোক তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলেন,

সঙ্গে একজন পুলিশ কনেষ্টবল! সর্ব্বনাশ! হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"আরে বেকুব্‌—কাঁহা পর রাখ্‌খা।"

"ওহি ত বা,—বিরিঞ্চি্‌ কা নীচে—" বলিয়া কনেষ্টবল বেঞ্চির নীচে কেরোসিন বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া নামিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমার নামা হইল না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। তিনি দারোগা। ক্রমশঃ মৃত শিশুর ইতিহাসও শুনিলাম। দারোগা সাহেব শিশুটিকে তাঁহার এলাকায় কুড়াইয়া পাইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে একটি লোককে তিনি গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। শিশুটিকে সদরে পোষ্টমর্টেম করাইবার জন্য যাইতেছেন। এই কনেষ্টবলের জিম্মায় জিনিষটা দিয়া তিনি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ঘুমাইতেছিলেন। কনেষ্টবলটা এমন বেকুব যে একটা থার্ড ক্লাস কামরার বেঞ্চির নীচে ওটাকে রাখিয়া দিয়া নিজে বেশ ইণ্টার ক্লাশে ঘুমাইতেছিল। যদি নষ্ট হইয়া যাইত! একে ত এইরকমভাবে লইয়া যাওটা একটু বে-আইনি। অন্তর্য্যামী মন দেখিলাম মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দারোগা বেচারীকে লইয়া পড়িয়াছে এবং বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—বুঝিয়াছি ব্যাটা ঘুষ্‌-খোর কোথাকার—

# স্ত্রী-চরিত্র

## এক

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী সুনন্দা একটি মাসিক পত্রিকায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছেন। বলা বাহুল্য হইলেও বলিব, উহারা স্বামী-স্ত্রী। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। সন্তানাদি এখনও কিছু হয় নাই।

সুনন্দা রোজই এইরূপ করে—অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাঙলা বই লইয়া মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ সুনন্দার নজরে পড়িল একটা গল্পের নাম "গল্প নহে"! আশ্চর্য্য নাম ত। লেখকের নাম নাই। সুনন্দা পড়িতে সুরু করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ সুনন্দার মন নির্ম্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর সুনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিল, কিন্তু সে রাগও বেশীক্ষণ টিকিল না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্ম্মলার দুটি হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন সুনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্ম্মলাকে পাইল না—পাইল কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে অন্য কোন কাজ না থাকায় সে পুষ্করিণীতীরে গিয়া

আড্ডা গাড়িল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা। একদিন ফাৎনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেচারা প্রায় অন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাৎনা ডুবিল এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক থ্যাচ্‌কা টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল!

"ওগো—মা গো—"

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আটকাইয়াছে। বলা বাহুল্য কিশোরী আর কেহ নহে—নির্ম্মলা।

এই সুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যত প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে এবং করিত যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধকস্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বেচারা একা কি করিবে। সে বড় জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকান তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্ম্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্ম্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিল না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্ম্মলার জন্য সুনন্দার ভারি কষ্ট হইতে লাগিল। আলো নিভাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিল, তখন নির্ম্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলটল করিতেছে। কি নিষ্ঠুর সমাজ!

## দুই

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তুমুল কাণ্ড। বেচারা "ডেলি-প্যাসেঞ্জার"; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর 'লোকাল' ট্রেণে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের 'লোকাল'-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্ব্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো হাঁড়ির মত করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার কি!'

মিনিট পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিল। মুখ তখনও তোলো হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল—"দেখ, আজ গাড়ীতে 'পুষ্পসুরভিসার' বলে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিল। রোজই করে। কাল মনে করছি কিনে আনব এক শিশি। গন্ধটাও ভাল, আর আমাদের মল্লিক মশাই বলছিলেন যে মাথাও নাকি বেশ ঠাণ্ডা রাখে!"

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিল গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইল কি! চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে সুনন্দা তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত উলের মাফ-

লারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিল—"আজ এত গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থম থম করছে কেন? ব্যাপার কি!"

সুনন্দা আর আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—

"আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না তোমার নির্ম্মলার কাছে, যার হাত ধরে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্ম্মলা! বিয়ে করতে চলল এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়-কাঠে বলি দিতে চল্লাম নিজেকে।"

বিস্মিত তমাল কহিল—"নির্ম্মলা কে! পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

সুনন্দা কিছু না বলিয়া "গল্পপ্রভাকর" নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিল।

সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছে—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'গল্প নহে' নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইল। এক সংখ্যা 'গল্পপ্রভাকর'ও আপনার নামে অস্ত পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার।

বিদ্যুৎঝলকের মত তমালের মনে পড়িয়া গেল যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গল্পটি সে "গল্প-প্রভাকরে" পাঠাইয়াছিল বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরী হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চ্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! আজ হঠাৎ এ কি আকস্মিক বিপদ!

আমতা আমতা করিয়া তমাল বলিল—"ওটা একটা গল্প লিখেছিলাম বটে, অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?"

"গল্প? তুমি ত নিজেই লিখে দিয়েছ "গল্প নহে"!"

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ওটা একটা—ইয়ে—ষ্টাইল—বুঝলে কি না—"

সুনন্দা কিছুই বুঝিল না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্ম্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিত মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কি না!

ঈর্ষ্যায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই নির্ম্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।

# থিওরি অব্ রিলেটিভিটি

## এক

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরাণী-গিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াই, কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরের ছিল কর্ম্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে—এইপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ এই বুড়ীটা। এই বুড়ী তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই বুড়ীটা না সরিলে··· আঃ কি মুস্কিল।

পীড়িতা মাসিমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থর-গতি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকেট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এইজাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম এমন সময় পিছন হইতে অর্দ্ধমলিন-পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—

"রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। 'বাথরুমে' যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে'।"

যথাসাধ্য দেহ-সঙ্কোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম।

ভদ্রলোক 'বাথরুম' হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে?"

"আহা চলুনই না—"

বুড়ীর সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার ওপরই বসুন। আসল 'ষ্টিল'—আপনার মত দশজন বসলেও এর কিছু হবে না।" তোরঙ্গটির চেহারা ভালই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—"আমার জিনিষ ভাল না দিলে নিস্তার আছে ছগ্‌গন লালের। তার মুনিব হ'ল গিয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়া ছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি?"

"তাই নাকি মানে? ছগ্‌গন লালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিষ দেয়? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হ'ল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুশী করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগল উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি।"

নিরীহভাবে বলিলাম—"টাকা কুড়ির ত কম নয়ই। কত?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই—হয়ত আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

"বলেন কি? বারো আনা?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"তাও নিতে চায় না। ছগ্‌গনকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকেও চার-গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে!"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্‌গন লালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না—" বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নীচ হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভাল ডাবি 'সু' বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"এর দাম কত হবে বলুন ত?"

"পাঁচ ছ' টাকা ত মনে হয়।" ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

"রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশী কিছুতে নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায় মশায়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় করে দিলাম কি-না। টম্‌সন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

চকিতের মধ্যে বুঝিলাম এই শীর্ণকান্তি ভদ্রোলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন।···সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ীর বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ীর অপর প্রান্তে দেখিলাম সেই বুড়ীটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়ীটাকে অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

## দুই

"ওটা কি পড়ছেন?"

"ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।"

ভদ্রলোক কোণে ঠেস্ দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুস্‌কি দিতে দিতে বলিলেন—"কার লেখা?"

"পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর।"

"মেয়েটি লেখে ভালই কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—"

"পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মেয়েমানুষ নাকি?"

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মেয়েমানুষ শুধু নয়—একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী!"

আমি সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর লেখা আমার ভাল গাগে। শুধু ভাল লাগে বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না,

তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর লেখা দেখিতে পাই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ! তন্বী—গৌরী—যুবতী!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"টুনি ত এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্য্যন্ত ফ্রক পরে' বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলে-বেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এক কথায় ওরকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখিনি—"

বলা বাহুল্য কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

"ওর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া, এলিজাবেথ হ'ত। অন্তত পক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা ষ্টার।

"ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্যে অস্থির হ'ল—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূষণ কে?"

"ভূষণ হল গিয়ে টুনির বাপ! বিয়ে দিলে তবে ছাড়লে। বিয়ের পর ও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্ত্তী—হেঁ!"

একটা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাঁহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোন মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে —পান্নালাল চক্রবর্ত্তী তন্বী—গৌরী—যুবতী।

## তিন

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালীই। খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থুলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামলাইয়া লইয়া এক জোড়া বড় বড় সদ্য ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লইয়া 'ওয়াণ্টেড' পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেণ আসিয়া ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া মাটির ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা-খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্ত্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাৎলা ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে এ কি, পান্নালাল বাবু যে! কোথা যাচ্ছেন?"

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ওবেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্য-চর্চ্চা করা হয়নি। এমাসের "কাহিনী-কুঙ্কুম" কাগজে আপনার 'চল্‌তি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!"

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

কিন্তু না—থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে উবু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা হাতে স্বপ্ন দেখাও ত সম্ভব নয়। "চল্‌তি চাকা" গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং "কাহিনী-কুঙ্কুম" এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্ত্তী?" ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্ব্বে বলিলেন—"হ্যাঁ, ইনিই।"

ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হ'ল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হ'লে? আচ্ছা, নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্ত্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাঙ্কের মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হ'ল ?"

"কোন্‌টা ?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ—কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন পান্নালাল চক্রবর্ত্তী একজন মেয়েমানুষ—তাকে আপনি চেনেন—অথচ—"

নির্ব্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম ?"

"আর বলেছিলেন আপনার ওই ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, "যিনি বলেছিলেন তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে ?"

অর্থাৎ আমার 'এ্যাংগল অব ভিশন্' মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্যপ্রকার।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এক মুখ্ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন! কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল হয়ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মেয়েমানুষ—ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়েছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তের ও পৌনে সাত টাকা দিয়েছিলাম। 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?"

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ীর অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

"আরে বাবুয়া তু কাঁহা…?"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়ীটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই এখন চিনিলাম মাসিমার বাড়ীর পুরাতন দাই রুক্‌মিনিয়া। মাসিমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুক্‌মিনিয়া মাসিমার বাড়ীতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসিমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ীর কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ী 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসিমা যাহাতে ভাল হইয়া যান। মলিন বসনাঞ্চল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম।

'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'ই বটে!

# মুহূর্তের মহিমা

## এক

দেখা যাক, এইবার কি করে!

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন। আসল নাম অবশ্য গুরগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধি। কারণ তিনি পুরাকালে চন্দ্রশেখরে গুরগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া বহু নরনারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদুপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামি।

চক্ষু তীক্ষ্ন।

বুকময় চুল।

—ইহা কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।

আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান শিক্ষিত।

জমিদার।

অপত্নীক।

মাংসাশী।

## দুই

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরীব-গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে থাকিতে ওই পিলে-রোগা ছেলেটা!

ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গের পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

এক চড় মারিলে তাহার মুণ্ডটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু মুণ্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানাপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধিয়াছেন।

জমিদার নাগরা পরিয়াছেন,

স্নো ঘষিয়াছেন,

জুলফি পর্য্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোকরাটির উপরই স্থির-নিবদ্ধ।

গুরগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।

## তিন

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না-থাকারই সমান।

গুরগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে। গুরগন ডাকিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেকা মুস্কিল।

হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই;

তাহা না হইলে—এই রিভলভার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্য-দীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?

ভীমগর্জ্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।

তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।

শ্রীমতী বলিল, আচ্ছা তা হ'লে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। একা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ওঘরে যান। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে গুরগন কহিলেন, কতক্ষণ ভাবতে চাও?

দশ মিনিট।

বেশ।

স্খলিতচরণে গুরগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

## চার

দেখা যাক— এইবার কি করে!

স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ী পাঠানো হয়।

ঘড়ির দিকে গুরগন চাহিয়া দেখিলেন—মাত্র নটা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

উঃ!

পিপীলিকায় দংশন করে নাই।

অধীর গুরগনের প্রণয়ীসুলভ অস্ফুট কাতরোক্তি।

হঠাৎ গুরগনের হাসি পাইল—ভয়ঙ্কর হাসি পাইল।

রোগাটার কি দশা হইবে? আহা বেচারী!

বেচারী?

দারুণ ক্রোধে গুরগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।

স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!

আবার দর্পণে গুরগন নিজের পেশীবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।

মুখে স্মিত হাস্য।

## পাঁচ

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

গাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ।

মনের অবস্থা ?

উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ীর শব্দ হইল।

দুইটা ঘোড়ার আটটা খুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পর্দার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী।

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরুগনের উন্মত্ত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল, আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম। কি কথা ?

তিনুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো ?

না।

দুই জনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত্ত।

সেই কয় মুহূর্ত্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরগন বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরগনের মনে হইল, এ কি করিলাম? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল? কে এ?

আশ্চর্য্য!

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার খুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

# শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেণে অসম্ভব ভীড়।

তিল ধারণের স্থান হয়ত আছে কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি-পোষাক-পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ান নহেন। সামন্ত মহাশয় ত নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেণযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিনরাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্ব্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

কাল ত অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—ওরে দাঁড়া!

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ান নহেন, তাহা ঠিক—কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্ত্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে ত আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ষ্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্দ্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়ত বুঝিতে পারে নাই—তাই!

বলিলেন— ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে ওটাতে নয় এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে ত গদি মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়ো মানুষ—গরীব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন, হুজুর তিনরাত্রি ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরণে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্য্যকভাবে বসানো কাচফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম্ম নির্লোম মুখখানি বিনয়গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতি-ফরসা-কালো। হাতে খেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্ম ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি"—

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবি পোষাক পরিহিত হইলেও বাঙ্গালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"ছাট কান্‌ট বি! আই কান্‌ট এলাউ!" সামন্ত মহাশয় করযোড়ে বলিলেন—আমিও ত হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি। অনুমতি যদি করেন দয়া করে—

এই বৃদ্ধের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

"শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি কুরুকে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়—বাঙ্কা,—ও বাঙ্কা,—এই দিকে—এইখানেই চড়াও সব—"

হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঙ্কা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটী—একটা ছিপ—দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্ষ্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঙ্গাকে বলিলেন—"তুই তাহলে ওই পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে! তামাক টিকে সব গুছিয়ে রাখ—"

বাঙ্গা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফ্‌টাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর।—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা কর্‌তে হবে—"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন, ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু'র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু'র নির্দ্দেশ-মত নিজের যাবতীয় জিনিষ পত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট্ প্লীজ্।"

"মাই টিকেট্ ইজ ইন্ মাই স্যুটকেস্। প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর ইট্।"

"আই কাণ্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড। মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেট্‌স্‌—"

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বেশীক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি!

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা—শ্রীহরি—!

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে যে, বাঙ্গালী বাবুদের সে ভাল করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুল-হীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচ্‌কচিতে আর কাজ কি! কটা টাকা লাগবে বলুন—আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন"—

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয়-কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—

"আপনিও ত হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধা মত—"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙ্গালী আপ স্থাথা হায়? জাত তুল্‌কে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি"—

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙ্গালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

...ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন...দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি?...সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি...কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম...কিন্তু শরীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ যদি নারীত্বের মর্য্যাদা না রক্ষা করিতে পারি?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলা আমাদের দুরবস্থা

দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি!···দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট্ হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া আছে—সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। একজন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে···ছি, ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল বীরপুরুষদের ছবি দেখি—ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম।···সাঁং করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ী আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-ষ্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ষ্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এ-দেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরীর চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরী জুটিতে পারে।

## দুই

এই শহরে ইতিপূর্ব্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও

আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। ষ্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম—হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলে একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

## তিন

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকেচক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদীধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে। একটি ঘুসিতে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ব্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতিকর ব্যাপার। ...সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্য্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না—ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর

দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি রোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। সহসা মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা! স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ-দেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট।···তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চ্চটা জ্বালিয়া দেখি সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছান রহিয়াছে! অগুণ্তি ছারপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্ব্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম।···অদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল। আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।···একেবারে অক্ষৌহিণী!

## চার

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলাম। বাহিরে চাহিবা মাত্র কর্ত্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নীচের গলিটাতে চেক্‌-কাটা লুঙ্গি-পরা একটি গাঁ্যাট্টাগোট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ীর জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মত সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে—পরনে একটি আধ-ময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই।···চকিতের মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে! —সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহা জীবনে

সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতি পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাস্‌কেল্‌! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম! আশ্চর্য্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, "আপনার কাছেই এসেছি—বিমল বাবুর জামাই আমি!"

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও, বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?"

"ওই হোটেলে—"

"আচ্ছা—কাল সকালে দেখা ক'রো—"

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

# ভ্রষ্ট-লগ্ন

## এক

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

● ● ● ●

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মেশে নাই।

স্কুলের পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিংে আর তকু থাকিত বাড়ীতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি

হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওই তকুকে যেমন ক'রে হোক হটাতে হবে। পারবে ত?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তকু কি বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, "ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভালো ছেলে—কিন্তু হাজার ভাল হলেও প্যাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না—"

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ! তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্ষ্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্ষ্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাৎটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে,—তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

## দুই

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্য্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে

বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহকোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমন সুন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোক মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব্ব। চাঁপাফুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে আমাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একবারে নির্ব্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ই বা ছিল। সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * * *

তকুর বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারেই। সুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, "দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্ষ্ট বয়?"

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ—"

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন ?

"বই মুখস্থ ক'রে ফার্ষ্ট সবাই হতে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি ?"

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার দাদার মত নই ত। হ'তেও চাইনি—"

"পারবেনই না—"

দশ বছরের মেয়ে!

## তিন

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ী বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়ীটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখ-পানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সে সন্তজাগ্রত যৌবনে—বেশী বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে

আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গীতে কথায়-বার্ত্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে! আশ্চর্য্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের পাল্‌টি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত—বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না। নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায়?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।...সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব্ব করিবার মত রূপ আছে সে তাহা লইয়া গর্ব্ব করিবে বই কি! রূপসী মাত্রেই গরবিণী। গর্ব্বটা সৌন্দর্য্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশোনায় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—তারপর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

## চার

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাশ করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—লিখিয়াছে মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, "ভাল পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র আছে—কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল ত সম্বন্ধ করি।"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

## পাঁচ

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম-এ পড়িতেছি। আশ্চর্য্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার

করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস্ মিত্র। আমার সহপাঠিনী।...আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্ত মিস্ মিত্র আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে এমন একটা মার্জ্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল।...ক্রমশঃ দেখিলাম তাহার অনুপস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ কোন্ রঙের শাড়ী পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

ছয়

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে—আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ হইবে—এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম!

বলিলাম, "সে কি সম্ভব?"

তকু বলিল, "সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি, ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতেও সাহস পাই না যে!"—বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "না ভাই এখন আর সে হয় না। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—"

মানপুর গেলাম।

* * * *

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, "কক্ষণো তুমি আমায় ভালবাস না—কক্ষণো না। একদিনও বাসনি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—কেন—"

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

"শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—"

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার এ মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া কদাকার! অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

# ঘটনাচক্র

## এক

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিক মহিলা।

অর্থাৎ বি-এ পাস করিয়াছেন, ট্রামে, বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। কোন্ লেখক ভাল, কোন্ লেখক মন্দ সে-বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। চেহারা? সুন্দরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী উষা—বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—উষা সেনের বাবা। অন্নদাবাবু ভদ্রলোক সনাতন মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক একটি সহপাঠী কৈবর্ত্ত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছরতিনেক হইল ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতার রোগী-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও

তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল—কার্য্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু উষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই "—জর্জেট শাড়ী জীবনে আর কখনও পরিব না।" মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে উষাকে ঐরূপ একটি শাড়ী কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে জর্জেট শাড়ী জীবনে আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি—দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষকালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

## দুই

পারুল-দিদি বেড়াইতে আসিয়াছেন।

পারুল মৈত্র উষা সেনের এক বছরের 'সিনিয়র' অথচ এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিন্যাস প্রসাধন সম্বন্ধে তিনি উদাসীনা নহেন। এই বেশ-বিন্যাসের কল্যাণে তাঁহাকে উষার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেট যেতে হবে।"

"মার্কেটে কেন?"

পারুল-দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "একখানা শাড়ী কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি না কি জর্জেট শাড়ীগুলো আজকাল খুব সুন্দর উঠেচে।"

"তাই নাকি ?"

পারুল-দিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ীর কথায় উষার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখবোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই দুঃখ হইল যে মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা যেন কমিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর ত সে তেমন করিয়া ভাবে না। দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে মণির কোন খবরই সে ত রাখে না আর! এখন সে মিসেস গুপ্ত এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে সে একান্তভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মন অতীতের স্মৃতি ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনশীল বর্ত্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী খারাপ লোক নয়, উষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই, তদুপরি সে উষার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে উষার হৃদয় জয় করিয়াছে।

* * * *

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া উষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—'তাকে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি—জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।'

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিষ্টার দাস ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বলাবাহুল্য, ডেপুটি বাবুটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম। এই জন্যও বটে এবং পিঠাপিঠি বলিয়াও বটে উষার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। এখন অবশ্য

দু-জনেই বড় হইয়াছে, চুলোচুলি খামচাখামচি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে—গহনা-কাপড়ের মারফৎ। উষা যদি সৌখীন দুল ক্রয় করিয়া কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করিলেন সন্ধ্যা অমনি সৌখীনতর দুল দুলাইয়া উষাকে সৌখীনতমের সন্ধানে উতলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে উষাকে জানাইলেন যে তাঁহার স্যাণ্ডাল জোড়াটার পাঁচ টাকা দাম, উষাকে অমনি জানাইতেই হইল—"হ্যাঁ, ওরকম স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওঁর কিছুতেই ওরকম ষ্ট্র্যাপ্-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ করে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ-টাকা দিয়ে! আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!"

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপর্য্যুপরি দুই দিন দুই বিভিন্নপ্রকার জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল তখন উষা দেবী বেশ একটু বিচলিত হইলেন! জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন, আহা ভারি ত জর্জেটের দাম! প্রতিজ্ঞা না করিলে এত দিন আমি কবে কিনতাম!"

* * * *

তৃতীয় বোমা হানিলেন বান্ধবী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—উষাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ী। সুন্দর সাদা রঙের জর্জেটখানা—সুন্দর কাজ-করা। উষা দেবী তাঁহার মুর্শিদাবাদীখানি সযত্নে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রশ্ন করিলেন, "ওটা পরলি কেন এই গরমে! জর্জেট নেই তোর?"

"না।"

"আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারিস একখানা। দামও ত বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—"

"মোটে ?" অতর্কিতে উষার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল !

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের সম্মুখে নানা বর্ণের কয়েকখানা জর্জেট শাড়ী আসিয়া পড়াতে পটখানা বেশ একটু আব্ছা হইয়া গেল। উষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমাটা দেখিতে লাগিলেন। সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী। এই গল্পের নায়িকাও যাহাকে প্রথম জীবনে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং যাঁহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন। ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি। 'ইন্টারভাল' হইল—ইন্টারভালে উষা লক্ষ্য করিলেন যে মহিলা-দর্শকদের মধ্যে আরও দুই-একজন জর্জেট শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন, "আর একজনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জর্জেট শাড়ী পরতে কি ! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই ত করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব ! যাক্, তবু জর্জেট আমি কিন্‌ছি না—"

* * * *

কয়েকটি দারুণ বোমার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই। কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই জর্জেট শাড়ী। উষাকে জব্দ করিবার জন্তই যেন সকলে দল বাঁধিয়া জর্জেট পরিয়া আসিয়াছে।

তাঁহার মনে হইত লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কাশ্মীরী শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে জর্জেট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছে।

শেষ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে।

হঠাৎ সেদিন বিকালে ঊষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে একটি মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মোটরে বসিয়া একটি জর্জেট-পরিহিতা তরুণী। সুন্দরী। দ্বিতলের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া ঊষা লক্ষ্য করিলেন যে মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিস্‌পেন-সারী হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীটির পাশে বসিলেন। কে এ মেয়েটি? রোগিণী? চেহারা দেখিয়া ত মনে হয় না! ঊষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কৌতূহল অদম্য হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক।

স্বামী ফিরিতেই ঊষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকেলে যে মেয়েটি তোমাকে এসে নিয়ে গেল—কে ও?"

"হাসপাতালের একজন নার্স। ডক্টর বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কি না।— সুবি অর্থাৎ ওই নার্সটি বেশ মেয়ে।"

"মেয়েটি দেখতে বেশ। জর্জেট পরে বেশ মানিয়েছিল। কিনে দাও না আমাকে একখানা জর্জেট" —ঊষা বলিয়া ফেলিল।

"বেশ ত! দাম কত?"

"কত আর হবে! আজকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি। দশ-পনর টাকা হ'লেই হয়। ছায়া সেদিন প'রে এসেছিল একখানা, বললে এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—"

"আচ্ছা দেখি! আমার এক রোগীর কাছে ষোলটা টাকা বাকী আছে। কাল বিল, পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।"

তিন

ঠিক তাহার পর দিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্তময় করিয়া কানে কানে কহিলেন, "মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ ক'দিন হ'ল। আমি জানতাম না। মালতী তার এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি নাকি? ঠিকানা জোগাড় করেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক'রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?"

ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে! কলেজের অর্দ্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভীড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভীতু মানুষটী—শান্ত নিরীহ, নিরহঙ্কার। মণীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।—নাঃ, জর্জেট শাড়ী আর সে কিনিবে না! স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।···মণিবাবুর সহিত একবার দেখা করিতে হইবে বই কি! হরিশ মুখার্জ্জির রোড কতটুকুই বা দূর!

* * * *

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই উষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা

খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

"আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন?"

"আপনার ঠিকানা ত আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, আর ত কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম—আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় কার সঙ্গে— কিছুই ত জানি না—" বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়ে—"কেমন আছেন আজকে আপনি" বলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার ব্রজবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন!

"এ কি, তুমি এখানে!"

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

"আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ না কি?"

* * * *

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে একটা কাগজের বাক্স দেখাইয়া বলিলেন—"ওই নাও তোমার শাড়ী। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকী ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন, তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ ত রংটা পছন্দ হয় কি না—"বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

# কালো

ভয়ানক বদরাগী ছিল কালো।

এ লইয়া কত গল্পই যে প্রচলিত আছে!

সেবার স্কুলে সামান্য একটা পেন্সিল লইয়া সে কি কাণ্ড।

ঝগড়ার কারণ এত তুচ্ছ যে শুনিলে হাসি পাইবে।

মিত্তিরদের ছেলেটা নাকি কালোকে প্রশ্ন করে—

"তোর পেন্সিলের রংটা কেমন জানিস?"

"কেমন?"

"আমাদের বাঘা কুকুরের ল্যাজের যা রঙ্—অবিকল সেই রকম—" সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘুসি খাইয়া মিত্তিরদের ছেলে অজ্ঞান হইয়া যায়। স্কুলে মহা হৈ চৈ—

হেডমাষ্টার বলিলেন—"এমন গোঁয়ার ছেলেকে স্কুলে রাখা 'সেফ' নয়।" অনেক বলিয়া কহিয়া তবে হেডমাষ্টার মহাশয় সেবারকার মত তাহাকে ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন। নামটা রহিয়া গেল।

• • • •

কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার এক কাণ্ড।

এ ব্যাপারটাও হাস্যকর।

কিন্তু কালোর ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক।

ছেলেরা খাতায় শব্দরূপ লিখিতেছিল।

পণ্ডিতমশায় ঘুমাইতেছিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া এবং টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া—অর্থাৎ রোজই যেমন করেন।

হঠাৎ পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই তাঁহার কানে আসিতেছিল পিছনের বেঞ্চি হইতে যে জাতীয় শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা ঠিক শব্দরূপ লেখার শব্দ নয়।

'খিক্—খিক্—খিক্—'

পণ্ডিত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার সেই শব্দ—খিক্—খিক্—! কারণ কি অনুসন্ধান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই কারণটি হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার টিকিটি কে দড়ি দিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে।

পণ্ডিতের সন্দেহ হইল—এ কালোর কাজ।

কালো শপথ করিয়া বলিল যে সে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না।

পণ্ডিতের বিশ্বাস হইল না।

গেলেন তিনি হেডমাষ্টারের কাছে।

হেডমাষ্টার একটু পরেই বেত্র-হস্তে দর্শন দিলেন।

ক্লাশ-সুদ্ধ ছেলে বেত খাইল কিন্তু অপরাধীর নাম বলিল না। তখন প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা ডাকিয়া ডাকিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় আপিস-ঘরে জেরা সুরু করিলেন।

এই জেরার মুখে পড়িয়া ফটিক নামক ছেলেটি ভয়ে ভয়ে যে উক্তিটি করিল হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত সেটি বিশ্বাস করিলেন। ইহাই তাঁহারা চাহিতেছিলেন।

কালো 'রাস্‌টিকিট' হইয়া গেল।

কালোর মত গুণ্ডা ছেলেকে ইস্কুলে হইতে দূর করিয়া দিয়া সমস্ত শিক্ষকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু অন্ধকারে বোঁ করিয়া একখানা লাঠি আসিয়া লাগিল হেডমাষ্টারের পায়ে। ভদ্রলোক খোঁড়া হইয়া গেলেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা লক্ষ্য করিয়া কে একদিন একটা পচা মুরগীর ডিম ছুঁড়িয়া মারিল। সেই দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা লইয়া আজিও অনেকে হাসাহাসি করে।

ফটিকের গালেও অন্ধকারে কে একদিন ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলের সন্দেহ হইল—কালো।

কালোর বাড়ীতে খোঁজ করা হইল। কালোর মা বলিলেন "কালো ত মামার বাড়ী গেছে—এখানে সে নেই ত—"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা।

মরাইএর পিছনে বসিয়া বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।

এইরূপে লেখাপড়া তাহার ইতি হইয়া গেল।

* * * *

বাড়ীতেও সে কি কম দৌরাত্ম্য করিত।

বিধবা মায়ের একটি মাত্র ছেলে।

পান হইতে চুণ খসিবার জো ছিল না।

একদিন তরকারীতে নুনই বুঝি একটু কম হইয়াছিল। ছেলের সে কি রাগ! লাথি মারিয়া ভাতের থালাটাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমন সুন্দর কাঁসার থালাটার কানাটা ফাটিয়া গেল। আর একবার—জলে বুঝি একটু ময়লা ছিল—আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল গেলাসটাকে। সেটাও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে কাঠের সিন্দুকটার ভিতর।

* * * *

তারপর আর একদিন।

কি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কাণ্ড!

পশ্চিম দিকের সিঁদুরে গাছটায় সেবার আম আসিয়াছিল প্রচুর। টুকটুকে লাল লাল আমগুলি—যেন আবীর মাখা।

কিন্তু ওই দেখতেই।

টক্—বিষ।

কালোই বলিত—"কাগ দেশান্তরি—বাঁদর বোবা—"

অর্থাৎ কাক যদি খায় দেশ ছাড়িয়া পালাইতে হইবে তাহাকে। বাঁদরের মত অম্ল-রসিকও যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে। এমন আমের গুণ!

সেই আম গাছে একদিন কে একটা ছোঁড়া ঢিল মারিয়াছিল। কালোর নজরে পড়িয়া গেল।

কালো হাঁকিল—কে—রে—

ছোঁড়া ত দে ছুট!

কালোও ছুটিল।

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলাকার কাঠ-ফাটা রোদ।

গ্রাহ্য নাই—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে কালো—ছোঁড়াটার পিছনে।

ধরিয়াই মার।

নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল ছোঁড়াটার।

তাহা লইয়া সে কি কাণ্ড! থানা-পুলিশ হইবার উপক্রম। গোটা দশেক টাকা খরচ করিয়া কালোর মা শেষে মিটাইয়া ফেলিল গোপনে।

* * * *

তারপর কালোর বিবাহ।

এই ত সেদিনের কথা।

সুন্দরী একটি ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখিয়া কালোর মা কালোর বিবাহ দিলেন। বেশ বড় সড়—সুন্দরী বউ।

ভাবিলেন ছেলের সংসারে মন হইবে—আর দস্যিপনা করিবে না। ছেলের মন কিন্তু গেল অন্য দিকে।

শ্বশুর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ একটি হার্ম্মোনিয়াম দিয়াছিলেন। ওই হার্ম্মোনিয়ামই হইল কাল।

দুনিয়ার যত বেকার ছোকরা ওই হার্ম্মোনিয়াটাকে কেন্দ্র করিয়া আসিয়া জুটিল এবং গলা সাধিতে লাগিল।

ক্রমশঃ একটা সখের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিল।

কালোর নাওয়া-খাওয়ার অবসর নাই।

থিয়েটারের মহড়া দিয়া কালো বাড়ী ফিরিতে লাগিল কোনদিন

বারোটায়—কোন দিন একটায়—কোন দিন তারও পরে। ছেলেমানুষ বউ বেচারি ভাত আগলাইয়া বসিয়া ঢোলে!

এক দিন বুঝি সে বলিয়াছিল—"একটু সকাল সকাল ফিরতে পারো না তুমি? একলা রাত্রে জেগে বসে থাকতে ভয় করে না আমার বুঝি!"

উত্তরে কালো তাহার চুলের ঝুঁটিটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিয়াছিল—"ইস্—ভারি মনিব এসেছেন আমার!" বউটার কি সে কম নাকাল করিত!

*  *  *  *

এমনই কত ঘটনা।

গ্রামের প্রত্যেকেই একটা দুইটা জানে।

কালোর বিরুদ্ধে সকলেরই একটা না একটা নালিশ ছিল। সকলকেই জ্বালাইত সে।

*  *  *  *

আজ কিন্তু সকলে তাকে ক্ষমা করিয়াছে।

খোঁড়া হেডমাষ্টার, পণ্ডিত মহাশয়—এমন কি ফটিক পর্য্যন্ত।

বিধবা মা কালোর সমস্ত দুষ্কৃতিগুলি পরম স্নেহভরে আজ স্মরণ করিতেছেন। বউটি তার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানার স্মৃতিটিকে অশ্রু-সিঞ্চনে পরম মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

আর তো সে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে আসিবে না।

কাল রাত্রে সে মারা গিয়াছে—

হঠাৎ একদিনের জ্বরে।

# বংশগৌরব

"জমিদার সূর্য্য চৌধুরীর কথা এখনও লোকে ভোলে নি, বুঝলে? শোন তবে একটি গল্প বলি। গল্প নয়—সত্যি কথা। নিজের চোখে দেখিনি—বাবার মুখে শুনেছি।

সবে তখন শিঙ্গাপুর জমিদারিটা কেনা হয়েছে। আসল জমিদার যিনি ছিলেন তিনি ত টাকা কড়ি নিয়ে চম্পট দিলেন বিলেতে। তিনি ছিলেন নীলকর সাহেব। তখন নীলকর সাহেবরা চাটি-বাটি গুটিয়ে সব সরে পড়ছেন। আসল জমিদার টম সাহেব চলে' গেলেন—কিন্তু তাঁর ম্যানেজার লং সাহেব আর নড়তে চায় না। সে ব্যাটা কুঠি দখল ক'রে ব'সে রইল। তাঁকে খবর পাঠান হলো।

ব্যাটা কি বললে জান?

বললে 'আমার ছ'মাসের মাইনে ছ'হাজার টাকা বাকী আছে। আমার মালিক টাকাটা তোমার কাছে নিয়ে নিতে বলেছে। টাকাটা পেলেই আমি চলে' যাব। জমিদারি কেনার সময় একটা সর্ত্ত ছিল যে, ম্যানেজারের বাকী মাইনেটাও দিয়ে দিতে হবে।'

সর্ব্বৈব মিথ্যে কথা—বুঝলে?

ব্যাটা এক জাল ডকুমেণ্টও বার করলে।

সকলের চক্ষু স্থির।

সূর্য্য চৌধুরী কিন্তু দমবার ছেলে নয়, তাঁর তখন চারটে হাতী, চোদ্দটা ঘোড়া—শতখানেক পালোয়ান, বরকন্দাজ। প্রবল প্রতাপ—বুঝলে?

তিনি ইচ্ছে করলে সেই দিনই ব্যাটাকে মেরে গ্রামছাড়া করতে

পারতেন। কিন্তু তাঁর সেই দিন মেজাজটা খুব ভাল ছিল। সেদিনই তাঁর নাতি হয়েছে—অর্থাৎ শর্মা জন্মগ্রহণ করেছে—"

বলিয়া বক্তা নিজের বক্ষঃস্থলে আঙুল দিয়া টোকা দিলেন।

"তাই সে দিন তিনি আর মার-ধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গেলেন না। ম্যানেজার বেহারী বাবুকে ডেকে বল্লেন 'ওহে, একটা কোন ফন্দি ক'রে লোকটাকে তাড়াতে হবে। এক কাজ কর, ব্যাটারা শুনেছি চা না খেলে টিকতে পারে না। এক কাজ কর—চা যাতে না খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা কর। বেশী কিছু করতে হবে না—গ্রামের সব গয়লাকে আজকে ডাকিয়া আনাও—সকলকে—'

ম্যানেজারবাবু গয়লাদের ডাকবার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজার বাবু চলে' গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শঙ্কর সিংকে ডেকে পাঠালেন। শঙ্কর সিং—দুর্দ্ধর্ষ জোয়ান, লম্বা প্রায় সাত ফিট—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া গালপাট্টা।

শঙ্কর সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই তার উপর হুকুম হয়ে গেল—লং সাহেবের যত গরু মহিষ আছে—সব রাতারাতি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশক্রোশ দূরে—আমদাবাদ খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে সায়েবের গোয়ালে যেন একটি গরু মহিষ না থাকে—

শঙ্কর সিং সেলাম করে চলে গেল।

বিকেল নাগাদ সব গয়লারা এসে পৌছে গেল। আশ-পাশের দশখানা গ্রামের যত গোয়ালা ছিল—সব হাজির। ঠাকুরদা তাদের উপর কড়া হুকুম জারি করলেন যে, তাদের যত দুধ হয় সব তিনি কিনবেন—লং সাহেব যেন এক ফোঁটা দুধ না পায়:

যদি কেউ লং সাহেবকে এক ফোঁটা দুধ বিক্রি করে তা'হলে তাকে আর আস্ত রাখা হবে না। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে জুতো মেরে তাকে জমিদারি ছাড়া করা হবে।

গোয়ালারা সমস্বরে বল্লে—'যো হুকুম—'

গোয়ালার দল চলে' গেল।

ঠাকুরদা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—'চা খাওয়া বার করছি ব্যাটার—'

তার পরদিন লং সায়েবের কুঠিতে হুলুস্থুল ব্যাপার।

খানসামা এসে সেলাম ক'রে জানালে—'হুজুর দুধ কাঁহু নেই মিলতা'—শুনে লং সায়েবের মুখখানা লং হয়ে গেল।

মেমসায়েব স্তম্ভিত।

মেম সাহেব ভীতু লোক ছিলেন। তিনি সাহেবকে অনুরোধ করতে লাগিলেন—মিষ্টার চৌধুরী শুনেছি ভয়ানক লোক। ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ঠিক নয়—

লং সায়েবের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ।

বল্লেন—'ইউ কিপ কোয়ায়েট।'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গেলেন থানায়।

জমিদার সূর্য্য চৌধুরীর নামে গরু-চুরির নালিশ করতে। গিয়ে দেখেন থানায় দারোগা নেই—সেই দিন ভোরেই—দারোগা সায়েব মফঃস্বলে 'টুরে' বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা জমাদার সায়েব বলতে পারলেন না।

দারোগা সায়েব ঠাকুরদার মহা-ভক্ত ছিলেন।

না হবেনই বা কেন?

তখনকার দিনে এমন কোন অফিসার ও'অঞ্চলে ছিলেন না যিনি ঠাকুরদার জমিদারির দই, দুধ, ক্ষীর, ঘি, মাছ না খেয়েছেন। আর তা-ও কি একটু আধটু। মণ মণ।

যাক—লং-সায়েব ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিনা দুধেই খানিকটা চা গলাধঃকরণ করলেন। বেচারা!

তার পরদিন কিন্তু এক কাণ্ড ঘটল!

কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিল যে সায়েব দুধ পেয়েছে।

সে কি? কে দুধ দিলে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে।

তখখুনি চর ছুটল সঠিক সংবাদ আনবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চর এসে খবর দিলে—সে খানসামার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে—সায়েব শহর থেকে টিনের দুধ আনিয়েছে। টিন ছ্যাদা করে তার থেকে দুধ বের করে চায়ের সঙ্গে গুলে খাচ্ছে।

ঠাকুরদা বল্লেন—'টিনের দুধ? সে কি?'

তখনও কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্কের চলন হয় নি—বুঝলে?

ঠাকুরদা ত আকাশ থেকে পড়লেন।

টিনের দুধ? বলে কি।

যাই হোক শূর্ধ্য চৌধুরী দমবার ছেলে নয়।

বজ্র-নির্ঘোষে হাঁক ছাড়লেন—শঙ্কর সিং—

শঙ্কর সিং এসে হাজির হল।

ঠাকুরদা হুকুম দিলেন লং-সায়েব কুঠিতে বসে কি এক টিনের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে—এক্ষুনি গিয়ে সেই টিন কেড়ে নিয়ে এসো। যাও—

শঙ্কর সিং বেরিয়ে গেল।

পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা সায়েব ভাল করে চা খেতে পায় নি। অবস্থাটা বোঝ একবার—প্রাণ একেবারে খাঁ খাঁ করছিল! টিনের দুধ শহর থেকে আনিয়ে বেশ বাগিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। সকাল বেলা।

চায়ের টেবিলের ঠিক সামনেই—কাচের দরজা বন্ধ। চা খাওয়া চলছে, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ টগবগ করতে করতে শঙ্কর সিং এসে হাজির—হাতে প্রকাণ্ড এক বর্শা। তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে শঙ্কর সিং সোজা সেই কাচের দরজার সামনে এসে হাজির হ'ল।

এসেই এক লাথি।

ঝনঝন করে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের টিন নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গিয়ে শঙ্কর সিং ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সায়েব হতভম্ব।

মেম সায়েব মূর্চ্ছিত।

"সেই দিনই সায়েব তল্পি-তল্পা গুটিয়ে—"

এমন সময় বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

'ঘণ্টা বেজে গেল নাকি? আর নয় ভাই আমাদের সায়েব-ব্যাটা ভয়ানক ষ্ট্রিক্ট! একটু দেরী হলেই 'ফাইন' করে—'

এই বলিয়া বক্তা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের পৌত্র চরণ বাবু—বর্ত্তমানে সদাগরি অফিসে কেরাণীগিরি করেন।

খাসা গল্প বলিতে পারেন ভদ্রলোক।

# ভূত

## এক

জনশ্রুতি, দেবরাজ ইন্দ্রই বজ্রধর। কিন্তু জরাজীর্ণ বুড়া পিওনটাও যে বজ্র হানিতে সমর্থ তাহা সেদিন সকালে বোঝা গেল। সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে করিয়া নির্ব্বাক সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত লিখিতেছে—

"আমার চিঠি পেয়ে তুমি কষ্ট পাবে জানি—কিন্তু তবু না লিখেও ত উপায় নাই। বিশ্বাস করো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কিন্তু বাবা, মা, ইন্‌টারকাস্‌ট বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। এ অবস্থায় তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। যাঁরা আমাকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁদের মনে এতবড় একটা আঘাত দিতে পারব না। তাঁদের আশীর্ব্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে? কি করব বল—এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভবপর হ'ল না। যদি পরজন্ম থাকে এবং সেই পরজন্মে যদি আমরা এক জাত হ'য়ে জন্মাই এবং এই জন্মের স্মৃতি যদি পরজন্মে জাগরূক থাকে তা হ'লে হয়ত আবার মিলন হবে।

তুমি রাগ কোরো না। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার দুঃখের ভাষা নেই। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা যে, তোমার জন্যেই আমি দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখই প্রেমকে মহিমান্বিত করে। যদি সম্ভব হয় অল্প কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রের বজ্র কি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ?

## দুই

কিন্তু নিদারুণতর আর একটি বজ্র উদ্যত হইয়া ছিল।

সেটি পড়িল দুই দিন পরে।

সেই জরাজীর্ণ রোগা পিওনই সেটি ছাড়িয়া গেল।

ক্ষুদ্র পত্র—কিন্তু সাংঘাতিক সংবাদ।

প্রশান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে।

সূর্য্য-সমেত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।

## তিন

সুষমা মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী।

বিস্তৃত স্কুল কম্পাউণ্ডের এক ধারে তাহার ফ্রি কোয়ার্টার্স। সেই কোয়ার্টার্সে সুষমা ও আর একজন প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ বোস থাকেন। পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইজনে শয়ন করেন। মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।

গভীর রাত্রি।

হঠাৎ সুষমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আলুথালুবসনা মিসেস্ বোস পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

ব্যাপার কি?

জানালায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিসেস্ বোস মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারী বাবুর বখাটে ভাইপোটা! ছোক্রার চাল-চলন,

আচার ব্যবহার বহুদিন হইতে মিসেস্ বোসের বিরক্তির কারণ হইয়া আছে। অথচ হাতে-নাতে ছোকরাকে ধরিবার উপায় নাই। সঙীন ধূর্ত্ত!

সুষমা মিসেস্ বোসকে কিছু বলিল না।

সে কিন্তু স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

প্রশান্তর ছায়া-মূর্ত্তি।

অবিকল!

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

## চার

সুষমা খাট টানিয়া মিসেস্ বোসের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

মিসেস্ বোসের শয়নঘর হইতে স্কুলের পিছন দিক্‌কার অশ্বত্থ গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কি ভীষণ ঝাঁকড়া দেখায় গাছটা! সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুষমা সভয়ে দেখিল, ওই গাছটার নীচু ডালটাতে বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে! অস্তমান চন্দ্রকিরণে ওই যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

প্রশান্ত!

সুষমা শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

* * * *

আর একদিন মনে হইল, বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া কে যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

তাহার চক্ষুতে ক্ষুধার্ত্ত সে কি দৃষ্টি!

চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

পাশের খাটে শুইয়া মিসেস্ বোস নাক ডাকাইতেছেন। সুষমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রশান্তের প্রেত-দৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মত তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে!

সে সভয়ে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

আর এক দিন সন্ধ্যার পর সে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

গেটে ঢুকিতে যাইবে—মনে হইল, তার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া সে চলিয়া গেল। হঠাৎ যেন গেটের পাশের ঝোপটায় মিলাইয়া গেল।

* * * *

জীবিতাবস্থায় যে প্রিয়তম ছিল—মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইলেই সুষমার গা ছম্ ছম্ করে!

## পাঁচ

সেদিন ছুটি ছিল।

মিসেস্ বোস ছিলেন না—ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। রাত্রে সুষমা ভাবিল করুণা দিদিকে (আর একজন শিক্ষয়িত্রী) পাশের কোয়ার্টার্স হইতে ডাকিয়া আনিবে। ডাকিতে গিয়া দেখিল করুণা দিদির আপত্তি নাই—কিন্তু মেনুদির ঘোর আপত্তি! তিনি একা শুইতে পারিবেন না।

নিরুপায় সুষমাকে চাকরটার উপর ভরসা করিয়া একাই শুইতে হইল।

গভীর নিশীথে ললাটে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সচকিতা সুষমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হিমশীতল স্পর্শ!

ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, একেবারে শিয়রে বসিয়া আছে।

চীৎকার…ফিট্!

কিছুক্ষণ পর সুষমা চক্ষু মেলিল।

স্বয়ং ভূত জলের ঝাপ্টা দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভাঙাইতেছে।

সুষমার গলায় কেমন যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। পেটের মধ্যে কি যেন একটা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। ভূত কিন্তু নাছোড়!

ক্রমাগত জলের ঝাপ্টা দিয়া চলিয়াছে।

## ছয়

পরদিনই সুষমা কাজে ইস্তফা দিয়া দিল।

গত্যন্তর ছিল না।

জিনিস পত্র গুছাইয়া অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।

"ছি-ছি—কি লজ্জা—"

"বাবা-মার যখন মত পেয়েছি তখন আর কাকে ভয়? ট্রেণটা পেলে হয় এখন! তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখ্‌ছিলাম আর কি!"

ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিল!

# জগমোহন

## এক

বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

জগমোহন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—বাইরে শোন্!

বাহিরে উঠিয়া আসিলাম।

কি?

কিছু নয়। একটা বিড়ি দে।

বিড়ি দিলাম।

জগমোহন কখনও বিড়ি কিনিয়া খায় না। চিরকাল সে পরস্মৈপদী ধূমপান করিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধব মহলে জগমোহনকে বিড়ি দেওয়াটা একটা রেওয়াজের মত হইয়া গিয়াছে।

নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জগমোহন বলিল,—

বিপ্‌নের আদিখ্যেতার কথা শুনেছিস? সে গোঁফ কামাতে রাজী নয়।

সংবাদটা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

কারণ বিহার বন্যায় অর্থ সাহায্য করা যে নাট্যাভিনয়ের উপর নির্ভর করিতেছে সেই নাটকের প্রধান নায়িকা বিপিন।

বলিলাম,—আগে ত কিছু বলেনি সে—

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া বার করছি ওর থাম্‌না।

রোষকষায়িত লোচনে জগমোহন বিড়িতে টান দিতে লাগিল।

## দুই

বিপিন সমাদ্দার গত বৎসর পূজার সময়ও 'সীতা' সাজিয়াছিল। সম্প্রতি অর্থাৎ বউ আনিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।

শুনিয়াছি ডাম্বেল-মুদ্গর-সহযোগে পেশীসমূহের উন্নতিবিধান করিতেছে—গোঁফও আর কামায় না। অধিকন্তু কস্‌মেটিক্ সাহায্যে গুম্ফপ্রান্তদ্বয়কে সূচালো করাই বর্ত্তমানে তাহার সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন-জাতীয় একটা শোভা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে জমকালো একজোড়া জুল্‌ফিও সে রাখিয়াছে।

রাখুক!

কিন্তু জগমোহনের যুক্তি ও উক্তি সাধুভাষায় ব্যক্ত করিলে এই দাঁড়ায়—গ্রামের মুখ-রক্ষা করা প্রত্যেক গ্রামবাসীরই কর্ত্তব্য। যে করে না সে শূকর। দেশের এই দুর্দ্দিনে থিয়েটার করিয়া কিছু অর্থ সাহায্যই যদি না করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর্ট-চর্চ্চা করার কোন অর্থ হয় না। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্'—ইহা নিতান্ত উজ্‌বুকের কথা। বাজে কথাও।

জগমোহনের মুখে এসব কথা সাজে।

কারণ গ্রামের জন্য জগমোহন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহার গ্রাম-প্রীতি এতই প্রবল যে গ্রামের মাইনর ইস্কুলটা হাই ইস্কুল হইল না বলিয়া সে মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়াই পড়াশুনা খতম করিয়া দিল। তাহারই লেখালেখি ও চেষ্টায় গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটি হইয়াছে। সে চাঁদা সাধিয়া না বেড়াইলে বারোয়ারি-মণ্ডপটি হইত কিনা সন্দেহ। গ্রামের সমস্ত বিবাহে জগমোহন বাঁধা বরযাত্রী। সে যাইবেই

এবং কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গিয়া গ্রাম-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত-জিহ্ব হইয়া থাকিবে। এ লইয়া বহুবার বহুস্থানে সে হাতাহাতি করিয়াছে। একবার নিকটবর্ত্তী শহরে সমাগত এক সার্কাস দেখিতে গিয়া জগমোহনের সার্কাসে ঢুকিবার বাসনা হয়। সুতরাং সার্কাসের একটি ছোকরার সহিত ভাব করিয়া সে সেই আশায় তাহার সহিত একটু মাখামাখি করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা নাক তুলিয়া তাহাকে বলিয়া বসিল—সার্কাসে ঢোকা কি সোজা কথা হে! আমাদের মত শহুরে ছেলেই হিমসিম খেয়ে গেছি। অজ পাড়াগাঁয়ে ত কাটালে এতদিন—মুখের কথা খসালেই অমনি নিয়ে নেবে তোমাকে! এ কি চাট্টিখানি কথা—

জগমোহন ঘৃণায় সেই দিনই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—ধড় থেকে মুণ্ডুটি তক্ষুনি বাছাধনের নামিয়ে দিতুম যদি না—

বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে সে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর সক্ষোভে বলিল—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একেবারে মনুষ্যত্বের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করেছে—বুঝছ না? দাও একটা বিড়ি দাও। দেখি যদি মিত্তির মশাইকে পগিয়ে একটা দরখাস্ত করতে পারি। গ্রামে একটা চেরিটেব্‌ল ডাক্তারখানা নইলে আর চলছে না। কিনে আর কাঁহাতক ওষুধ খাওয়া যায়—

পরদিনই সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়া গেল।

মিত্র মহাশয়কে দিয়া দরখাস্ত লিখাইয়া, চাঁদা সাধিয়া সে বহু চেষ্টায় ছোটখাট সরকারি ডিস্‌পেন্‌সারিও একটি খাড়া করিয়াছে। চাঁদার

পরিমাণ প্রথমে আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু জগমোহন নিজেই দুইশত টাকা দান করিয়া বসিল। দান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কিন্তু জমিদারের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের গলা হইতে একটি সোনার হার চুরি হইয়া গেল।

জগমোহন শুনিয়া বলিল—ওদের চুরি যাবে না ত যাবে কার! চাঁদা চাইতে গেলুম কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে! ভগবান বলে একজন আছেন ত!

গ্রামের যাবতীয় কুৎসা সংগ্রহ করা জগমোহনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য! কিন্তু গ্রামের কুৎসা লইয়া গ্রামান্তরের কেহ আলোচনা করুক দেখি! ছলে বলে কৌশলে জগমোহন তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিবেই।

সুতরাং গ্রামে জগমোহনের অনুরাগী একটি দল ছিল।

জগমোহন নিজে থিয়েটার করে না।

কিন্তু থিয়েটারের সে-ই প্রধান পাণ্ডা। ষ্টেজ বাঁধা, চাঁদা তোলা, টিকিট বিক্রী করা, ড্রেস আনানো, রিহার্স্যালের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক অভিনেতাকে উৎসাহ দেওয়া—সব জগমোহন!

নবাগত ডাক্তারবাবুটিও থিয়েটার-ভক্ত।

তিনিও জগমোহনের বন্ধু ছিলেন।

আমি ত ছিলামই।

## তিন

গভীর রাত্রে জগমোহনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া নামিয়া আসিলাম।

যাহা শুনিলাম তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল।

জগমোহন বলিল—শিগ্‌গির চল্—বিপ্‌নের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একটা বিড়ি দে চট্ ক'রে।

জগমোহনের সঙ্গে দেখিলাম নিতাই, করালি ও হাবুল রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে ভীত চকিত ভাব।

জগমোহন বলিল,—তুই এদের নিয়ে এগো—আমি থানায় চল্লাম।

* * * *

বিপিনের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞান বিপিনের গোঁফ ও জুলফি অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিষ্কার কামানো।

বউ পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গ্রামের প্রান্তে বিপিনের বাড়ী। জগমোহনের বাড়ীর পাশেই। বিপিনের বৃদ্ধ পিতামাতা সম্প্রতি তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। কাছে-পিঠে এক জগমোহন ছাড়া আর কেহ নাই। সুতরাং ডাকাতির সুবিধা আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাকাতে গোঁফ ও জুলফি ব্যতীত আর কিছুই অপহরণ করে নাই। বিপিনের স্ত্রীর সহিতও তাহারা সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে।

ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ।

গভীর রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন মুখোসপরা লোক প্রাচীর টপকাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বিপিনকে ডাকিতে থাকে। বিপিন বাহির

হইবামাত্র তাহারা তাহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলে এবং একটা ঠোঙার মত জিনিসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া শুঁকাইতে থাকে।

বিপিনের স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী জগমোহন যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় তখন দস্যুগণ বিপিনের গোঁফ ও জুল্‌ফি কামাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

একটু পরেই স-দারোগা জগমোহন আসিয়া হাজির হইল।

গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া দারোগাবাবু কি সব টুকিয়া লইলেন।

তাহার পর হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অদ্ভুত কাণ্ড! যাক্ আর কোন ভয় নেই।

বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

দারোগাবাবু লোক ভাল।

জগমোহনের বন্ধু। নাট্যামোদী।

যে নাটকটি অভিনয় হইবে তাহাতে তিনিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

জগমোহন আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল এবং বলিল—দে একটা বিড়ি দে—

# চৌধুরী

## এক

পুরা নাম কংসারি চৌধুরী।

লোকে সংক্ষেপে বলে চৌধুরী।

বহুকাল পূর্ব্বে কংস চৌধুরীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই একবার দর্শনের ফলেই মনের মধ্যে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল তাহা আজও মোছে নাই। মনে হইয়াছিল যেন একটা সিংহ অথবা শার্দ্দূল মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।

ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখখানা।

আরক্ত চক্ষু দুইটি জাজ্বল্যমান।

ভ্রূযুগল-মধ্যে রক্ত সিন্দুরবিন্দু।

একমাথা কোঁকড়ান বাব্‌রি চুল—মাঝখানে সিঁথা।

শক্তিব্যঞ্জক মাংসল ওষ্ঠাধরে স্পর্দ্ধা-ক্রূর নীরব হাস্য।

হাসিলে অথবা কথা কহিলে উগ্র শাদা শ্বাদন্তগুলি চক্ চক্ করিয়া ওঠে—নাসিকা কম্পিত হইতে থাকে।

ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল।

## দুই

একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছি অনেক। বস্তুত এই স্বল্পভাষী দুর্দ্ধর্ষ লোকটির সম্বন্ধে নানা কাহিনী না শুনিয়াছেন এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল।

সমস্ত কাহিনীরই মূল কথা এক।

চৌধুরীকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে হটাইতে পারে নাই।

চৌধুরী গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু এখন তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমিদার।

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী"—শিরোনামা-সম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাঁহার দরবারে পৌঁছিতেছে।

দুর্দ্দান্ত কর্ম্মী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে তিনি অপরাজেয়।

কখনও কাহারও কাছে হার মানেন নাই।

জাল, জুয়াচুরি, ঘুস, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল—কার্য্যসিদ্ধির জন্ত যখন যেটার প্রয়োজন কাজে লাগাইয়াছেন।

কিছুতেই চৌধুরী পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

দারোগা, উকিল, ডাক্তার, হাকিম সকলেই চৌধুরীর নামে তটস্থ—সকলেই তাঁহার করায়ত্ত।

চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হাস্ত করিয়া বলিতেন—

"জুতো মারব আর কাজ আদায় করে নেব। চামড়ার জুতোয় না কুলোয় চাঁদির জুতো লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সব!"

এবং সত্যই সব ঠিক হইয়া যাইতেছিল।

চৌধুরী করেন নাই কি?

গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা,

বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ—এমন কি শিশু-হত্যা পর্য্যন্ত।

যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ দেশে এরূপ অদম্য চরিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

একটা গরুর গাড়ী যেন মন্ত্রবলে মোটরের গতি লাভ করিয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকলেই আমরা আশ্চর্য্য হইতাম।

লোকটা কখনও কোন বিষয়ে হার মানিল না।

হাতীর মুখে লাগাম লাগান যায় না বলিয়া চৌধুরী হাতীই চড়িতেন না!

## তিন

হঠাৎ কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল।

চৌধুরী সহসা অন্ধ হইয়া গেলেন।

অকস্মাৎ!

চতুর্দ্দিক হইতে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য আসিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিবে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন—

'কিছুতেই না?'

'না—'

'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও না?'

'না—'

একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চৌধুরী তাঁহার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলিলেন—'বল কি হে! পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল!'

দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরী আবার বলিলেন—

'আচ্ছা যাও—তুমি ওষুধটা নিয়ে এস—'

দেওয়ানজী চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া দেখেন বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।

রিভলভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুলি করিয়াছেন চোখেই।

# ভোম্বলদা

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হইলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া ওঠে। হাতে এক টিপ্ নস্য লইয়া এবং নাকের আশপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হইতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিকমাত্রকেই সহাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য।

—মাতুল যে,—মাছ কত ক'রে কিন্‌লে? গ্র্যাণ্ড মাছ ত! ছ' আনা সের? বল কি!

বাজার দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ' আনাতে। ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বলিলেন—ড্যাম চীপ্!

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহঙ্কার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুসি হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—আফিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

—ভূতো যে রে, মাছ কিনেছিস দেখছি—কত ক'রে পেলি? ছ' আনা সের? ড্যাম—

ভোম্বলদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভূতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মতন লোকের লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার! ছ' আনা সের মাছ? কিনে খেতে পারি আমরা!

ভোম্বলদার চক্ষু কপালে উঠিল।

—ছ' আনা সের! বলিস্ কিরে! গলা কাট্‌ছে বল্!

ভূতো বলিতে লাগিল—

—আধ সের কিনেছি—এই দেখ না—বড় জোর চার-পাঁচ পিস্ হবে! তিনগণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েল্‌ভ্ পাইস্ কিন্তু সাফ্ হয়ে গেল!

—দিনকাল বড় খারাপ পড়ল—সত্যি।

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দে নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন!

—এক টিপ্ আমাকে দাও ভোম্বলদা। আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো হাতই জোড়া আমার—

—এই যে,—টান্ ভাল করে—

ভোম্বলদা এক টিপ্ নস্য ভূতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

ভূতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস-সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা এবং সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

—অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই চমৎকার হ'য়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে, এ যে গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর না কি? দেখি, দেখি—বাঃ—

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাতে দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন—বাঃ এ যে প্রায় সার্জ্জের মতন। চমৎকার জিনিস ত!

চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যবাণী করার মত ধরণে অক্ষয়বাবু বলিলেন—সার্জ্জই হোক আর চটই হোক—খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্যে আপনারা যে প্রাণপাত করছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস্ না হ'লে কিছু হয়? খদ্দরটা কিন্তু বেশ চমৎকার। খাপির ওপর বেশ ইয়ে—কত করে গজ?

দেড় টাকা বোধ হয়। ঠিক মনে নেই—

দামও ত এমন কিছু বেশী নয়—বাঃ।

ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের ওখানে যেতে হবে। লোকটা শুন্‌ছি অ্যাণ্টি-কংগ্রেস প্রোপাগ্যাণ্ডা করছে।

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন—ছাড়িয়া দিলেন।

দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ওপাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—খুড়ো, পাশ কাটাচ্ছ যে! খবর সব ভালো ত?

খর্ব্বকায় বালাপোষ-আবৃত খুড়ো রাস্তাটা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—খবর আর কি! সূর্য্য চন্দ্র এখনও উঠছে ভালোর মধ্যে এই। সারা বাজারটা ঢুঁড়ে বিলিতি গরম মোজা একজোড়া পেলাম না হে।

তাই না কি?

হ্যাঁ হে! আগে সেই যে সাদা—একটু হলদেটে গোছের একরকম যোজা আসত। এক জোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! প'রেও আরাম—টেঁকেও অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম এক জোড়া। ঠেসে-মেড়ে দুটি বছর পায় দিয়েছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে—সে ত লম্বা এক লেক্‌চারই ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। উচিত নয় সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম যোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক্ দিকি আমাকে!

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকার নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ্ নস্য লইতে লইতে চাপা-কণ্ঠে চুপি চুপি বলিলেন—এসব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন! বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে মার নেই! কাকে বলি বলুন! আজকাল অক্ষয়বাবুদের পোয়া বারো—। দিনকাল যা পড়ল ভালো জিনিস মেলাই দুর্ঘট!

ভোম্বলদা এমন একটা মুখভাব করিলেন যেন মনের গোপন কথাটি দয়াময় খুড়োর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিয়া তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

খুড়ো বলিলেন—ঐ যে বললাম—আজকাল ভালোর মধ্যে এই যে চন্দ্র সূর্য্য এখনও উঠছে! যাই দেখি, মাড়োয়ারিদের দোকানগুলো খুঁজি একবার। থাকলে ঐ ব্যাটাদেরই ওখানে থাকবে। শীতও বেজায় পড়েছে হে! চাকরির কিছু হ'ল?

ক'ই আর কিছু হ'ল!

খুড়ো গেলেন।

আসিল ফণী।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটি বালক—স্থানীয় স্কুলে পড়ে।

তাহার সহিতও ভোম্বলদা ফুটবল খেলা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন—তাহাকেও এক টিপ্ নস্য দিলেন। তাহাদের স্কুলের টীম সেদিন ম্যাচে ছয় গোলে হারিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ যে রেফারির পক্ষ-পাতিত্ব সে বিষয়েও তাহার সহিত একমত হইলেন।

ফণী চলিয়া গেলে আসিলেন টেকো ভটচায্।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আধুনিক ছেলেছোকরাদের নিন্দাবাদে সর্ব্বদাই শতমুখ। তিনি আসিয়াই আধুনিক ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ তুলিলেন এবং ভোম্বলদার আন্তরিক অনুমোদন পাইলেন। একটু পরেই অতি-আধুনিক ছোকরা বিমল আসিল এবং ধর্ম্মই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং সস্তার মধ্যে মুর্গীর ডিমই যে নির্ভেজাল শ্রেষ্ঠ খাদ্য ইহা লইয়া আলোচনা করিল এবং সে-ও ভোম্বলদার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

এইরূপে অনেকেই আসিল এবং গেল।

নস্যের টিপ্ হাতে ভোম্বলদা সারা সকালটা মোড়ে দাঁড়াইয়া সকলের সহিত সকল বিষয়েই একমত হইলেন।

ভোম্বলদার মনটি যেন জলবৎ—যখন যে পাত্রে রাখা যায় তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার চাকুরিটি গিয়াছে। অফিসে বড়বাবুর কাছে ছোটবাবুর সম্বন্ধে এবং

ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা সারল্যভরে ভোম্বলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে উভয়েই তাঁহার উপর মর্মান্তিক চটিয়া যান—ফলে চাকুরিটি যায়।

ভোম্বলদা সকলেরই মন রাখিয়া কথা বলেন—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কখনও কাহারও মন পান না। সকলেরই সকল কথায় সায় দেন—কিন্তু কেহই যেন তাঁহাকে আমল দেয় না। এমন কি, নিজের গৃহিণীও নয়। বাড়ীতে সকলের সকল প্রকার আচরণের সহিত সায় দিতে গিয়া এবং পরস্পর-বিরোধী কথা বলিয়া ফেলিয়া ভোম্বলদা গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া এত অশান্তির সৃষ্টি হয় যে ভোম্বলদা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

তখন ভোম্বলদার মুখখানি দেখিলে সত্যই বড় কষ্ট হয়।

তাঁহার তরল মনটি কিছুতেই যেন কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি!

দূরে গঙ্গার ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

সরল গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ।

হাসি নাই।

# মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণ-সমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্ন-সায়রে নিমগ্ন। শাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান মাছ-রাঙা পাখীগুলি সন্ধ্যারুণরাগ-রঞ্জিত। টলমল নদী জল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোভা।

তৃণাঙ্কিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধর-দেহ একটি গাভী।

আরও একটু দূরে মুদিত নয়ন একটি মার্জ্জার।

দেবালয়ে করুণ গম্ভীর সুরে নহবৎ বাজিতেছে।

পুরবীর অপরূপ আলাপ।

চতুর্দ্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি সুন্দর এই পৃথিবী।

• • • •

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি একটি ভিখারী এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া অনুনাসিককণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

একটি পয়সা বাবু—

সঙ্গের মেয়েটিও সে কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল সতেরো—

শরীরে কোন ব্যাধি আছে বলে মনে হইল না।

পরণে একটি মাত্র বসন—শতছিন্ন।

বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখ-চোখ ভাব-ভঙ্গী ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিণী ইতিপূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে—আর একজন যৌবনকে।

দুইজনকেই দুইটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূরে গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচ্‌কি হাসি।

নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনের শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

* * * *

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার।

সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—বিড়ালটা একটি ইঁদুর ধরিয়াছে। ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণ-পণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

* * * *

আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষ মেলিয়া সারি সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা নৌকাগুলি দেখিলাম জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিলাম।

আলোক সমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণ-সমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মাণ।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিণী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম পাশের বাড়ীর বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দ-শঙ্খধ্বনি সে শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সন্ত-পুত্রশোকাতুরা আমার গৃহিণী সজল চক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান বাঁচাইয়া রাখ।

অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলা উল্টাইতে লাগিলাম।

বহুবাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

—বহুবিফলতাসত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট অভিযানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান-যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালীর দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস—

দুয়ারে কড়া নড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এই চাকুরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটি পাইয়াছে।

এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুশী হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর-ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিতেছে।

পূর্ব্ব দিগন্ত জ্যোৎস্না-পুলকিত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি—সিগারেট কেস খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আমি আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।



# বনফুল

# রচনাবলী ০২